

ভারতের আধ্যাত্মিক, ধর্ম ও সমাজ দর্শনের আলোকে মনুস্মৃতির মূল্যায়ন

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Manu Smriti* before the
students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna
Mission Vivekananda University, Belur Math in the year 2012
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

হিন্দু ধর্মে যত শাস্ত্র আছে তার মধ্যে মনুস্মৃতিই সব থেকে বিতর্কিত শাস্ত্র। মনুস্মৃতিকে নিয়ে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যত তোলপাড় হয়েছে অন্য কোন শাস্ত্রকে নিয়ে সেই তুলনায় কিছুই আলোড়ন হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নেতা থেকে শুরু করে ‘সমাজ সংস্কারক’ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মনুস্মৃতি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করাটা একটা ফ্যাশান হয়ে গেছে। তাই ভারতীয় রাজনীতিতে মনুস্মৃতি এখনও বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে নিম্ন জাতির শ্রেণীর যখনই জাতপাত বা অন্য কিছু নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনই মনুস্মৃতি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোটা একটা উপাচারে দাঁড়িয়ে গেছে। মনুর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি শূদ্রদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তিকর নিন্দাজনক কথা বলেছেন, নারীদের বিরুদ্ধে মনুর কথাগুলো অযৌক্তিক এবং তিনি ছিলেন ঘোর নারী-স্বাধীনতার বিরোধী। আসলে তা নয়, পুরো ধারণাটাই ভুল। হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিরাট একটা জায়গা এখনও নিয়ন্ত্রিত হয় মনুস্মৃতিকে অবলম্বন করে। সমস্যা হল বেশীর ভাগ লোকই মনুস্মৃতি পাঠ করেনি বলে এদের কোন ধারণাই নেই মনুস্মৃতিতে মনু কি বলেছেন। এদের বেশীর ভাগই এখন ওখান থেকে আর লোকের মুখে কিছু কথা শুনে ভুলভাল ধারণার বশবর্তী হয়ে নানা রকম বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে বসে।

আমরা এখন মনুস্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। সমগ্র মনুস্মৃতি ঠিক ঠিক ভাবে অধ্যয়ন করতে একটি বছর লেগে যাবে। তাই এই স্বল্প সময়ের মধ্যে মনুস্মৃতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ, মনুস্মৃতির দর্শন আর এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কিছু আলোচনার মাধ্যমে মনুস্মৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করার চেষ্টা করব। কিন্তু সবারই একবার অন্তত পুরো মনুস্মৃতি অধ্যয়ন করে আমাদের ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে মনুস্মৃতির ভূমিকা জানা দরকার এবং বিশেষ করে আজকের দিনে মনুর বক্তব্যের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। মনুস্মৃতির মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের ভারতের হিন্দু ধর্মের কিছু মূল জিনিষগুলো নিয়ে আলোচনা করে নিলে মনুর বক্তব্যকে আমরা ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারব।

পুরুষার্থ

বিশ্বের যে কোন ধর্ম চারটে মূল স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু ধর্ম এই চারটে মূল স্তরের উপর দাঁড়িয়ে চারটে পুরুষার্থের কথা বলে – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আমাদের এই জীবনটা কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই জীবনে আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকব, বেঁচে থাকতে হলে আমাদের কি করণীয়, কোন জিনিষকে অবলম্বন করে এই মানবজীবনকে চালিত করে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব – এতগুলো প্রশ্নের উত্তর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা হয় তাকে বলা হয় পুরুষার্থ। পুরুষার্থের আরেকটি অর্থ হল, মানুষ যেখানে কোন কিছুর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যখন গরু কিনতে যায় তখন গরুর লেজে হাত দিয়ে দেখে। কিছু গরুর লেজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, আর কিছু গরু তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। তার মানে যারা এই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠছে তাদের মধ্যে শক্তি আছে, অর্থাৎ পুরুষার্থ আছে। ভেতরে দম থাকা মানেই পুরুষার্থ। বর্তমানে হিন্দু জাতিটা একেবারে ম্যাদামারা জাতিতে পরিণত হয়েছে, ভেতরে কোন দম নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, খেললাম, ঘুরলাম, খেললাম আবার শুয়ে পড়লাম, যা হোক তা হোক করে চলে গেলেই হল। এদের অনেকেই আবার কত রকম ধর্ম পালন করে যাচ্ছে, কিন্তু শক্তিটা ভেতরে আসছে না। এরই ভেতর আবার সন্তানাদিও হচ্ছে। তারাও জন্ম থেকে এগুলোই শিখছে। আমাদের ঋষিদের মধ্যে এই ধরণের জীবন যাপন কখনই দেখা যেত না।

একটি চিন্তা, একটা কোন কাজ নিয়ে দিনে তিন চার ঘন্টা লেগে থাকা, তাও একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস লেগে থাকলে ভেতরে শক্তির স্ফূরণ হতে শুরু করে। আমরা বলতে পারি, কেন? অফিসে তো আমি টানা পাঁচ-ছয় ঘন্টা কাজ করছি। কিন্তু ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সেখানেও আমরা অনবরত কাজ পালাচ্ছি, আর এই দুশ্চিন্তাও তখন থাকে কাজ না করলে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেবে, মাসের শেষে মাইনে পাবো না ইত্যাদি। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে নিজের ইচ্ছাতে। আমি এক মাস ছুটি নিয়ে ফাঁকা আছে, এখন আমি কি করব? কিন্তু আমরা একটি চিন্তা, একটি কাজ নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে থাকতে পারি না। যে মানুষ নিজের ইচ্ছাতে একটা কিছুতে টানা লেগে আছে সেটাকেই বলা হয় পুরুষার্থ। যখন তিন ঘন্টা সিনেমা দেখছি বা টিভিতে খেলা দেখছি সেখানে আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না, দৃশ্য গুলো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, আমি বসে বসে উপভোগ করছি। এটাকে বলে Passive Participation। Passive participation যেখানে হয় সেটাকে কখন পুরুষার্থ বলে না। যেখানে Active participation আছে সেটাকেই বলা হবে পুরুষার্থ। পুরুষার্থ মানে যেখানে সব কিছুর ব্যাপারে জোর চেপ্টা চালান হচ্ছে। এখন আমরা কিসে চেপ্টা চালাচ্ছি? রোজ সকালে নাকে মুখে গুজে অফিসে যাচ্ছি, বস্ যা বলে দিল সেই কাজটা করে দিচ্ছি, আর মাসের শেষে মাইনে পাচ্ছি। এটাই বেশীর ভাগ মানুষের জীবনের দিনগত পাপক্ষয়, যা হোক তা হোক করে চলে গেলেই হল। এর মধ্যে যাদের একটু পয়সাকড়ি হয়েছে তারা কি করছে? আগেকার দিনে বড়লোকরা, জমিদাররা ঘোড়ার পিঠে বসে বন্দুক লক্ষ্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, জঙ্গলে গিয়ে শিকার করত, ফুর্তি করত। এখনকার দিনে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে কোন হলিডে রিসর্টে গিয়ে হৈহুল্লোড় করছে। এটাও পুরুষার্থের মধ্যে পড়বে না। পুরুষার্থ হল, আমি এই জিনিষটা পেতে চাই, এটা আমাকে পেতে হবে, এবার আমার সাধনা হল ওই পাওয়াটাকে সার্থক করতে কায়মনোবাক্যে পুরোদমে চেপ্টা চালিয়ে যাওয়া। বেশীর ভাগ ছাত্ররা পড়াশোনা করে পরীক্ষায় ভালো নম্বর আর না হয় পাশ করার জন্য। এটাও পুরুষার্থের মধ্যে গণ্য করা হয় না। পুরুষার্থ হল আমি চেপ্টা করে এই বিষয়টাকে রপ্ত করব, তার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস লেগে আছি।

আমাদের ঋষিরা সবার জন্য চারটে পুরুষার্থ নির্ধারিত করে দিলেন – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। মানুষ যখন ঠিক ঠিক অর্থোপার্জন করতে চাইছে তখন তাকে প্রচুর খাটতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ রোজগারের জন্য লেগে থাকতে হয়। কিন্তু অর্থ রোজগারের জন্য এই লেগে থাকাটা সব সময় ধর্ম সম্মত আর আইন সম্মত হতে হবে, তখন এই লেগে থাকাটাই পুরুষার্থ হবে, যাকে বলা হয়ে অর্থসিদ্ধি। তাই বলে ডাকাতি করে, রাত জেগে নোট জাল করে, স্মাগলিং করে যে অর্থ রোজগার করছে তার কিন্তু পুরুষার্থ সাধন হচ্ছে না। অর্থের জন্য যে পুরুষার্থকে লাগাচ্ছে সেটা সৎ ভাবে হতে হবে, শাস্ত্র সম্মত অর্থাৎ শাস্ত্র যেভাবে অর্থোপার্জনের কথা বলে দিয়েছে সেইভাবেই অর্থোপার্জন করতে হবে। ধর্ম সম্মত ভাবে অর্থ উপার্জন করার পর এই অর্থটা শুধু সঞ্চয় করে রাখলে কোন কাজ হবে না। অর্থের প্রয়োজন দুটো ক্ষেত্রে – একটা কাম সাধন অর্থাৎ ভোগের প্রয়োজনে আর ধর্ম সাধনের প্রয়োজনে। সেইজন্য অর্থ সাধন যদিও নিম্ন সাধন কিন্তু অর্থ সবার মূলে। অর্থ না হলে ধর্মও হবে না, কামও হবে না। অর্থ না থাকলে নিজের স্ত্রীও মানবে না, অর্থ না থাকলে ছেলেও বাবাকে মানবে না। কিছু দিন আগে এক ভদ্রলোক ভালোবেসে নিজের সব সম্পত্তি ছেলের নামে লিখে দিয়েছিল। এরপর যা হয়, ছেলে আর ছেলের বউ বুড়ো বাপকেই দেখছে না। বুড়ো বাপ এখন কাঁদতে কাঁদতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। আদালত বলে দিল, সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেওয়ার পর সম্পত্তি আর ফেরত নেওয়ার কোন আইন নেই। ভদ্রলোক এখন নিজের পরিচিতদের সাবধান করে বলে বেড়াচ্ছে, ছেলেকে আপনি যতই ভালোবাসুন সম্পত্তি কখনই হাতছাড়া করবেন না, শেষ দিন পর্যন্ত হাতে রেখে দেবেন। সেইজন্য বলা হয় অর্থ হল মূলে। অর্থ হল ভোগের জন্য। বুড়োবুড়ি সম্পত্তি কেন ধরে রাখবে? যাতে শান্তিতে মরতে পারে। শান্তিতে মরার ইচ্ছাটাও কামের মধ্যে। হাতে যদি টাকা না থাকে তাহলে ছেলেবউ শান্তিতে মরতেও দেবে না।

কাম হল, এই জগতে যা কিছু আমরা ভোগ করতে চাইছি। মৃত্যুর পরেও যে সুখ পাওয়ার ইচ্ছা, সেই সুখ ধর্ম দিয়ে অর্জন করতে হয়। এই জগতের সুখ ভোগ যেমন অর্থ দিয়ে অর্জন করা হয়, মৃত্যুর পরের সুখ

ধর্ম দিয়ে অর্জিত হয়। আবার ধর্ম পালন করার জন্য অর্থের বিরাট প্রয়োজন। ধর্ম মানে, দান দক্ষিণা দেওয়া, তীর্থাদি করা, সাধুসেবা করা ইত্যাদি। যাঁরা এই তিনটির মধ্যে কোনটাই চাইছেন না, তাঁরা হলেন মোক্ষমার্গী। এই জিনিষ শুধু হিন্দু ধর্মেই নেই সব ধর্মই একই জিনিষ বলছে। খ্রীষ্টান, মুসলমানরাও তাই করছে, তাদের ধর্ম বলছে তুমি এই এই পালন করবে। কেন পালন করবে? মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে সুখ ভোগ করতে পারবে। আমাদের ঋষিরা এগুলোকে একটা নাম দিয়ে দিলেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

হিন্দু ধর্মের চারটি মূল স্তম্ভ

প্রত্যেক ধর্মই আবার চারটে স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম হল দর্শন, দ্বিতীয় পুরান, তৃতীয় উপাচার আর চতুর্থ বিধি-নিষেধ। হিন্দু ধর্মের দর্শন উপনিষদ, পুরান হল ইতিহাস পুরান – বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর আঠারোটি পুরান গ্রন্থ। হিন্দু ধর্মের পূজা অর্চনার উপাচার গুলো মূলতঃ তন্ত্র থেকে আসে আর কিছুটা পুরান থেকেও আসে। বিধি-নিষেধ আসে স্মৃতি গ্রন্থ থেকে। হিন্দু ধর্মের এই চারটির যা কিছু আছে সবটা বেদেই আছে। কিন্তু বেদের সমস্যা হল, ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ অধ্যয়ন কেউ করতে পারত না। দ্বিতীয় সমস্যা হল, বেদের অনেক কিছু খুব সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে বিস্তারিত করে না বলে দিলে সাধারণ মানুষ ধরতে পারবে না। এই ধরণের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য বেদের বাইরে অন্য ধরণের কিছু ধর্মীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হল – যার নাম দেওয়া হল স্মৃতি। সেই থেকে বেদকে বলা হয় শ্রুতি আর বেদের বাইরে যাবতীয় ধর্মীয় গ্রন্থকে স্মৃতি বলা হয়। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, পুরান ও অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রগুলোকে বলা হচ্ছে স্মৃতি। এই স্মৃতির সঙ্গে এখানে যে স্মৃতির আলোচনা হচ্ছে তার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মশাস্ত্র মানে, যে শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় ধর্মীয় জীবন কি রকম হবে। ধর্মীয় জীবন বলতে বোঝায়, সাংসারিক জীবন কিভাবে চলবে আর তার সঙ্গে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য কি কি কর্ম ও আচরণ করতে হবে, যেটাকে বলা হয় সদাচার। এগুলো যে শাস্ত্র বলে দিচ্ছে তাকে ধর্মশাস্ত্র বলছে। ধর্মশাস্ত্রেরই আরেকটি নাম স্মৃতি। তাহলে এখানে স্মৃতির দুটি অর্থ এসে যাচ্ছে, বেদ ব্যতিরেকে যত ধর্মীয় পুস্তক আছে তাকে বলা হয় স্মৃতি, আর ধর্মশাস্ত্রকেও স্মৃতি বলা হচ্ছে। এই অর্থে মহাভারতও স্মৃতি আবার মনুস্মৃতিও স্মৃতি। কিন্তু মনুস্মৃতিটা একটা নাম। কিন্তু মহাভারতকে যখন স্মৃতি বলা হচ্ছে তখন মহাভারত হল স্মৃতিমূলক সাহিত্য, দুটো কিন্তু আলাদা জিনিষ। এই স্মৃতিমূলক সাহিত্যের মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণ আছে, তার সাথে মহাভারত ও আঠারোটি পুরান। আর এখানে আমরা যে স্মৃতির আলোচনা করছি এর আরেকটা নাম ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রকে অনেক সময় সংহিতাও বলা হয়। মনুর এই গ্রন্থকে মনুস্মৃতিও বলা হয় আবার মনুসংহিতাও বলা হয়। বাংলাতে ধর্মশাস্ত্র মানে হয় যে কোন ধর্মীয় পুস্তক। কিন্তু এখানে ধর্মশাস্ত্র মানে একটাই, ল বুক। সেদিক থেকে মহাভারতকে আমরা ধর্মশাস্ত্র বলতে পারিনা, মহাভারতকে বাংলায় ধর্মশাস্ত্র বলছে। কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে ধর্মশাস্ত্র সংস্কৃতে একটা আলাদা পরিভাষা। সংস্কৃতে এই ধরণের কিছু টেকনিক্যাল শব্দ আছে, এই শব্দগুলোকে বাংলার প্রচলিত শব্দের সঙ্গে মেলাতে নেই। আমাদের হিন্দু ধর্মে স্মৃতির উপর যত বই আছে তাদের ধর্মশাস্ত্র বলা হচ্ছে। ধর্মশাস্ত্র মানে যে শাস্ত্রে ধর্মের বিধানগুলো দেওয়া হয়েছে। সেই দিক থেকে বাল্মীকি রামায়ণ ধর্মের বিধান দেয় না, পুরানও ধর্মের বিধান দিচ্ছে না। মহাভারতের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এমন কিছু বিধান দেওয়া হয়েছে যে মনে হবে ধর্মশাস্ত্র, কিন্তু সেই অর্থে মহাভারতকেও ধর্মশাস্ত্র বলা যায় না। ধর্মশাস্ত্র হল মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি।

বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের মৌলিক পার্থক্য

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমরা যা কিছু জানতে চাই তার সবই আমরা বেদে পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু দৈনন্দিন জীবন কিভাবে চালাতে হবে সেই ব্যাপারে বেদে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া নেই, সেইজন্য ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হল। যুগের পরিবর্তন ও সময়ের তালে তালে মানুষের অনেক কিছুই পাল্টে পাল্টে যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তন, স্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের খাদ্যের অভ্যাস, পোশাকের ব্যবহার, আচার ব্যবহার পাল্টাতে থাকে। এই পরিবর্তনের জন্য মানুষের জীবনের বিধি নিষেধ গুলোও পাল্টে যায়। ধর্মশাস্ত্র মানে বিধি-

নিষেধ। যে শাস্ত্র আমাদের বিধি আর নিষেধ বলে দিচ্ছে, সেই শাস্ত্রকেই একমাত্র ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। বিধি মানে করণীয়, আমাদের যেগুলো করতে বলা হচ্ছে আর নিষেধ মানে যেটা অকরণীয় – যে শাস্ত্র এই দুটোকে নিয়ে আলোচনা করে সেই শাস্ত্রকে বলছে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি বা সংহিতা। বেদে যেখানে ঋচাগুলো আছে সেই অংশকেও সংহিতা বলা হয়। স্মৃতিকাররা বলেন স্মৃতির এই বিধি নিষেধ গুলো বেদের মতই প্রামাণ্য, তাই একে সংহিতা বলা হচ্ছে। বেদের সংহিতার সাথে এই সংহিতার যাতে কোন সংশয় না হয় তাই এই সংহিতাকে আলাদা করে স্মৃতিও বলা হয়। সংহিতা আসলে হল একটা জায়গায় সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা। বেদের যেখানে মন্ত্রগুলোকে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় মন্ত্র-সংহিতা। সেই রকম যেখানে আচার ও বিধি নিষেধ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে সেটাকে বলছে আচার-সংহিতা। মনুর যে আচার-সংহিতা এর নাম হল মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি। যেমন যেমন পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, রাজা পাল্টাচ্ছে, দেশ পাল্টাচ্ছে, খাবার দাবারের উপকরণ পাল্টাচ্ছে, সেই অনুসারে বিধি নিষেধও পাল্টে যায়। বিধি নিষেধ পাল্টে যায় বলে আচার-সংহিতাও পাল্টে যায়। আচার-সংহিতা পাল্টে যাওয়া মানে ধর্মশাস্ত্রও পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু বেদের আধ্যাত্মিক যে সত্যগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো কোন দিন পাল্টাবে না। সচ্চিদানন্দই একমাত্র আছেন, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, এই কথাগুলো বেদবাক্য, এগুলো কোন দিন পাল্টে যাবে না, কিন্তু আমি কি খাব, কি পড়ব, কিভাবে খাব, সকালে উঠে কি করব, কিভাবে ঘুমোব এগুলো পরিস্থিতি অনুসারে পাল্টাতে থাকবে। তাই স্মৃতি ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে, কিন্তু শ্রুতি যে ভাবে আছে সেইভাবে চিরদিন থাকবে। শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যে এটি একটি বিরাট পার্থক্য। আমরা এর আগে যেমন বলেছি, স্মৃতি, পুরান, তন্ত্রে যা কিছু বলা হয়েছে সব বেদেই আছে। তাই মনুস্মৃতির মূল যে বক্তব্য এও বেদের মধ্যে আগেই এসে গিয়েছে। বেদের আবার ছটি অঙ্গ, সব কটিকে একসাথে বলা হয় বেদাঙ্গ। এই ছটি হল – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। যাঁরা বেদ মুখস্ত করতেন তাঁদের এই ছটি বেদাঙ্গও মুখস্ত করতে হত।

বেদই মনুস্মৃতির আধার

বৈদিক যুগে ঋষিরা যে যজ্ঞগুলো করতেন, সেই সব যজ্ঞের প্রচুর নিয়ম-কানুন ছিল, যজ্ঞের উপকরণ কি হবে, কি ভাবে যজ্ঞ হবে, যজ্ঞের বিধি বিধান কি হবে ইত্যাদি। বেদাঙ্গের কল্পে এগুলোকে রাখা হয়েছিল। দিনে দিনে কল্পের কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকল। আয়তন বাড়ার ফলে সমস্যা হল এত কিছু মুখস্ত কিভাবে করা যাবে! তখন ঋষিরা ঠিক করলেন যজ্ঞের বিধি-বিধানগুলোকে সূত্রাকারে লিখে রাখা হোক। সূত্রাকারে লেখা হওয়ার জন্য ফরমুলার মত সব সহজে মুখস্ত করে নেওয়া যেত। এই সূত্রগুলোকে একসাথে নাম দিলেন কল্পসূত্র। কল্পসূত্রের আবার দুটো ভাগ ছিল – শ্রৌতসূত্র, শ্রুতি থেকে শ্রৌতসূত্র আর গৃহ্যসূত্র। যখন কোন যজ্ঞ বাড়ির বাইরে জন সমক্ষে করা হত, যেমন সার্বজনীন পূজা, সেই যজ্ঞ গুলোকে বলা হত শ্রৌতসূত্র। বাড়ির মধ্যে পরিবারের সদস্যরা যখন যজ্ঞ করত সেই যজ্ঞ গুলোকে বলা হত গৃহ্যসূত্র। এই গৃহ্যসূত্রের মধ্যে যজ্ঞের নিয়মাবলীর বিবরণ ছাড়াও অনেক আচার আচরণ, বিধি-নিষেধও পাওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রই পরের দিকে অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধর্মসূত্রের রূপ নিল। শ্রৌতসূত্রগুলো কিন্তু ধর্মসূত্রের মধ্যে স্থান পায়নি। মূল গ্রন্থ সেই বেদ, সেই বেদ থেকে এল কল্প, কল্প থেকে বেরিয়ে এল কল্পসূত্র, কল্পসূত্র থেকে আবার বেরিয়ে এল শ্রৌতসূত্র আর স্মার্তসূত্র। শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞাদির নিয়মাবলীর সাথে কিছু বিধি-নিষেধ ও আচারের উল্লেখ ছিল। শ্রৌতসূত্র থেকে কিছু যজ্ঞের নিয়মাবলী আর বিধি-নিষেধ ও আচারের অনেক কিছু নিয়ে তৈরী হল গৃহ্যসূত্র। স্মার্তসূত্রে যা কিছু ছিল সেগুলো সংস্কারের দিকে চলে গেল। গৃহ্যসূত্রের উপর আলাদা বই আছে, এখনও গৌতম গৃহ্যসূত্র বই দেখা যায়। এই গৃহ্যসূত্র পড়তে গেলে দেখা যাবে মনুস্মৃতির অনেক কিছু এখানে দেওয়া আছে। তেমনি কল্প পড়লেও অনেক সময় দেখা যায় এরও অনেক কিছু মনুস্মৃতিতে এসে গেছে। কল্পের জিনিষগুলো আবার পাওয়া যাবে বেদের ব্রাহ্মণে। সুতরাং যে যাই বলুক মনুস্মৃতির আধার কিন্তু বেদ, এর মূল যা কিছু আছে সব বেদেই আগে থাকতে রয়েছে।

আইন প্রণয়নের ইতিহাস ও আইনের উদ্দেশ্য

মনুস্মৃতিতে প্রায় দু হাজার আটশ মত শ্লোক আছে, এর মধ্যে কিছু শ্লোক যেগুলো বেদের ব্রাহ্মণ অংশে পাওয়া যাবে। বাকি শ্লোকগুলো মনু নিজেই যোগ করেছেন। কারণ ব্রাহ্মণে অত কথা নেই, পরের দিকে বাড়তে হয়েছে বলেই আলাদা করে কল্প এসে গিয়েছিল। কিন্তু মনুর মূল বক্তব্য কখনই বেদের বাইরে যাবে না, মূল বক্তব্যকেই মনু নিজের মত বিস্তার করে গেছেন। সূত্রগুলোতে যে বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে এই বিধি-নিষেধ শুধু যে আমাদের দেশেই আছে তা নয়, সারা বিশ্বেই এই বিধি-নিষেধ আছে। সারা বিশ্বে তিনটে নামে এই বিধি-নিষেধ পাওয়া যায়। প্রথম নাম ল (Law), যাকে বাংলায় বলছে আইন, ল মানেই বিধি ব্যবস্থা। দ্বিতীয়, কমান্ডমেন্টস। আজ থেকে তিন-চার হাজার বছর আগে সমাজ ব্যবস্থা এখনকার মত এতটা সুশৃঙ্খল ভাবে গোছান অবস্থায় ছিল না। তখন যে যখন রাজা হত সেই অনেক বিধান তৈরী করে দিত। সব থেকে পুরনো এই রকম এক রাজার নাম আমরা পাই তিনি হলেন মেসোপটেমিয়ার হামমুরবী। হামমুরবী কিছু আইন করে গিয়েছিলেন। এই আইনগুলো লিখিত আকারে থাকার জন্য এত দিন পরেও সেগুলো থেকে গেছে। হামমুরবীর আইন ব্যবস্থা জংলীদের মত ছিল, যেমন একটা বিখ্যাত আইন ছিল ‘an eye for an eye and an arm for an arm’। যদি কেউ এমন কিছু করল যার জন অন্য একজনের চোখ চলে গেল, তখন আইন খুব সোজা, তোমার চোখ চলে গেছে তুমিও ওর চোখ উপড়ে নাও। কারুর জন্য একটা হাত কাটা গেল, তারও হাত কেটে দাও, কারুর দাঁত ভেঙে গেছে, যার জন্য ভেঙেছে তারও দাঁত ভেঙে দাও। তোমার উপর যা হয়েছে ওর উপরেও তাই হবে। বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে এখনও এই বিধান চলে, সার্বিক ভাবে প্রকাশ্যে না চললেও ভেতরে ভেতরে অনেক জায়গাতেই চলে। আমাদের এখানেও যে সব সময় এই বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না তা নয়, আমরাও করছি। একজন খুন হল, খুনীর বিচারের পর রায় হল একেও মেরে ফেলা হোক। কিভাবে? ফাঁসি দিয়ে। আমরাও এই বিধানকে অন্য ভাবে অনুসরণ করছি। তবে কেউ চুরি করে ধরা পরে গেলে তারও বাড়িতে গিয়ে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া হয় না। আবার কেউ আমাকে অপমান করে দুটো গালাগাল দিয়েছে বলে আমরাও তাকে উল্টে গালাগাল দিতে যাই না। এগুলো বাচ্চাদের মধ্যে হয়, এক বাচ্চা আরেক বাচ্চাকে প্যাঁচা বলেছে, বড়দের কাছে নালিশ করেছে, বড়রা শিখিয়ে দেয় তুইও ওকে গাধা বলে দে তাহলেই তো ঝামেলা মিটে যাবে। আজ থেকে দু-তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বে এই বিধান বা আইন হামমুরবি করে গেছেন, হামমুরবি এভাবেই বিধান দিয়েছিলেন। এই বিধানগুলো খুব সহজ আর খুবই কাঁচা মানের বিধান। বেশীর ভাগ দেশেই এই ভাবেই আইন চলে। সব দেশেই আইন প্রবর্তন করার কতকগুলো পরিস্থিতি আছে, এর উপর অনেক গবেষণাও আছে। তবে আইন প্রবর্তনের প্রথম উদ্দেশ্য হল সমাজকে রক্ষা করা। বিশেষ করে সমাজে যারা ভালো লোক, সৎ লোক, নিরীহ, দুর্বল লোক আছে তাদের কিভাবে রক্ষা করা যাবে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শুরু হল। সেইখান থেকে আইনের প্রবর্তনের গুরুত্ব মাথায় এল। দ্বিতীয়তঃ কোন লোক যেন বদমাইশি না করতে পারে। তৃতীয় অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা পুলিশ, জেল, কোর্ট-কাছারি এগুলো থেকে ভয়ে দূরে থাকতে চাই, সেইজন্য অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও করি না। এই ভয় যদি কারুর না থাকত তাহলে ভগবানই জানেন মানুষ কি করে বেড়াত। এই ধরনের কয়েকটি কারণে আইন প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়।

অনেক সময় কোন আইন আবার একটা সময় চলে না, পরিস্থিতিটাই পাল্টে গেছে, কিন্তু আইনটা এখনও চলছে। মুঘলদের সময় ভারতে খুব নামকরা একটা আইন ছিল, মুঘলদের পর ইংরেজরা মসনদে বসার পরও ওই আইনটা চলতে থাকল। এই আইনটার নাম দিল্লী সরাইখানা এ্যাক্ট। এই আইনে মোঘলদের সময় থেকেই বলা আছে যে, যেখানে সরাইখানা থাকবে, সরাইখানা মানে বিশ্রামাগার বা আজকের দিনে হোটেল বা লজ, সেখানে বিনামূল্যে জল পান করাবার ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। ভারতে যত হোটেল তৈরী হয়ে আসছে সব হোটেল এই দিল্লী সরাইখানা এ্যাক্টের অধীনে অনুমোদিত হয়ে আসছে। এই এ্যাক্টের অধীনে যদি তাজ বেঙ্গল অনুমোদন পেয়ে থাকে তাহলে তাজ বেঙ্গলে আমি গেলে আমাকে বিনামূল্যে জল খাওয়াতে হবে। ঠিক এই নিয়েই কয়েক বছর আগে বোম্বেতে একটা ঘটনা হয়েছিল। বোম্বের তাজ বেঙ্গল হোটেলে এক

পুলিশের দারোগা হোটেলের কোন কর্মচারীর কাছ থেকে ঘুষ চেয়েছিল। পুলিশকে সেই কর্মচারী ঘুষ দেয়নি। পরের দিন সেই দারোগা সিভিল ড্রেসে হোটলে গিয়ে একটা চেয়ার টেবিলে বসল। বসার পর বলছে এক গ্লাস প্লেইন জল নিয়ে এস। ওয়েটার বলে দিল আপনাকে তো জল দেওয়া হবে না, জল খেতে হলে আপনাকে মিনারেল ওয়াটার নিতে হবে। তাজ বেঙ্গলে আবার এমনি সাধারণ জল পাওয়া যায় না, জল খেতে হলে মিনারেল ওয়াটার নিতে হবে যার দাম পনের টাকা। দারোগা বলে দিল ঠিক আছে লিখে দাও তোমরা আমাকে জল দিতে পারবে না। এবার ঝগড়া ঝাটি শুরু হয়ে গেছে। এরাও বুঝতে পারেনি যে এই লোকটি সেই দারোগা। হোটেল থেকেও লিখে দিয়েছে জল দেওয়া হবে না। ব্যস্, এবার আর যাবে কোথায়, দিল্লী সরাইখানা এ্যাক্টে হোটলে নোটিশ লাগিয়ে দিয়েছে। হোটেল বন্ধ হয়ে গেল। কারণ দিল্লী সরাইখানার এ্যাক্টে হোটেল খোলা হয়েছে, এ্যাক্ট অনুসারে জল চাইলে বিনামূল্যে জল দিতে হবে। হোটেল থেকে জল দেওয়া হয়নি, তাও আবার লিখিত আকারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এরপর মামলা শুরু হল। মামলা গড়াতে গড়াতে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে গেল। হাইকোর্টের বিচারক তো রেগে কাঁই হয়ে গেছেন। সেই কবেকার মোঘলদের সময়ের একটা আইন। তারপর ইংরেজরা যখন হোটেল খুলতে শুরু করল তখন তারাও দিল্লী সরাইখানা এ্যাক্টে খুলল। ইংরেজরাও ভারত থেকে সেই কত বছর আগে চলে গেছে, তারপর আরও কত কি হয়ে গেছে, কিন্তু সেই আইন এখনও একই ভাবে চলে আসছে। ইতিমধ্যে জলের ব্যবহারও সব জায়গায় পাল্টে গেছে। বিচারক তো পুলিশকে খুব ধমক দিল, এগুলো নিয়ে বাঁদরামো বন্ধ কর। গভর্নমেন্টকে বলে দিল এক্ষুণি এই আইনটাকে, জল না দিলে লাইসেন্স চলে যাবে, এটা বন্ধ কর। আমাদের বেশীর ভাগ আইনই এই রকম পুরনো আর বিচিত্র রকমের আইন।

রেলওয়েতে এখনও যেসব আইন আছে এই আইনগুলোর বেশীর ভাগই প্রথম ইংরেজদের সময় যখন ১৮৫৭ সালে রেলওয়ে তৈরী হয়েছিল সেই সময়কার। এখনও আইনী জটিলতাতে উল্লেখ করতে দেখা যায় আগার দি এ্যাক্ট অফ ১৮৭০। সেই কবে আইন হয়ে আছে কিন্তু এখনও তার নিয়ম পাল্টাচ্ছে না। যখন হৈচৈ হয় তখন আবার আমাদের দেশের মাতব্বররা আইনটাকে ঠিক করে। এগুলোকে বলা হচ্ছে ল। এর অন্য দিকে আছে কম্যাণ্ডমেন্ট। কম্যাণ্ডমেন্ট হল ঈশ্বরীয় আদেশ। অনেক ধর্মীয় নেতা ঈশ্বরীয় আদেশ পেয়ে সাধারণ মানুষকে বলে দেন – তোমরা এই রকমটি করবে বা তোমরা এই রকমটি করবে না। এর মধ্যে খুব বিখ্যাত হল মোজেসের টেন কম্যাণ্ডমেন্টস্, তিনি দশটা আদেশ দিয়েছিলেন। মিথ্যে কথা বলবে না, চুরি করবে না, অপরের স্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ করবে না ইত্যাদী। কম্যাণ্ডমেন্টস্ আর আইনের মধ্যে পার্থক্য হল, আইনটা যে কোন সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী পাল্টে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কম্যাণ্ডমেন্টস্কে কেউ কখন পাল্টাতে পারবে না। কম্যাণ্ডমেন্টস্কে পাল্টাতে হলে অবতারকে আসতে হবে। যেমন জুহুদিরা কিছু কিছু কম্যাণ্ডমেন্টস্ অনেক দিন ধরে পালন করে আসছিলেন, কিন্তু যিশু অবতার হয়ে আসার পর তিনি তার কিছু কম্যাণ্ডমেন্টস্কে পাল্টে দিলেন। ঠাকুরের আগমনের আগে থেকে আমাদের সমাজেও অনেক কিছু কিছু জিনিষ লোকেরা করে আসছিল। কিন্তু ঠাকুরের আসার পর তিনি যেভাবে জীবন-যাপন করেছেন, যা কিছু আচরণ করেছেন সেগুলোই লোকেরা অনুসরণ করতে থাকল। আগে সন্ন্যাসীরা মাছ খেত না, এখন সন্ন্যাসীদের মাছ খাওয়া কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু কম্যাণ্ডমেন্টস্ গুলো অত সহজে পাল্টানো যায় না, তবে ভারতে সেই ধরনের কোন কম্যাণ্ডমেন্টস্ ছিল না। হঠাৎ কোন সাধু বলে দিল আমাকে ভগবান আজ্ঞা করেছেন তোমাদের আদেশ করতে এই এই ভাবে থাকো, এই ধরনের প্রথা আমাদের ভারতে কোন দিন ছিল না।

ধর্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য

নানান রকমের ল, কম্যাণ্ডমেন্টস্ এগুলোর একদিকে উদ্দেশ্য হল সমাজকে রক্ষা করা অন্য দিকে মানুষ যেন নোংরা পথে না চলে যায়। আইনের কাজ হল সমাজের লোকদের রক্ষা করা আর সাবধান করা তুমি যদি কোন রকম নোংরা কাজ কর তাহলে তুমিও শাস্ত পাবে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এই আইন বা কম্যাণ্ডমেন্টস্‌দের ভূমিকা প্রধানতঃ স্মৃতিই পালন করত। আমাদের আচার বিধিকে বলা হত স্মৃতি, আর যে শাস্ত্রে

এই স্মৃতির কথা বলা হত তাকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র। শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুক্তির কথা না বললেও চারটে পুরুষার্থের মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক পুরুষার্থের সিদ্ধি করিয়ে দেবে। অন্ততঃ যে কোন একটি পুরুষার্থ যদি সিদ্ধি না হয় তাহলে কিন্তু তাকে শাস্ত্র বলা যাবে না। কিন্তু শাস্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থ হল মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

মনুস্মৃতি হল ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রের কাজ হল মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। তাই মনুস্মৃতি ল বুকও নয় আবার কমান্ডমেন্টসও নয়। আইনজীবীরা দেখেন চোর বদমাইশদের কিভাবে আটকান যায় আর কমান্ডমেন্টস দেখবে আমার যারা ভক্ত আছে তাদের কিভাবে আমার কাছে ধরে রাখব। এই দুটোর একটিও ধর্মশাস্ত্রের কাজ নয়। ধর্মশাস্ত্র কখন আমাদের আইনের বিধান দিচ্ছে না, আর ধর্মশাস্ত্র কখনই কোন একটাতে বেঁধে রাখবে না। ধর্মশাস্ত্র বলবে – তুমি যে পরিস্থিতির মধ্যে আছ সেই পরিস্থিতিকে কাজ লাগিয়ে, কি ধরণের আচরণ করলে তুমি মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্মশাস্ত্র কোন রুল নয়, কোন এ্যাক্ট নয়, কোন ল নয়, কোন কমান্ডমেন্টসও নয়, এটা হল শাস্ত্র। তাই মনুস্মৃতিও শাস্ত্র। মনুস্মৃতির কথাগুলো যারা পালন করবে, যারা আচরণ করবে তার মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। মনুস্মৃতিও কিন্তু আচার-সংহিতা। কিন্তু এই আচার-সংহিতা আর ভারতের সংবিধান বা ভারতীয় দণ্ডবিধিকে যখন মিলিয়ে দেওয়া হয় তখন মনুস্মৃতির সাথে এগুলোর খুব বেশী তফাৎ নেই বলে মনে হবে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বা ক্রিমিনিয়াল প্রসিডিওর কোড এগুলোর সাথে মনুস্মৃতির কোন সম্পর্কই নেই। মনুস্মৃতিতে আমাদের আচার আচরণকে এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে আমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, সেখান থেকেই আমি ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধন করে উপরের দিকে উঠে আসতে পারব, আর চাইলে মোক্ষের দিকেও এগিয়ে যেতে পারব। এই কারণে মনুস্মৃতিকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। অথচ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে যে কথা আছে সেই একই কথা মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যাবে। যদিও আইপিসির অনেক ধারা বা নিয়ম আছে যেগুলো আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র থেকেই নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছু এই স্মৃতি আদি শাস্ত্র থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মৃতি পুরোপুরি আলাদা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, কারণ এতে এমন অনেক কিছু বলা হয়েছে যেগুলো পালন করলে আমরা ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারব। শুধু ভারতীয় সংবিধান বা আইপিসি পড়ে গেলে আমরা কখন মুক্তির দিকে এগোতে পারবো না, এদের উদ্দেশ্য হল সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, আর স্মৃতিশাস্ত্রের কাজ হল ব্যক্তিকে সব কিছু থেকে রক্ষা করে তাকে কিভাবে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেওয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্র এবং আইনশাস্ত্রের পার্থক্য

যদিও স্মৃতি সমাজকে সামলে রাখছে কিন্তু তার দৃষ্টি হল ব্যক্তির প্রতি। কিন্তু সংবিধানে যে আইন প্রণয়ন করা হয় সেটা সব সময় সমাজকে লক্ষ্যে রেখেই করা হয়। সেইজন্য আইন সবাই ভাঙবে। মানুষ চুরি করবে, বেআইনী কাজ করবে তার সঙ্গে চেষ্টা করবে যাতে ধরা না পড়ে। কারণ সে জানে আইন তো সমাজের জন্য, আমার জন্য খোঁরাই। কিন্তু স্মৃতিকে কখন কেউ ভাঙার চেষ্টা করবে না, কারণ সে জানে এটা আমার জন্য, আমার ভালোর জন্য। তাই স্মৃতিকে কোন মানুষ ভাঙতে চায় না, কারণ এটা আমার মঙ্গলের জন্য। খুব সহজ দৃষ্টান্ত হল ট্রাফিক আইন, রাস্তার সিগন্যাল যখন লাল থাকে তখন রাস্তা পারাপার করা যাবে না। কেন বারণ করা হচ্ছে? গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি জখম হতে পারি, মারাও যেতে পারি। এবার রাতের দিকে তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছি রাস্তায় লাল সিগন্যাল, কেউ দেখার নেই, গাড়ি সংখ্যাও কম, তখন কেন আর আমি আইন মানতে যাব। তখন হয়তো চারটে রেড সিগন্যালকে পার করে চলে যাব। কারণ এখানে আমার স্বার্থ হল তাড়াতাড়ি যাওয়া। আবার রেলের একটা নিয়ম আছে, আমি যদি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে থাকি রাজধানী ট্রেনে উঠতে পারবো না, যদি ওয়েটিং লিস্টে নাম থাকে অন্য ট্রেনে উঠতে পারব কিন্তু রাজধানীতে উঠতে পারবো না। এখন কারুর খুব জরুরি দরকার পড়ে গেছে সে বেচারী এখন কি করবে, ওয়েটিং লিস্টে নাম থাকলেও রাজধানীতে উঠে পড়বে, যা হয় হবে। তখন একে তাকে ঘুষ দেবে, হয়তো ফাইন দিয়ে দেবে, যা হয় একটা কিছু করে নেবে। কেন এই আইন? কারণ রাজধানীতে বাবুরা যাতায়াত করেন, ভিড় বাড়ান চলবে না, ওয়েটিং

লিস্টের যাত্রীরা যাতে না উঠে ভিড় বাড়ায়। এই আইন কার সুবিধার জন্য? বড়লোকদের সুবিধার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন দেশে কোন আইন সাধারণ লোকদের জন্য করা হয় না। আইন সব সময় বড়লোকদের সুবিধার জন্য করা হয়। যারা এয়ারে ট্রাভেল করেন তাদের এয়ারপোর্টের সিকিউরিটিদের হাতে কি ভাবে হেনস্থা হতে হয় তার খুব ভালো অভিজ্ঞতা আছে। কারণ ওদের দৃষ্টিভঙ্গি আছে সব বড়লোকেরা এয়ারে যাতায়াত করে, যদি একটা বোমা পড়ে তাহলে বড়লোকদের কি হবে! অন্য দিকে ট্রেনে কোটি কোটি লোক যাচ্ছে তাদের জন্য কারুর কোন মাথা ব্যাথা নেই।

স্মৃতি যারা পালন করে তারা কখনই স্মৃতির বিধান লঙ্ঘন করবে না। স্মৃতিতে মেয়েদের বলছে পর পুরুষ সঙ্গ করবে না। যদি কোন মেয়ে স্মৃতিকে মানে তাহলে সে যে অবস্থাতেই চলে যাক না কেন কোন দিন কোন ভাবেই পর পুরুষের সঙ্গ করবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বা সাধারণ কোন হিন্দু কেউ গরুর মাংস খাবে না। কেন সে খাবে না? কবেকার কোন ঋষি মহাভারতে বলে দিয়েছেন তুমি গরুর মাংস খাবে না। সেই তখন থেকে গরুর মাংস খাওয়ার কথা ভাবতেই আমাদের গা শিউড়ে ওঠে। এটাই যদি আইন হিসাবে থাকত তখন কিন্তু এই নিয়ে কেউ এত কিছু ভাবত না। কারণ আইন সব সময় প্রণয়ন হয় সমাজের স্বার্থে আর স্মৃতির বিধান তৈরী হয় ব্যক্তির স্বার্থে। মানুষ জানে এই বিধান আমার ভালোর জন্য। স্মৃতি যে বিধানকে গ্রহণ করে নেবে, সে কিন্তু আর কখন ওই বিধানকে ছাড়বে না। আইন আর স্মৃতির মধ্যে এখানেই বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। স্মৃতি যেহেতু ধর্মশাস্ত্র তাই আমি ধর্মকে কখনই ছাড়ব না। গীতায় ভগবান বলছেন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহঃ। আমি আমার ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছি, যেমন একজন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে সে এখন বলবে আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস ধর্মে যা যা আছে সবটাই আমি পালন করে যাব, আমি মরে যাব কিন্তু আমি আমার ধর্মের সাথে কোন ভাবেই আপোষ করতে যাব না। একজন বলে দিল আমি ব্রাহ্মণ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, শূদ্রের হাতের অন্ন আমি গ্রহণ করবো না, এখন কোন অবস্থাতেই তাকে দিয়ে শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করান যাবে না। ক্ষত্রিয় বলছে, আমি ক্ষত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, যুদ্ধে আমি মরে যাবো তো সেও ভালো কিন্তু কোন অবস্থাতে আমি যুদ্ধে পিঠ দেখাবো না। এটাকেই যদি আইন করে বলে দেয় যুদ্ধের সময় তুমি পালিয়ে আসতে পারবে না, তখন সে আর সেই আইন মানতে চাইবে না, সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবে। কিন্তু ধর্মের দিক থেকে যে এটা মেনে নিয়েছে, এই ধর্ম আমার আত্মোন্নতির জন্য, তখন সে আর কখনই পিছিয়ে আসবে না। সেইজন্য আমাদের সবারই স্মৃতিশাস্ত্র জানা অত্যন্ত জরুরী।

ভারতের বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র

বেদের ব্যাপারে বলা হয় এবং এটা সবারই বিশ্বাস যে বেদ হল ভগবানের মুখের কথা। যেমন কর্মমার্গ আর জ্ঞানমার্গের কথা, এটা ভগবানের কথা, ভগবানই এই দুটো মার্গ ঠিক করে দিয়েছেন আর এই কথা বেদে আছে। ভগবানেরই কথা কিন্তু ঋষিদের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তাই বেদের কথাতে হাত দেওয়া যাবে না। কিন্তু স্মৃতি হল মনুবার কথা। স্মৃতির ব্যাপারে এনারা কখনই বলবেন না যে এটা ভগবানের কথা। স্মৃতিতে বলা হয় অমুক ঋষি এই বিধান দিয়ে গেছেন। এরপর সেই কথাগুলো বেদের মত মূল্য থাকল না। এর ফলে আমাদের অনেকগুলো স্মৃতি তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে আঠারোটা স্মৃতি খুব নামকরা। এগুলোর মধ্যে আমরা পাই মনুস্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, যাঙ্গবল্ক্য স্মৃতি। যাঙ্গবল্ক্য স্মৃতি আবার খুব নামকরা স্মৃতি। বলা হয় যাঙ্গবল্ক্য স্মৃতি আরও খুব পরিণত, কিন্তু মনুস্মৃতির আলাদা নিজস্ব একটা সম্মান আছে। বর্তমান কালে আমাদের হিন্দুদের যে আইনকানুন চলছে এগুলো বেশীর ভাগই মিতাক্ষরের স্মৃতি থেকে এসেছে। মিতাক্ষর যিনি ছিলেন তিনিও অনেক বিধান দিয়ে গেছেন। বাংলাতে আবার রঘুনন্দন স্মৃতির খুব প্রচল, বাঙ্গালীদের যা কিছু আচার সংস্কার আছে সব রঘুনন্দন স্মৃতিকে অনুসরণ করে পালন করা হয়। সেইজন্য দুশ, তিনশ বছর পর বিধান গুলো পাল্টে যায়। তখন আবার স্মৃতিকাররা নতুন করে স্মৃতির বিধানগুলো তৈরী করেন। কিন্তু মনুস্মৃতি হল মূল গ্রন্থ। যাঁরা স্মৃতি রচনা করেন তাঁরা মনুস্মৃতিকে আধার করেই লেখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক নিয়ম-কানুন পাল্টে যায়। নতুন স্মৃতি মানেই নিয়ম পাল্টে গেছে। তবে গত হাজার বছরে ভারতে নতুন কোন স্মৃতি রচিত

হয়নি, যদিও আমরা বলতে পারি ভারতীয় সংবিধান ও আইপিসি এসে গেছে, কিন্তু এগুলো সেই অর্থে স্মৃতিশাস্ত্র নয়। স্বামীজীও চেয়েছিলেন আমাদের একটা নতুন স্মৃতি লেখা হওয়া উচিত।

মনুস্মৃতির পর সব থেকে উল্লেখযোগ্য স্মৃতিশাস্ত্র আমরা পাই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি। বলা হয় মনুস্মৃতি লেখার প্রায় সাত আটশ বছর পর যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি লেখা হয়েছিল। মনুস্মৃতির তুলনায় যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির শ্লোক অনেক কম। মনুস্মৃতিতে বিষয়ান্তর খুব বেশী দেখা যায়, একটা বিষয় নিয়ে কথা চলছে, হঠাৎ সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য একটা বিষয়ে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি এই দিক থেকে খুবই পরিষ্কার ও সাজান গোছান। অবশ্য প্রথম যে কাজটা হয় তাতে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতেই পারে, সেই কাজটাই যখন দ্বিতীয় বার করা হয় তখন অনেক পরিষ্কার আর ত্রুটিমুক্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উপর মিতাক্ষরীর ভাষ্য খুব বিখ্যাত। ভারত সরকার যত আইনকানুন তৈরী হয়েছে তার বেশীর ভাগই এই মিতাক্ষরীর ভাষ্যকে আধার করেই তৈরী করা হয়েছে, বিশেষ করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর আইন, বিবাহের আইন এবং হিন্দুদের অনেক আইনকানুন। মনুস্মৃতি দর্শনের দিকে বেশী জোর দিয়েছে। ঠিক ঠিক শাস্ত্র বলতে যা বোঝায়, সেই দিক থেকে মনুস্মৃতি হল একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। যে কাজটা আটশ বছর পর হবে সেই কাজ আরও ভালো ভাবে সংগঠিত রূপ নেবে, কারণ সে সমাজের আরও অনেক কিছুর পরিণতি দেখে নিয়েছে, এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আইন প্রণয়ন অনেক উন্নত এবং বাস্তবোচিত।

এই রকম আরেকটি স্মৃতি হল পরাশর স্মৃতি। তখনকার দিনে ঋষিরা কিছু কিছু বিধান ও নিয়ম কানুন দিয়ে গেছেন সেই নিয়মগুলোকেই পরে সেই ঋষির নামে স্মৃতিশাস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। পরাশর স্মৃতির বৈশিষ্ট্য হল আপৎধর্ম। আপৎকালীন অবস্থায় তোমার কি রকম আচরণ হবে এটার উপর পরাশর স্মৃতিতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সব স্মৃতিশাস্ত্রই কিছু জিনিষকে ছাড় দিচ্ছে অন্য জায়গায় আবার কিছু জিনিষের উপর জোর দিচ্ছে, কিন্তু সব স্মৃতিশাস্ত্রের মূলে মনুস্মৃতি।

মনুর ইতিহাস

মনু কে ছিলেন, কোন সময় ছিলেন, এই ব্যাপারে আমাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। পুরান মতে সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা আমরা পাই তাতে দেখানো হচ্ছে ব্রহ্মা যখন প্রথম সৃষ্টির কাজে নামলেন তখন প্রথমে তিনি যা কিছু সৃষ্টিতে নিয়ে এলেন তার সব কিছুই ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে করেছিলেন। সর্ব প্রথমে তিনি মন থেকে চারজন কুমার সনক, সনন্দন, সনৎ ও সনাতন ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। তারপর সপ্তর্ষির সাতজন ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু মন থেকে সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিটা খুব মন্ডুর গতিতে এগোচ্ছিল। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় গতি আনার জন্য তিনি নিজেকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে মনু আর শতরূপার সৃষ্টি করলেন। সেখান থেকে এরপর পুরোদমে সৃষ্টি এগোতে শুরু করল। সৃষ্টির এই বর্ণনা বিভিন্ন পুরানে বিভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। কোথাও কোথাও এই বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু মনু যে ব্রহ্মার সন্তান এটা সবাই মেনে নিয়েছিলেন। ফলে মনুর জানা ছিল ভগবান কিভাবে জগৎকে পরিচালিত করতে চাইছেন। আমরা যদি এই পৌরাণিক কথা কাহিনীকে সরিয়ে রাখি তাহলেও আমরা পাই যে আগেকার দিনে মনু বলে একজন ঋষি ছিলেন যাঁর অগাধ জ্ঞানরাশি ছিল, যে জ্ঞানরাশির কোন তুলনা করা যেতে পারেনা। সারাটা জীবন মনু যেন জ্ঞানের মধ্যেই অতিবাহিত করে গেছেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে উপলব্ধি করলেন সমাজে এখন কি চলছে আর কিভাবে চললে সমাজ মস্ন ভাবে চলতে পারে। তারপর তিনি যেন তাঁর এই উপলব্ধি জ্ঞানকে স্মৃতি আকারে রচনা করে নিজের শিষ্যদের বলে গেলেন। পরম্পরায় মনু কয়েকজন শিষ্যকে বললেন, তাঁরা আবার তাঁদের শিষ্যকে বললেন, এইভাবে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে আমরা ভৃগু নামে এক ঋষির নাম পাই। তিনিও মনুর কাছ থেকেই শুনলেন। পুরনো কাহিনীতে যা হয়ে থাকে, গল্প কাহিনীতে মূল তথ্যগুলো হারিয়ে যায়। কেউ বলেন মনুস্মৃতিতে মূলতঃ এক লক্ষ শ্লোক ছিল, পরে কেউ একজন কিছু শ্লোক কমিয়ে দিলেন, এইভাবে কমতে কমতে শেষে যখন ভৃগুর কাছে এল তিনি এই স্মৃতিকে কেটে ছেঁটে চার হাজার শ্লোকে দাঁড় করালেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে যে মনুস্মৃতি এসেছে তাতে তিন হাজারের মত শ্লোক আছে।

মনুস্মৃতির বর্ণনা ভৃগুর মুখ থেকে শুরু হয়। সবটা যেন ভৃগুই বলছেন। তাতে প্রথমে সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর মনুর ইতিহাসের কথা আছে। সেখানে দেখানো হচ্ছে মনুর কাছে ঋষিরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন। মনু ঋষিদের বলছেন ‘আপনাদের যা প্রশ্ন তার সব উত্তর কিছু আমি ভৃগুকে বলে দিয়েছি, ভৃগুই আপনাদের সব কিছু বলে দেবে’। তখন ভৃগু খুব খুশী হয়ে বলতে শুরু করেছেন। তাই ভৃগু যেটা বলছেন এটাই মনুস্মৃতি। মনুস্মৃতিতে ভৃগু নিজে কিছু বলেননি, তাঁর গুরু মনু তাঁকে যা কিছু বলেছেন সেটাই তিনি ঋষিদের বলে যাচ্ছেন।

এর আগে আমরা ল, কমাণ্ডমেন্টস আর স্মৃতির তুলনামূলক আলোচনা করছিলাম। সেখানে আমরা বলছিলাম ল সব সময় বড়লোকদের রক্ষা করছে, কমাণ্ডমেন্টে একজন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে বাকিদের ছোট মনে করে যেন কিছু আদেশ করে বলছেন তোমরা এগুলো পালন করবে। স্মৃতিতে এর কোনটাই হয় না। মনু লক্ষ্য করে দেখলেন সমাজে বেশীর ভাগ লোক এই রকমটি চাইছে বা এই রকমটি করছে আবার কিছু লোক সেই রকমটি করছে না। মনু তাই বিধানে ওইটাই আনলেন যেটা বেশী লোক পালন করছে, আর পালন করতেও সুবিধা। যে জিনিষগুলো বেশীর ভাগ লোক পালন করছে সেগুলোকে করে দেওয়া হল বিধান। যখন বিধান করে দেওয়া হল তখন সেই বিধানটাই ধর্ম সম্মত হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় যার পালন করছিল না, তারাও সেটাই পালন করতে শুরু করে দিল। তবে কি, আইন হোক আর ধর্মের বিধানই হোক কখনই মানুষ মানতে চায় না। কারণ সমাজে শৃঙ্খলাপারায়ণ মানুষের সংখ্যা সব সময় কম। শৃঙ্খলাপারায়ণহীন মানুষের সংখ্যাই বেশী, ধর্মের ভয় যদি না থাকে আর শাস্তির ভয় বা পুলিশের ভয় যদি না থাকত তাহলে মানুষ যে কি করে বসত কল্পনাই করা যায় না। ভারতে যখন সব কিছু কর্মই ধর্ম সম্মত হয়ে গেল তখন চুরি ডাকাতি এগুলোও ধর্ম সম্মত হয়ে গেল।

আগেকার দিনে দিল্লী থেকে কলকাতা যাতায়াতের পথে বিশেষ ধরনের ডাকাতির দল ছিল, এদের বলা হত ঠগী। এক ঠগী আরেক ঠগীকে চিনত একটা বিশেষ ধরনের গুড়ের মাধ্যমে। ওই গুড় খাওয়ালে বুঝে নিত এই লোকটি ঠগী, ওরাই শুধু এই ব্যাপারটা জানত। এই পদ্ধতিতে যখন বুঝে নিত এও ঠগী তখন এক অপরকে সাহায্য করত। পথিকরা যাতায়াত করার সময় ঠগরা এসে তাদের সাথে মিশে যেত। মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে বুঝে নিত এর কাছে কি পরিমাণ টাকা-পয়সা আছে আর কোথায় রাখা আছে। একদিন, দুদিন ধরে একসাথে হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুত্ব করে নিত। এখন চুরি ডাকাতি যেটা করবে সেটাও ধর্ম সম্মত হতে হবে, তাই যখন বুঝে নিত এবার একে খুন করে টাকা-পয়সা যা কিছু আছে সব নিয়ে সরে পড়তে হবে, তখন তারা কখনই এই পথিককে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করত না। রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ যে ঠগী সে সাপ সাপ করে চিৎকার করে উঠবে। সাপ সাপ চিৎকার শুনে যেই পথিক ঘুম থেকে জেগে যেত, ওদের কাছে সব সময় একটা সিল্কের রুমাল থাকত, তাতে একটা টাকা বাঁধা থাকত, সেই রুমালটাকে গলার মধ্যে ফাঁসিয়ে টেনে দিত। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই পথিক শেষ। তারপর তার সব জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়ে চলে যেত। এখনও ট্রেনে যাতায়াতের পথে পাশের লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে চায়ের মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে সব জিনিষপত্র নিয়ে নেমে যাচ্ছে। মানুষ চিরদিন একই রকম আছে। এখন যারা ডাকাতি করছে এরা কোন ধর্ম সম্মত ভাবে করছে না। কিন্তু এই ঠগীরা পুরো ধর্ম সম্মত ভাবে যা কিছু করার করত। ঘুমন্ত মানুষকে কখনই ওরা মারবে না। দিল্লী কলকাতার পথে এই ঠগদের এত সন্ত্রাস ছিল যে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। পরে উইলিয়াম বেন্টিং এসে পুরো একা এই ঠগী বাহিনীকে ঠাণ্ডা করে দিলেন। মানুষের স্বভাবে চিরদিনই শৃঙ্খলতার অভাব। এদের ধর্মও বাঁধতে পারেনা আইনও পথে নিয়ে আসতে পারেনা।

মনুস্মৃতির সময়কাল

মনু ছিলেন একজন মহাপুরুষ, তিনি দেখলেন যে জিনিষগুলো পালন করলে সমাজের মঙ্গল হবে, মানুষের ভালো হবে, সেগুলোকে তিনি বিধান করে দিলেন। আমরা এখন যে মনুস্মৃতি পাচ্ছি, বিদ্বদজনের বক্তব্য হল এই মনুস্মৃতি ঈশাপূর্ব দুশো থেকে চারশ বছরের মধ্যে এর বর্তমান মূল কাঠামোটা রূপ পেয়েছে।

যখনই শাস্ত্রের সময়কাল নিয়ে কথা বলা হয় তখন সেই শাস্ত্রের শেষ যে রূপটা পেয়েছে সেটাকে মাথায় রেখেই বলা হয়। যেমন গৃহ্যসূত্রের কথা বলা হয়েছে, বেদের সময়েই গৃহ্যসূত্র এসে গিয়েছিল, তার মানে এর শুরু অনেক আগেই হয়ে গেছে। তারপর ক্রমাগত চলতে চলতে এক সময় মনু কবে এটাকে শেষ রূপ দিলেন, আর সেই মনু কোন সময় ছিলেন সেটা এখন বলা মুশকিল। ঐতিহাসিক গবেষকরা নানান দিক থেকে বিভিন্ন রেফারেন্স টেনে টেনে একটা সময় বার করার চেষ্টা করে গেছেন, কিন্তু তাও সঠিক ভাবে কেউ বলতে পারছেন না। তবে মোটামুটি যেটা বোঝা যাচ্ছে ঈশাপূর্ব দুশো বছর থেকে শুরু করে ঈশার পরবর্তি দুশো বছর এই চারশ বছরের কোন এক সময়ে ধীরে ধীরে মনুস্মৃতি আজকের এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এরপর মনুস্মৃতিতে আর কিছু পরিবর্তন হয়নি।

মনুর চিন্তাধারা থেকে এটা খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি মেনে নিচ্ছেন কোন মানুষ সমান নয়। আমাদের প্রগতিবাদী সমাজে যেমন আজকাল সবাই আলোচনা করে আমরা সবাই সমান, কিন্তু মনু এটা কখনই মানবেন না। মনুর বক্তব্য হল, সচ্চিদানন্দই আছেন। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক অবিদ্যা বা অজ্ঞান এসে ঘিরে ফেলছে। অজ্ঞান ও অবিদ্যা থেকে জন্ম নিয়েছে কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনার পূর্তির জন্য মানুষকে কর্ম করতে হয়। যেমন যেমন কর্ম করে তেমন তেমন তার স্বভাব তৈরী হয়। এই স্বভাবের প্রভাবেই মানুষ ধর্ম অধর্ম পালন করে। ধর্ম অধর্ম পালনের অনুসারে তার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হতে থাকে। বিভিন্ন যোনিতে যে তার জন্ম হচ্ছে তখন সেই যোনিগত ধর্মটাও তার মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আবার ওই ধর্মটা পালন করতে করতে সে বড় হতে শুরু করে। মনু বলছেন যত রকম যোনি বা প্রাণী দেখা যায় তার মধ্যে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ প্রাণী। কারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম পালনের ক্ষমতা আছে। অন্য প্রাণী ধর্ম পালন করতে পারেনা। আইন মানতে পারে, অনুশাসন মানতে পারে, যেমন কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিলে সে অনেক আদেশ পালন করে, কিন্তু একে ধর্ম পালন করা বলা যায় না। একমাত্র মানুষই পারে ধর্ম পালন করতে। আবার মানুষের মধ্যে যাঁরা চিন্তনশীল তাঁরা শ্রেষ্ঠতম। মনু বলছেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ধর্মের আচরণ করা। কেন এই উদ্দেশ্য এগুলো আমরা পরের দিকে বিশদ ভাবে আলোচনা করব, এখন শুধু মূল কয়েকটি প্রারম্ভিক বিষয়কে তুলে ধরা হচ্ছে। ধর্মের আচরণ করলে মানুষ ধর্মে উন্নতি করতে পারে, তার কামের পূর্তি হয় আর পরলোকে সুখভোগ পাওয়ার ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। আর ঠিক ঠিক ধর্ম পালন করলে সে মোক্ষের দিকেও চলে যেতে পারে।

ধর্মের কথা কোথা থেকে জানা যায়

মানুষ যে ধর্মের পালন করবে সেই ধর্মকে মানুষ কিভাবে ও কোথায় কোথায় জানতে পারবে? মনু বলছেন মানুষ ধর্মের কথা প্রথম জানে বেদে, বেদে যা কিছু বলা হয়েছে সেটাই ধর্ম। দ্বিতীয় সে স্মৃতিশাস্ত্র থেকে ধর্মের কথা জানতে পারে, এই স্মৃতিশাস্ত্র মানে রামায়ণ, মহাভারত। তৃতীয় হল মহাজনো যেন গতঃ স পত্নাঃ, মহাপুরুষরা যে পথ অবলম্বন করে গেছেন, তাঁদের জীবন থেকে ধর্মের শিক্ষা পাওয়া যায়। এই তিনটে জায়গা থেকে মানুষ ধর্মের আচরণ কিভাবে করবে জানতে পারে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে আমরা অনেক ধর্মের কথা পাই, কিন্তু পরবর্তিকালে যেসব মহাপুরুষরা এসেছেন তাঁরাও অনেক কিছু করে গেছেন সেই সব কথা আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে পাইনা। যেমন ঠাকুর স্বামীজী এনারা অনেক কিছু করেছেন যেগুলো আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে পাইনা। কারণ অনেক দিন ধরে নতুন করে আর স্মৃতিশাস্ত্র লেখা হয়নি। এই তিনটির বাইরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ উৎস হল, নিজের শুদ্ধ পবিত্র মন। এই চারটে মিলিয়ে মানুষ ধর্ম কি জানতে পারে আর ধর্মাচরণ সেইভাবেই করে।

ধর্মশাস্ত্রের কাজ

মনুর বক্তব্য হল আমরা যে পরিবেশের মধ্যে দৈনন্দীন জীবন যাপন করে চলেছি সেখানে এমন অনেক কিছু আচরণ আছে যেগুলোর সংশোধন করা দরকার। যে যে জায়গায় যে যে জিনিষগুলোকে ঠিক করা দরকার, এই আলোচনা করার সময় কোন বিষয়কে তিনি বাদ দেননি। একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছেন আবার অন্য দিকে নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা কিভাবে সুরক্ষিত থাকব, যেমন এই নিরাপত্তার ব্যাপারে বিধান দিচ্ছেন বাছুর বা গরু যদি দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে তখন সেই দড়িকে

কখন লজ্জন করে যাবে না, এই ধরনের ছোটখাটো বিষয় নিয়েও বিধান দিয়ে নিয়ম করে দিচ্ছেন। বাছুর দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকলে কেন দড়ি ডিঙাতে নিষেধ করছেন? ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, গরু হঠাৎ দড়ি শুদ্ধ দাঁড়িয়ে গেলে দড়িতে হেঁচট খেয়ে পড়ে গেলে হাত পা ভেঙে অনেক কিছু হতে পারে। নিয়মটা আমাদের নিরাপত্তার জন্য করা হয়েছে। ইদানিং গাড়িতে যে সিট বেল্ট লাগাতে হয়, এই আইনটা আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করা হয়েছে। লোকে আইন মানতে চায় না, মনে করে পুলিশকে ধোকা দিয়ে আমি বিরাট কিছু করলাম। টু হুইলার চালাবার সময় হেলমেট লাগানো বাধ্যতামূলক, এগুলো আমাদের ভালোর জন্য। দুর্ঘটনা তো একবারই হবে, তাই সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত আচার কি রকম হবে, নিজেকে কিভাবে পরীক্ষার রাখবে, দাঁত কিভাবে মাজবে, স্নানের সময় গায়ে মাটি দিয়ে কিভাবে পরীক্ষার করবে, জামা-কাপড় কিভাবে পরীক্ষার রাখবে এই ধরনের সব কথা মনু বলছেন। তারপর অপরের সাথে কথা বলা, চলাফেরার সময় ব্যবহার কি রকম হবে, মানুষকে অভিবাদন কিভাবে করবে এগুলো সব বিশদ ভাবে মনু আলোচনা করছেন, যাতে আমাদের ব্যক্তিত্বে ভদ্রতা ও দৃঢ়তার প্রকাশ হয়।

মনু বলছেন, মানুষ যে কোন কাজই করুক সব কাজের পেছনে কামনা-বাসনা থাকবেই। প্রয়োজন যদি না থাকে, ধান্দা যদি না থাকে একজন মহামুর্খও কিন্তু কাজ করে না। কিন্তু সব সময় যদি ধান্দা নিয়েই সব কাজ করে তাহলে মানুষ তামসিক হয়ে যাবে। এই তামসিকতাকে দূর করার জন্য, আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তিগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যই ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র মানুষের তামসিক বৃত্তিগুলো প্রশমিত করে সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে দেয়। তোমার খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে, মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করছে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু লোভে পড়ে কখন খাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো না। যখন খাওয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখন এটাই হল তামসিক ব্যবহার, তার মানে ইচ্ছাটা এমন প্রবল যে মনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, মনকে ইন্দ্রিয় একেবারে খাবারের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল এই প্রবৃত্তিকে আটকে মনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। ঠিক তেমনি যেখানে টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে, কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপার আছে, নাম-যশের ব্যাপার আছে সব জায়গাতেই মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। আমাকে কেউ বলল যখন দরকার হবে আপনি আমার গাছ থেকে দুটো লেবু নিয়ে যাবেন। আমি এখন দেখছি, আরে এইতো সুযোগ। এখন আমি দুটোর জায়গায় গাছে যত লেবু আছে সব নিয়ে এলাম। যারা চঞ্চল মনের, যাদের মধ্যে শুভ সংস্কার তৈরী হয়নি, ভদ্রতা শেখেনি এদের মধ্যে এই ধরনের প্রবৃত্তি থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল বুদ্ধি যাদের পরিপক্ব হয়নি লোভের জিনিষ দেখলে এরা আর নিজেদের সামলে রাখতে পারেনা, একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ধরনের মনকে কিভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় মনু তার জন্য আমাদের আচার আচরণগুলিকে বেঁধে দিচ্ছেন।

ব্রাহ্মণের সম্মান কেন

শৈশবকাল থেকে কিভাবে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে সেটার উপর বেশী জোর দিতে হবে, সব থেকে বেশী নজর ছিল ব্রাহ্মণ সন্তানদের প্রতি। কারণ এরা হল শ্রেষ্ঠতম। প্রথমে এদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করো তাহলে পুরো সমাজও ঠিক থাকবে। শিশু মাত্রই একটু লোভী হয়। শূদ্রের পরিবার একেই গরীব, সেই গরীব বাড়ির ছেলেকে যদি খেতে পড়তে না দেওয়া হয় তাহলে কি করে চলবে! মনু এদের ছেড়ে দিচ্ছেন, তুমি যা করছ কর। বৈশ্যদের ক্ষেত্রেও তাই, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেও একই নিদান। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্য বলছেন, পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেছে এবার একে উপনয়ন করিয়ে ব্রহ্মচারী করে দাও। এখন থেকেই শুরু হয়ে যাক এর তপস্যা। কারণ পরে এরাই নিজের ত্যাগ ও পাণ্ডিত্য দিয়ে সমাজকে সামলাবে। মনু এদের প্রচণ্ড সম্মান দিচ্ছেন। কিন্তু তার আগে তাকে ত্যাগ আর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। মনু তাই বার বার বলছেন যে ব্রাহ্মণ পুরো বেদ জানে না, যে ব্রাহ্মণের আচার নেই সেতো ব্রাহ্মণ নয়, সে শূদ্র। এখানে একটা শব্দ আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমরা এখানে যে ব্রাহ্মণ শূদ্র বলছি, আজকের দিনে যে শূদ্র, মায়াবতী যে অর্থে নিজেকে বলছে আমি একজন শূদ্র, এই অর্থে মনু কিন্তু বলছেন না। এটা আমাদের এক পুরনো সমস্যা। যদিও বলা হয় ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছে, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, দুই জজ্বা থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শূদ্র বেরিয়েছে।

আমরা যদি সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি কিছু লোকের মধ্যে ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব বেশী, কিছু মানুষ ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, কিছু মানুষ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চাইছে আর চতুর্থ এক ধরনের লোক আছে যারা নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এই চার ধরনের মনোভাবা সম্পন্ন লোককে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র এনারা শ্রেণী বিভাগ করে দিচ্ছেন। এর থেকেও আরও মারাত্মক ব্যাপার হল বাইরে থেকে যেসব বহিরাগত জাতিগুলো ভারতে প্রবেশ করছিল এদেরকে তো সঙ্গে সঙ্গে সমাজ উচ্চ স্থান দেওয়া যাবে না। এদেরকেও এনারা নিয়ন্ত্রণ করছেন। এগুলো হল দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। আজকের দিনে বর্তমান ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রের কোন তাৎপর্য নেই। ভারতে যারাই হিন্দু সবাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু সংরক্ষণের সুযোগটা কেউ ছাড়তে চাইছে না। আগে যেমন সবাই ব্রাহ্মণ হতে চাইত এখন সবাই সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার জন্য শূদ্র হতে চাইছে। কারণ লোভ মানুষের থেকেই যায়, লোভটা এখন যাবে কোথায়!

মনু যেটা বলছেন সেটা আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা, আজকের দিনে কোন মতেই আর প্রযোজ্য নয়। কারণ তখনকার সমস্যা আর আজকের সমস্যার মধ্যে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। তখন বাইরে থেকে বিভিন্ন জাতিগুলোর অনুপ্রবেশ হচ্ছে, এদের নিয়ে সমাজে নানা সমস্যা হতে শুরু হল। এদেরকে তাই বলা হল তোমাদের মধ্যে এখনও হিন্দু সংস্কারাদি ঢোকেনি, তাই তোমরা কিছু দিন শূদ্র হয়ে থাক, পরে তোমাদের ব্যবস্থা করা হবে। শূদ্রদের মধ্যে যারা কাজকর্ম করে ধনী হয়ে যেত এদেরকে তখন শূদ্র থেকে ক্ষত্রিয় করে দেওয়া হত। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন শঙ্করাচার্যও কেরলের অনেক জেলেতে ব্রাহ্মণ করে দিয়েছিলেন। এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মহাপুরুষরা অনেক সময় কাউকে সমাজে ভালো স্থান দিয়ে দিতেন।

সমাজকে চালাতে গেলে সব রকম লোকেরই দরকার। এক দিকে বিদ্বান পণ্ডিত দরকার আবার অন্য দিকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য ক্ষত্রিয়ের দরকার, সমাজের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বৈশ্যের দরকার আবার সেবাকার্যের জন্য শূদ্রেরও দরকার। সব কিছু মিলিয়ে মনু তাঁর বিধান গুলো তৈরী করেছিলেন, কিন্তু আজকের দিনে সেই বিধানগুলো চলবে না। কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে হলে আমাদের জানা দরকার কিভাবে হিন্দু সমাজ গঠিত হয়েছে, আমাদের মূল আদর্শ কি, যে নিয়ম-কানুনগুলো আমাদের পূর্বজরা পালন করে এসেছেন সেগুলো কিসের ভিত্তিতে পালন করতে হয়েছিল। এই জিনিষগুল আমরা সব মনুস্মৃতিতে পাচ্ছি। মনুর মূল কথা হল, জগতে তুমি একা এসেছ একা যাবে, তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র এরা কেউ তোমাকে কোন কিছুতে সাহায্য করবে না। তুমি যখন পরলোকে যাত্রা করবে তখন এরা কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। আর এই জগতে তোমাকে এরা সাহায্য করবে বলে যে ভাবছ, এটা তোমার ভুল ধারণা। সেইজন্য তুমি সবার আগে নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি দাও।

আমাদের সবারই মধ্যে ভালোবাসা আছে। আমরা অনেককেই ভালোবাসি, নিজের বন্ধুদের ভালোবাসি, আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসি, যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি তার প্রতি একটা ভালোবাসা আছে আর তার সাথে সাথে নিজের সন্তান, স্ত্রী, বাবা-মার প্রতি তো ভালোবাসা আছেই। ভালোবাসা মানেই প্রত্যাশা, যাকে ভালোবাসছি তার কাছ থেকে আমি কিছু প্রত্যাশা করছি। যখনই দেখে প্রত্যাশার পূর্তি হচ্ছে না তখনই মানুষ ভেঙে পড়ে। জাগতিক ভালোবাসা প্রত্যাশা ছাড়া কখনই হবে না। ভালোবাসা যেখানে খুব নিবিড় হয়ে যায়, যেখানে প্রেমসী তার প্রিয়তমকে সর্বস্ব মন, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সেখানেও যদি স্বার্থের কারণে একটু ফাটল ধরে তখন দুজনের সেই নিবিড় সম্পর্কও ভেঙে চূরমার হয়ে যায়। এখানেই আমরা ভুল করে বসি। মনু এটাই বলছেন, তুমি যে মনে করছ এই ভালোবাসার বন্ধনে তুমি আর তোমার স্ত্রী এক, কিন্তু কখনই তোমরা দুজনে এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। এই ভালোবাসার মধ্যে তোমার নিজের একটা প্রত্যাশা লাগান আছে আর নিজের চিন্তা ভাবনা কল্পনা দিয়ে তুমি তোমার ভালোবাসার পাত্রের সাথে জুড়ে নিয়ে মনে করছ এক, কিন্তু কোন অবস্থাতেই এক নয়। তুমি আর সে সব সময়ই আলাদা। জুড়েও যদি নাও তাতে কোন আপত্তি নেই, সমস্যা হবে যখন মৃত্যু এসে শিয়ড়ে দাঁড়াবে। মৃত্যু তোমাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে, তারপর তুমি সেই একাই হয়ে

গেলে, তোমার আশা নিরাশায় পরিণত হয়ে গেল। হয়তো তোমার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় পরিজনদের তুমি ভালোবেসে এসেছ, তারাও চিরদিন তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, জীবনে তুমি কোন দিন কারুর কাছে আঘাত পাওনি, তুমি বলবে, শাস্ত্রে জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্টের কথা আছে ঠিকই কিন্তু আমি তো কখন দুঃখ-কষ্ট পাইনি। ঠিকই বলছ তুমি, কিন্তু তুমি তো মৃত্যুকে দেখনি তাই এই কথা বলতে পারছ। যখন মৃত্যু আসবে তখন তোমাকে আলাদা হতেই হবে, কোন পথ নেই। তুমি বলবে আমি মৃত্যুর পর কিছু আছে মানি না। তুমি মান আর নাই মান, পরলোক আছে আর সেখানে তোমাকেও যেতে হবে। আর এটাও ঠিক যারা মৃত্যুর পর কিছু আছে মানে না তাদের জন্য এই ধর্মশাস্ত্র নয়।

ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মের কথা মানুষকে ধরে বেঁধে শেখানো যায় না। উপদেশ দেওয়ার জন্য ধর্মশাস্ত্র নয়। একটা হল পারিবারিক সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতির প্রভাবে শৈশব থেকেই ধর্ম ও ধর্মীয় আচরণ করার একটা মানসিকতা তার মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় মানুষ যখন প্রচুর সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে তখন তাকে ধর্মের কথা বলা হয়। সেইজন্য আগেকার দিনে এই পথে ব্রাহ্মণ বাড়ির সন্তানরাই আসত। তাদের বাপ-ঠাকুরদার কাছে কোন পয়সা-কড়ি ছিল না, যার জন্য তারা বাধ্য হয়ে বিদ্যার্জনের জন্য গুরুগৃহে চলে যেত। ছোটবেলা থেকেই তাদের বলা হত, দেখো বাপু বড়লোকদের সঙ্গ করবে না, তোমাদের জমি-জায়গা নেই, তুমি বিদ্যার্জনের দিকে মন দাও, বিদ্যা ছাড়া আর কোন সম্পদ তোমার নেই। মন দেওয়ারও কোন দরকার হত না, পাঁচ বছর হলেই মাথা মুড়িয়ে উপনয়ন করিয়ে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিত। গুরুরাও ছিলেন কাঙাল। শিষ্যরা ভিক্ষা করে যা নিয়ে আসত সেখান থেকে গুরুও খেত শিষ্যরাও পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করত আর বেদ অধ্যয়ন করে যেত। কি কঠোর জীবন ভাবাই যায় না। সেই পাঁচ বছরে ঢুকে সাতাশ বছর ধরে শুধু বেদ মুখস্ত করে যেত। শিক্ষা সমাপ্ত করে বত্রিশ কি তেত্রিশ বছর বয়সে গুরুগৃহ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। তিরিশ বছর ধরে যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হয়ে শাস্ত্র পড়ে গেছে এরপর বাড়ি ফিরে বিয়ে করে সে কি নিজের স্ত্রীকে খুশী রাখতে পারবে! শুধু তাই নয়, শিক্ষা সমাপ্ত করেই তো আর অর্থ উপার্জন করতে পারছে না। এখন যেমন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তেই কোম্পানি চাকরি দিয়ে দিচ্ছে। এখানে কি হচ্ছে, তুমি পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিজের এলাকায় ফিরে এসেছ, তোমার এলাকার লোকেরা জানবে তাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত হয়ে এসেছেন। এরপর কবে কার বিয়ে হবে, শ্রাদ্ধ হবে তারা সেই পণ্ডিতকে ডাকবে, কিছু দক্ষিণা দিল কি দিল না, দু-চার পয়সা যা হত তাই দিয়ে সে সংসারের ভরণপোষণ করত। এইভাবে একটা সম্প্রদায় আট হাজার দশ হাজার বছর ধরে এই উচ্চ সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিলেন। তাঁদের কাছে এটাই বাস্তব, গুরুগৃহের সংস্কৃতিতে তাঁরা বড় হয়েছেন। যতই কাঙাল হোক, কিন্তু ত্যাগ বৈরাগ্যের ফলে এঁদের মধ্যে যে তেজ ও শক্তি বিকশিত হয়েছিল, সেই তেজ আর শক্তির সামনে কারুর দাঁড়াবার সাহস ছিল না। ফলে ক্ষমতাবান লোকেরাও তাঁদের সামনে বিনম্র ও সংযত হয়ে যেত। এদের দেখাদেখি অন্যান্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররাও এই ত্যাগী ব্রাহ্মণদের খুব সম্মিহ করে চলত। যাঁর মধ্যে আত্মবল আছে, ত্যাগ তপস্যার তেজ আছে, তাঁদের সামনে অন্যরা দাঁড়াতে পারেনা, সমাজে তাঁদের সম্মানও তাই সবার থেকে বেশী।

মনু যখন ধর্মের বিধান ও তার ভাবগুলোকে সমাজ জীবনে নিয়ে আসছিলেন তখন এই ব্রাহ্মণরাই পুরো শক্তি দিয়ে এই ভাবগুলোকে পালন করে ধরে রাখতে প্রয়াসী হল। ব্রাহ্মণরা যখন এগুলোকে পুরো দমে ধরে রাখছে তখন অন্য বর্ণের লোকেরাও তাঁদের দেখাদেখি ধর্মের এই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এল। মনু জানতেন, সমাজে কিছু লোক আছে যার একেবারে বিশিষ্ট, যাদের পাণ্ডিত্য আছে, ত্যাগ তপস্যা আছে এরা হলেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ। এদের সম্মান সবার থেকে বেশী, সুযোগ সুবিধাও অনেক বেশী। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে সমাজের প্রত্যাশাও অনেক বেশী। মনু এই ধরনের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ঠিক করে দিলেন তোমার আচার ব্যবহার খুব উচ্চ মানের হবে। এক জায়গায় মনু বলবেন, শূদ্র চুরি করে যে পরিমাণ শাস্তি পাবে বৈশ্য চুরি করলে তার দুই গুণ শাস্তি দেবে, ক্ষত্রিয় তিন গুণ আর ব্রাহ্মণ যদি চুরি করে তাহলে চার গুণ শাস্তি পাবে। তার মানে, একই দোষের জন্য শূদ্রকে যদি একশ টাকা ফাইন দিতে হয় ব্রাহ্মণকে সেখানে চারশ টাকা ফাইন দিতে হবে। কারণ ব্রাহ্মণকে আমরা সম্মান দিচ্ছি। আবার অন্যটাও আছে কোথাও কোথাও

ব্রাহ্মণের জন্য কম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মনু বিধান দিয়ে দিয়েছেন, কোন্ জায়গাটায় ব্রাহ্মণকে অনুমতি দেওয়া হবে, আবার কোন্ জায়গাতে ব্রাহ্মণকে বেশী শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমার কাছে সমাজ কিছু জিনিষ প্রত্যাশা করছে। আবার এক জায়গাতে বিধান আছে, একটা দোষ যদি সাধারণ লোক করে তখন তাকে যে পরিমাণ শাস্তি দেওয়া হবে সেই দোষ রাজা করলে দশ গুণ শাস্তি দেবে। মনুর কাছে সহজ যুক্তি, আমার সমাজের কিছু লোকের দরকার যাঁরা খুব উচ্চ মানের হবেন। এই উচ্চমানের লোকদের সমাজ অনেক সম্মান ও বিশেষ অতিরিক্ত সামাজিক সুযোগ সুবিধা দেবে, বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে মানুষের প্রত্যাশাও অনেক বেশী থাকবে।

মনুর কয়েকটি মৌলিক চিন্তা-ভাবনা

মনুস্মৃতির আধার হল বৈষম্য। কোন মানুষই সমান নয়, আর কোন দিন সমান হতে পারবে না। সমান করার চেষ্টাও করা হবে না। সমান হবে একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়ে। আধ্যাত্মিকতার দরজা মনু আবার সবার জন্য খুলে দিচ্ছেন – তোমরা সবাই আধ্যাত্মিক হয়ে যাও, তাহলে সবাই সমান হয়ে যাবে। অন্য দিকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনুর লক্ষ্য ছিল যারা নিম্নস্তরে আছে, যারা শূদ্র, তাদেরকে কিভাবে আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণের স্তরে উত্তীর্ণ করা যায়। স্বামীজীও এই কথা মনুর নামে বলেছিলেন, পরে তিনি ‘ভারতে বিবেকানন্দ’ গ্রন্থের বক্তৃতায় বলছেন আমাদের উদ্দেশ্য হল শূদ্রকে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করা। সামাজিক সমস্যাগুলো যখন সামনে চলে আসে তখন বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, বিভিন্ন স্মৃতিপ্রণেতারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সামাজিক সমস্যাগুলোর মূল্যায়ন করে তার সমাধান দিচ্ছেন। মনু যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন তাতে তিনি এই সমাধান দিয়েছেন – দেখো ভাই হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়, সমাজে যারা জন্ম নিচ্ছে এরা কেউই সমান নয়, আর কোন দিন এরা সমান হবেও না। সংস্কৃতির দিকে থেকেও এরা সমান নয়। কিন্তু কিভাবে এই বৈষম্যের মধ্যে একটা সমন্বয় করা যায়, কিভাবে যারা নীচে পড়ে আছে তাদের উন্নীত করা যায়। স্বামীজীও তাই চেয়েছিলেন – এক দেশ, এক সংস্কৃতি ও এক জাতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। দুজন কখনই সমান হবে না। আমাদের ঋষিরাও দেখেছেন দুজন সমান হবে না, কিন্তু চেষ্টা করে যতটা কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়। ঠিক ঠিক সমান হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে। তার আগে পর্যন্ত বৈষম্যের মধ্যে ভারসাম্য কিভাবে আনা যায় তার প্রচেষ্টা চলতে পারে। বাজারে এক মাছওয়ালা অন্য মাছওয়ালাকে ঠিকায় না কিন্তু খন্দেরকে বোকা বানিয়ে দেবে। যারা ব্যবসা করে তারা জানে কোথাও চালাকি করতে হবে কোথায় চালাকি করা যাবে না।

ইংরেজদের সময় রাজস্থানে তিন থেকে চার হাজার জাতি ছিল। এখন তো জাতির সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। তামিলনাড়ুতে গত কুড়ি বছরে দুশো জাতি বেড়ে গেছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অসবর্ণের বিবাহ হচ্ছে আর জাতিও সেই অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে। মনুর কাছে এই সমস্যাটা ছিল। এই যে হাজার হাজার জাতি উপজাতি ছিল মনু সব কটা জাতিকে চারটে বর্ণের মধ্যে বেঁধে দিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ছোট ছোট জাতি ছিল, সেই রকম কায়স্থ, বৈশ্য এদেরও অনেক জাতি উপজাতি ছিল। মনু বলে দিলেন সব ব্রাহ্মণের আচার আচরণ এক রকম হবে। ছোট খাটো আচার আচরণ পাল্টাবে, কিন্তু সাধারণ আচার আচরণ সবার ক্ষেত্রে এক হবে। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেও তিনি এক করে দিলেন। ভারতকে একটা জাতিতে মনুই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মনু আসলে ছিলেন ঐক্য সাধনকারী এক বলিষ্ঠ নেতা। মনু এটাও জানতেন বিভিন্ন যে জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠি, পরিবার ছিল এদের সবারই নিজস্ব অনেক আচার, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি ছিল। মনু সেখানে কোন হাত দেননি। কারণ কারুরই নিজস্ব সংস্কৃতিকে গায়ের জোরে পাল্টাতে নেই। আবার রাজাকে বলছেন, তুমি সব সময় যুদ্ধ জয় করবে, নতুন নতুন রাজ্য অধিগ্রহণ করবে কিন্তু ওখানকার মানুষের নিজস্ব রীতিনীতি সংস্কৃতির উপর কখনই আঘাত করবে না। কিন্তু মুসলমানরা ঠিক এর উল্টো কাজ করল, খ্রীস্টানরাও ঠিক তাই। এরা যেখানেই নিজদের অধিকার গ্রহণ করে নেবে সেখানে প্রথমেই গিয়ে বলবে এখানকার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও। হিন্দু ধর্মের মধ্যে এখনও যে একটা অখণ্ড ভাব এটা মনুর জন্যই হয়েছে। যারা ধর্ম পথে যাচ্ছে তাদের আচার

ব্যবহার কেমন হবে আর শুধু ঠিক ঠিক আচার ব্যবহার পালনের ব্যাপারে মনুষ্যতিকে যে অনুসরণ করবে তারও কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে।

স্মৃতির দর্শন

আমাদের এখন জানতে হবে যত স্মৃতিশাস্ত্র আছে এর দর্শনটা কি, কিসের উপর এই স্মৃতিশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব সংবিধান থাকে। এই সংবিধান লেখার আগে প্রথমে একটা প্রস্তাবনা নেওয়া হয় যাতে শপথ নেওয়ার মত কিছু কথা বলা হয়, আমরা এই সংবিধান কেন তৈরী করতে যাচ্ছি, আমরা কি চাইছি। সংবিধানের অর্থ হয় আমরা একটা নতুন কিছু শুরু করতে যাচ্ছি। বিবাহের সময় পাত্র-পাত্রী যেমন অগ্নিকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে আমরা দুজন দুজনের হাত ধরলাম, সারা জীবন আমরা দুজন দুজনের সুখে দুখে সব সময় একসাথে থাকব। বিবাহ মানে একটা নতুন জীবন শুরু হচ্ছে। জীবন শুরু করছি মানে, এর আগে তোমার জীবন এক রকম ছিল সেখান থেকে তুমি আরেকটা নতুন জীবন শুরু করার প্রতিজ্ঞা করছ। বেশীর ভাগ দেশই তাদের সবারই কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তারা এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য একটা নতুন জীবন শুরু করে। যেমন সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতের বুকে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। এরপর মুসলমানরা এসেছে, ইংরেজরা এসে দুশো বছর ভারতকে শাসন করল। তারপর ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের জাতীয় নেতারা ঠিক করলেন আমরা একটা নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি। সবাই মিলে বসে আলোচনা করে রচিত করলেন ভারতীয় সংবিধান।

পৃথিবীতে একটাই দেশ যার কোন সংবিধান নেই, সেই দেশটি হল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে সেইভাবে নতুন করে কিছু শুরু হয়নি, যেখানে সবাই মিলে বলবে যে আমরা নতুন কিছু শুরু করছি। প্রায় হাজার বছর আগে ইংল্যান্ডের কয়েকজন মিলে একটা ছোট কাগজে ম্যগনা কার্টা বলে একটা চার্টারে সই করেছিল। তারপর থেকে ইংল্যান্ডের জীবন একই ভাবে চলছে, তাদের যে কোন বিরাট বিপ্লব হয়ে গেছে, সেই রকম কিছুই হয়নি। এই ম্যগনা কার্টা ছাড়া ইংল্যান্ডের সংবিধান বলে কিছু নেই। ওদের যে নতুন কোন পরিবর্তন হয়েছে তাও না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ইংল্যান্ডে প্রচুর আইন প্রণয়ন হয়েছে। এক সময় ইংল্যান্ডের লোকরা ঠিক করল এখানে রাজা আর রাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকবে না, এখন থেকে পার্লামেন্টেই সব কিছু নির্ধারণ হবে। সেই সময় ইংল্যান্ডের একটা নতুন সংবিধান হওয়া উচিত ছিল, কারণ তারা একট নতুন কিছু শুরু করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ রাজা থেকে পার্লামেন্ট এটাকে তারা নতুন শুরু বলে মনে করছে না, আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। আমাদের যেমন মাঝে মাঝেই সংবিধানের সংশোধন হয়, ইংল্যান্ডেও আইনের সংশোধন হয়, আর এদের আইন সংশোধনের সর্বোচ্চ অধিকারী হল কোর্ট। ইংল্যান্ডের সিভিল সিস্টেমটা ভারতেও এসেছে।

ইংল্যান্ডে যত আইন পাস হয় সব কোর্টেই ওঠে, আজ থেকে কোর্ট এই অনুসারে আইন দেবে, আর কোর্টের অধীনে সবাই। যদিও পার্লামেন্ট সবার উপরে, কিন্তু পার্লামেন্ট যেটা আইন করবে সেটা কোর্ট একবার খতিয়ে দেখবে আইনটা ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না। অন্যান্য দেশে আইন পাস হওয়ার আগে খতিয়ে দেখে সংবিধানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু ইংল্যান্ডের তো সংবিধানই নেই, কিসের বিরুদ্ধে তাহলে খতিয়ে দেখবে। ভারতেও কয়েকবার এই সমস্যা হয়েছিল, পার্লামেন্টে কোন একটা আইন পাস হওয়ার পর সুপ্রীম কোর্ট বলে দিল এই আইন সংবিধানের এই এই ধারার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, সেইজন্য এই আইন মান্য হবে না। পাকিস্তানেও প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, পার্লামেন্ট আর সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে এই নিয়ে এক তীব্র লড়াই চলছে। এমনও হয়েছে পার্লামেন্ট গতকাল যে আইনটা পাস করেছিল পরের দিনই সুপ্রীম কোর্ট সে আইন খারিজ করে দিয়েছে। কোন আইন পাস হওয়ার আগে সংবিধানের সাথে ভালো করে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা হয় এই আইন পাস হলে সংবিধানের বিরুদ্ধে যাবে কিনা। ইংল্যান্ডে কোন সংবিধানই নেই, হাজার বছর আগে যে ম্যগনা কার্টা ছিল, ওই কাগজের টুকরোতে তেমন কিছু নেই, শুধু কয়েকজন মিলে একটা চার্টারে সই করছে যাতে লেখা আমরা কয়েকজন মিলে এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু ইংল্যান্ডে একের পর এক আইন তৈরী হয়ে গেছে। সেই আইনগুলোকে পার্লামেন্ট পাস করে, পরে আইনগুলো কোর্ট বিচার করে দেখবে আইন প্রণয়ন হলে ভালো

হবে কি হবে না। বাকি সব দেশেই সংবিধান আছে। কোথাও বা রাজা যা বলবে সেটাই বিধান, কিন্তু এর সংখ্যা খুব কম। যে কটি সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে তাদের সবারই সংবিধান আছে, সেই সংবিধান অনুসারেই তাদের সব কিছু চলে।

আমেরিকার সংবিধানের প্রথমে প্রস্তাবনাতে বলছে By the people for the people of the people, এটা হল আমেরিকা সংবিধানের মূল স্তম্ভ। আমাদের দেশের রাজা যারা হবে তারা এইভাবে হবে – সাধারণ লোকদের দ্বারা সে নির্বাচিত হবে, দেশবাসীদের জন্য করবে আর দেশবাসীদেরই হবে। ভারতেও যখন সংবিধান রচিত করা হল তখনও এই কয়েকটি জিনিসকে মাথায় রেখে ঠিক করলে আমরা স্বাধীনতা দেব, বাক স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এই ধরনের কিছু মৌলিক অধিকার দেব। সংবিধানের প্রথমে Preamble, তারপরে থাকবে Fundamental Rights, শেষে থাকবে Derived Rights। এগুলো নিয়ে আবার অনেক বিতর্কও হয়। কিছু দিন আগে সুপ্রীম কোর্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ রায় দান করেছেন। টেলিফোনের রেগুলেটরি অথোরিটি থেকে একটা নিয়ম করা হয়েছিল একই ফোনের সিম থেকে দিনে দুশোর বেশী এসএমএস পাঠানো যাবে না। এই নিয়মকে অনেকে আপত্তি করেছে, কারণ অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক এসএমএস পাঠায়, আবার যারা মুক বধির তারা এসএমএসের উপর নির্ভর করে। আসলে এই নিয়মটা করা হয়েছিল বিভিন্ন কোম্পানী থেকে বিজ্ঞাপনের জন্য যাতে প্রচুর এসএমএস পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে বিরক্ত না করতে পারে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে টেলিফোন কোম্পানী গুলির তরফ থেকে সুপ্রীম কোর্টে একটা মামলা করা হল। তাতে তারা এটাই বলল – ভারতীয় সংবিধান অনুসারে আমাদের বাক স্বাধীনতা আছে, এই নিয়মের দ্বারা এই ফ্রিডম অফ স্পীচে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, আমরা কেন এসএমএস পাঠাতে পারব না বলতে হবে। এর উপর গতকালই সুপ্রীম কোর্ট তাঁর রায় দিয়ে বলে দিলেন দুশোর যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এটা থাকবে না। এই রায় দিয়ে এটাও বলছেন যে, আপনার যেমন বাক স্বাধীনতা আছে তেমনি সাধারণ লোকের রাইট টু প্রাইভেসি আছে। আপনার বাক স্বাধীনতা দিয়ে অপরের রাইট টু প্রাইভেসিকে নষ্ট করতে পারেন না। সেইজন্য সুপ্রীম কোর্ট কোম্পানী গুলো যে প্রচুর এসএমএস পাঠাতো সেটাকে বন্ধ করে দিলেন। সংবিধানে এই ধরনের অনেক সমস্যা ও জটিলতা উদ্ভব হয়।

বিখ্যাত আর্টিস্ট মাকবুল ফিদা হোসেনের উপর আরেকটি খুব নামকরা মামলা আছে। মাকবুল ফিদা হোসেনের আর্টের একটা বৈশিষ্ট্য হল বেশীর ভাগ ছবিতে তিনি মুখ আঁকতেন না, খুব বিচিত্র ধরনের ছবি আঁকতেন। একবার মা সরস্বতীর ছবি আঁকেছেন বিনা বস্ত্রের। এই নিয়ে সাধারণ মানুষ তো আপত্তি করবেই। মা সরস্বতীকে ভারতীয় সমাজে এই ভাবে দেখা হয় না। এই ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি করে কোর্টে কেস করা হয়েছে। মাকবুল ফিদার আইনজীবীরা বলছে আমার ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান আছে। যারা আপত্তি করেছে তারা বলছে তোমার ছবি আমার ধর্মী ভাবাবেগকে আঘাত করছে। হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে ছবি আঁকার সময় ফ্রিডম এক্সপ্রেশানের প্রশ্ন ওঠে, মাকবুল ফিদা হোসেনকে বলা হোক মহম্মদের কোন স্ত্রীকে নিয়ে মা সরস্বতীর মত একটা ছবি আঁকতে, তাহলেই বুঝতে পারবেন ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান কাকে বলে। ২০০৮ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায় মাকবুল ফিদার অনুকূলে গিয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের খুব সহজ যুক্তি হল ভারতে এই ধরনের পেইন্টিং যে হয় না তা নয়, এই ধরনের পেইন্টিং স্কাপচার ভারতে আদিম কাল থেকে হয়ে আসছে। আর যাঁরা শিল্পী তাঁদের তো ফ্রিডম এক্সপ্রেশান দিতেই হবে। যাই হোক, এই রায়ের বিরুদ্ধে আর কেউ সোরগোল তোলেনি। কিন্তু হোসেন সেই যে ভারত ছাড়লেন তারপর আর ফেরত আসেননি। সংবিধানের অনেক কিছু নিয়ে এই ধরনের নানান জটিলতা তৈরী হয়।

যখন আমরা গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছি, তখন গণতান্ত্রিক দেশে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান থাকবেই। কিন্তু তার সাথে আমারও তো রাইট টু সারভাইভ আছে। বম্বে কোর্টে একবার একটা মজার মামলা উঠেছিল। ইদানিং লাফটার ক্লাব নামে কিছু সংস্থা গজিয়েছে, যেখানে সবাই একজোট হয়ে হাঃ হাঃ করে হাসবে। বম্বের একজনের বাড়ির সামনে একটা লাফটার ক্লাব হয়েছে। বিচারক ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, আপনারা যে

হাসছেন এতো খুবই ভালো কথা, মানুষের জীবন থেকে হাসি হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের হাসি যদি অপরের কান্নার কারণ হয়, সেই হাসি চলে না। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধরনের সমস্যা হবে। একদিকে রাষ্ট্র ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশান দিচ্ছে আবার অন্য দিকে বলছে প্রত্যেক ধর্মকে সম্মান দিতে হবে। কিন্তু এই দুটোর মধ্যে যখন সজ্ঞাত হবে তখন আপনি কোন দিকে যাবেন! মহাভারত ও রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য, তারা একটা জিনিষকে ঠিক আরেকটিকে ভুল কখনই বলবে না। এনারা এটাই বলবেন, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। এবার যদি দুটোর মধ্যে সজ্ঞাত লাগে তখন আমি কোনটাকে বেছে নেব? এখন মাকবুল ফিদা হোসেন হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে এই ধরনের ছবি আঁকতে শুরু করেছেন, হিন্দুরা তখন কি করবে! আমাদের হয়ত সেই রকম কিছু মনে হবে না। কিন্তু আজকে যদি কোন শিল্পী শ্রীমা সারদাদেবীর কোন ছবি বিনা বস্ত্রে আঁকেন তাহলে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী কি এটাকে মেনে নেবে? কখনই মানবে না। ঠিক তেমনি যারা সরস্বতী দেবীর ভক্ত, সীতার ভক্ত তারা কেন মেনে নিতে চাইবে! যদিও বলা হয় কোনারক ও অন্যান্য মন্দিরের গায়ে যে ধরনের মূর্তি করা হয়েছে কিন্তু সেখানে কোন নেগেটিভ অনুভূতি আসে না, এখানে এসে বোঝা যায় এটা একটা শিল্প। তাছাড়া এক সময় এই ধরনের শিল্পের প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু এখন দিনকাল অনেক পাল্টে গেছে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, জাতপাতের লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা অনেক বেড়ে গেছে তাই ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশানকে নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে।

মনুস্মৃতি রচনার সময় স্মৃতিকারদের কাছেও এই ধরনের অনেক সমস্যা ছিল। তখনকার স্মৃতিকাররা স্মৃতিশাস্ত্র রচনার মাধ্যমে একটা দর্শনকে সামনে নিয়ে আসছেন, এই দর্শনকে আধার করে তাঁরা বিভিন্ন বিধান তৈরী করছেন। বিধান যখন তৈরী করতে যাচ্ছেন তখনই সজ্ঞাত লাগছে। আমরা এর আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মনুস্মৃতি লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে যে নিয়ম-কানুনগুলো আছে সেগুলোও আরও হাজার বছর আগেকার। এখন কোন কারণে যদি এমন কোন শ্লোক বা কথা আসে যেটাতে কারুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা জাতিগত ভাবে কোন আপত্তিজনক কিছু মনে হয়, সেটাকে কখন ব্যক্তিগত ভাবে নেওয়াটা ঠিক হবে না। ইদানিং মনুস্মৃতিকে যেভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে আসলে সেই ভাবে মনুস্মৃতি কখনই ছিল না।

তখনকার দিনে যত স্মৃতিকাররা ছিলেন তাঁরা সবাই দেখলেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যেই জীবন আছে। সেখান থেকে তাঁরা চার রকমের চৈতন্যের কথা বললেন। যা কিছু জড় পদার্থ আছে, এই গ্লাস, টেবিল, মাইক্রোফোন এই জড় পদার্থের মধ্যে চৈতন্য ঘুমিয়ে আছে (Sleeping consciousness), গাছপালার মধ্যে চৈতন্য স্থির হয়ে আছে (Static Consciousness), পশুপাখির মধ্যে চৈতন্য চলতে পারে (Walking Consciousness) আর মানুষের ক্ষেত্রে বলে জাগ্রত চৈতন্য (Self বা Thinking Consciousness), আমি আছি এই বোধটা এসে যায়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এখানেই বোঝা যায় এনাদের চিন্তাভাবনা কত উচ্চমানের ছিল। আগেকার দিনের লোকেরা মানতই না যে পশুপাখিদের মধ্যেও আত্মা আছে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস যখন বললেন গাছেরও চেতনা আছে তখন পাশ্চাত্য জগৎ মানতেই চাইল না। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়ে দিচ্ছেন এই দেখুন গাছও কি রকম সংবেদনশীল। অথচ আমাদের স্মৃতিকাররা আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে তারা এটাকে একেবারে নথিভুক্ত করে মান্যতা দিয়ে দিচ্ছেন। শুধু চেতনা আছে বলে ছেড়ে দিচ্ছেন না, চেতনা কোন স্তরে আছে সেটাও বলে দিচ্ছেন – এদের মধ্যে চেতনা ঘুমিয়ে আছে, গাছের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে, পশুপাখিদের ক্ষেত্রে চেতনা চলছে আর মানুষের ক্ষেত্রে চৈতন্য নিজেকে জানতে পারছে, যেখান থেকে তার আত্মবোধ এসে যাচ্ছে।

যতগুলো স্মৃতি আছে তার preamble এর প্রথম পয়েন্ট – সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যে পরিপূর্ণ। চৈতন্য বা জীবন ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই। এখানে কাউকেই ত্যাগ করা যাবে না। বেদান্তে বা ঈশাবাস্যোপনিষদ এবং সমস্ত উপনিষদও একটি কথাই বলছে শুদ্ধ আত্মাই আছেন। এই তত্ত্ব মনুস্মৃতিও গ্রহণ করেছে। শুদ্ধ আত্মা যখন এই গ্লাস রূপে প্রতিভাসিত তখন চেতনা এর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। সেই শুদ্ধ আত্মাই বৃক্ষ রূপে বিরাজ

করছেন তখন তার চেতনা দাঁড়িয়ে আছে। পশুপাখির মধ্যে হাঁটছে আর মানুষের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ। আত্মচেতন্য ছাড়া অন্য কিছু নেই। কার্টিশান ডিভাইড বলছে জড় আর মন, এটা জড় তো জড়ই আর মন মানে চৈতন্য। আজকের দিনেও বিজ্ঞান এই কার্টিশান ডিভাইডের তত্ত্ব মেনেই চলছে। গ্লাশের মধ্যেও চেতনা আছে, পাথরের মধ্যেও চেতনা আছে এটা বিজ্ঞান আজকের দিনেও মানবে না, উল্টে তারা হাসে। এই বিজ্ঞানীরাই একশ বছর আগে যখন গাছেরও চেতনা আছে বললে তারা হাসত। আরও আছে, বেড়াল কুকুরের আত্মা নেই বলেই খ্রীষ্টানরা মানত। জীবন্ত মানুষের উপর এইজন্য কাঁটাছেড়া করে পরীক্ষা করা হয় না, কারণ মানুষের ভেতরে আত্মা আছে কিন্তু ইঁদুর, ব্যাঙের মধ্যে আত্মা নেই বলে এদেরকে যত পার কাঁটাছেড়া করে।

একজন জাপানী লেখক ইংরাজীতে উপন্যাস লেখেন, তাঁর নাম ইশিগুরো। ইশিগুরোর অনেকগুলো নামকরা উপন্যাস আছে। এর মধ্যে একটা উপন্যাসের বিষয় হল সমাজ এখন অনেক এগিয়ে গেছে। সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে বলে মানুষের অনেক কিছুর দরকার হচ্ছে। যার বয়স হয়ে যাচ্ছে তার একটা হাত দরকার, লিভার দরকার, হার্ট দরকার। সমাজ এত উন্নত হয়ে গেছে যে এখন সব কিছুই ট্রান্সপ্লান্ট করা যাচ্ছে। কিন্তু ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে শরীরের এত অঙ্গ পাবে কোথা থেকে। তখন এরা ঠিক করল যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে তাদের ক্লোন বানিয়ে নেওয়া হোক। ক্লোনিং করে যে মানুষ তৈরী হবে, তা মেয়ে কিংবা ছেলে যাই হোক, এদের শরীরের থেকে অঙ্গগুলো বার করে নেওয়া যেতে পারে। এদের অঙ্গগুলো বার করে নিয়ে সভ্য সমাজের মানুষের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো হল ক্লোনিং করে যাদের তৈরী করা হচ্ছে। সমাজের বিশ্বাস যে, এই ক্লোনিং করা মানুষদের আত্মা নেই। সেইজন্য এদের অঙ্গগুলো কেটে নিতে কোন অসুবিধা নেই। এখন একজন মহিলা দেখাতে চাইছেন এদের মধ্যেও আত্মা আছে, এদের মধ্যেও অনেক মানবিক গুণ আছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকলে তার অনেক সম্মান হয়। এদেরও অনেক শারীরিক চাহিদা আছে। মহিলা প্রমাণিত করতে চাইছেন এরা সত্যিকারের মানুষই, এদেরও আত্মা আছে, এদের মনেও ভাব জাগে। এর মধ্যে আবার দেখাচ্ছে ক্লোনিং করা একটি ছেলে আরে মেয়ে দুজনের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে, তারা বিয়ে করতে চাইছে। কিন্তু এদের পালিয়ে যাবার অনুমতি নেই। খুব বিয়োগান্তক আর অত্যন্ত বেদনাদায়ক উপন্যাস। এতই বেদনাদায়ক যে উপন্যাসটা শেষ পর্যন্ত পড়াও যায় না। এই হল পাশ্চাত্য জগৎ। যারা পশুপাখি ছেড়ে দিন, গাছপালা ছেড়ে দিন, এমনকি মানুষেরও যদি ক্লোনিং হয় সেটাকেও তারা মানে না যে এর মধ্যে আত্মা আছে। সেইজন্য পাশ্চাত্য জগতে যত নিয়মকানুন আছে তাদের সাথে আমাদের নিয়মকানুনের বিরাট তফাৎ। আমাদের কাছে কোন কিছু নেই যার মধ্যে জীবন নেই, সব কিছুর মধ্যেই চেতনা আছে। তাদেরও দুঃখ বেদনা, সুখ আছে, কিন্তু বোধের তারতম্য আছে। এটাই হল প্রথম নিয়ম যেটাকে আধার করে মনুস্মৃতি চলছে।

বৈষম্যই জগতের ধর্ম

দ্বিতীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল বৈষম্যই জীবনের বৈশিষ্ট্য। আমরা এত দিন উল্টো শুনে এসেছি – আমরা সবাই সমান। মনু খুব ভালো ভাবেই জানতেই সমান বলে জগতে কিছু হয় না, বৈষম্যই জগতের ধর্ম। মায়ের পাঁচটি সন্তান, পাঁচটি সন্তানকেই মা সমান ভালোবাসে কিন্তু তার মধ্যে কোন এক সন্তানকে একটু বেশী ভালোবাসে, এটাই নিয়ম। কিছু করার নেই। শিক্ষকের যদি কোন প্রিয় ছাত্র না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই শিক্ষকের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। যদি শিক্ষক বলে আমি সব ছাত্রকে সমান ভালোবাসি, তাহলে বুঝতে হবে সেই শিক্ষক কোন ছাত্রকেই ভালোবাসে না। মনু এটাকে মেনেই চলেছেন যে, জগতে বৈষম্য আছে। আর এরই দ্বিতীয় নিয়ম হল কোন দিন এই বৈষম্য দূর হবে না। যখন কেউ বলছে সবাইকে সমান করতে হবে, তখন দুটো পথ আছে – হয় সবাইকে ব্রাহ্মণ করে দাও, তা নয়তো সবাইকে শূদ্র করে দাও। ভারত সরকার উঠে পড়ে লেগেছে সবাইকে শূদ্র করে দেওয়ার জন্য। এখন কেউ আইনকানুন মানছে না, সবাই তাই শূদ্র স্তরে চলে যাচ্ছে। আবার স্বামীজী বলছেন সবাইকে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে নিয়ে আসতে হবে। কারণ দেশ এমন অধঃপতনে চলে গিয়েছিল যে তখন কখনই বলা যায় না যে বৈষম্য থাকবে। যদিও মনুস্মৃতির কাজই হল মানুষকে তার

নিম্নস্তর থেকে টেনে ব্রাহ্মণত্বের দিকে নিয়ে আসা। মনু এও বলছেন এই বৈষম্য সাম্যতে রূপান্তরিত হবে একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়ে। আধ্যাত্মিক স্তর ছাড়া বৈষম্য দূর হবে না।

আমাদের পরম্পরাতে এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, বিশ্বামিত্র প্রথমে ছিলেন ক্ষত্রিয় কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে তিনিও বশিষ্ঠের সমান ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করলেন। অন্য দিকে এর থেকেও ভালো দৃষ্টান্ত আমরা পাই লাটু মহারাজ আর স্বামীজীর জীবনে। লাটু মহারাজ আর স্বামীজীর মধ্যে সব কিছুতেই বৈষম্য ছিল। পারিবারিক দিক দিয়ে বৈষম্য, বিদ্যার দিক দিয়ে বৈষম্য, বক্তব্য রাখার ব্যাপারে বৈষম্য। কিন্তু স্বামীজীই বলছেন ঠাকুরের কৃপায় লাটু ওইখানেই পৌঁছেছে যেখানে আমরা পৌঁছেছি। সাম্য একমাত্র হতে পারে এই আধ্যাত্মিক স্তরে। অন্য দিকে মনু এটাই মনে করছেন না যে বৈষম্য সব সময় থাকবে। এখানে নিয়মটা হল বৈষম্যই জীবন। তাই বলে যে ধনী সে চিরদিন ধনী থাকবে আর যে গরীব সে কি সব সময় গরীব থেকে যাবে? সেটা মনু একবারও বলছেন না। এটা পরিবর্তনশীল, বড়লোক গরীব হয়ে যেতে পারে, গরীব বড়লোক হয়ে যেতে পারে। তবে সমাজকে পরিচালিত করার জন্য যদি এই বৈষম্য থাকে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তাই বলে যে কাউকে নীচেই ফেলে রাখবে আর কারুর জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে যে তারা যেন কখন উপর থেকে নীচে না পড়ে যায়। ব্যাপারটা তা নয়, সে যাতে স্বাভাবিক ভাবে উপরে উঠে আসতে পারে তার জন্য সমাজকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে। প্রথম বক্তব্য হল যত যাই করা হোক না কেন বৈষম্য থাকবেই। দ্বিতীয় বক্তব্য হল আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়ে এই বৈষম্যটা দূর হয়ে যায়। তৃতীয় বক্তব্য হল এই বৈষম্য স্থায়ী নয়, পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনশীলতার জন্যই সমাজ ঠিক থাকে।

এখন যেমন দেশে কেমন একটা সাম্যবাদের ঢেউ এসেছে। এটা খারাপ কিছু নয়, কেননা এই সাম্যবাদের পরেই সমাজ পাল্টাতে শুরু করবে। এর ফলে অন্য দিকে হাতের কাজ করার লোক, যারা রাষ্ট্র পরিষ্কার করবে, বাথরুম পরিষ্কার করবে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না, চারিদিকে বিরাট সমস্যা। বিদেশে বড় বড় পরিবারের লোকেরা নিজের বাথরুম, পায়খানা নিজেরাই পরিষ্কার করে, কিন্তু ভারতের লোকেরা কিছুতেই পরিষ্কার করতে চায় না। অথচ স্বামীজী অনেক বছর আগেই বলে দিয়েছেন বর্তমান শৃঙ্গের যে কাজ অদূর ভবিষ্যতে এই কাজ মেশিন দিয়েই করতে হবে। এখন সত্যিই তাই হচ্ছে, রেলওয়েতে এখন বড় বড় এয়ার প্রেসার দিয়ে সমস্ত ট্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে। এখন না হয় মেশিনে করা হচ্ছে কিন্তু সেই সময় তো মেশিন ছিল না, স্মৃতিকাররা এগুলোকে আধার করে বলেছিলেন সমাজকে সুস্থ ভাবে টিকে থাকতে হলে সব রকম লোকেরই দরকার। কিন্তু তাই বলে যে যে কাজ করছে সে সেই কাজই চিরদিন করে যাবে, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকবে, সেটা বলছেন না। সবাইকেই সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে সুস্থ ভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, আর তারই মধ্যে বর্তমান অবস্থা থেকে উপরে নিয়ে আসার চেষ্টাও করা হয়েছে।

বর্ণাশ্রম, কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ

এই বৈষম্যের একটা বড় আধার হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। ভারতে যে কটি স্মৃতিগ্রন্থ আছে প্রত্যেকটি স্মৃতিগ্রন্থ বর্ণাশ্রম ধর্মকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছে। এই বর্ণাশ্রম আবার কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মবাদকে গ্রহণ করলে পুনর্জন্মকেও মানতে হবে। বর্ণাশ্রম, কর্মবাদ আর পুনর্জন্ম এই তিনটে তিনটেকে ছাড়া চলবে না। কেউ যদি বলে আমি কর্মবাদকে মানি কিন্তু পুনর্জন্মকে মানিনা। কিন্তু কর্মবাদ মানলে পুনর্জন্মবাদকেও মানতে হবে, কর্মবাদ না মানলে পুনর্জন্মবাদও মানা যাবে না। পুনর্জন্ম আর কর্মবাদ যদি না মানে তাহলে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানবেই না। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান রচনার সময় কর্মবাদ, পুনর্জন্ম আর বর্ণাশ্রম এই তিনটেকে বাদ দিয়েছে। এই তিনটেকে বাদ দিয়ে যখন আইন তৈরী হয়েছে তখন আমাদের সংবিধান যে রকম হবার সেই রকমই হয়েছে। কিন্তু স্মৃতি সাহিত্য এই তিনটে বিষয়কে আধার করেই রচিত হয়েছে। কর্মবাদ মানে, তুমি যেমনটি কর্ম করছ তেমনটি ফল পাবে, তোমার জীবনে ভালো মন্দ যা কিছু ঘটছে সব তোমার নিজের জন্য, বাইরে থেকে কিছু হচ্ছে না। দ্বিতীয়, যে কর্মগুলো তোমার বাকি থেকে গেছে তার জন্য তোমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। যেমন যেমন কর্ম করেছ সেই অনুসারে তুমি জন্ম নেবে, প্রচুর ভালো কর্ম করলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম

নেবে, আর খুব খারাপ কর্ম করলে চণ্ডাল হয়ে জন্মাবে। আদর্শ একদিকে ব্রাহ্মণত্ব অন্য দিকে একেবারে চণ্ডাল, মানে গ্রামের বাইরে শাসনের দিকে থাকা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান এই জিনিষকে আদৌ অনুমতি দেয় না। তুমি ব্রাহ্মণ বলে আলাদা করে কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে না, আর তুমি চণ্ডাল হলে তোমার প্রতি যে অবিচার করা হবে তা নয়। আইনের দৃষ্টিতে আজকে সবাই সমান। এটা ভালো কি খারাপ এই আলোচনার মধ্যে আমাদের যাওয়া উচিত হবে না, কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রাও অনেক পাল্টে গেছে। আর আমরা যে বিধান ও নিয়মগুলো পড়তে যাচ্ছি সেগুলো দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। আজকের দিনে যেটা হওয়া দরকার তা হল ভারতীয় সংবিধান যে আদর্শগুলো রেখেছে, সেগুলোর সাথে বর্ণাশ্রমের আদর্শ এগুলোকে প্রেক্ষাপটে রেখে এবার সংবিধান যে সবার জন্য সমান সুযোগের কথা বলছে সেটাকে কার্যকরী করা। আগেকার দিনে আমাদের সমাজে যে গোলমালটা হয়ে গিয়েছিল তা হল – সাম্য আর সমান সুযোগ দেওয়া। সাম্য আর সমান সুযোগ দুটো আলাদা জিনিষ। স্মৃতি যখন বলছে বৈষম্যই হল জগতের নিয়ম তখন তারা কিন্তু সবার জন্য সমান সুযোগটাকে বাদ দিয়ে দিলেন। এটাই একটা মস্ত ভুল তারা করেছিলেন। আমাদের স্মৃতিকাররা সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে সমান থাকলেন না। আমাদের সংবিধান বৈষম্যকে সরিয়ে সমান সুযোগ করে দিল। আজকের দিনে একজন শূদ্র যদি বলে আমি বেদ অধ্যয়ন করতে চাই, একজন মুসলমানও যদি বলে আমি বেদ পাঠ করতে চাই, তখন কেউ আর তাদের বাধা দিতে পারবে না। আজ ভারতে যে কোন লোক যে কোন সংস্থাতে গিয়ে পড়তে পারে। বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজীও এই কথা বলেছিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মের সাথে বিশেষ কিছু লোককে সুবিধা সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারটাকে দূর করতে হবে। এই ব্যাপারটা দূর করা মানে, সবার জন্য সমান সুযোগ। স্মৃতিকাররা এই জায়গাটাতে ভুল করেছিলেন।

তখনকার দিনে সবার সমান সুযোগ ছিল না। সমান সুযোগ না থাকা মানে শূদ্র বেদ অধ্যয়ন করতে পারবে না। কেউ খারাপ কর্মের জন্য শূদ্র বা চণ্ডাল হয়ে জন্মেছে ঠিক আছে, কিন্তু accidental birth তো হতে পারে। সে হয়তো ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্যই যোগ্য ছিল কিন্তু দুর্ঘটনা বশতঃ সে শূদ্র বংশে গিয়ে জন্ম নিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা তো যে কারুর পক্ষে হতে পারে। একবার এক ক্ষত্রিয় কয়েকজন দুষ্টদের হাতে মারা গেছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর অল্প বয়সী স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে আসছে আর স্বামীর প্রেতাত্মা স্ত্রীর পেছনে পেছনে চলেছে। সেই সময় এক মুচির অন্তঃসত্ত্বা মেয়েও ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, আর ঐ প্রেতাত্মা মুচির মেয়ের গর্ভে ঢুকে গেছে, কারণ তার তো এখনও মরার সময় হয়নি। এটাই হয়ে গেল accidental birth। যখন মুচির বাড়িতে জন্ম হয়েছে তখন তার স্মৃতি থেকে গেছে যে আমি হলাম রাজপুত ঠাকুর। তারপর চারিদিকে খোঁজ নিয়ে দেখার পর জানা গেল অমুক ক্ষত্রিয় যুবককে খুন করা হয়েছিল। বাচ্চাটিকে তার পূর্বজন্মের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর সে সব ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছে অমুক জায়গায় আমার অমুক জিনিষ রাখা আছে, দেখা গেল সব মিলে যাচ্ছে। ছেলেটি আর এখন থেকে যেতে চাইছে না। আর যার ছেলে মারা গিয়েছিল সেও মনে করছে আমার ছেলে আবার ফিরে এসেছে, ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। এই নিয়ে অনেক জলঘোলা হল, ওখানে বলা হয়েছিল যে It was a case of accidental birth। যেখানে জন্ম নেওয়ার কথা সেখানে জন্ম না নিয়ে অন্য জায়গায় জন্ম নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটির পরে আর বিয়েই হল না। কারণ ছেলেটি বলছে আমি কোন মুচিকে বিয়ে করব না, আমি হল রাজপুত ঠাকুর। অন্য দিকে কোন ঠাকুর তার মেয়েকে এর সাথে বিয়ে দিতে রাজী নয়, তারা বলছে জন্ম তো সে মুচির ঘরেই নিয়েছে। সে বেচারী অবিবাহিত থেকেই মারা গেল। বর্ণাশ্রম ধর্মকে মেনেও যদি আমরা এই accidental birth কে মেনে নিই তাহলে তখন আমাদের সমান সুযোগ দিতে হবে। এই গোলমালটা স্মৃতিকাররা করে গিয়েছিলেন।

যদিও মনু অনেক জায়গায় বলেছেন যদি একজন শূদ্রের আচার ব্রাহ্মণের মত হয় সে ব্রাহ্মণ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তখনকার দিনের সমাজ এই চিন্তাধারাকে কোন দিন গ্রহণ করল না। স্বামীজীও অনেক জায়গায় বলেছেন আচার্য শঙ্কর অনেক সময় নিম্ন জাতিদের ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিয়েছেন, কাউকে ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ঋষিদের কিন্তু কোথাও দেখা যায়নি যে এই ধরনের কিছু করতে। একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভু পুরো

দলকে দল সবাইকে বৈষ্ণব বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই বৈষ্ণবদের মধ্যেই তখন সব কিছু, বিয়ে থা হতে শুরু করল। সেই থেকে একটা ভক্ত বংশ রূপে আলাদা একটা জাতি দাঁড়িয়ে গেল। আমরা যেভাবে মনে করি যে তখনকার দিনে জাতিপ্রথা খুব কঠোর ভাবে চলে আসছিল, ঠিক ততটা ছিল না। বড় বড় মহাত্মা মহাপুরুষরা কেউ কেউ এই জাতিপ্রথাকে ভেঙে দিতেন। তখন আবার ঐটাই একটা নতুন জাতি রূপে দাঁড়িয়ে যেত।

যেখানে বৈষ্ণবাই জীবনের ধর্ম, কর্মবাদ, পুনর্জন্ম এগুলোকে না মানা হবে স্মৃতি সেখানে চলবে না। আজকে যে চারিদিকে এত উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার, অনাচার বেড়ে গেছে, এত দুরবস্থা কেন? তার একমাত্র কারণ ভারতে আজ স্মৃতিশাস্ত্রের মূল্য হারিয়ে গেছে। এখন ভারতের সব কিছুতে শুধু সংবিধান আর দণ্ডধারা। যদি তুমি আইনের মধ্যে থাক তাহলে তুমি যা খুশি করতে পার আর আইন বিরোধী যদি কোন জঘন্য কাজ কর তখন ধরা যদি না পড় তাতেও কোন দোষ নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে সিভিক সেন্স, মূল্যবোধ, ভদ্র আচরণ যে জিনিষগুলো সমাজের রক্ষাকবচ, সমাজকে সুস্থ ভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে, এগুলোকে আইন করে তো চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আইন করে বলা যাবে না যে ট্রেনে বাসে সাধু সন্ন্যাসীদের দেখলে সীট ছেড়ে দিতে হয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বসতে দিতে হবে। বাসের দেওয়ালে লিখে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কেউ মানবে কি মানবে না সেটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। যার ফলে দেশের সব কিছু আজ লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতে তাও এখনও কিছুটা ভদ্রতা আছে কিন্তু উত্তর ভারত, বিশেষ করে বিহার ইউপি অবস্থা তো কল্পনাই করা যায় না, বিহার ইউপি দিয়ে ট্রেনে করে যাতায়াত করা তো এখন রীতিমত আতঙ্কের ব্যাপার। কেন এই দুরবস্থা? স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানগুলো আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। স্মৃতি শাস্ত্রের বিধানে কি বলছে? কর্মফল আছেই আছে, পুনর্জন্ম থাকবেই, আজকে যে তোমার দুরবস্থা এর জন্য তুমি নিজে দায়ী। সেইজন্য তোমার জন্য এই বিধান দিয়ে দেওয়া হল, তুমি যদি মেনে চল তোমার জীবন উন্নত হবে। সংবিধান কি বলছে, পেনাল কোড কি বলছে এগুলোর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাকে তোমার নিজের জীবন নিজেই সামলাতে হবে, নিজের জীবন নিজেকেই চালাতে হবে। এই পুরো ব্যাপারটাকে স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে।

আমাদের আচার আচরণ কেমন হবে এটা স্মৃতি শাস্ত্র বলে দিচ্ছে। আমাদের দেশের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ হল আমাদের কেউ আজ মনুস্মৃতি পড়ে না, মনুস্মৃতি বোঝে না, মনুস্মৃতির বিধান অনুযায়ী আচরণ করে না। কিন্তু এর আগেও আমরা বলেছি, মনুস্মৃতি তো আর চলবে না। কারণ বেদ হল ভগবানের কথা, তাই ওখানে হাত দেওয়া যাবে না। কিন্তু স্মৃতি হল ঋষিদের কথা, ঋষিরা যতই হোক ওনারা মানুষ, সেইজন্য তাঁর কথাকে পালেট দেওয়া যাবে। আজকে মনু একটা বিধান দিয়ে গেলেন, আগামী দিনে যাঙ্গবক্ষ্য এসে অন্য একটা বিধান দিয়ে দিলেন, পালেট গেল জিনিষটা। বর্তমান কালের জন্য একটা নতুন স্মৃতির প্রয়োজন। জীবন এভাবে চলবে না, চলতে পারেনা। ওকে বোঝাতে হবে তোমার জীবন তোমার হাতে, আজকে যে তোমার দুরবস্থা কারণ আগে তুমি ঠিক ভাবে চলোনি। ঠাকুর বলছেন – কি জানো, আগের জন্মে একটু দান পুণ্য করা থাকলে এই জন্মে টাকা-পয়সা থাকে। একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতার মধ্যে যদি প্রাণখুলে কেউ দান করে দেখা যাবে কদিন পরে তার অবস্থাটা পালেট গেছে। আমি যদি অপরকে সম্মান করতে থাকি দেখা যাবে কদিন পর থেকে আমিও সম্মান পেতে থাকব। কিন্তু প্রতিদান আর ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে দান করলে কোন দিন তার ফল পাওয়া যায় না। যেদিন আমি মনে করব দান করাটা আমার ধর্ম তাই দান করছি তখনই ঠিক ঠিক ধর্ম পালন হবে, আর তার ফলও আসতে থাকবে। স্মৃতিশাস্ত্র মানে তাই, স্মৃতিশাস্ত্র বলে দেবে এই হল বিধান, তুমি আগে ঠিক কর কোন জিনিষকে তুমি তোমার ধর্ম রূপে গ্রহণ করছ। ওই ধর্মানুসারে আচরণ করলে ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে অন্য রকম হয়ে যাবে। যখন তুমি ভেতর থেকে নিজেকে পালাতে শুরু করবে তখন তোমার চারপাশের সব কিছুও পালাতে শুরু করবে আর তুমি সেটাই পেতে শুরু করবে যেটা তুমি ভেতর থেকে অপরকে দিচ্ছ। ভেতর থেকে হওয়া চাই। একটা হিন্দী গান আছে তুম্ এক পয়সা দেওগে ও দশ লাখ দেঙ্গে। তুমি যদি এক পয়সা দান কর ভগবান তোমাকে দশ লাখ দেবে। যার জন্য একজন ভগবানকে বলছে ‘হে ভগবান! তোমাকে কেউ এক

পয়সা দিলে তুমি দশ লাখ দাও, তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর, আমাকে এক পয়সা কেন দিতে হবে, একটা টাকা তুমি রেখেই দাও বাকিটা আমাকে দিয়ে দাও’। এই ধরনের বেনে বুদ্ধি থাকলে ধর্ম পালন হয় না।

স্মৃতি চলে ধর্মের উপর। এটা আমার ধর্ম, আমাকে এবার কি করতে হবে বলুন। কারণ কর্মফল সত্য, পুনর্জন্ম সত্য আর আমি আজ যে অবস্থায় আছি তার জন্য আমার পূর্ব পূর্ব কর্মই দায়ী। হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রায়ই শোনা যায় ক্রস ইনফেকশান হচ্ছে। ক্রস ইনফেকশান হলো একজন রোগীর অপারেশন হয়েছে, প্রায় সেরে এসেছে, হঠাৎ তার ম্যালেরিয়া হয়ে গেল। ম্যালেরিয়া হয়েছিল আরেকজনের সেখান থেকে তার সংক্রমণ হয়ে গেছে। এবার তার ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার শুরু হয়ে গেল। ম্যালেরিয়া যতক্ষণে সেরে গেলে ততক্ষণে তার আবার জন্টিস হয়ে গেল। কারণ ক্রস ইনফেকশান হয়ে গেছে। কেন ক্রস ইনফেকশান হচ্ছে? রোগীর শরীর এখন দুর্বল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এই দুর্বল শরীরে যখনই কোন বাইরে থেকে আঘাত আসছে তখনই তাকে রোগ আক্রমণ করছে। আমাদের কর্মটাও ঠিক তাই, আমাদের ভেতরে যদি খারাপ কর্মের বোঝা থাকে তখন একটা ছোট্ট ধাক্কাই তাকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে। খারাপ কিছু হলেই আমরা বলি ওর জন্য আজ আমার এই অবস্থা হল। কারুর জন্যই তোমার কিছু হয়নি। একটা মশা ধাক্কা মারলে আমরা কখনই উল্টে পড়ব না, হাতি ধাক্কা মারলে সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পড়ব। দুর্বলতা আমাদের ভেতরেই। দুর্বলতা যেভাবে ভেতরে থাকে ঠিক সেই ভাবে শক্তিও আমাদের ভেতরে আছে। বাইরে থেকে একটা উত্তেজনা এসে শুধু আমাদের নাড়িয়ে দিচ্ছে, বাকিটা নিজে থেকেই হতে থাকে। এই যে নিজে থেকে হবে, এটার প্রস্তুতি হয় ধর্মের মাধ্যমে। যেমন যেমন আমরা ধর্মাচরণ করব তেমন তেমন আমার ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে।

একটা সময় ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় আমাদের দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে গুয়াহাটির মত রাজধানী শহরে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রায় একটা মেয়েকে পঁচিশ জন মিলে কিভাবে শীলহানি করল। এই ধরনের ঘটনা এখন হামেশাই হচ্ছে। দেশ যে গোপলায় যাচ্ছে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। এই দেশকে এখন যে বাঁচাতে যাবে সেও মরবে। এক সময় স্বামীজী দূর দৃষ্টিতে বলেছিলেন আগামী দিনে চীন সারা বিশ্বকে শাসন করবে। এমন সময় স্বামীজী এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যখন চীন দেশের কিছুই ছিল না। সেই চীন ভারতে ঢুকল বলে, এরাই কদিন পারে ভারতকে চালাবে। এই পরিণামের দিকে আমরা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি। আমাদের এখন নৈতিকতা বলে কিছু নেই, চরিত্র বলে কিছু নেই, শিক্ষা বলে কিছু নেই, সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা সব হারিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান, ব্রিটিশ যে পরিস্থিতিতে যে ভাবে ভারতে ঢুকেছিল, ঠিক সেই পরিস্থিতি আবার এসে গেছে চীনকেও আমরা ভারতে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেইজন্য মনু এই ধরনের বিধান ও নিয়ম করে গেছেন। তুমি আগে বোঝ কর্মবাদ সত্য, পুনর্জন্ম সত্য, বর্ণাশ্রম সত্য। বুঝ নিয়ে এমন ভাবে এমন ধর্ম কর, এমন কর্ম কর যেন তোমাকে বিপদে না পড়তে হয়। এটা হল মনুসূত্রের দর্শনের একটি অঙ্গ।

ধর্মশাস্ত্রই প্রমাণ

গীতায় বলছেন তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ, শাস্ত্র যেটা বলছে সেটাই প্রমাণ, সেইভাবেই তুমি কি কার্য করবে কি কার্য করবে না ঠিক করে নাও। আমরা যখন বিচার করতে বসি, এই কাজ করব কি করব না, তখন আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়েই বিচার করি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি কতটুকু! আর এই বুদ্ধিটুকু আবার কামনা-বাসনাতে রঞ্জিত হয়ে আছে। হিন্দু বাড়ির ছেলে একটা মুসলমান মেয়েকে ভালোবেসেছে। ছেলেটির বাবা-মা, বাড়ির লোক বোঝাতে চাইবে, এটা কি করছ তুমি, এর পরিণামের কথা তুমি একবারও ভেবে দেখলে না! আমরা এই জিনিষ মেনে নিতে পারিনা। এবার ছেলেটি মাকে বোঝাবে – মা! মানুষকে ভালোবাসা কি খারাপ? তুমি কি মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করে বলতে পারবে ও হিন্দু না মুসলমান। এই ধরনের নানা রকমের যুক্তি নিয়ে আসবে। এমন সব যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেবে তার উত্তর কেউ দিতে পারবে না। আমরা মনে করছি এই ধরনের কাণ্ড শুধু অল্প বয়সী যুবক যুবতীরাই করছে। না, আমরা সবাই করছি। যখনই আমরা কেউ কোন গোলমাল করি তখন সেটাকে সঠিক প্রমাণিত করার জন্য বুদ্ধির উপর ভরসা করি। এই বুদ্ধি আবার সব সময় কামাসক্ত। এই কামাসক্ত বুদ্ধি আমাদের সামনে এমন সব যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেবে যা কিনা

সব সময় আমাদের গোলমালের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন তস্যাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং শাস্ত্র যেটা বলছে তার বাইরে তুমি যাবে না। স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সময় স্মৃতিকারদের মাথায় এটাই ছিল। স্মৃতিকাররা এটাই বলছেন, তোমাকে আর বুদ্ধি খাটাতে হবে না, তোমার যা কিছু করার এখানে বেঁধে দেওয়া হল। এর বাইরে তোমাকে কিছু করতে হবে না। আর তুমিই শুধু মানবে না, সবাই মানবে। সবাই যদি মানে তখন আর কোন সমস্যা হবে না।

স্মৃতিকাররা কখনই বলছেন না যে তোমার সবাই অপদার্থ, তোমাদের মধ্যে সব আবর্জনাতে ভর্তি। খ্রীশ্চানরা যেমন বলে জন্ম থেকেই তুমি হলে পাপী, তাই তোমাকে যা বলা হচ্ছে তুমি সেটা পালন কর। কিন্তু স্মৃতিকারদের অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে টেনে তুলছেন। স্মৃতিশাস্ত্র এত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মহাভারত, রামায়ণ, পুরান যেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সেইভাবে স্মৃতিশাস্ত্র সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তার কারণ স্মৃতিশাস্ত্র হল আইন বিষয়ক বই। অথচ প্রত্যেক হিন্দুর একবার অন্ততঃ মনুস্মৃতি পড়া দরকার। পড়লে একটা ধারণা তৈরী হয়, আমরা কে, আমরা কিসের জন্য এই জগতে আছি, আমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য, কিভাবে জীবনকে চালিত করব। এনাদের ঘুরে ঘুরে এই কথাটাই আসবে, জীবনের উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ হল ধর্ম পালন। এই পর্যায়েই যদি উপনিষদ বা গীতাতে যাওয়া যায় সেখানে দেখব আচার্য বার বার দুটি পথের কথা বলছেন – প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ। মনুস্মৃতি প্রবৃত্তিমার্গের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে। নিবৃত্তিমার্গেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলছেন সন্ন্যাসী কিভাবে থাকবে, কি কি করবে।

স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়

ভারতে অনেকগুলো স্মৃতিশাস্ত্র আছে, এই স্মৃতিশাস্ত্র গুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিছু পার্থক্য থাকলেও দেখা যায় অধিকাংশ বিধিগুলো প্রায় একই আছে। ভাবের ব্যাপারে বেশীর ভাগ স্মৃতির মধ্যে খুব একটা তারতম্য দেখা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্র মোটামুটি তিনটে বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করে। প্রথম হল আচার, আমার নিজের আচার, আমি কি ধরনের আচরণ করব, কিভাবে আমি নিজের জীবনকে অতিবাহিত করব। আচার হল নিজের শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা। দেহ ও মনের শৌচ কিভাবে করব, শাস্ত্র অধ্যয়ণ কিভাবে করব। সব স্মৃতিশাস্ত্র আচার নিয়ে আলোচনা করবেই। দ্বিতীয় ব্যবহার, সমাজ ও পরিবারের সবার সাথে যখন আমি মেলামেশা করব তখন তাদের সাথে আমার ব্যবহারটা কেমন হবে। বাংলায় আমরা যেমন প্রায়ই বলতে শুনি তোমার আচার ব্যবহারটা ঠিক কর। তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা সবাই কিছু না কিছু ভুল কাজ বা শাস্ত্রবিরোধী কাজ করে ফেলি। এই ভুল কাজের জন্য আমাদের মনের মধ্যে যে কালিমা পড়েছে সেটাকে কিভাবে দূর করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে স্মৃতিশাস্ত্র বিভিন্ন ভুল কাজের জন্য বিভিন্ন রকমে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ স্মৃতিশাস্ত্র তিনটে বিষয় – আচার, ব্যবহার আর প্রায়শ্চিত্তকে নিয়েই আলোচনা করে, কিছু স্মৃতিশাস্ত্র এই তিনটে বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করে, আবার কিছু স্মৃতিশাস্ত্র হয়ত সেগুলো নাও আলোচনা করতে পারে, তারা হয়ত অন্য কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে কিন্তু এই তিনটে হল সাধারণ।

দ্বিতীয় কথা হল প্রত্যেক স্মৃতি আচার ব্যবহার আর তার সাথে আইন এই দুটোকে মিলিয়েই একসাথে আলোচনা করেন। অন্যান্য দেশে ব্যক্তির আচরণ আর আইন এই দুটোকে পুরো আলাদা করে দেখা হয়। কিন্তু ভারতের স্মৃতিকারদের কাছে দুটো আলাদা নয়। এনারা দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ দেখতেন না। ব্যক্তির আচার আচরণ ব্যক্তির মধ্যে যেমন আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করছে, আর সাধারণের জন্য যে আইন প্রণয়ন হয়েছে তারও উদ্দেশ্য তাই। আমাদের ঋষিরা জানতেন ব্যক্তিগত আচার আচরণের মাধ্যমে যে কোন মানুষ তাঁর আত্মোন্নতি ঘটাতে পারে। কিন্তু এর বাইরে এমন কিছু কিছু জিনিষ আছে যেগুলো ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও অনেকের সাথে জড়িয়ে থাকে, যেখানে কোন ভুল কাজকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মেটান যাবে না। প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে হতে পারে, সেই ভুল কাজের জন্য যার ক্ষতি হয়েছে সে যদি মেনে নেয়। যেমন কেউ যদি

আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তাকে আমি বলতে পারি, তুমি এ কি ধরনের আচরণ করছ! লোকটি ভুল বুঝতে পেরে আমাকে বলে দিল – সরি সরি, ভুল হয়ে গেছে। এই যে সরি বলে দিল এটাই লোকটির প্রায়শ্চিত্ত। দুর্ব্যবহার করার জন্য যে পাপ হয়েছিল তখন সেটা কেটে গেল। এর বাইরে আরেকটা অন্য উপায় আছে। আমি সোজা থানায় গিয়ে লোকটির নামে ডাইরি করে দিতে পারি। তখন এটাই আইনী ব্যাপার হয়ে গেল। সেখানেও একই ব্যাপার হচ্ছে, লোকটি একটা দোষ করছে তাতে তার একটা শাস্তি হল। আইনগত ভাবে যখন কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় তখন তার উদ্দেশ্য পুরোপুরি আলাদা। আইনের দিক দিয়ে যখন কাউকে শাস্তি দিয়ে দেওয়া হল তখন তার যে ঔদ্ধত্যটাকে প্রশমিত করে দেওয়া হল। এর আরেকটা দিক হল, তাকে এমন একটা সাজা দেওয়া হল যেটা অন্যদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল, এই রকম অন্যায় করলে এই রকম শাস্তি পেতে হবে। তার সাথে সাধারণ ভাবে সমাজকে নিরাপত্তা দেওয়াও হয়ে গেল। সাধারণতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্তটা চলে শুধু নিজেকে নিয়ে।

সব স্মৃতিশাস্ত্রই গৃহস্থ ধর্মে সন্ধ্যা বন্দনাদিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। এর সাথে পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থকে অবশ্যই করতে বলা হয়েছে। স্মৃতিকাররা প্রথম থেকেই গৃহস্থধর্মকে খুব উচ্চস্থান দিয়ে এসেছেন। কারণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বাণপ্রস্থ্যশ্রম আর সন্ন্যাসাশ্রম এই তিনটে আশ্রমই দাঁড়িয়ে আছে গৃহস্থের উপর। গৃহস্থ যদি এই তিনটে আশ্রমকে সব দিক দিয়ে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোশকতা না করে, এই তিনটে আশ্রম চলতেই পারবে না, কারণ গৃহস্থ ছাড়া বাকি তিনটে আশ্রম কোন উপার্জন করে না। সেইজন্য গৃহস্থধর্মের দিকে মনুর খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল যাতে গৃহস্থ সব দিক দিয়ে ঠিক থাকে। গৃহস্থ যদি কৃপণ হয়, ধর্ম থেকে সরে আসে তাহলে বাকি তিনটে আশ্রমও নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে সন্ন্যাসীরা আজকাল সব গোলমালে হয়ে গেছে। তাদের ভাবা উচিতঃ সন্ন্যাসীরা কেউ আকাশ থেকে আসছে না, আমার আপনার পরিবার, এই সমাজ থেকেই আসছে। সমাজটাই এখন গোলমালে হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালককে প্রশ্ন করা হয়েছিল আগের মত এখন আর ভালো ভালো সিনেমা তৈরী হচ্ছে না কেন। তার উত্তরে তিনি বলছেন – সমাজ কি আর আগের মত সেই রকম ভালো আছে নাকি, সমাজে যা কিছু হবে তারই প্রতিচ্ছবি সিনেমাতে নিয়ে আসা হচ্ছে। মনু এই ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। রিডার্স ডাইজেস্টে কিছু দিন আগে একটি লেখাতে একজন বলছেন আমেরিকাতে যে এত এত রিসার্চ হচ্ছে সেখানে বেশীর ভাগ রিসার্চের যে পেপার তৈরী হয় সেগুলো ডলার পে করে অন্য একজনকে দিয়ে লেখান হয়। এই কাজের জন্য পেশাদার লোকই আছে, যারা সারা দিন অপরের রিসার্চ পেপার লিখে যাচ্ছে। যিনি পিএইচডি করছেন তিনি খুব মজা করে বলছেন – আপনারা আমার ধারে কাছে দাঁড়াতে পারবেন না, আমি এ্যাস্ট্রোফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বায়োলজি এই রকম দশ খানা সাবজেক্টের উপর পিএইচডি পেয়ে গেছি, তাছাড়া মিলিটারি সাইন্সের উপর আমার এতগুলো পেপার আছে। আসলে এর নিজের একটাও পেপার তৈরী করতে হয়নি, বিভিন্ন লোক এই কাজের জন্য বসে আছে। শুধু বলে দিতে হবে আমি এই সাবজেক্টের উপর পিএইচডি করতে চাই। গৃহস্থ যদি ঠিক না থাকে তাহলে পুরো সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়ে পুরো সমাজে পচন ধরে যাবে। ঠিক সময় অফিসে যাচ্ছে না, অফিসে গিয়ে কাজ ঠিক ভাবে করছে না, ঘুষ না দিলে কাজ করবে না, এর সন্তান আর কি রকম হবে! আর তার দানের অর্থ যারা উপভোগ করবে তাদের কি হবে! মনু এই জিনিষটা বুঝতেন।

হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্মের আচার বিধি

পাশ্চাত্য জগৎ অনেক আগে থেকেই এই দুটো জিনিষকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে – আপনার আচার আচরণ আলাদা আর আইন পুরো আলাদা। ইসলাম ধর্মে আবার আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের মত চলে, সেখানে কোরান আর হাদিস এই দুটোকে মিলিয়ে যত রকম আইন আর তাদের যে আচার আচরণ এক সঙ্গেই পুরোটা চলে। সেইজন্য মুসলমানরা সব সময় বলে যতক্ষণ একটা রাষ্ট্র পুরোপুরি মুসলিম রাষ্ট্র না হচ্ছে, পুরোপুরি শরিয়ৎকে নিয়ে না চলে তাহলে কিন্তু ইসলাম ধর্ম ঠিকভাবে পালন করা যাবে না। এই নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট সমস্যা। কিছু মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র আছে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র

পরিচালিত হচ্ছে আবার আলাদা সংবিধানও আছে, মুসলমানরা বলে এইসব রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম পালন করা যাবে না। যার ফলে পাকিস্তানে এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান যখন শুরু হল তখন এইভাবে তারা আলাদা হয়েছিল যে এটা পাকিস্তান আর ওরা হিন্দুস্তান, যদিও আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়া। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর জিন্মা বলে দিলেন আমাদের একটা সংবিধান তৈরী করতে হবে, এখানে সবাই থাকতে পারবে, তবে মুসলিম প্রাধান্য রাষ্ট্র। অন্য দিকে ভারত হল হিন্দু প্রধান কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমাদের সংবিধান আলাদা হবে, অন্যান্য সব কিছুই আলাদা হবে কিন্তু দুটো রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করল। কিন্তু পরের দিকে পাকিস্তান বলে দিল এই পদ্ধতি চলবে না। তারপর জিয়াউল হকের সময় পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করে দেওয়া হল। ইসলামিক রাষ্ট্র করে দিলে আবার সব কিছু তাদের শরিয়তির নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। অন্য দিকে মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলি পুরোপুরি শরিয়তি আইনে চলে।

শরিয়তি প্রথায় পুরোপুরি শাসন চালাতে গিয়ে বর্তমান যুগে আবার অনেক সমস্যাও হয়ে যায়। এর মধ্যে তুর্কি বা তুরস্ক হল এক অদ্ভুত ধরনের রাষ্ট্র। তুর্কিরা হল পুরো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা শাসিত। এরা কখন মোল্লাদের সামনে আসতে দেয় না। এই নিয়ে ওখানে প্রচুর ঝগড়া। অনেক মুসলমানরা বলে ইসলামের স্বার্থে আমরা এই আইনগুলো কয়েম করতে চাই। কিন্তু ওখানকার রাষ্ট্র প্রধানরা এদেরকে কোন পাত্তাই দেয় না। এই নিয়ে অনেক অশান্তি লেগে আছে। ইরান আবার প্রথম থেকেই খুব খোলামেলা দেশ ছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লা খোমেইনি ইরানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইরান পুরোপুরি শরিয়ার উপর চলছে।

মনুস্মৃতি আর মুসলিম ল অর্থাৎ শরিয়ার মধ্যে মিল হল জাগতিক আইন আর ব্যক্তির আইন দুটোই এক, কারণ দুটোই ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় দুটো আলাদা। এরা বলে কিছু কিছু নিয়ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, যেমন মা সন্তানের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করবে, এটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার পরিবারে যে পরম্পরা আছে সেই অনুসারে সে চলবে, আইন সেখানে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু যে কোন স্মৃতি ব্যক্তিগত ব্যাপারকেও ছাড়বে না, তারা পরিস্কার বলে দিচ্ছে সন্তানের সাথে মা এই এই আচরণ করবে। সন্তানকে কিভাবে পালন করবে এর উপর আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে খুব নামকরা বিধান দেওয়া আছে। পাঁচ বছর পর্যন্ত পুত্রকে খুব আদর যত্ন কর, আর আগামী দশ বছর সন্তানকে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রাখবে। ষোল বছর হয়ে যাওয়ার পর পুত্রের সাথে বন্ধুর মত আচরণ করবে। এই বিধানকে যদি না পালন কর তাহলে কিন্তু ছেলে মানুষ হবে না। এই বিধানের দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছেন সমাজকে তাঁরা কিভাবে সুস্থ ভাবে চালনা করতে চাইছেন। হিন্দুদের সব বাবা-মাকে এখন এই বিধানই পালন করতে হবে, এটাই তাদের প্রতি নির্দেশ করে দিচ্ছেন। কিন্তু ইদানিং এমন অনেক আইন প্রণয়ন হচ্ছে যেখানে এই ধরনের অনেক বিধান পালন করলে ভারতীয় দণ্ডবিধি উল্লঙ্ঘন হয়ে যাবে। যেমন ধরুন কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্র অন্যায় করার পর শাস্তি দেয় তাহলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হয়ে যাবে। এই আইনটা কারা করল? লোকসভার সদস্যরা এই আইনকে লোকসভায় পাশ করাল। বেশীর ভাগ এমপি এমএলএরা কোন দিন ছেলেমেয়েদের পড়ানি। যাঁরা শিক্ষকতা করছেন তাঁরা জানেন কি ধরনের ছাত্রদের নিয়ে তাঁদের চলতে হয়। এদের এখন কোন শাসন করা যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থাও তাই সেই রকম দিন দিন অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। ছাত্ররাই এখন উল্টে শিক্ষকদের শারীরিক নিগ্রহ করছে। আমাদের স্মৃতিকাররা কখন দুম্‌দাম করে যখন তখন কোন আইন করে দিতেন না। হাজার হাজার বছর ধরে সমাজে যা কিছু চলে আসছে, সেখান থেকে তাঁদের যে অভিজ্ঞতার অনুভূতি হয়েছে সেই দিয়ে তাঁরা এই বিধানগুলি রচনা করেছিলেন। তবে সব বিধানগুলো যে একই ভাবে চলবে তা নয়, একভাবে কোন কিছুই চলতে পারেনা। সন্তানকে পালন করার চাণক্যের যে নীতি সেটাও পাল্টাবে, পাল্টে তারা বলে দেবেন সমাজে আগে এই বিধান ছিল কিন্তু এখন এই বিধান চলতে পারেনা। কারণ সমাজ এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। আগেকার দিনে সবারই অনেকগুলো করে সন্তান হত, এখন সবারই একটি কি দুটি সন্তান, এতে বাপ-মায়ের দুশ্চিন্তাও অনেক বেড়ে গেছে। সমাজের এই পরিবর্তন সাথে সাথে এই বিধানগুলো পাল্টে দিতে হয়।

স্মৃতিকাররা যখন রাজধর্মের বিধান তৈরী করছেন, যেমন একটা চোরকে কি ধরণের সাজা দেওয়া যেতে পারে, সেখানেও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অশুদ্ধতাকে দূর করে শুদ্ধি করা। পাপকর্ম যেটা হয়ে গেছে, যার ফলে তার ভেতরে অশুদ্ধির ছাপ পড়ে গেছে, সেই অশুদ্ধিকে দূর করে কিভাবে শুদ্ধি করা যায় এটাই তাঁদের চিন্তার মধ্যে থাকত যখন তাঁরা এই বিধানগুলো রচনা করতেন। তোমাকে এমন এক সাজা দিলাম যাতে তুমি জীবনে আর এই ধরণের পাপকর্ম না করতে পার। দ্বিতীয়ত এই সাজা থেকে সমাজের বাকিরা যেন সবাই শিক্ষা পেয়ে যায়, ভবিষ্যতে এই পাপকর্ম যেন কেউ না করে। উদ্দেশ্য ছিল, তুমি একটা দোষ করেছ, এই দোষ তোমাকে শেষ করে দেবে, আমি তোমাকে তাই শুদ্ধি করে দিলাম। মা যেমন ছেলে অন্যায় করলে ছেলেকে উত্তম-মধ্যম দেয় আবার ভালোও বাসে, এই মারের পেছনে একটা ভালোবাসা আছে। ঠিক তেমনি এনারা যে সাজা দিতেন এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সাজা দিতেন। সেইজন্য আইন ও ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারের সাথে তারা কোন পার্থক্য করতেন না। এখন অবশ্য আমাদের দেশে এই দুটোকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, যদিও মুসলিম রাষ্ট্রে আলাদা করেনি।

আমাদের যত স্মৃতিকাররা ছিলেন সবাই বর্ণাশ্রমকে অবশ্যই আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক মানুষকে সমাজে একটা স্থান দিতে হবে। সবাই যেন জানতে পারে সমাজে আমার এই স্থান। বর্তমান যুগে যখন শিক্ষা সমাপ্ত করে যুব সম্প্রদায় স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসছে তাদের সবার অবস্থা একেবারে ছন্নছাড়া। ছেলেমেয়েরা হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর কলেজে কলেজে ছুটে বেড়াচ্ছে, কোন্ কলেজে কি সাবজেক্ট পাওয়া যেতে পারে, কোন্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কি কি ট্রেড পাওয়া যাচ্ছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য সবাইকে দৌড়াতে হচ্ছে। কিন্তু আগেকার দিনে যেই শিশুর জন্ম নিল তখনই তার পথ একেবারে পরিষ্কার, তুমি জন্ম নিয়েছ, সমাজে এই জায়গাটিতে তোমার স্থান। ব্যস, এবার তুমি সেইভাবে চল। এখন যদি কারুর সন্তানের জন্ম বেলেড়ে হয় তখন বাচ্চার ছয় বছর থেকে বাবা-মার চিন্তা শুরু হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাকে বেলেড়ে ভর্তি করা, নাকি লিগুয়াতে ভর্তি করা। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আবার টেনশান, কলকাতায় পড়া না, লালবাবাতে পড়া। শেষ পর্যন্ত যখন একটা ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এল তখন আবার টেনশান, কিসে আর কোথায় চাকরি করবে। যে আইআইটি থেকে পাশ করছে সে বলছে আমি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ব। ম্যানেজমেন্ট পাশ করে শেষে সাবান শ্যাম্পু বিক্রী করে বেড়াচ্ছে। সে ট্রেনিং নিয়েছে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কিন্তু বিক্রী করে বেড়াচ্ছে সাবান। স্মৃতিকাররা এই ছন্নছাড়া অবস্থাটা কখনই হতে দিতেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেই এটা – জন্ম সূত্রে তুমি এই পরিবারে জন্ম নিয়েছ, এখানে তোমার এই বর্ণ আর এই আশ্রম। এখন তুমি ছাত্র, এখন তুমি গৃহস্থ, এখন তুমি বাণপ্রস্থী। তোমার এই এই বয়সে এই এই ধর্ম, এর বাইরে তুমি যাবে না। এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। এখানে এর ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি না, আমরা শুধু দেখছি ওনারা কিভাবে এগুলোকে দেখতেন। এখন সন্তানের জন্ম থেকেই আমরা যেমন টেনশানে থাকি, তখনকার সময় কিন্তু কারুরই কোন টেনশান ছিল না, ছেলে জন্ম নিল এবার জানে ওকে কি করতে হবে। ছেলে খুব প্রতিভাবান, তাকে গুরুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিল। খুব ভালো কথা, তুমি বড় হয়ে পণ্ডিত হবে। তার থেকে একটু কম প্রতিভা ঠিক আছে কোন টোলে শিক্ষকতা করবে। সেটাও যদি না পারে পুরোহিত কর্ম করবে। তাও যদি না পারে তাহলে চাষবাশ করে খাবে। এইটাই ছিল তখনকার পদ্ধতি।

রাজধর্মের উপর সব স্মৃতিকাররাই খুব জোর দিতেন। রাজকর কিভাবে আদায় করতে হবে, দণ্ড কিভাবে প্রয়োগ করবে এই জিনিসগুলোকে একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। রাজা যে নিজের খেয়াল খুশী মত চলবে, যাকে ইচ্ছে খুশী দণ্ড দিয়ে দেবে, স্মৃতিকাররা এভাবে রাজাকে একেবারেই চলতে দিতেন না। রাজার ক্ষমতাকে এনারা নিয়ন্ত্রণ করে পরিষ্কার ভাবে বেঁধে দিচ্ছেন। এই হল তোমার সীমারেখা এর বাইরে তুমি কখনই যেতে পারবে না। এখন পার্লামেন্টে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা যেমন যা খুশী করে নিতে পারে, যে কোন বিল পাশ করিয়ে নিতে পারে। এরপর যখন রাষ্ট্রপতির কাছে বিল সইয়ের জন্য পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতির যদি তখন পছন্দ নাও হয়, তখন আবার বিলটা ফেরত আসবে। আবার পাশ করে পাঠাবে, এবার রাষ্ট্রপতিকে সই করতেই হবে, সই করুক আর নাই করুক এটাই এখন আইন হয়ে যাবে।

১৯৫৩ সালে জহরলাল নেহেরু পার্লামেন্টে নিয়ে এলেন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট। এই আইনে কোন হিন্দু পুরুষ দুটো বিয়ে করতে পারবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন লোকসভা আর রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন ছিলেন রাষ্ট্রপতি। উনি বলে দিলেন আমি সই করব না। বিল ফেরত চলে এল। আবার পাশ হল, পাশ হয়ে আবার যখন রাষ্ট্রপতির কাছে গেছে, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলে দিলেন আমি সই করব না। তাঁকে বলা হল, সই না করলেও তো এটা আইন হয়ে যাবে, যখন সংবিধান তৈরী হয়েছিল তখন সেই কমিটিতে আপনিও ছিলেন। আপনি কি তখন এটা জানতেন না যে, দ্বিতীয়বার যদি লোকসভা আর রাজ্যসভায় পাশ হয়ে যায় আপনাকে তখন সই করতেই হবে। আপনি যদি সই নাও করেন তাও এটা আইন হয়ে যাবে। তারপর সেটাই আইন হয়ে গেলে রাষ্ট্রপতি কিছু করতে পারলেন না। রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের রাজা, কিন্তু কিছু করতে পারলেন না। অন্য দিকে যখন শাহাবানুর রায় এল। শাহাবানুর তালুক হয়ে গিয়েছিল, শরিয়ার আইনে সে মাসে একশ টাকা করে পেত। শাহাবানু এখন কেস করে দিয়েছে। কেস চলতে চলতে সুপ্রীম কোর্টে পৌঁছে গেল। সুপ্রীম কোর্ট শাহাবানুর অনুকূলে রায় দিয়ে দিল। এবার সারা দেশে আশুন লেগে গেল। মৌলবী থেকে শুরু করে মোল্লারা সব ইনকুাব জিন্দাবাদ শুরু করে দিল। সেই সময় রাজীব গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি তখন তড়িঘড়ি করে একটা বিল নিয়ে এলেন। সেই বিলে বলা হল কোন মুসলমান মহিলা ডিভোর্স কেসে আর্থিক ক্ষতিপূরণের অনিয়মের বিরুদ্ধে কোন ভাবেই কোর্টে যেতে পারবে না, তাদের মুসলিম পার্সোনাল আইন অনুসারে চলতে হবে। এখনও রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে এই নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়। এটা তাহলে কিসের দেশ! একদিকে বলছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, একদিকে বলছেন পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ, সুপ্রীম কোর্ট সর্বোচ্চ। সমস্ত ভারতীয় নাগরিক সুপ্রীম কোর্টের অধীনে। সেখানে এটা কিসের আইন! কার স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠার জোরে আইন পাশ হয়ে গেল, রাষ্ট্রপতির সইও হয়ে গেল। সুপ্রীম কোর্ট যে আইন দিয়েছিল সেটা খারিজ হয়ে গেল। এই ধরনের নোংরা কাজ স্মৃতিকাররা কখনই রাজাকে করতে দিতেন না। এখন রাজা যদি বিরাট ক্ষমতাবান ও শক্তিমান হয় তখন সেই রাজা একটা বিরাট কোন পণ্ডিতকে ডেকে এনে বলে দেবে তুমি একটা নতুন স্মৃতি লিখে দাওতো। এখন সেই পণ্ডিত রাজার আদেশে একটা নতুন স্মৃতি লিখে দিল। নতুন স্মৃতি লিখে দিলেই তো সেটা স্মৃতি হয়ে যাবে না, দেশের অন্যান্য স্মৃতিকাররা সেটা মানলে তবেই স্মৃতি হবে।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাজা হওয়ার পর তিনিও এই ধরনের অনেক কিছু করতে শুরু করেছিলেন। অনেক কিছু জিনিষ যেগুলো বে-আইনী নেপোলিয়ন সেগুলো করে দেওয়ার পর বাকীদের গিয়ে বলতেন – কি! এটা কি কোন ভুল হয়েছে? নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কে কথা বলতে যাবে – না না, সব ঠিক হয়েছে। স্মৃতিকাররা ধর্মের নাম করে, ধর্মকে সামনে রেখে প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। অনেকে মুর্খের মত মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে বলে মনু নারীদের নিন্দা করে অসম্মান করেছেন। মনু বলেছেন মেয়ে যখন কম বয়সের তখন সে বাবার অধীনে থাকবে, বিয়ের পর স্বামীর অধীনে আর বয়স কালে পুত্রের অধীনে থাকবে। মনুর এই বিধানের জন্য অনেকে মনুর প্রচুর সমালোচনা করেছে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্যটা কি সমালোচকরা ধরতেই পারবে না। মনুর কাছে দুটো সমস্যা ছিল। নারীকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে নারী যে কোথায় কি করে বসবে কোন ঠিক থাকবে না। দ্বিতীয় হল, কোন পুরুষের প্রতি যদি কোন কিছু হয়ে যায় তার প্রভাব খুব একটা বেশী সমাজে পড়ে না, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে যদি কোন গোলমাল হয়ে যায় তখন পুরো সমাজকে ভুগতে হয়। দুটো দিক চিন্তা করে মনু এই বিধান দিয়েছিলেন – একটা দিক হল মেয়েদের সুরক্ষা দেওয়া আর অন্য দিক হল সমাজকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করা। মুসলিমদের মধ্যে এটাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নেওয়া হয়। ইসলামিক দেশগুলোতে খুব কড়া আইন, কোন মেয়ে একা রাস্তায় বেরোতে পারবে না।

কিছু দিনে আগেও, এমনকি এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায় বিধবাদের বোকা বানিয়ে তার আত্মীয় স্বজনরা সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে তাকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। সেইজন্য মনু বলে দিচ্ছে বিধবাদের কখন একা একা কোথাও ছাড়বে না, কোথায় কে কি করে বসবে, নিজে কি ভুল করে বসবে কোন নিশ্চয়তা নেই। স্বামীজীর সমকালীন রমাবাঈ বলে একজন সমাজসংস্কারক ভারতে এসেছিলেন। রমাবাঈ খুব অল্প বয়সে

বিধবা হয়ে গিয়েছিলেন, পরে তিনি খ্রীশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীশ্চান হয়ে যাওয়ার পর পাশ্চাত্য দেশগুলোতে তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন আর তাতে তিনি হিন্দুধর্মে মেয়েদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। কথামতেই রমাবাঈয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলছে, রমাবাঈ বলে একজন মহিলা দেশের জন্য অনেক কাজ করছেন। ঠাকুর রমাবাঈয়ের নাম কখন শোনেননি। সব শোনার পর ঠাকুর বলছেন – তোমার কথাটথা শুনে মনে হচ্ছে ওর একটু লোকমান্য হওয়ার ইচ্ছে আছে। পরের দিকে দেশে বিদেশে অনেক রমাবাঈ সার্কেল হয়ে গেল। রমাবাঈ সার্কেলের কাজ ছিল কি করে হিন্দু মেয়েদের রক্ষা করা যায়, তাদের জন্য কি কি করা যেতে পারে। এই সব করতে গিয়ে তারা অর্থ সংগ্রহ করত আর ইংল্যান্ড আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। স্বামীজীও ধর্ম সম্মেলন উপলক্ষে আমেরিকাতে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা শুরু করলেন। এবার এই রমাবাঈ সার্কেলও স্বামীজীর উপর তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করে দিল। স্বামীজী প্রথমে খ্রীশ্চানদের উপর আক্রমণ করতেই রমাবাঈরা ফোঁস করে উঠেছে। স্বামীজীর কাছে প্রধান সমস্যা হল রমাবাঈ সার্কেল ওখানকার সংবাদপত্রকে পুরোদমে ব্যবহার করা শুরু করে বড় বড় প্রবন্ধে হিন্দুরা কিভাবে নিজেদের মেয়েদের উপর অত্যাচার করে তার বর্ণনা ছাপতে থাকল। স্বামীজীকেও এসবের জবাব দেওয়ার জন্য অনেক মহল থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজী কোথাও সরাসরি এদের জবাব না দিয়ে ভারতের নারীর আদর্শের উপর অনেকগুলো বক্তৃতা দিলেন।

এরপর পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরামি পর্যায়ে চলে যেতে স্বামীজীর একজন অত্যন্ত অনুরাগী আমেরিকান ভক্ত সংবাদপত্রে একটা লম্বা চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি প্রত্যেকটি পয়েন্টকে ধরে ধরে রমাবাঈয়ের বক্তব্যকে খণ্ডন করলেন। আর ঠিক সেই সময়তেই ম্যাক্সমুলারের মনুস্মৃতির বইটা অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছিল (Laws of Manu)। সেই সময় তিনি মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি তুলে তুলে দেখালেন মনু মেয়েদের নামে এই এই বলেছেন। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলছেন বিবাহের সময় কন্যার পিতা কন্যাকে যা ধন সম্পদ দেবে তাতে পুরোটাই কন্যার অধিকারে থাকবে, এর নামই হল স্ত্রীধন। মনু আইন করে দিলেন কোন পরিস্থিতিতে স্বামী এই স্ত্রীধন দাবী করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, বিবাহের পরেও কন্যার বাপের বাড়ি থেকে কেউ যদি কন্যাকে কিছু উপহার দেয় সেটাও স্ত্রীধনের অন্তর্গত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী জীবিত থাকলে এই স্ত্রীধন স্বামী কোন মতেই পাবে না, ওই স্ত্রীধন তার ছেলে পাবে, ছেলে যদি না থাকে মেয়ে পাবে। ছেলে বা মেয়ে যদি না থাকে তাহলে তাদের সন্তান পাবে, স্বামী কোন দিন পাবে না। এই আইন করেই মনু ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি আবার রাজাকে আদেশ করছেন, স্ত্রীধনের এই নিয়মটা যাতে ঠিক ঠিক পালিত হয় সেই ব্যাপারে রাজাকে নিশ্চিত হতে হবে। এরপর তৃতীয় আরেকটা বিধান দিচ্ছেন যারা এই আইন মানবে না তাদের উপর ভগবানের অভিশাপ বর্ষিত হবে। ভদ্রলোক তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন যেখানে হিন্দুধর্মের আইনে বলে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীধনের উপর স্বামীর কোন দিন অধিকার থাকবে না এরপর আপনি কি বলতে চাইছেন পরিস্কার করে বলুন। তাও লোকে বলে মনু নাকি নারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রী যদি চাকরি করে যে অর্থ উপার্জন করবে সেই অর্থ স্ত্রীধন রূপে গণ্য করা হবে না, ওই অর্থের উপর স্বামীরও অধিকার আছে। স্বামীজী একটা চিঠিতে তাই খুব দুঃখ করে লিখছেন হিন্দুদের মত অকৃতজ্ঞ জাতি বিশ্বে আর কোথাও নেই। আমি হাজার হাজার মাইল দূরে হিন্দুধর্মের জন্য একা লড়াই করে যাচ্ছি আর তোমরা দেশে সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ। মনুস্মৃতি আজ পর্যন্ত কেউ খুলে একবারও পড়েনি, মনু কিভাবে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন। শুধু মনুস্মৃতিই নয় যতগুলো স্মৃতিশাস্ত্র আছে তাদের একটা সবিশেষ দায়িত্ব হল নারীদের কি কি দায়িত্ব দেওয়া যায়, আর সব দিক থেকে তাদের সুরক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে তার বিধান তৈরী করে দেওয়া। স্বামীজীও এক জায়গায় মনুকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যেখানে যেখানে নারীর পূজা ও সম্মান করা হয় সেখানে দেবতারা বাস করেন।

সব স্মৃতিশাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল সংস্কার। বেদের সময় চৌষটি রকম সংস্কারের বিধান ছিল। প্রত্যেক মানুষকে তার জন্মের আগে থেকেই এই সংস্কারগুলো পালন করা শুরু হয়ে যেত। প্রথম সংস্কার হল গর্ভাধান। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যে শিশু ঈশ্বরের প্রার্থনা ছাড়া পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছে সেই

শিশু সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপ। আগেকার দিনে উচ্চবর্ণের মধ্যে একটা নিয়ম ছিল, যখনই কারুর সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা হত তখন তাঁরা রীতিমত একটা বিশেষ যজ্ঞ করতেন, অর্থাৎ একটা বিশেষ ধরনের পূজাও বলা যেতে পারে, যার নাম গর্ভাধান সংস্কার। এই বিশেষ যজ্ঞ বা পূজা করার পরই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হত। প্রথম সংস্কার হল গর্ভাধান, জন্মের আগে থাকতেই মানুষকে সংস্কারের মধ্যে বেঁধে ফেলা হত। এই রকম চৌষটিটি সংস্কারের বিধান আমরা বেদে পাচ্ছি, যার মধ্যে শেষতম সংস্কার হল দাহসংস্কার। ঈশোপনিষদে বলছেন অগ্নে নিয়ে সুপথা রায়ে অস্মান্, এবার আমাদের অগ্নিতে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হবে তাই হে অগ্নি মহার্ঘ বস্তুলাভের জন্য আমাদের সুপথে নিয়ে যান, এখানেও সেই দাহসংস্কারের কথাই বলা হচ্ছে। দাহসংস্কার হয়ে যাওয়ার পর আর কোন সংস্কার অবশিষ্ট থাকে না। এরপর শ্রাদ্ধাদি কর্ম থাকে, এগুলোকে সংস্কার না বলে কর্ম বলা হয়। মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিকাররা বেদের এই চৌষটি সংস্কারকে কমিয়ে ষোলটি সংস্কারে নিয়ে এলেন। তন্ত্রে এসে এটাই দশটি সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে।

সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হল জন্মের আগে থেকে এবং জন্ম নেওয়ার পর থেকে যত রকমের আবর্জনা আমাদের দেহ মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে, এই আবর্জনাগুলোকে সময়ে সময়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া। যেমন বিবাহ একটি সংস্কার, যজ্ঞের অগ্নিকে সাক্ষি রেখে একজন নারী ও পুরুষ ধর্ম সম্মত ও পবিত্র ভাবে বিবাহিত জীবন যাপনের অঙ্গিকার করছে। একে ওর ভালো লেগে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে দুজনে হাত ধরে নিয়ে বলে দিল আজ থেকে আমরা স্বামী স্ত্রী, এই ধরনের জিনিসগুলোকে স্মৃতিকাররা আটকে দিচ্ছেন। কোটে গিয়ে বিয়ে করে নিলাম, সেটাও স্মৃতিকারদের বিধান অনুযায়ী চলবে না। তোমার বিবাহটাও একটা সংস্কার, তা নাহলে তুমি একা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে চলতে পারবে না। সমাজে, পরিবারে জীবনযাত্রা একা কখনই চলতে পারে না। তাই তোমাকে একজনের হাত ধরতে হবে। এই হাত ধরাটাও একটা সংস্কারের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। সংস্কার হল কোন কিছুকে শুদ্ধিকরণ করা। কিন্তু একবার যদি কেউ সন্ন্যাসব্রত নিয়ে নেয় তখন তাঁকে আর সংস্কার পালন করতে হবে না, কারণ সন্ন্যাসীর কোন সংস্কার থাকে না। সন্ন্যাস নেওয়ার সময় বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিতে হয়। বিরজা হোম মানে – বিঃ রজ, রজ মানে ধুলো, ধুলো যেটা এত কাল যাবৎ জমেছে সেটাকে পরিষ্কার করাই হল বিরজা হোম। সেইজন্য অনেক সন্ন্যাসী নিয়মিত মানসিক প্রক্রিয়াতে বিরজা হোম করে নিজেকে পরিষ্কার করেন। এই যে সংস্কার করতে বলা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্যই হল মানব জীবনকে সুসংস্কৃত করা। গর্ভাধান না করে যদি সন্তানোৎপত্তি হয় তাহলে সেই সন্তান আর সংস্কৃত হল না। যদি নামকরণের সংস্কার করা না হয় তাহলেও তার শুদ্ধিকরণ করা হল না। তেমনি চূড়াকরণ একটি অন্যতম সংস্কার, যাতে জাতককে প্রথম মুণ্ডিত করা হয়। মায়ের গর্ভ থেকে যে চুল নিয়ে জাতক এসেছে সেই চুল অশুদ্ধ, তাই এই চূড়াকরণ সংস্কারের মাধ্যমে ওই অশুদ্ধ চুলকে পরিষ্কার করে মুণ্ডিত করে দেওয়া হয়। তারপর উপনয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। সমস্ত সংস্কারের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক সংস্কারগুলোকে শুদ্ধিকরণ দ্বারা একটা সুসভ্য চরিত্রবান ব্যক্তিতে দাঁড় করান হচ্ছে।

এখন একটা শূকর কাদার মধ্যে পড়ে আছে, আপনি চাইছেন এই শূকরটিকে কাদা থেকে তুলে ধুয়ে মুছে সংস্কার করবেন। কিন্তু শূকরটি বলছে, আমাকে ধুয়ে মুছে দিলে কি হবে, আমি তো আবার এতেই নামব, এটাই আমার জীবন, এখানেই আমার সুখ, পাঁকেই আমার আনন্দ, বেশী জ্ঞান না দিয়ে এখান থেকে ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ুন। এখন সমগ্র হিন্দুজাতি বলছে আমরা পাঁকেই আনন্দ পাই, পাঁকেই আমাদের জীবন। এদের আপনি কি শিক্ষা দেবেন! এটাই আজকের দিনে আমাদের দুর্ভাগ্য, যে জাতির কাছে সংস্কার, শুদ্ধিকরণ, পবিত্রতাই ছিল আদর্শ, এই আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়ে সবাই অশুদ্ধিকরণে নামার প্রতিযোগিতায় ছুটে চলেছে।

সাজা বা দণ্ড আর প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে সব স্মৃতিশাস্ত্রই আলোচনা করে। এনাদের ধারণা ছিল আমরা যা কিছু কর্ম করছি সব কর্মের একটা ফল হবেই। কোন দোষযুক্ত কর্ম করলে তারও একটা ফল হবে। কোন কর্মগুলো দোষযুক্ত সেটা স্মৃতি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে – কি কি কর্ম করতে হবে আর কি কি কর্ম না করাটা দোষ বা করলে দোষ। এই নিয়মগুলো পরিস্থিতি ও সময়ের পরিবর্তনে পাল্টাতে থাকে। যদি তুমি

দোষযুক্ত কর্ম কর, তখন এটাও একটা কর্ম, তাই তোমাকে সাজা পেতে হবে। যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে নাও তাহলে তুমি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও শুদ্ধ হওয়া যাবে না, সেই সব ক্ষেত্রে রাজা যদি দণ্ড দিয়ে দেন তাহলে সে আবার আগের মত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে। রাজা যদি দণ্ড না দেন তাহলে তার আর শুদ্ধিকরণ হল না, নোংরাটা তার থেকে গেল। তার ফলে তার নানান রকমের ক্ষতি হতে শুরু করবে। সেইজন্য মনু যেসব সাজার নিদান দিয়েছেন পড়লে গা শিউড়ে উঠবে। স্মৃতিকারদের এটা ধারণা ছিল তুমি যদি দণ্ড না নিয়ে নাও তাহলে চারিদিক থেকে তোমার বিভিন্ন রকমের ক্ষতি হতে থাকবে। এটা সত্যিই দেখা যায়, যখন কেউ কোন অপরাধ করে যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহলে তাকে তিনটে ক্ষেত্রে মার খেতে হবে। শাস্তি যদি কারুর হয়ে যায় তখন আবার সমাজে তার দুর্নাম হয়ে যায়। আমরা সবাই চাই যাতে আমার দুর্নাম না হোক, সেইজন্য আমরা শাস্তিকে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু কর্মের এমনই বিধান যে, এই কর্ম কিন্তু কাউকে ছাড়বে না। অন্য একটা জায়গাতে তার কলঙ্ক হয়ে যাবে। যদি কোন ভাবে কলঙ্ক থেকে বেঁচে যায় তাহলে এবার তাকে শরীরের কোন একটা কোন অঙ্গে সেটা আঘাত হয়ে আসবে। একটা অঙ্গই হয়ত চলে যাবে।

বিশ্বের সব ডাক্তাররাই বলছেন ব্যাক পেইন বলে কোন রোগ হয় না। ব্যাক পেইন মানেই তার মনে কিছু একটা ব্যাথা বা দুঃখ আছে। মস্তিষ্কে সেই মানসিক ব্যাথাটা জমে থাকে। কিছু দিন পর মস্তিষ্ক দেখে এই ব্যাথাটা আমি আর ধরে রাখতে পারছি না, আমি যদি একে ধরে রাখি তাহলে আমার সব কিছু বিকল হয়ে যাবে। মস্তিষ্কের পর সব থেকে শক্তিশালী অঙ্গ হল কোমর, মস্তিষ্ক তখন সেটাকে কোমরের উপর ফেলে দেয়। ব্যাক পেইন মানেই তাই, তার মনের মধ্যে এমন একটা কষ্ট আছে যেটা কিছুতেই সে বার করতে পারছে না। আর কখন সখন কিছু ক্ষেত্রে যদি তার কোন জরুরি কাজকর্ম থাকে, তখন সেটা পেটের উপর ফেলে দেয়। তখন পেটে স্থায়ী ভাবে নানা রকম রোগ, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি দেখা দেবে। ইদানিং আমেরিকার ডাক্তাররাও বলছে যেটা করলে আপনার কোমর ঠিক থাকে আপনি তাই করুন – যদি ওষুধ খেলে ঠিক থাকে তাহলে ওষুধ খান, যদি যোগ করলে কমে তাহলে যোগ করুন, যদি ওঁ জপ করে ঠিক থাকে তাহলে তাই করুন। কারণ এর কোন চিকিৎসাই নেই। অনেকে জানেও না তার মনের গভীরে কি কষ্ট আছে। কারুর যদি কোন অঙ্গ হানি থাকে তাহলে বুঝতে হবে কোথাও তার একটা পাপকর্ম করা আছে, যেটা সে নিজেও জানে না। পরের দিকে এগুলো আবার অন্য একটা খারাপ দিকে মোড় নিয়ে নিল। আলবিরুনী হিন্দুদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উপর একটা বই লিখেছেন তাতে তিনি একটা বিরাট তালিকা দিয়েছেন কোন্ কোন্ রোগ কি কর্মের জন্য হয়েছে। অর্থাৎ এই জন্মে যদি আপনার এই রোগ হয় তাহলে বুঝতে হবে এর আগের আগের জন্মে আপনি এই পাপকর্ম করেছিলেন, যেটার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়নি। শ্রীমাও বলছেন প্রায়শ্চিত্ত না করে মরলে পরের জন্মে শরীরে রোগ নিয়ে জন্মাবে।

কিছু দিন আগে বেলুড় মঠে একটি বাচ্চা ছেলে বাড়ির লোকদের সাথে বেড়াতে এসেছিল। ক্লাশ সিক্স সেভেনের ছেলে হবে, তার কপালে একটা বিরাট অদ্ভুত ধরণের তিলক সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। বোঝাও যাচ্ছে না বাঙালী না মারাঠী। একজন মহারাজ হিন্দীতে জিজ্ঞেস করতে কিছুই বুঝতে পারছে না। পরে বাংলাতে জিজ্ঞাসা করাতে বোঝা গেল, ছেলেটি বাঙালী, দমদমে বাড়ি। এই রকম অদ্ভুত তিলক কেন লাগিয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি বলল, আমার মা লাগিয়েছে। মা কেন লাগিয়েছে? ছেলেটি বলল, মা স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে। দূরে একজন মহিলা বসে ছিলেন তাঁরও কপালে এই ধরণের তিলক লাগান। মাথায় গুণ্ডগোল আছে কোন সন্দেহ নেই, স্বপ্ন যেটা দেখেছে সেটাতেও কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তার মনে এমন কোন ব্যাথা আছে যার কোন পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। স্বপ্নেই হয়ত পথ পেয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর স্বপ্নে যদি কিছু নির্দেশ পেয়ে থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই পালন করা উচিত। পালন করলেই যে রোগ ব্যাথার উপশম হয়ে যাবে তা নয়, কিন্তু অবশ্যই পালন করা দরকার। যদি না করা হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে সমস্যা আরও বাড়বে বই কমবে না। স্মৃতিকাররা এই জিনিষগুলো মানতেন। এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা যে আমাদেরই ছিল তা নয়, খ্রীস্টানদের মধ্যে পাপের স্বীকারোক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। আপনি যদি কোন দোষ করে থাকেন তাহলে আপনি ফাদারের কাছে যাবেন, ফাদার আপনার মুখ দেখতে পারবে না, আপনিও ফাদারের মুখ

দেখতে পারবেন না কিন্তু আপনি শুধু বলে যাবেন আমি এই পাপ করেছি, সেই পাপ করেছি। এই নিয়ে জেকে চেস্টারননের ‘ফাদার ব্রাউন’ নামে একটা নামকরা উপন্যাসই আছে। ফাদার ব্রাউন ক্রিমিনালদের এত স্বীকারোক্তি শুনেছেন যে, কিভাবে ক্রাইম হয় সবটাই তার জানা হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তিনি একজন বিরাট গোয়েন্দা হয়ে গেলেন। স্মৃতিকারদের এই মত ছিল, তুমি যদি দোষ কর তাহলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত যদি না কর তাহলে পাপের জন্য সাজা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কোন কারণে যদি প্রায়শ্চিত্ত না কর, সাজা যদি না পাও তাহলে ওই কর্ম তোমাকে তিনটে জায়গায় মারবে। প্রথমে তার কলঙ্ক হয়ে যেতে পারে, দ্বিতীয় অঙ্গে মারবে, তারপর মস্তিষ্কে মারবে। মস্তিষ্কে মারা মানে, তার ঘুম নষ্ট করে দেবে, শান্তি বিঘ্নিত হবে, তাকে জপ-ধ্যান করতে দেবে না, তাকে পড়াশোনা করতে দেবে না, শিক্ষা আর সংস্কৃতিতে তার কোন উন্নতি হবে না, এরপর আস্তে আস্তে মানসিক রোগের দিকে ঠেলে দেবে। এটা হল সব থেকে মারাত্মক পরিণতি। কলঙ্কিত হয়ে যাওয়া এর থেকে অনেক ভালো, খুব সস্তায় অল্পের উপর দিয়ে কেটে গেল। কোন কারণে যদি কলঙ্কিত হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায় তাহলে তাকে অঙ্গে মারবে, অঙ্গের উপর মারটাও যদি বেঁচে যায় তাহলে এবার তার সর্বনাশটি হয়ে ছাড়বে, আত্মহত্যাও করিয়ে দিতে পারে। একজন ভক্ত শ্রীমাকে বলছেন – মা ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যেতে, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি পাগল হয়ে যেতে পারি। শ্রীমা শুনে বলছেন – ওগো! ও রকমটি বলো না, অনেক জন্ম পাপ করলে মানুষ পাগল হয়। মনু এবং আমাদের স্মৃতিকাররা এটা জানতেন। সেইজন্য তাঁরা সবার জন্য বিশেষ করে মহিলাদের বিধান করে দিলেন, সারা দিন বসে তুমি শুধু পূজা অর্চনা করে যাও। পূজা অর্চনা আসলে মূলতঃ প্রায়শ্চিত্ত। মায়েরা যখনই কোন পূজা করেন তখন তারা এই ভেবেই করেন যে এই পূজোটা আমার ছেলের জন্য, এই উপোসটা আমার স্বামীর জন্য, এই ব্রতটা আমার মেয়ের জন্য। সব সময় তাঁরা এটাই করে যাচ্ছেন। মা যেটাই করেন সন্তানের মঙ্গলের জন্যই করেন। হিন্দুদের এগুলো খুব উচ্চ আদর্শ ছিল।

রমাবাঈ সার্কলের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে সেই ভদ্রলোক লিখছেন – রমাবাঈরা বিধবাদের কথা লিখতে গিয়ে যত কথা বলছে সেখানে তারা একবারও বলছে না যে, এই বিধবারা সব গরীব, আর গরীব লোকের কষ্ট সারা বিশ্বে সমান। পুরো ভারতটাই গরীব দেশ ছিল, দুবেলা পেট ভরে খেতেই পায় না। গরীব মানেই সব জায়গাতে তাদের একই সমস্যা। যারা নিজেরাই খেতে পায় না তারা তাদের বিধবাকে খাওয়াবে কোথা থেকে। তার জন্য ধর্মকে দোষ দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। হিন্দুধর্মে কোথায় বলেছে যে নারীদের উপর নির্যাতন কর! বরং নারীদের হিন্দুধর্ম সব দিক থেকে বেশী রক্ষাকবচ দিয়ে তাদের সুরক্ষা দিয়েছে।

মূল কথা হল, প্রায়শ্চিত্ত আর দণ্ড বা সাজা স্মৃতিশাস্ত্রে একটা মুখ্য আলোচনার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যদি দেখা যায় জন্ম থেকে কোন অঙ্গের ক্রটি থাকে তাহলে বুঝতে হবে গত জন্মে সে এমন কিছু খারাপ কাজ করেছিল যে কাজের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করেনি বা কোন দণ্ডও সে পায়নি। কিছু গোলমালে কাজ আমরা সবাই করে থাকি, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত যদি করে নেওয়া হয় তাহলে এগুলো মিটে যায়। কোন খারাপ কাজের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এর বিশদ আলোচনা সব স্মৃতিকাররাই করে থাকেন। তার সাথে শৌচের ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়। জামা-কাপড় কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে, স্নান করা, দাঁত মাজা, নিজেকে ফিটফাট রাখা এগুলো সবই স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে।

একটা উদ্ভট জিনিস ছিল যেটা সাধারণত অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় না। একই কর্ম একটা ক্ষেত্রে হয়ে যায় সামান্য ধর্ম আবার অন্য জায়গায় ওই একই কর্ম না করলে সেটা হয়ে যাবে উচ্চ ধর্ম। যদি ওই কাজটা কেউ করে তাহলে সে সাধারণ বা সামান্য ধর্ম পালন করল, আর যদি সে ওই কাজটা না করে তাহলে সে অসাধারণ বা উচ্চ ধর্ম পালন করেছে। যেমন বলবেন, যদি কেউ মাছ-মাংস খায় তাতে কোন দোষ নেই – এটা হয়ে গেল সাধারণ ধর্ম। যে মাছ-মাংস না খায় তাহলে সে বিশিষ্ট। যদি কেউ সত্যি কথা বলে তখন এটা সাধারণ ধর্ম, কিন্তু কারুর ভালোর জন্য কিংবা কারুর প্রাণ রক্ষার জন্য সে যদি সত্যি কথা না বলে তখন এটাই বিশিষ্ট ধর্ম বা উচ্চ ধর্ম। ঠিক তেমনি বিবাহ করাটা সাধারণ ধর্ম, কিন্তু কেউ যদি বিবাহ না করে ঈশ্বরের

প্রতি নিজেকে সমর্পিত করে দেয় তখন সেই বিবাহ না করাটাই হয়ে যাবে উচ্চ ধর্ম। অবশ্য মনুর কাছে বিবাহ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু সমাজ ছাড়া আর কোন সমাজে এই জিনিষ পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক স্মৃতিকাররা এই সামান্য ধর্ম ও উচ্চ বা বিশিষ্ট ধর্মকে নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এর আগেও আমরা বলেছি যে মনুর ইতিহাস আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে একজন করে মনু আসেন। ভারত সবার কথা শুনতে ও মানতে চায় না। বেদ হল ভগবানের কথা, ভারত তাই বেদের কথাকে শেষ কথা বলে মানে। বাল্মীকি, ব্যাসদেব বড় ঋষি ছিলেন তাঁদের কথাকে কথা ও কাহিনী রূপে মেনে নিচ্ছে। কিন্তু যখন দৈনন্দী আচরণের নিয়ম বিধি আসে সেখানে সমস্যার ব্যাপার হয়ে যায়। তোমার কথা কে শুনতে চাইছে? সেইজন্য মনুসূত্রের মনু শব্দটা যখনই আসে তখন সবার মাথায় এটাই আসে, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই মন্বন্তরে প্রথম জন্ম নিলেন। মানবজাতির জীবন-যাপন কিভাবে হবে সেটা নাকি ব্রহ্মা মনুকেই আদেশ দিয়ে গেছেন। সেই আদেশই পরম্পরা ভাবে চলতে চলতে আজ আমাদের কাছে এসেছে। এটা গেল পৌরানিক দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখা। কিন্তু যদি আরেকটু বাস্তব দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখা হয় তাহলে আমাদের সেই বেদে ফিরে যেতে হবে। যজ্ঞ কিভাবে হবে তার বিধি বিধানগুলোকে একটা হ্যাণ্ডবুকের মত বইতে লিখে রাখা হত। সেটাকে বলা হচ্ছে কল্পসূত্র। এগুলো আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। কল্পসূত্রে দুই ধরনের সূত্র থাকত – একটা হল শ্রীতসূত্র আরেকটি গৃহ্যসূত্র। পারিবারিক যে যজ্ঞাদি হত তার বিধানাদি লেখা থাকত গৃহ্যসূত্রে। এই গৃহ্যসূত্রের মধ্যে কিছু বিধান ছিল যেগুলো পরে স্মৃতিশাস্ত্রের আকার ধারণ করেছে। যেমন একজন বালক বেদ কবে অধ্যয়ন করতে শুরু করবে, এগুলো সব গৃহ্যসূত্র থেকেই এসেছে। গৃহ্যসূত্রের এই ধরনের কিছু কিছু বিধান আগে থাকতেই অনুশীলন করা হয়ে আসছিল, আবার অনেকে এমন কিছু বিধান অনুশীলন করছিলেন যেগুলো গৃহ্যসূত্রের মধ্যে উল্লেখ ছিল না। কোন একজন তেজস্বী মুনি এই ধরনের সব বিধানগুলোকে সংগ্রহ করে একটা জায়গাতে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

হিন্দুদের মানসিকতায় সমন্বয়ের অভ্যাস স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসছিল, তারা সব কিছুকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে জানত। কারণ হিন্দুরা পুরো জিনিষটাকে সামগ্রিক ভাবে এক দেখছে। যেমন এর আগে বলা হয়েছিল এনারা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যা কিছু আছে সব কিছুতে সেই চৈতন্যকেই দেখছেন। বিজ্ঞানকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বিজ্ঞানীরা কি কোন দিন ভগবানকে খুঁজে পাবে? এর একটাই উত্তর, কোন দিন খুঁজে পাবে না। এই ব্যাপারে হিন্দুদের তরফ থেকে মজা করে বলা হয়। ভগবানের বর্ণনা হল তিনি অণোরণিয়াম মহতোমহীয়ান, তিনি অনু থেকেও অনু আর বৃহৎ থেকেও বৃহৎ। যখন অনু থেকে অনুতে যাওয়া হবে সেখানে তখন হাইজেনবার্গের Uncertainty Principle এসে যায়। হাইজেনবার্গের Uncertainty Principle বলে ইলেক্ট্রন প্রোটন স্তরে পরীক্ষা করতে গেলে ঠিক ঠিক কোন জিনিষকে জানা যায় না। এই কথা কোন ধর্ম শাস্ত্রকে বলতে হচ্ছে না, পদার্থ বিজ্ঞানীরাই এই কথা বলছেন। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা অণোরণিয়াম কখন জানতেই পারবে না। মহতোমহীয়ানের সমস্যা হল Whole is always more than sum of its parts। যেমন মানুষ, মানুষের হাত, পা, মাথা, চোখ, কান এগুলোই মানুষ নয়। মানুষ সব সময়ই এর থেকে একটু বেশী হয়ে যায়। কিছু বিজ্ঞানী ছিলেন যাদের বলা হত Reductionist, এনারা বলছেন, কোন একটা জিনিষকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দাও, যেমন পাঁচ যোগ তিন। এটা একটা সমস্যা, Reductionist methode এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তারা পাঁচকে এক এক করে টুকরো করে পাঁচ করে দিলেন, এবার তিনকেও এক এক করে টুকরো করে তিন করে দিলেন, এবার সব কটি এক যোগ করে দিলে আট চলে আসবে। এর সারমর্ম হল যে কোন জিনিষকে যদি টুকরো করে দেওয়া হয় তখন মূল জিনিষটা যা তার টুকরোটাই তাই। যেমন এই বোতল, এর প্লাস্টিক, এর জল আর ক্যাপ সব কটিকে আলাদা করে দিলে আলাদা হয়ে গেল। সব কটিকে আবার মিলিয়ে দিলে যা ছিল তাই থাকল। কিন্তু একটা স্তরের পর এই নিয়মটা ঘটবে না, এটাকে বলে Wholeism। এতে কি হয়? The whole is more than sum of its parts। কোন জিনিষের সব অংশকে যদি মিলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার পরিমাণ থেকে মূল জিনিষটা সব সময় বেশী হবে। মহতোমহীয়ানের ক্ষেত্রে সব কিছুকে মিলিয়ে বলা হচ্ছে, তাহলে সব কিছুকে মিলিয়ে যেটা হবে তার থেকে

আসল বস্তু অর্থাৎ ভগবান বেশী হবেন। তাই বিজ্ঞান অণোরণীয়ামকেও জানতে পারবে না আর মহতোমহীয়ানকেও জানতে পারবে না, সুতরাং ভগবানের ব্যাপারে বিজ্ঞানী কিছুই বলতে পারবে না।

কিছু দিন আগে একজন তার একটি প্রবন্ধে লিখছেন – বলা হয় পাশ্চাত্য জগতে আইনস্টাইন ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিজীবী, কিন্তু আমার মতে পাণিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান। বিশ্বের যে কোন ভাষা কিভাবে তৈরী হবে পাণিনি সেটা চার হাজার সূত্রের মধ্যে সমাধান করে দিয়েছেন। আইনস্টাইন শুধু জড় ও শক্তি এগুলোর একটা সমন্বয় করলেন। কিন্তু বিশ্বের যত রকমের ভাষা হতে পারে সব কটি ভাষাকে শুধু চার হাজার সূত্র দিয়ে পাণিনি বলে দিলেন বিশ্বের যেকোন ভাষাকে এই চার হাজার সূত্র দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। কম্পিউটারে যে ‘সি’ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় তাতে পাণিনির চার হাজার সূত্রের মৌলিক নিয়মকে অনুসরণ করেই ব্যবহার করা হচ্ছে। যিনি এই ‘সি’ ল্যাঙ্গুয়েজ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি পাণিনির চার হাজার সূত্র থেকে একশটা সূত্র থেকেই এটাকে বার করেছিলেন। এই ‘সি’ ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করে পরবর্তী কালে কম্পিউটারের আরও অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরী হয়েছে। কম্পিউটারের উইনডো পুরোটাই ‘সি’র উপর দাঁড়িয়ে আছে। কম্পিউটারটাও একটা ভাষা, সেই ভাষাতে এই একশটি সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করা হয়েছে। পাণনিকে তাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, কারণ পুরো ভাষা বিজ্ঞানটাকে তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তের মধ্যে বেঁধে দিলেন, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন এই চার হাজার নিয়মের বাইরে কখনই কোন ভাষা যেতে পারবে না। ঠিক তেমনি মনু তখনকার দিনে যত রকম আচার ব্যবহার সমাজে অনুশীলিত হচ্ছিল, সেই আচার ব্যবহারের পেছনে কি সিদ্ধান্ত আছে, তার পরিণতি কি হতে পারে এই সব কিছুকে আড়াই হাজার শ্লোকের মধ্যে নামিয়ে দিলেন। তোমার কোন আচার ব্যবহার এর বাইরে যাবে না। তাহলে বলতে পারে সংবিধানটা কি? আসলে সংবিধানও এর বাইরে যায় না, কিছু জিনিষকে নিচ্ছে কিছু জিনিষকে সরিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যেই ঘুরঘুর করবে।

প্রথমোহ্যায়

মনুস্মৃতির সৃষ্টি প্রকরণ

এবার আমরা মনুস্মৃতির মূল গ্রন্থে প্রবেশ করব। মনুস্মৃতির কাহিনী হল, মনু সমস্ত কিছুকে এই আড়াই হাজার সিদ্ধান্তের মধ্যে বেঁধে দেওয়ার পর তাঁর বয়স হয়ে গেছে। সেই সময় কয়েকজন ঋষি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করছেন জীবন যাত্রা কেমন হবে এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন। মনু তখন ঋষিদের বললেন ‘আমার যা কিছু বক্তব্য আমার শিষ্য ভৃগুকে বলে দিয়েছি। তোমার ভৃগুর মুখ থেকে শুনে নাও। ভৃগু যা বলবে সব আমারই কথা’। এরপর ভৃগুই সব বললেন, এটাই মনুসংহিতা। ভৃগুর নিজেরও একটা আলাদা স্মৃতিশাস্ত্র আছে যার নাম ভৃগুসংহিতা, সেখানে আবার ভবিষ্যৎবাণীই বেশী দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরও ঠিক নরেনের নামে বলছেন ‘নরেন শিক্ষে দেবে’। নরেন শিক্ষে দেবে মানে কি শিক্ষা দেবেন? ঠাকুরের যা বক্তব্য সেটাই নরেন জগৎকে বলবে। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না, মনু যে রকমটি বলেছেন ভৃগু ঠিক সেই রকমটি রেখেছেন।

এখন অনেক প্রশ্ন ওঠে, মনু বলে আদৌ কোন ঋষি ছিলেন কি ছিলেন না, নাকি ভৃগু নিজেই এভাবে রচনা করে মনুর কথা বলে তুলে ধরছেন। নাকি, ব্রহ্মার যে মনু নামে পুত্র ছিল তাঁর যে সিদ্ধান্ত গুলো ছিল সেই সিদ্ধান্তই এই মনুর কাছ থেকে ভৃগু শুনেছিলেন। এর উত্তর চিরদিনের মত ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছে। আমরা শুধু জানি এই বইয়ের নাম মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। এর আলোচনা শুরু করে ভৃগু প্রথমে বলছেন স্বয়ংভূবে নমস্কৃত্যে অমিততেজসে মনুপ্রণীতাম – এই যা কিছু বলা হচ্ছে এটা মনু প্রণীত, মনুই এই বিধান রচনা করেছেন। ব্রহ্মাকে প্রণাম করে এই মনুস্মৃতির কথা শুরু করছি।

ঋষিরা এসে মনুকে বলছেন ‘আপনি অনেক কিছু জানেন। সমাজ ও ব্যক্তির বিধানের ব্যাপারে আর ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণ, সূত ও অন্যান্য জাতির কর্তব্য কি আর অকর্তব্যই বা কি হবে। এই সব বিষয়ে উপদেশ দানে একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয়। আপনি আমাদের কিছু বলুন তখন মনু বলছেন –

আসীদিদং তমো তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।।১/৫।

যদিও এটা মনুস্মৃতি, বিধানশাস্ত্র, কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে সেই সৃষ্টির প্রকরণে। কারণ যতক্ষণ সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা না করা হয়, জগৎ কি, ঈশ্বর কি, জীব কি এগুলোকে যদি পরিষ্কার করে না ব্যাখ্যা করা হয় ততক্ষণ বিধানের কথা বলে কিছু কাজ হবে না। কাউকে যদি বলে দেওয়া হয় তুমি এই রকমটি আচরণ করবে তখন তার মনে প্রশ্ন আসাটা কোন অন্যায়ে হবে না যে আমি কেন এই রকম আচরণ করতে যাব। আগেকার দিনে গ্রীস দেশে কিছু দার্শনিক ছিলেন তাঁরা সব কিছুকে প্রশ্ন করতেন। যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন অবস্থাতে তাঁরা শুধু প্রশ্নই করে যেতেন। এই রকম একজন দার্শনিক রাত্রিবেলা কি করে নর্দমায় পড়ে গেছে। তার শিষ্য সেই রাত্তা দিয়ে যাচ্ছিল। শিষ্য দেখল তার গুরু নর্দমায় পড়ে আছেন, কিন্তু তাঁকে না তুলে চলে গেল। পরে অন্য লোকরা মিলে তাঁকে নর্দমা থেকে তুলেছে। তোলার পর তারা বলছে ‘আপনার শিষ্য দেখল আপনি পড়ে আছেন কিন্তু তাও সে আপনাকে না তুলে চলে গেল’। দার্শনিক তখন বলছেন ‘চলুন, দেখা যাক কেন সে আমাকে নর্দমা থেকে না তুলে চলে গেল’। শিষ্যকে গিয়ে জিজ্ঞাস করা হল। তুমি কেন আমাকে নর্দমা থেকে তুললে না। শিষ্য বলছে ‘স্যার! আমি নর্দমার পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম যে, আমি যদি আপনাকে নর্দমা থেকে তুলি এতে আপনার সত্যিই কি কিছু ভালো হবে, নাকি নর্দমায় পড়ে থাকলে আপনার ভালো হবে। কিন্তু আমি উত্তর কিছু খুঁজে পেলাম না, সেইজন্য আমি আপনাকে ছেড়ে চলে এসেছি’। এরাই ঠিক ঠিক সংশয়বাদী। যারা সত্যিকারের যুক্তিবাদী তাদের এই রকম বিচার করে দেখতে হয়, আমি বিচার করে কিছু পেলাম না, নর্দমায় পড়ে থাকলে আপনার বেশী ভালো হবে, নাকি নর্দমা থেকে তুলে আনলে আপনার বেশী ভালো হবে। আমাকে কেউ যদি বলে আপনি এই নিয়ম পালন করুন তাহলে আপনার ভালো হবে। প্রথমে আমি তাকে জিজ্ঞেস করব ‘আপনি আগে বলুন তো আপনি কে’? তারপর এক এক করে প্রশ্ন করতে থাকব ‘আমার ভালো মানে কি’? ‘ভালো আমার কেনই বা চাইব’? স্কুলের ছাত্ররাও প্রায়ই প্রশ্ন করে ‘এটা পড়ে আমার লাভ কি’?

দিল্লীর এক নামকরা বড় স্কুলের একজন ইংরাজী শিক্ষক খুব দুঃখ করে বলছেন যে, উনি ক্লাশে পড়াচ্ছেন তখন ছেলেগুলো বলছে ‘আমরা কেন ইংরাজী পড়ব, ইংরাজী পড়ে আমাদের কি লাভ’? ছাত্রদের বাবারা সব বড় বড় কোম্পানীর মালিক। শিক্ষক তখন বলছেন তোমরা ইংরাজী শিখলে শুদ্ধ ইংরাজীতে চিঠি লিখতে শিখবে। ছেলেগুলো বলছে ‘আমরা কেন লিখতে যাব! পয়সা দিয়ে লোক রাখব’। ‘তাহলে কি করতে স্কুলে এসেছ’। ‘কেন, বাবা মা পাঠিয়ে দিয়েছে তাই আসতে হচ্ছে’। এই হল অবস্থা। ভালো মানে কি, আমার ভালো কেন চাই, আমিই বা কে, আমি তো মরে গেলেই শেষ, এই প্রশ্নগুলো যাতে না ওঠে সেইজন্য গুরুত্বই সৃষ্টির প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। সৃষ্টি জিনিষটা কি? তুমি কে? তোমার লক্ষ্য কি? তোমার শেষ যাত্রা কোথায়? যতক্ষণ এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসা না হচ্ছে তখন আমরা এগোব কি করে! স্বামীজীও এক জায়গায় উল্লেখ করছেন, আলেকজান্ডার যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তাঁর সাথে অনেক দার্শনিকরাও এসেছিলেন। এদেরই এক দার্শনিকের সাথে এক দিগ্গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গ্রীক দার্শনিকরা বেশীর ভাগই বস্তুবাদী, তাঁরা জগৎকে নিয়ে বেশী চিন্তাভাবনা করেন। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত খুব অবাক হয়ে তাঁকে বলছেন ‘তুমি ঈশ্বরকেই যদি না জান তাহলে জগৎকে কি করে জানবে’! এটা একেবারে প্রাথমিক সমস্যা।

বিজ্ঞান আর হিন্দুধর্মের মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। বিজ্ঞান বলছে তুমি আগে জগৎকে জান, ঈশ্বর আছে কি নেই আমরা জানিনা। ধর্ম সব সময় বলবে *কসিদ্ধু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*, তাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যাবে, ঈশ্বরকে না জানলে কোন কিছুই জানতে পারবে না। সেইজন্য মনু গুরু করছেন

আসীদিদং তমো তমোভূতম এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার সৃষ্টির পূর্বে গাঢ় তমসচ্ছন্ন ছিল। তমোভূতম বলতে বোঝাচ্ছে স্থির, মানে সৃষ্টিটা তখন নেই। বেদে সৃষ্টি তত্ত্বে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছে – একটা হল আগে সৎ ছিল, আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গীতে বলছেন আগে অসৎ ছিল। উপনিষদ দুটোকে নিয়েই চলে। উপনিষদে কোথাও বলছে আগে সৎ ছিল আবার কোথাও বলছে আগে অসৎ ছিল। নাসদীয় সূক্তে এই দুটোকে সমন্বয় করা হয়েছে। মনুর দৃষ্টিভঙ্গী হল আগে অসৎই ছিল। কিন্তু অসৎকে তিনি ভাবানুবাদ করে তমোভূতম বলছেন। এর অর্থ হল কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অসৎএর একটা অর্থ এইভাবে করা যেতে পারে – রাতের অন্ধকারে একটা ঘরে অনেক লোক বাস করছে। কাউকে বলা হল দেখে এসোতো এই ঘরে কিছু আছে কিনা। অন্ধকার ঘর, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। লোকটি দেখে এসে বলল ঘরে কিছু নেই। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যাচ্ছে ওই ঘর থেকে এক এক করে সব কিছু বেরোতে শুরু হয়ে গেল। এটাকে বলছেন অসৎ থেকে সৃষ্টি। কিন্তু এর ঠিক ঠিক অর্থ হল, যে জিনিষটাকে জানা যায় না। অসৎ মানেও তাই, যেটাকে জানা যায় না। এটাকেই আবার বলা যেতে পারে সব কিছু তমে লীন ছিল, আসলে জিনিষটা তাই। বটবৃক্ষ সৃষ্টির আগে কোথায় ছিল? বীজের মধ্যে লীন ছিল। বীজে লীন থাকা মানে তমোতে লীন ছিল।

তখন আর কি ছিল? অপ্রজ্ঞাতম্ অলক্ষণম্, সৃষ্টি তখন অজ্ঞেয় অবস্থায় ছিল, কি ছিল জানা যাবে না, কারণ সব কিছু ইন্দ্রিয়ের বাইরে। অলক্ষণম্, কোন লক্ষণ দিয়ে অনুমান করা যাবে না যে সৃষ্টি আছে। ঈশ্বরকে কিভাবে জানা যেতে পারে? তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, সৃষ্টি হল তটস্থ, সৃষ্টি আছে তাই সৃষ্টিকে দেখা যায়, বোঝা যায় এই সৃষ্টির পেছনে এর একজন স্রষ্টা বা কর্তা আছেন। ধুঁয়ো উঠলে যেমন বলা যেতে পারে ওখানে লোকজন আছে। কিন্তু তখন কোন চিহ্নই ছিল না। সৃষ্টিই ছিল না, তাই চিহ্ন কোথা থেকে আসবে। অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ম্, কোন ধরনের প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের দ্বারাও জানা যাবে না। শব্দ প্রমাণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না। শব্দকে এখানে আনা হচ্ছে না এই কারণে যে, আমরা বাস্তব সৃষ্টিকে নিয়ে কথা বলছি। প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ, সর্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। এই ভাবটা আমাদের শাস্ত্রে বারংবার ঘুরে ঘুরে আসে। প্রথমে যেন সৃষ্টিতে কিছুই ছিল না, কিন্তু সেই কিছু নেই ঐ অবস্থা থেকে যেন সব কিছু বেরিয়ে এল। ঠাকুর এর দুটো উপমা দিচ্ছেন। বাড়ির গিল্লীর কাছে একটা হাড়ি থাকে। তাতে শশার বীচি, কুমড়োর বীচি, সমুদ্রের ফেনা সব পুটলি করে সামলে রেখে দেয়। যখন সময় হয় তখন সেই পুটলি থেকে বার করে চাষবাশ শুরু করে। কিন্তু এখানে বর্ণনাটা হল জিনিষটা আছে অথচ বোঝা যাচ্ছে না। জিনিষটা আছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না এটারও ঠাকুর একটা উপমা দিয়ে সৃষ্টির অর্থে বুঝিয়ে দিচ্ছেন – পায়রাকে চাল গম খাওয়ানোর পর বোঝা যায় না যে ওর ভেতরে কিছু আছে, কিন্তু পায়রার গলাতে হাত দিলে বোঝা যায় সব জমা করা আছে। যা কিছু খাবে সব গলার মধ্যে জমিয়ে রাখে। আসলে পাখির তো দাঁত থাকে না, তাহলে এই চাল গম এগুলো ভাঙবে কি করে? তাই ওদের গলার মধ্যে এক ধরনের সিক্রেসন হয়, তাতে গলায় ছোট ছোট পাথর তৈরী হয়। চাল গম গোটা গোটা গিলে গলার মধ্যে রেখে পায়রাগুলো যে গুটুর গোঁ গুটুর গোঁ করে আওয়াজ করে তখন পাথরগুলো নড়তে থাকে, পাথর নড়ার ফলে ওই চাল গম গুলো পিশে যায়। ভেতরে ওদের পাথর তৈরী হচ্ছে, যদি এই পাথর কমে যায় তখন বাইরে থেকে পায়রাগুলো ছোট ছোট নুড়ি পাথর খেয়ে নেয়। ঠাকুর বলছেন পায়রাকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু গলায় হাত দিয়ে দেখ, পরিষ্কার বুঝতে পারবে ওর গলায় চাল গমে গিজগিজ করছে। এখানে ঠিক তাই, কোন প্রমাণ নেই, কোন লক্ষণ নেই কিন্তু আছে।

তারপর সেখান থেকে ভগবান আকাশাদি মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি করে নিজে প্রকট হলেন। পরমাত্মা, যিনি অতিন্দ্রীয়, সূক্ষ্মস্বরূপ তিনিই প্রথমে প্রকট হলেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে ভগবানের স্বরূপ হল তিনি নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক মায়ার একটা আবরণ চলে আসে। মায়ার আবরণের ভেতর দিয়ে যখন যে সচ্চিদানন্দকে দেখা যাচ্ছে তখন তিনিই ভগবান। তখন সেই ভগবানের মনে ইচ্ছা জাগে, আমি একা আমি বহু হব। মায়ার আগে ভগবান কি আমরা কোন দিন জানতে পারব না। মায়া এসে যাওয়া মানে স্থান, কাল ও কারণ এসে যাওয়া। এরপর থেকে আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু নির্গুণ নিরাকারে মায়ার আবরণ কেন আসে এর উত্তর আমাদের কাছে নেই, বেদান্তের কাছেও কোন উত্তর নেই। যাই হোক মায়ার

আবরণ এসে যাওয়ার পর তো ভগবান এলেন, কিন্তু এখন তিনি থাকবেন কোথায়। পুরানে এর খুব সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। প্রথমে একটা ডিম তৈরী হল, পরে সেই ডিমটা মাঝখান থেকে ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে একটা হয়ে গেল অন্তরীক্ষ আরেকটা নীচের ভূঃ। এখন ভগবান থাকবেন কোথায়?

তিনি তখন জল সৃষ্টি করলেন। এখানে সামান্য একটু তফাৎ আছে। সৃষ্টি তত্ত্বে আসলে যা বলা হচ্ছে এগুলো বাস্তবিক নয়। নাসদীয় সূক্তে খুব সুন্দর বলছে – সৃষ্টি কিভাবে হয়ে কে বলতে পারবে! দেবতাদেরই সৃষ্টি পরে হয়েছে তারা জানবে কোথা থেকে! সৃষ্টির ব্যাপারে নানা রকমের তত্ত্ব আছে। কিন্তু এখানে বলছেন ভগবান প্রথমে কারণ সলিলের সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে ওই কারণ সলিলে নিজের বীজ প্রক্ষিপ্ত করলেন। ভগবানের বীজ কি? তাঁর নিজের শক্তি – তাসু বীজমবাসৃজৎ। বীজ ছাড়তেই সেই বীজ সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের মত প্রভা বিশিষ্ট একটা সুবর্ণ ডিমে পরিণত হল। এই সুবর্ণ অণু থেকে ব্রহ্মা জন্ম নিলেন। মনুর সৃষ্টির বর্ণনা খুব একটা পরিষ্কার নয়। পুরানের সৃষ্টির বর্ণনাগুলো আরও পরিষ্কার। সেখানে এই কারণ সলিলকে বলছে নারা, এই নারার উপর তিনি বাস করেন, নারাটাই তাঁর অয়ন, সেইজন্য ভগবানকে বলা হয় নারায়ণ। মনু এখানে বলছেন –

যত্ত্ব কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।

তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মোতি কীর্ত্যতে।।১/১১।

সৃষ্টি প্রকরণের ব্যাখ্যাতে অব্যক্ত, সৎ, অসৎ, কারণ এই শব্দগুলো ঘুরে ঘুরে আলোচনাতে আসবে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে এর অর্থ এক এক রকম হয়। যত্ত্ব কারণমব্যক্তম্, যিনি আদিকারণ তিনি অব্যক্ত। অব্যক্তের একটা অর্থ প্রকৃতি। এখানে অব্যক্তকে প্রকৃতি অর্থে নিলে সব কিছুর সৃষ্টি প্রকৃতি থেকে হচ্ছে বলে মানতে হবে। অব্যক্তের আরেকটা অর্থ যেটা ব্যক্ত নয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে যাঁকে জানা যায় না। এই অর্থ নিলে সব কিছুর কারণ হয়ে যাবেন ভগবান। হিন্দুদের দর্শনগুলিতে এই এক বিরাট সমস্যা। যেমন সৃষ্টি কোথা থেকে হল। কেন এইতো বলছেন যত্ত্ব কারণমব্যক্তং নিত্যং, অব্যক্ত মানে প্রকৃত, তাই প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি। ব্রহ্মসূত্রে যখন প্রশ্ন উঠছে জন্মাদস্য যতঃ, যেখান থেকে জন্ম হচ্ছে, সেখানে আচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য তিনজনই বলবেন ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা ভগবান থেকে সৃষ্টি হয় মানবেন না, তাঁরা বলবেন প্রকৃতি থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। আর এখানে তো বলাই হচ্ছে অব্যক্তম্, অব্যক্ত মানে প্রকৃতি। এবার সাংখ্যবাদীদের কি জবাব দেবে! এইজন্য শাস্ত্র অত্যন্ত দুর্বোধ্য, কঠিন এবং সূক্ষ্ম বিষয়। এবার সাংখ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এনারা বলবেন, তুমি যদি বল প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের আধার। আবার তোমরাই বলছ যখন সৃষ্টি নেই তখন এই তিনটে গুণ সব সময় সাম্য অবস্থায় থাকে। সৃষ্টির জন্য রজোগুণের প্রাবল্য দরকার। সৃষ্টি মানেই কার্য, কার্য রজোগুণের এলাকা। তোমরা নিজেরাই বলছ সব কটি সমান সমান, তিনটেই সাম্য অবস্থায়। তাহলে যখনই রজো এগোতে চাইবে তখন তমো এসে আটকে দেবে, এরপর থেকে যাবে সত্ত্ব, সত্ত্ব দিয়ে সৃষ্টি হবে না, তাহলে প্রকৃতি থেকে তোমার সৃষ্টি হবে কি করে! আর যতক্ষণ রজো বেশী না হবে ততক্ষণ সৃষ্টির কার্যও শুরু হবে না। সাংখ্যের বিরুদ্ধে এটা সব থেকে জোরালো যুক্তি। একবার সৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃতি নিজে থেকেই সব কিছু দায়িত্ব নিয়ে নেবে, কারণ তখন তার সাম্য অবস্থা ভঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমটা কি করে হবে? সাংখ্যের কাছে এটা এক বিরাট সমস্যা।

সাংখ্যের দর্শনটা যে দিনে দিনে হারিয়ে গেল ঠিক এই কারণেই। সাংখ্যবাদীরা কিছুতেই এর উত্তর দিতে পারল না। এর উত্তরে সাংখ্যবাদীরা অবশ্য বলে যে, যখন পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য প্রকৃতির কাছে আসে তখন প্রকৃতি নড়ে ওঠে, তখনই প্রকৃতির এই তিনটে গুণের সাম্য অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। সাংখ্যবাদীদের এই যুক্তিও কার্যত দাঁড়াতে পারল না, কারণ তোমার যুক্তিতেই সৃষ্টির কারণ তো প্রকৃতি থাকল না, চৈতন্যকে আসতে হচ্ছে। এবার পয়েন্টটা পাল্টে গেল। প্রথমে প্রশ্ন ছিল সৃষ্টি কি অব্যক্ত থেকে হয়? সেখানে বেদান্তীরা বলছেন অব্যক্ত থেকে কি করে হবে, তোমার দর্শনের যুক্তিতে তুমি নিজেই ফেঁসে যাচ্ছ। তাহলে সৃষ্টিটা কার

থেকে হচ্ছে? ওই যে প্রথমে বললেন অব্যক্ত থেকে, এখানে তাহলে অব্যক্তের সংজ্ঞাটা পাল্টাতে হবে। বেদান্তীর কাছে অব্যক্তের সংজ্ঞা অতি সরল, বলছেন যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না সেটাই অব্যক্ত। ইন্দ্রিয় দিয়ে কাকে জানা যায় না? ভগবানকে। তাহলে সৃষ্টি কোথা থেকে আসছে? ভগবান থেকে। অব্যক্তের আরেকটি সংজ্ঞা হল প্রকৃতি। আর সাধারণতঃ সব জায়গাতে অব্যক্তের অর্থ প্রকৃতি রূপেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যদি কখন শাস্ত্রে বলা হয় অব্যক্ত বা অসৎ থেকে উৎপত্তি, তখন এর সব সময় অর্থ হয় যাঁকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না।

এখানে এটাই বলা হচ্ছে যন্তঃ কারণম্, যিনি সব কিছুর কারণ। কে সব কিছুর কারণ? অব্যক্তম্ তিনি সামনে আসেন না। নিত্যং, তিনিই আছেন আর সদসদাত্মকম্, তিনি সৎ অসৎ স্বরূপ। এখানে বলছেন তিনি সৎ অসৎ স্বরূপ, নাসদীয় সূক্তে ঠিক এর উল্টোটা বলছেন ন সৎ ন অসৎ। মনুস্মৃতি যে কথা বলছে নাসদীয় সূক্তে এই একই কথা ঘুরিয়ে বলছে। নাসদীয় সূক্তে বলা হচ্ছে তিনি সৎ নন অসৎও নন, মনুস্মৃতিতে বলছে তিনিই সৎ তিনিই অসৎ, সদসদাত্মকম্ এর এটাই অর্থ। তিনি আছেন, এটা বলতে পারবে না যে তিনি নেই, শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না। সৎ মানে তিনি আছেন আর অসৎ মানে তাঁকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। বিজ্ঞান যেমন টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সব কিছুকে মেপে নিচ্ছে, সেইভাবে কোন দিন তুমি তাঁকে জানতে পারবে না। তাহলে কি তিনি নেই? না, তিনি আছেন। তিনি যদি না থাকেন তাহলে এটাই শূন্যবাদ হয়ে যাবে। তিনি নেই এই অর্থে যদি বলা তিনি অসৎ তখন এটাই বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যবাদে চলে যাবে। আর যদি শুধু বলে দিই তিনি সৎ তখন এটাই দ্বৈতবাদী হয়ে যাবে তখন হিন্দুধর্মের সাথে ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের কোন পার্থক্য থাকবে না। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে ভগবান সব সময় সৎ, হিন্দুদের কাছে ভগবান হলেন সদসদাত্মকম্। এক ভগবানই যখন আছেন তখন একেশ্বরবাদ, সেখান থেকে যখন সৃষ্টি হয় তখন ভগবান সৎ। যেমনি বলে দেব এক ভগবানই আছেন, তাঁকে জানা যায় তখন ভগবান হয়ে গেলেন সৎ, তখনই সেটা ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্ম হয়ে যাবে। হিন্দুধর্মের দর্শনকে বোঝা তাই খুব কঠিন, এই সদসদাত্মকম্ একটা কথা ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে অনেক দিন লেগে যাবে। আর এই সদসদাত্মকম্ হলেন হিন্দুদের ঈশ্বরের স্বরূপ। এক সঙ্গেই তিনি দুটো, তিনি সৎ মানে তিনিই আছেন, আছেন এই অর্থে বলা হচ্ছে কিন্তু আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কোনটা দিয়েই তাঁকে জানা যাবে না, তাই তিনি অসৎ।

তদ্বিস্ত্যঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মোতি কীর্ত্যতে, সেই ঈশ্বর প্রথম যাঁকে রচনা করলেন জগৎ তাঁকে ব্রহ্মা বলে জানে। পুরানে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়, যখন ভগবান ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তখন একটা সুবর্ণ অণু তৈরী হল। সেই সুবর্ণ অণু কারণ সলিলের উৎপন্ন হল, সেই কারণ সলিলে ভগবান শায়িত হলেন। ভগবানের নাভি থেকে একটা পদ্মের সৃষ্টি হল, সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মার আবির্ভাব হল। এত কিছু পুরানের কথাতে না গিয়ে যদি সাংখ্য, বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তখন আমরা দেখছি – ভগবান আছেন, ভগবান থেকে শক্তির সৃষ্টি হল, শক্তি মানে প্রকৃতি। যেমনি প্রকৃতি হল এবার প্রথম ভগবানকে দেখা যাচ্ছে মানে সগুণ ঈশ্বর। সেই নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরকে যখন মায়ার ভেতর দিয়ে দেখা হয় তখন তাঁকেই সগুণ সাকার ঈশ্বর রূপে দেখা যায়। এবার এই ঈশ্বরের পরে প্রথম যে সৃষ্টিটা হবে তিনি হলেন ব্রহ্মা। তাহলে সাংখ্য মতে মহৎ যেটাকে বলছে সেই মহৎকেই বলছেন ব্রহ্মা (Cosmic Mind)। তবে এর মধ্যে অনেক কিছু এদিক সেদিক করা হয়। কোথাও একে হিরণ্যগর্ভ বলছে কোথাও সূত্রাত্মা বলছে। তবে মনু পৌরাণিক মতটাকে এখানে নিয়েছেন।

ব্রহ্মা সেই ডিমের মধ্যে সংবৎসরকাল বাস করে সেই ডিম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখানে আবার দ্বিতীয় ডিমের কথা এসে গেছে। মনুর মতে যে সৃষ্টির বর্ণনা একটু অন্য রকমের, এটা সাংখ্যের সাথেও মেলে না, আবার বেদান্ত কিংবা পুরানের সাথেও মেলে না। যাই হোক, এখানে বলছেন ব্রহ্মা প্রথম মনের সৃষ্টি করলেন, আর মনের আগে অহং এর সৃষ্টি করলেন – প্রথমে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ এর পর অহঙ্কার। কিন্তু প্রকৃতি নিজে সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের সাম্য অবস্থা। পরে এই তিনটে গুণ সত্ত্ব,

রজো ও তমো গুণ দিয়ে ইন্দ্রিয়াদি ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে সৃষ্টি করলেন। এই হল মনুস্মৃতির মোটামুটি সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা। এরপর আমরা অন্য প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। এরপর বলছেন –

কর্মাভ্যুনাঞ্চ দেবানাং সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।

সাধ্যানাঞ্চ গণং সৃক্ষ্মং যজ্ঞৈশ্চৈব সনাতনম্।।১/২২।

এই সৃক্ষ্ম ও স্থূল ভূত সব তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ব্রহ্মা যত রকমের ইন্দ্রাদি দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। আর *কর্মাভ্যুনা*, কর্মে প্রবৃত্ত শরীরযুক্ত জীব অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি করলেন। এমনকি পশুপাখি এরাও কর্ম স্বভাবযুক্ত। দেবতাদের কর্ম স্বভাব নয়, তাঁরা কাজ করেন না, আমরা যে যজ্ঞে আহুতি দিই সেটা দিয়েই তাঁদের সব কিছু চলে। এছাড়া সেই প্রভু ব্রহ্মা নানান রকমের ঋষিগণ, সাধ্যগণ এবং নানা রকমের বস্তুর সাথে যজ্ঞাদির রচনা করলেন। প্রশ্নোপনিষদে ভগবান কিভাবে একটার পর একটা সৃষ্টি করেছেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর এই যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য অগ্নি, বায়ু ও সূর্য আর তার সঙ্গে তিনটি দেবতা থেকে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটে বেদ রচনা করলেন।

এরপর তিনি মনের ধর্মগুলোকে আলাদা ভাবে সৃষ্টি করলেন। এইভাবে তপস্যা, বাক্য, রতি অর্থাৎ চিন্তার পরিতোষ, কামনা, ক্রোধের সৃষ্টি হল। এগুলোকে সৃষ্টি করার জন্য এবং নানান রকমের প্রজাতির সৃষ্টি করার জন্য কর্মের বিবেচনার্থে ধর্ম ও অধর্মকে পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্টি করলেন। আবার সমস্ত প্রজাকে সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত করে দিলেন। তার মানে, ব্রহ্মা প্রথমে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে প্রথমে মনের বিভিন্ন ধর্মের রচনা করলেন, মনের ধর্ম রচনা করে লোকের মনে সুখ আর দুঃখ দুটোই দিয়ে দিলেন। আমরা যে বলি শান্তি কোথায় পাব। শান্তি কি করে পাবে! তিনি তো প্রথমেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আমাদের শান্তি অশান্তি দুটোই দিয়ে রেখেছেন, সুখ-দুঃখ দুটোই দিয়ে রেখেছেন, জ্ঞান-অজ্ঞান দুটোই দিয়েছেন। সেইজন্য ভগবান গীতায় বলছেন *নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্*। তুমি নির্দ্বন্দ্বো হও, তুমি সুখ-দুঃখের পারে যাও, পাপ-পুণ্যের পারে যাও, যত রকমের দ্বন্দ্ব হতে পারে তার থেকে বেরিয়ে এস। এই দ্বন্দ্বের জন্য আমাদের কারুরই মনে শান্তি নেই। কার শান্তি ছিল? ঠাকুরের শান্তি ছিল? হৃদয়রামের মর্ম পীড়িত বাক্যে জর্জরিত হয়ে তিনি গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলেন। শ্রীমার শান্তি ছিল? ওই রাধু, মাকু, নলিনীর মত মেয়েদের নিয়ে কারুর শান্তিতে থাকা সম্ভব! স্বামীজীর শান্তি ছিল? শান্তি থাকলে পাগলের মত সারা জগৎ কি তিনি দৌড়ে বেড়াতেন! রাবণের বন্দীদশায় সীতার শান্তি ছিল? একটি আধ্যাত্মিক পুরুষ নেই যিনি শান্তিতে ছিলেন। সাধু জীবন, সন্ন্যাস জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন মানেই কখন শান্তি নয়। আধ্যাত্মিক জীবনের পথে যে পা রেখেছে তার মানে তার সুখ শান্তি সব গেল। ইতিহাসেই কোন দৃষ্টান্ত নেই। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু খ্রীষ্টের জীবন দেখুন সবাই সারা জীবন শুধু কষ্টই পেয়ে গেলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য কি শান্তিলাভ করা? কখনই নয়, আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞানেই একমাত্র পরমশান্তি। পরমশান্তি আবার আলাদা জিনিস। আমাদের কারুরই শান্তি নেই কারণ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির রচনা করলেন তখনই এই দ্বন্দ্বটা ভেতরে স্থাপন করে দিয়েছেন, একটা থাকলে আরেকটাও থাকবে, যেমনি সুখ আসবে তার সাথে দুঃখটাও আসবে, শান্তিও আসবে অশান্তিটাও আসবে।

সৃষ্টির ব্যাপারে পুরানের যে ধ্যান-ধারণা, স্মৃতিকাররা, বিশেষ করে মনুও মোটামুটি ওই একই ধারণাকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। সচ্চিদানন্দই আছেন, কিন্তু মায়ার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, তাঁর যেন ইচ্ছে হল আমি একা আমি বহু হব, আমি সৃষ্টি করব। কেন ইচ্ছে হয় এটা আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না। কারণ মায়ার এই রেখার ওপারে কি হয় আর কি না হয়, আমাদের বুদ্ধি দিয়ে সেটা কোন দিন বোঝা যাবে না। যাই হোক সচ্চিদানন্দের যখন ইচ্ছা হল আমি বহু হব, তখন সেই নির্গুণ নিরাকার প্রথমে সগুণ সাকারে নিজেকে প্রকাশ করলেন। সগুণ সাকার যখন হয়েছেন তখন তাঁকে কোথাও একটা জায়গায় থাকতে হবে। নিজেকে স্থাপন করার জন্য তিনি কারণ সলিল সৃষ্টি করলেন। কারণ সলিল মানে যেখান থেকে

সব কিছুই সৃষ্টি হবে, সৃষ্টির বীজ যেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। আমরা যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের কথা বলি, এই কারণ থেকেই সব কিছু এসেছে এটাকে বোঝাবার জন্য এইভাবে কারণ সলিলের কথা বলা হচ্ছে। এই কারণ সলিলে সগুণ সাকার সচ্চিদানন্দ হাজার বছর যাবৎ পড়ে রইলেন। তারপর সেই সগুণ সাকার থেকে ব্রহ্মা জন্ম নিলেন। ব্রহ্মা জন্ম নিয়েই এক বৎসরাধিক কাল ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠল আমাকে কেন সৃজন করা হয়েছে। নিজের ভেতর থেকেই তিনি উত্তর পেলেন আমাকে সৃষ্টির কার্য করতে হবে। সৃষ্টির ব্যাখ্যা বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। সাংখ্য এক রকম বলছে, বেদান্তসার আবার আরেক রকম বলছে, পুরাণে অন্য রকম, মনুস্মৃতি আবার অন্য ভাবে বলছে। আমেরিকা থেকে স্বামীজী একবার নিজের গুরুভাইদের একটা চিঠিতে বলছেন আমাদের শাস্ত্রের যত রকমের সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে এক জায়গায় সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠাও। বলে তিনি বলছেন, এটা খুব কঠিন কাজ কিন্তু এটাকে তোমরা হালকা ভাবে করার চেষ্টা করো না, আমার প্রত্যেকটি কথা চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই কাজটা করা হয়ে ওঠেনি। আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে ঔৎসুকতা আসতে পারে স্বামীজী কেন এই সৃষ্টির ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন। যে কোন পাঁচটা বই থেকে সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যাকে সংগ্রহ করতে গেলেই আমাদের মাথা গুলিয়ে যাবে, সেখানে আঠারোটা পুরান, আঠারোটা উপপুরান আর প্রত্যেক জায়গায় সৃষ্টির এক এক রকমের বর্ণনা। শুধু শ্রীমদ্ভাগবতেই তিন চার রকমের সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যাবে। যাই হোক আমাদের অত কিছুতে না গিয়ে এখানে স্মৃতিশাস্ত্র কি বলছে দেখা যাক।

ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তখন চিন্তা শুরু করলেন সৃষ্টি কর্ম কিভাবে করা যাবে। ব্রহ্মা তখন আদেশ পেলেন এর আগের কল্পে ঠিক যেভাবে ছিল সৃষ্টি ঠিক সেইভাবেই হবে, নতুন করে কিছু হবে না। সাংখ্যে একটা ধারণা আমরা পাই, যেখানে বলছে প্রকৃতি অনন্ত থেকে অনন্ত কালের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর পুরুষও অনন্ত কাল থেকে অনন্তের দিকে বহমান হয়ে চলেছে। প্রকৃতি আর পুরুষ যেন আবহমানকাল থেকে প্রবাহিত দুটি নদী, যাদের কোন আদি নেই অন্ত নেই। পুরুষ যখনই প্রকৃতির সম্পর্কে চলে আসে তখনই সৃষ্টি শুরু হয়। আবার যখন পুরুষের নানা রকমের ভোগ থেকে নিবৃত্তি হয়ে যায়, প্রকৃতি তখন মুক্ত করে দেয়।

বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রকমের সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এনাদের ধারণা হল সৃষ্টি সব সময়ই অনন্ত, ব্রহ্মা যখন নতুন করে সৃষ্টি করবেন তখন তিনি আগে যেমনটি সৃষ্টি ছিল এখনও তেমনটি হবে। কি কি তিনি সৃষ্টি করছেন ইন্দ্রাদি দেবতাদের, কর্মস্বভাব প্রাণীদের, মানে মানুষ কাজ ছাড়া থাকতে পারে না, আবার অপ্রাণী, যাদের প্রাণ ক্রিয়া করে না। এখানে বলা মুশকিল অপ্রাণী বলতে ঠিক কাদের বোঝাতে চাইছেন। তবে সাধ্যাদির মত যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষিদের কথা হয়ত বলছেন, কারণ আমরা প্রাণহীন ক্রিয়া বলতে যেভাবে বুঝি সেই অর্থে এনাদের প্রাণহীন ক্রিয়া হয় না। বাল্মীকি রামায়ণে আমরা পাই যেখানে কিছু ঋষিদের বর্ণনা করা হয়েছে যাঁরা সূর্যরশ্মি পান করেই বেঁচে থাকতেন। পাথরাদির সৃষ্টি হল, অর্থাৎ সমস্ত জড় পদার্থের সৃষ্টি করলেন। এর আগের সৃষ্টি যাঁরা যেমনটি ছিলেন তাঁরা তেমনটিই থেকে গেলেন, নতুন করে তাঁদের কোন পরিবর্তন হল না। যেমন এই শ্লোকে বলছেন –

হিংস্রোহিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্মাধর্মার্তানতে।

যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তৎ তস্য স্বয়মাবিশৎ।।১/২৯

মনের যে বিভিন্ন গুণ ও ধর্ম হতে পারে এবং যে প্রাণীর যেমনটি স্বভাব এই সৃষ্টিতে ঠিক তেমনটি গুণ, ধর্ম ও স্বভাব তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হল। কি কি সে গুণ বা স্বভাব? হিংস্র, অহিংস্র, মৃদুতা, ক্রুরতা, ধর্ম, অধর্ম, সত্য এবং মিথ্যা। যেমন ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন যে ঋতু আসে তখন সেই ঋতুর লক্ষণ গুলো আসতে শুরু করে। যেমন শীতের পরে বসন্ত ঋতুর আগমনে গাছের কচি পাতা, নানান ফুলের বাহার আর পশুপাখিদের মধ্যে চাঞ্চল্যতা দেখে বোঝা যায় যে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। ঋতু আর ঋতুর চিহ্ন যেমন এক সাথে চলে ঠিক তেমনি প্রাণী আর তার স্বভাব এক অপরকে স্বাভাবিক ভাবেই নিজে থেকেই প্রাপ্ত করে নেয়। এর আগের সৃষ্টিতে ঠিক যেভাবে প্রাণী আর তার স্বভাব এক সাথে চলছিল, এই সৃষ্টিতেও সেই

একই ভাবে চলবে। সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। এই লোকটির স্বভাব এত ক্রুর কেন? তখন বলবে আগের জন্মে তার এই স্বভাবই ছিল। তার আগের জন্মে কেন ছিল? কারণ তার আগের জন্মেও সে এই রকমই ছিল। সিংহকে কে এত ক্রুর স্বভাবে তৈরী করেছে? কেউই তৈরী করেনি, এর আগের জন্মেও সেই ক্রুরই ছিল। এটাই প্রথম থেকে চলে আসছে, এটাই তার স্বভাব। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাওয়া না। উত্তর দেওয়া যায় না বলেই আগের জন্মে ঠেলে দিচ্ছে, আগের জন্মে সে এই রকমই ছিল।

একটা উপজাতির বর্ণনাতে পাওয়া যায় যে, তাদের ইতিহাসের ব্যাপারে কোন অনুভূতি নেই। পূর্বকালের ব্যাপারে তাদের যদি কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন তারা এটাই বলে – চিরদিন এটা এই রকমই ছিল। যদি প্রশ্ন করা হয় এই পৃথিবীটা আগে কি রকম ছিল। তখন তাদের একটাই উত্তর পৃথিবী চিরদিন এভাবেই ছিল। আমরা যেমন বলি একটা সময়ে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। বলার পর বলি এর আগের কল্পে জিনিষটা এই রকমই ছিল। এই উপজাতির লোকেরা কতকটা ঠিক এই ভাবেই উত্তরটা দেয়। আমরাও বলি সৃষ্টিটা চিরদিন এইভাবেই চলে আসছে, ব্রহ্মা নতুন করে কিছু কায়দা করেননি। ভগবান কাউকে নিজের মত করেননি, অনন্ত কাল ধরে এটা এভাবেই চলে আসছে। এর কোন আদি নেই। তবে এর শেষ আছে, তুমি যদি মুক্তির দিকে এগিয়ে যাও তাহলে একটা সময় এটা শেষ হয়ে যাবে।

ভগবান যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, আমি এক বহু হব। এবার এই বহু কিভাবে হবে আর এর স্থায়িত্ব কিভাবে হবে তার জন্য ব্রহ্মা চারটি জাতির রচনা করলেন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র। একটা সময় দেখলেন সৃষ্টিতে গতি আসছে না, তখন ব্রহ্মা নিজের শরীরকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে তাঁর অর্দ্ধ পুরুষ অর্দ্ধেক নারী হল। সেখান থেকে যাঁর প্রথম জন্ম হল তাঁকে বলা হয় বিরাট। এই বিরাট আবার তপস্যা করতে শুরু করলেন। বিরাটের তপস্যা থেকে মনুর জন্ম হল। সেইদিক থেকে মনু হলেন ব্রহ্মার নাতি। ব্রহ্মাই একাধারে বাবা ও মা, সেখান থেকে জন্ম হল বিরাটের, বিরাট যে তপস্যা করলেন, সেই তপস্যার যোগবলে জন্ম নিলেন মনু। মনু জন্ম নিয়ে তিনিও আবার তপস্যা করতে শুরু করলেন। আমরা এর আগেও বলেছি স্মৃতিশাস্ত্রের এই বর্ণনার সাথে পুরানের সৃষ্টির বর্ণনার অনেক পার্থক্য। এখানে সৃষ্টির ক্ষেত্রে তপস্যার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তপস্যার প্রভাবে যে তাপের উৎপন্ন হচ্ছে সেখান থেকেও জন্ম হচ্ছে। আর দ্বিতীয় জন্ম হচ্ছে পুরুষ নারীর সম্পর্ক থেকে। সুতরাং এখানেই আমরা দুই রকম জন্মের কথা পাচ্ছি। এবার এদের মধ্যে বিবাহের সূত্রে সেখান থেকে আবার অনেক কিছুর জন্ম হচ্ছে। এইভাবে আরও কিছু প্রজাপতির জন্ম হল। এই প্রজাপতিদের থেকে একটার পর একটা প্রজাতির জন্ম হতে শুরু করল।

এইসব সৃষ্টির কথা বলার পর মনু বলছে, বিভিন্ন রকমের যত জীবের জন্ম হল, এদের মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যত পশু আছে আর যাদের দুপাটি দাঁত আছে, এরা সবাই জরায়ুজ –

পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।

রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ।।১/৪৩

যত পশু, হরিণ, গবাদি পশু, উভয় পঙক্তি দাঁত বিশিষ্ট, তারপর হিংস্র পশু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্যগণ এরা সবাই জরায়ুজ। তবে এখানে রাক্ষস, পিশাচের কথা যেভাবে বলা হচ্ছে তাতে মনে হয় জাতি হিসাবেই বলা হচ্ছে। জরায়ুজ মানে যাদের গর্ভ থেকে জন্ম হয়। তারপর বলছেন অণ্ডজ, যারা ডিম থেকে জন্ম নেয়, যেমন পাখি, সর্প, মৎস, কচ্ছপ। এই ধরণের স্থলচর কিংবা স্থলচর প্রাণী যারা ডিম থেকে জন্ম নেয় তাদেরকে বলা হচ্ছে অণ্ডজ। এরপর তৃতীয় এক শ্রেণীর ছোট ছোট পোকামাকড় প্রাণী যারা বিশেষ তাপমাত্রায় ঘাম থেকে জন্ম নেয়, এদের বলছেন স্বেদজ। এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হল মশা, উকুন, ছারপোকা এগুলোকেও বলছেন স্বেদজ, কিন্তু এগুলোর জন্মও হয় ডিম থেকে। সেইজন্য স্বেদজ বলতে ঠিক কি বলতে চাইছেন এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় না। একটা হতে পারে মাথার মধ্যে যে উকুন হয় এগুলো মাথার ঘাম থেকে জন্ম নেয়। বিছানাতে শরীরের ঘাম লাগে তাতেই বোধ হয় ছারপোকার জন্ম হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যে ব্যাপার

হল মশা মাছিকেও স্বেদজের মধ্যে রেখেছেন। চতুর্থ হল উদ্ভিজ, বীজ বা কলম করে মাটি থেকে জন্ম নিচ্ছে তাদের বলা হচ্ছে উদ্ভিজ।

উদ্ভিজের আবার কতকগুলো শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যে সব গাছে প্রচুর ফল ফুল হয় তাদের বলা হয় ওষধি। আমাদের উপনিষদে ওষধির কথা অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। যেসব গাছে ফুল না হয়ে যদি ফল হয়ে যায় তখন তাকে বলা হচ্ছে বনস্পতি। আর ফুল হয়ে ফল হলে তাকে বলছেন বৃক্ষ। আবার গুচ্ছ ও গুল্মও নানা প্রকার। যার মূল থেকে অনেক শাখা জন্মায় অথচ কাণ্ড নেই তার নাম গুচ্ছ। আবার যার একটি মূল থেকেই বহু অঙ্কুর উদ্গত হয় তার নাম গুল্ম। এরপর এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। পূর্ব পূর্ব জন্মের অত্যন্ত তমোগুণের জন্য এদের অন্তশ্চেতনাটা একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে কিন্তু সুখ-দুঃখ যুক্ত, এরাই পরের জন্মে বৃক্ষ হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কোন মানুষ বা প্রাণী যদি অত্যন্ত তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন কিন্তু তারা গাছপালা হয়ে জন্মায়। এদের অন্তশ্চেতনা আর সুখ-দুঃখের বোধ আছে। এই জিনিষটাই পরবর্তী কালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস বৃক্ষের মধ্যে যে প্রাণ আছে, তাদের মধ্যেও যে সংবেদনশীলতা আছে সেটা তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করে জগদ্বাসীকে দেখালেন।

ভাগবতে বৃক্ষের অন্তশ্চেতনাকে যমলার্জুন কাহিনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। নল আর কুবর দুজন যক্ষ পুত্র একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মেয়েদের সাথে পুষ্করিণীতে খেলা করছিল। সেই সময় দেবর্ষি নারদ সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের আড়ালে নিয়ে যায়। কিন্তু নল আর কুবর এতই অহঙ্কারে মত্ত ছিল যে দেবর্ষি নারদকে কোন সম্মান না করে বিনাবস্ত্রের তঁর সামনে ক্রীড়া করতে থাকল। নারদ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে দুজনকে অভিশাপ দিয়ে বললেন – তোমাদের লজ্জা যখন বিলোপ হয়ে গেছে তখন তোমাদের এমন অবস্থাই হওয়া উচিত যাতে সর্বদা এই রকমই বস্ত্রহীন হয়ে থাক। লজ্জা চলে যাওয়া মানেই তমোগুণে পরিণত হয়ে যাওয়া। নারদের অভিশাপে তারা দুজন বৃন্দাবনে দুটো অর্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্ম নিল। বৃক্ষ মানে তার অন্তশ্চেতনা আছে, এরা দুজন জানে আমরা কারা, যখন লোকেরা গাছের পাতা ছিড়ে নিচ্ছে, ডাল ভাঙছে তখন তাদের দুঃখও হচ্ছে, কিন্তু কোন অভিব্যক্তি নেই। তমোগুণের প্রচণ্ড আধিক্যে তার বৃক্ষে পরিণত হয়ে গেছে। সেইজন্য আমাদের সবাইকে খুব সাবধান হয়ে, চিন্তা-ভাবনা করে সব কাজ করা উচিত।

ব্রহ্মা যখন জাগ্রত হন তখন সৃষ্টি আবার জেগে ওঠে, ব্রহ্মা যখন নিদ্রাতে চলে যান তখন সৃষ্টিটাও শেষ হয়ে যায়। যখন মহাপ্রলয় হয়, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মা সমেত সমস্ত কিছু পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায় –

যুগপৎ তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।

তদায়াং সর্বভূতাত্মা সুখং স্থপতি নির্বৃতঃ।।১/৫৪

তখন জীবের আর কোন বৃত্তি থাকে না, এটাকেই বলছেন নির্বৃতঃ, যেন পরম সুখে নিদ্রা যান। এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না যে, মহাপ্রলয়ে সব জীবের মুক্তি হয় কিনা। মুক্তি যদি না হয় তাহলে সব কিছু আবার বীজ রূপে থেকে যাচ্ছে। সৃষ্টি তত্ত্বের বিশ্লেষণে এগুলো অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে। কারণ সচ্চিদানন্দ ছাড়া যখন কিছু নেই, তখন যে জীবগুলোর মুক্তি হল না তাদের এবার কি হবে। এনাদের মতে মুক্তি না হলে সবাই ওই ভাবেই পড়ে থাকবে। যদি বীজাকারে পড়ে না থাকে তাহলে সৃষ্টির অনাদি তত্ত্ব সিদ্ধ হবে না। এনাদের মতে মহাপ্রলয়ের পর সমস্ত জীব দীর্ঘকালের জন্য, এই কাল কত দীর্ঘ আমরা হিসাবের মধ্যে ধরতে পারবো না, এই সুদীর্ঘকালের জন্য পড়ে থাকবে। এর পর আবার যখন ভগবান চিন্তা করবেন আমি এক আমি বহু হব, তখন আবার ব্রহ্মার সৃষ্টি হবে। ব্রহ্মা যখন নতুন করে সৃষ্টি করবেন তখন তিনি কোথা থেকে সৃষ্টি করবেন? ওই যে জীব যারা দীর্ঘকাল ধরে পড়ে আছে, তাদেরকেই আবার সৃষ্টির মধ্যে টেনে নিয়ে আসা হবে। তাই মুক্তি যদি না হয়ে থাকে তাহলে যেমন আমরা এক রাত ঘুমোচ্ছি, মৃত্যুর সময় একশ বছর ঘুমিয়ে আছি, ব্রহ্মা যখন ঘুমোচ্ছেন তখন আমরা আরও কোটি কোটি বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকছি, আর ভগবান যখন নিজেই লয় হয়ে গেলেন, তখন কত কোটি কোটি বছর ঘুমিয়ে থাকব তার কোন হিসাব আমাদের জানা নেই। কিন্তু আবার

যখন ভগবান ইচ্ছে করবেন আমি বহু হব তখন তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করবেন, ব্রহ্মা তখন আবার সবাইকে টেনে নিয়ে আসবে। কোন্ অবস্থা থেকে টানবেন? ঠিক ওই অবস্থা থেকে যেখানে আমাদের ছেড়ে রেখে ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এর থেকে কারুর নিস্তার নেই। তবে তারা কিভাবে থাকে, সচ্চিদানন্দের সাথে এক হয়েই তো থাকছে। এই জায়গাটা ঠিক পরিষ্কার নয়। কারণ সচ্চিদানন্দ ছাড়া তো কিছু নেই, তাই সেখানে জীবধর্মী কোথা থেকে আসবে। এখানে দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈতে এসব নিয়ে কোন সমস্যা নেই। অদ্বৈতে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সচ্চিদানন্দ যখন সব কিছু গুটিয়ে নিলেন তখন সব খেলাই শেষ। অদ্বৈতের এই তত্ত্বটাকে আরেকটু ঠেলে দিলেই হয়ে যাবে অজাতবাদ। অজাতবাদ মানে আদৌ কোন সৃষ্টিই হয়নি, সৃষ্টি বলে কোন কিছু নেই। যাই হোক, আমরা সৃতিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি, এইসব দর্শনের মধ্যে আমরা বেশী ঢুকবো না।

মনু এইসব বর্ণনা করে ঋষিদের বলছেন, আমার শিষ্য ভৃগুর কাছে আমি সব বলেছি, ভৃগু সব কিছু জানে, এরপর থেকে ভৃগুই সব বর্ণনা করবে আর ভৃগু যা কিছু বলবে সেটা আমার মত বলেই জানবে। মনুর আদেশে ভৃগু প্রথমেই এক এক করে কাল অর্থাৎ সময়ের বর্ণনা করছেন – ১) নিমেষ – চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগছে সেইটুকু সময়কে বলা হচ্ছে নিমেষ। ২) আঠারোটি নিমেষে এক কাষ্ঠা। ৩) তিরিশ কাষ্ঠায় এক কলা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের স্তবে আমরা পাই কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ। ৪) তিরিশ কলায় এক মুহূর্ত। ৫) তিরিশটি মুহূর্ত নিয়ে হয় একটা দিন। ৬) তিরিশ দিনে একটি মাস আর ৭) বারোটি মাসে একটি বছর।

সূর্য মানুষ ও দেবতাদের দিন ও রাত্রি বিভাগ করে থাকেন। সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণ আসার পর থেকে যে সময় পর্যন্ত সূর্যরশ্মি দেখা যাবে সেই সময়টুকুকে বলা হয় অহঃ বা দিন আর সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পর যতক্ষণ না আবার উদয় হয় সেই পরিমাণ কালকে বলা হয় রাত্রি। দিন হল কর্মানুষ্ঠানের জন্য আর রাত্রি জীবের নিদ্রার জন্য। মানুষের একটি বছর দেবতাদের একটি দিন ও রাত্রি, অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা। দেবতাদের দিন হল উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি। আমাদের ছটি মাস দেবতারা জাগ্রত থাকেন আর আমাদের বাকি ছটি মাস যাবৎ দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। দেবতাদের চার হাজার বছর হল সত্যযুগ। এরপর যুগের আবার সন্ধ্যা, সন্ধ্যাংশ নিয়ে নানা রকম হিসাব করা হয়েছে, এগুলোতে আমাদের অতটা প্রয়োজন নেই। এখান থেকে আবার বলছেন, প্রত্যেকটি যুগের ধর্ম আলাদা আলাদা।

বিভিন্ন যুগের ধর্ম

সত্যযুগের ধর্ম হল তপঃ। তপস্যা করা মানেই সত্যযুগের ধর্ম পালন করা। ত্রেতাযুগের ধর্ম হল জ্ঞান। যদি কেউ জ্ঞান অর্জন করেন তখন সেটাই ত্রেতাযুগের ধর্ম হবে। দ্বাপরের ধর্ম হল যজ্ঞ। কলিযুগের ধর্ম হল দান। কলিযুগে কেউ যদি দানই করে যায় তাহলেই তার সব পুণ্য হবে। এরপর চারটি বর্ণের কি কি ধর্ম বলছেন – ব্রাহ্মণের ছয়টি কাজ – অধ্যাপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কাজ হল প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি। বৈশ্যদের কাজ হল, পশুদের রক্ষা করা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, সুদে টাকা খাটানো এবং কৃষিকাজ। বিশ্বের সমস্ত দেশে বণিক সম্প্রদায়ের বড়লোকি স্বভাব মারাত্মক ভাবে দেখা যায়। একমাত্র ভারতবর্ষই একটি দেশ যেখানে এই বড়লোকি দেখানোটা কোন বণিকরই দেখাননি। শেঠ শব্দটা এসেছে শ্রেষ্ঠ থেকে। তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক কিন্তু কাউকে জানতে দেবেন না। তাদের ছেলেরাও জানে না, যখন তারাই মালিক হয়ে বসবে তখনই জানতে পারবে। টাকাটা নিয়ে তারা একাই হজম করে নিতে পারেন না, এই ক্ষমতা একমাত্র ভারতবর্ষই দেখিয়েছিল। দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করাটা তাদের ধর্ম। আমার কাছে যত অর্থ আছে আমি এর মালিক নই, আমি হলাম এই অর্থের অছি, ভগবানই এর মালিক। এই ট্রাস্টটা এক একটা ব্যাপারে এক এক জনের হাতে দেওয়া থাকত, বিদ্যার ট্রাস্ট ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয়েছিল, রাষ্ট্রকে রক্ষা ও পালনের জন্য ক্ষত্রিয়দের ট্রাস্টি করা হয়েছিল। তার সাথে শূদ্রদের দিয়ে দেওয়া হল সমাজের সেবামূলক কাজের ট্রাস্ট। এইভাবে চারটে বিভাজন ব্রহ্মার আদেশে মনু করে দিয়েছিলেন।

প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে

যত রকমের জীব আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল প্রাণী যারা প্রাণ ধারণ করে। বৃক্ষকে এখানে প্রাণীর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। প্রাণীদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি আছে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। যাদের মধ্যে বুদ্ধি আছে তাদের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। বিদ্বানদের মধ্যে যাঁর শাস্ত্রোক্ত বুদ্ধি আছে তাঁরা ঠিক ঠিক শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধি ধারণ করে যাঁরা শাস্ত্রীয় আচরণ করে তাঁরা সব থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর উপরে আর কেউ নেই। জন্ম নিতেই ব্রাহ্মণ সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ ধর্মকে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকে। কেউটে সাপ, সে বাচ্চাই হোক আর বড় হোক, একটা ছোবলেই মৃত্যু। ঠিক তেমনি একজন ব্রাহ্মণের যখন জন্ম হল তার মানে, সে বেদাধ্যয়ন করার ক্ষমতা নিয়ে এসেছে, বেদের বুদ্ধি ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, ওই বুদ্ধির মত আচরণ করতে পারবে, আচরণ করে সে ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত হয়ে যেতে পারবে। এই সুপ্ত শক্তিটা আছে বলে তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হচ্ছে। কিন্তু পরে মনুস্মৃতিতে অনেক জায়গায় বলা হবে যদি সুপ্ত শক্তিটা না জাগায় তাহলে তাকে চণ্ডালের মত ত্যাজ্য করে দাও। ঠিক তেমনি একজন যখন সন্ন্যাসী হয়ে গেল, এবার কিন্তু সে চেষ্টা করলে ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে ভারতে সন্ন্যাসীদের সবাই প্রচণ্ড সম্মান করে। এখন যদি সন্ন্যাসী সেই রকম সচেতন না হয়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর নাম-যশের পেছনে ছুটতে থাকে তাহলে মানুষ তাকে সেই সম্মানটা আর দেবে না। এরপর ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণের লোকেরা কি কি কাজ করবে তার বর্ণনা করছেন। তাদের কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে, আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা পাষণ্ড তাদের আলাদা করে বোঝাবার জন্য পরিষ্কার করে সবার ধর্ম বলে দিয়েছেন। এই অধ্যায়ের নাম সংসারোৎপত্তি।

স্মৃতিশাস্ত্রের ষোড়শ সংস্কারের উদ্দেশ্য

স্মৃতিকারদের সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাপারে ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, আমাদের কাছে জীবনের কি আদর্শ, আমরা কেন বেঁচে আছি, কিসের জন্য বেঁচে থাকতে চাইছি এই প্রশ্নগুলোকে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া আর এর উত্তরগুলোকে স্পষ্ট করে দেওয়া। আমেরিকাতে কিছু দিন আগে একটি সিনেমা হলে উন্মাদগ্রস্ত একটি বন্দুকবাজ লোক এলোপাখাড়ি গুলি চালিয়ে বারো জনকে মেরে ষাট জনের মত লোককে আহত করেছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ওবামা তখন একটা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বাইরে ছিলেন। নির্বাচনের সব অনুষ্ঠান বাতিল করে তিনি ছুটে এসে বলছেন – জীবনটা যে কি নয়, কেন নয় সেটা আমরা হয়ত জানিনা, কিন্তু জীবনটা কি আর কেন সেটা আমরা জানি। জীবনটা কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ভালোবাসা। যারা মারা গেছে তারাও অনেককে ভালোবাসত, তাদেরকেও অনেকেই ভালোবাসত, এই জিনিষটা আমরা বুঝি। কি উদ্ভট একটা উত্তর আমরা পাচ্ছি। একটা পশুও নিজের সন্তানকে ভালোবাসে। পালের গরুরা তাদের মধ্যে অন্য গরুকে ঢুকতে দেয় না। এতে আশ্চর্যের কি আছে! আমরা এই মানব জীবনে কেন এসেছি, কেনই বা এখানে আছি আর কোথায় যাচ্ছি, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি স্পষ্ট না থাকে তাহলে কি করে আমরা বিধান তৈরী করব। মনুস্মৃতি সবটাই বিধান আর নিয়ম। এখানে দুটো জিনিষ – একটা হল ধর্মীয় ব্যাপার আর অন্যটা রাজধর্ম – কি আইন হবে, কি বিধি নিষেধ হবে ইত্যাদি। আইন প্রণেতাদের কাছে এই ব্যাপারটা যদি স্পষ্ট না থাকে তখন আজকে সংবিধানের একটা ধারার পরিবর্তন হচ্ছে, আবার পরের দিন ওই পরিবর্তনের উপর আরেকটা পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এই সমস্যা কিন্তু মনুর কাছে ছিল না। তিনি পরিষ্কার দেখছেন সচ্চিদানন্দই আছেন, মায়ার আবরণে তাঁকেই ঈশ্বর রূপে দেখাচ্ছে। তিনিই পরে একটা অবস্থায় ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা থেকেই সৃষ্টি এগিয়ে গেছে।

সৃষ্টি কিভাবে হয়? আর কেনই বা সৃষ্টি হয়? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে নেই। এনাদের কাছে এগুলো হল Statement of fact। এগুলোকেই যখন তাঁরা কাহিনী আকারে নিয়ে আসেন বা দর্শনের কোন মডেল রূপে রাখেন তখন তাঁরা একটু অন্য ভাবে উপস্থাপনা করেন যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। নাসদীয় সূক্তের মত সরাসরি বলেন না যে, কে জানে সৃষ্টির আগে কি হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল আর কেন

হয়েছিল। কারণ সত্যিই এগুলো জানার কোন উপায় নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে প্রশ্ন করা হচ্ছে *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*। সচ্চিদানন্দ যিনি আপ্তকাম, যাঁর মধ্যে কোন কামনা-বাসনা নেই তিনি কেন সৃষ্টি করতে চাইবেন। আপ্তকামের কেন স্পৃহা হবে, খেলার ছলে কেন তিনি সৃষ্টি করতে যাবেন, আপ্তকামের মনে ইচ্ছা জাগবে কেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এর খুব সুন্দর উত্তর দেওয়া হয়েছে – যিনি আপ্তকাম তাঁর মনে কেন ইচ্ছা জাগে আমি সৃষ্টি করব, এটাই মায়া। কিন্তু যখন বলছেন এটাই মায়া, এর অর্থটা কি? এটাই মায়া বলা মানে আমি এর উত্তর জানিনা। স্বামীজী অনেকবার বলছেন – *Hindu is honest there, he says I do not know*। তাহলে তুমি কি জান? আমি আছি এই সত্যটাকে আমি জানি। আমি এটাও জানি, আমি যে কাজই করি না কেন, সেটা হল কামনা প্রেরিত। যতক্ষণ পেছনে কোন কামনা না থাকে, যতক্ষণ না কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভবনা না থাকে ততক্ষণ মানুষ কাজ করবে না। কামনা ছাড়া যিনি কাজ করে তিনি তো ভগবান বা মহর্ষি বা মহাপুরুষ পদবাচ্য। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন ভগবান আর সাধারণ মানুষের পার্থক্য কোথায়? বলছেন ভগবানের নিজের কোন প্রয়োজন নেই, কোন কামনা নেই। তিনিই আবার জীবের মঙ্গলের জন্য শরীর ধারণ করেন। এটাই ভগবান আর সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য। একটা গরুর সামনে যদি সবুজ ঘাস নিয়ে কেউ দাঁড়ায়, গরু স্বাভাবিক ভাবেই তার দিকে চলে আসবে। আবার যদি ডাঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সমস্ত পশুই পিছিয়ে যাবে। এদিক থেকে মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ নেই। কাম বা কামনা, কাম শব্দটা আরও জুর ও নিকৃষ্ট, কামনা শব্দটা তার থেকে একটু ভালো। কাম হল সব কিছুর মূলে আর কামনা তারই একটা অঙ্গ। আমাদের সমস্ত কাজের মূলটা রয়েছে কামের মধ্যে। যার শেকড় বিষের মধ্যে নিহিত তার ফল আর কিভাবে ভালো হবে, সেটাতো বিষবৃক্ষ হয়ে গেল। কোন কাজের মূল যদি কামনার মধ্যে নিহিত থাকে সেই কাজের ফল আর কত ভালো হবে। তার ফলটাও কামনা জর্জরিত হবে। মনু বলছেন আমাদের ভেতরে এই যে নোংরা জমে আছে এটাকে আগে পরিষ্কার করতে হবে। এখানে যাঁরা ধর্ম কথা শুনতে আসছেন, কত রোদ বৃষ্টি মাথায় করে, বাসে ট্রেনে কত দূর দূর থেকে আসছেন, তাঁরা কি ফলের আশায় এখানে আসছেন ভেবে দেখতে হবে। মনু এগুলো নিয়ে কিন্তু বলছেন না। সেই তুলনায় এনারা সত্যিই মহাপুরুষ।

একটা মানুষ যখন তার মায়ের গর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে, তখন থেকে শুরু করে চিতায় ওঠার আগে পর্যন্ত সেই মানুষটি হল একটা নোংরার পুটলি। মনু এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ না করে নোংরা বলে এইবার তাকে পরিষ্কার করতে নেমে যাবেন। এই নোংরা আবর্জনাগুলো যদি পরিষ্কার করা না হয় তাহলে সে জন্ম জন্মান্তরে ঘুরতে থাকবে। একটু ভালো কর্ম করলে পিতৃলোকে যাবে, খারাপ কাজ করলে সাপ বিছে হয়ে জন্মাবে, মৃত্যুর পর আবার জন্মাবে। এইভাবেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকবে। তবে বর্ণাশ্রম ধর্মকে যারা মানে না, জীবনে যাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই, স্মৃতিশাস্ত্র তাদের জন্য নয়।

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে দেখা গেল দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টি হচ্ছে না বলে সেখানকার এক রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্যবাসীকে আবেদন করে বলা হয়েছে আপনার মন্দির গীর্জা মসজিদে ভগবানের কাছে বৃষ্টির জন্য ভালো করে প্রার্থনা করুন। এই নিয়ে আবার যুক্তিবাদীরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছে – এর মধ্যে আবার ভগবানকে কেন নিয়ে আসা হচ্ছে, বৃষ্টির সাথে ভগবানের কি সম্পর্ক ইত্যাদি। এখন যদি ধর্মবাদীরা যুক্তিবাদীদের বলে আপনার তাহলে বলুন কেন মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করা হবে না। যুক্তিবাদীর যুক্তি কি ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, যখন এটাকে পুরোদমে নামিয়ে আনা হবে তখন দেখা যাবে এদের যুক্তির কোন ভিত্তিই নেই। এদের একটাই যুক্তি গলাবাজী, গলার জোর বেশী। এদের না আছে কোন আদর্শ, না আছে আদর্শে চলার কোন সঠিক পথ। মনুর কাছে কিন্তু সব কিছু পরিষ্কার – আমার এই হল জীবন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য হল সংস্কৃত হওয়া, আর্য হওয়া। মায়ের গর্ভ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তুমি হলে একটা আবর্জনার পুটলি, তোমার এই আবর্জনা গুলোকে পরিষ্কার করতে হবে।

পরিষ্কার করার জন্য এনারা কতকগুলো সংস্কার বিধি ঠিক করে দিলেন। বেদের সময় চৌষট্টিটি সংস্কার ছিল। মায়ের গর্ভে আসার আগে থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়মিত পরিষ্কার করাই হল

সংস্কারের উদ্দেশ্য। খাওয়া-দাওয়া করার পর উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র গুলোকে যেমন রোজ পরিষ্কার করতে হয়, আমাদের এই দেহ, মনকেও ঠিক সেই রকম প্রতিনিয়ত লাগাতার ভাবে যদি পরিষ্কার না করা হয় তাহলে সে যে নোংরা পুটিলি নিয়ে এসেছিল সেই নোংরা পুটিলি নিয়েই মরবে। একটা হল সে আগের জন্মের নোংরা আবর্জনা নিয়ে এসেছে আর দ্বিতীয় হল দৈনন্দীন যে নোংরাগুলো জমছে সেগুলো আলাদা। আর যদি বলে, নোংরা যেমন থাকার থাক, নোংরাটাও দরকার।

সত্যিকারে একটা মজার ঘটনা আছে, আমেরিকার একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুই তিনজন ছেলে রাখাল বালকরা যেভাবে থাকে সেই ভাবে নিজেদের মত থাকত। এদেরই আত্মীয়া চারটি মেয়ে চিঠি লিখে জানাল আমরা তোমাদের সাথে দুটি মাস থাকব। চিঠি পেয়ে এদের মাথায় হাত। দু-তিনজন ব্যাচেলার ছেলে নিজেদের মত থাকে, আর তাদের বোনেরা এসে থাকবে, এদের তো ঘুম নেই। একজন বলল, কোন চিন্তা নেই আমি এর একটা বিহিত করছি। বোনেরা আসার পর এরা খুব খাতির যত্ন করে রান্নাবান্না করে রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া করিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকে যাওয়ার পর বোনেরা বলছে, আমরা তাহলে বাসন-টাসন গুলো মেজে রাখি। ছেলেগুলো বলছে – না না, কিছু করতে হবে না, সব ব্যবস্থা করা আছে। কি ব্যবস্থা? একটি ছেলে সিস্ মারল। সিস্ মারতেই ওদের পোষা তিন চারটে কুকুর এসে পুরো থালা বাটি চেটে পুটে সব পরিষ্কার করে দিয়ে চলে গেল। ছেলেগুলো বলল, তোমরা সব ঘুমিয়ে পর, কাল সকালে এগুলোকেই ব্যবহার করা যাবে। সেই রাতেই মেয়েগুলো ট্রেন ধরে ফেরত চলে গেল। ওদের চিঠি পাওয়ার পর থেকেই কুকুরগুলোকে থালা বাসন চাটার ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে। এখন যদি কেউ মনে করে একেতো খেয়ে নোংরা হল এরপর কুকুরে এসে চেটে দিয়ে যাক আর এটাই আমার জন্য ঠিক আছে, তাহলে তো অন্য জিনিষ হয়ে যাবে। মনু বলছেন এভাবে জীবন চলবে না।

ম্যাক্সমুলার মনুস্মৃতির অনুবাদ করতে গিয়ে লিখছেন, কোন মানুষ যদি কখন ধার্মিক পুরুষ হয়ে যায় তখন তার মনে কোথাও একটা ইচ্ছা জাগে আমি সেই পরমাত্মা, ঈশ্বর বা যে নামেই বলা হোক না কেন, তাঁর সাথে এক হব। এই এক হওয়ার ইচ্ছাটা যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধি না হয় জাগবে না। জ্ঞানমার্গীরা যে বলছেন ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য, ঠাকুর বৈরাগ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন যেটাকে অনিত্য বলে জেনে গেলে সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। এটাই শুদ্ধিকরণ। ভক্তির পথকে যাঁরা অবলম্বন করছেন তাঁরা দেখেন আমি শুধু আমার ইষ্টকেই ভালোবাসছি, আমার ইষ্টের বাইরে অন্য কোন কিছু দিকে তাকাতে চাই না, আমার অন্য কোন কিছু লাগবে না। এটাই অব্যাভিচারিণী ভক্তি, এখানে একটা জিনিষকে সে অবলম্বন করে নিচ্ছে তার সাথে বাকি সব কিছু খসে পড়ে যাচ্ছে। তার মানে কামনা-বাসনা জনিত কর্মগুলো সব খসে যাচ্ছে। যাঁরা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন তাঁদের মনে অদম্য শক্তি থাকতে হবে। আবার ভক্তিমার্গে দরকার অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত। সেইজন্য যারা অশুদ্ধ চিত্তের তাদের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। আমরা বেশীর ভাগই হল্যাম অশুদ্ধ চিত্তের, এদের জন্য প্রথমে দরকার বৈধী ভক্তির অনুশীলন করা। বৈধী ভক্তি হল বিভিন্ন উপাচারে নিয়মিত পূজা, পাঠ, জপ ইত্যাদি করা। মনুস্মৃতি মূলতঃ বৈধী ভক্তির অনুশীলনের উপরই জোর দিচ্ছে। দৈনন্দীন জীবনে আমাদের অনেক কিছুই করতে হচ্ছে, স্নান করা, খাওয়া-দাওয়া করা, পোশাকাদি ধৌত করা, দাঁত ব্রাশ করা, সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাবার আগে যত রকমের কাজ করা হচ্ছে, স্মৃতিকাররা এই দৈনন্দীন কর্মগুলিকে আধ্যাত্মিকরণ করে দিচ্ছেন। আমি কি পাঠ করছি, কি কথা বলছি, কার সঙ্গে কথা বলছি, আমার খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা এই সব কিছুকে স্মৃতিকাররা এমন ভাবে মার্জিত করে সাজিয়ে দিচ্ছেন যাতে আমাদের মন আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসতে শুরু করতে পারে। এটাই জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা।

ভক্তির ক্ষেত্রে একটা লোক দেখানোর ব্যাপার থাকে। আমি নিয়মিত মন্দিরে যাই, চরণামৃত খাচ্ছি, উৎসবাদিতে থিচুড়ি ভোগ খাচ্ছি লোকে ভাবছে আমি কত বড় ধার্মিক। আমিও সারা বছর এইভাবে নিজেকে নিজে একজন ভক্ত বলে মনে করে ভাবছি এতেই আমার সব ধর্মকর্ম করা হয়ে গেল। আবার অনেক ভক্ত কারুর কাছে শুনেছে গুরুদর্শন হওয়া মানে এক লক্ষ জপের সমান, তাই একবার গুরুদর্শন করে নিলাম আমার

আর কিছু দিন কোন জপ না করলেও হবে। স্মৃতি এগুলো আমাদের করতে দেবে না। স্মৃতিশাস্ত্র কোন চালাকি, ফাঁকিবাঁজিকে বরদাস্ত করবে না, তোমাকে রোজ সকালে উঠতে হবে, উঠে এইভাবে দাঁত ব্রাশ করবে, কথা শুধু এই ধরনের লোকদের সাথেই বলবে, বড়দের এইভাবে সম্মান করবে, স্মৃতি সব কিছু একটা কঠোর অনুশাসনের দ্বারা আমাদের দৈনন্দীন কাজগুলোকে বেঁধে দিচ্ছে। আর একদিন দুদিনের জন্য নয়, সারা জীবন এইভাবেই করে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, ধ্যান ধারণা করে যদি তুমি জীবনমুক্তও হয়ে যাও, তখনও তোমাকে এগুলো করে যেতে হবে। তবে তখন এসব বিধি-নিষেধে আবদ্ধ থাকতে হবে না, কিন্তু অভ্যাস এমন হয়ে যাবে যে, অপরের মঙ্গলের জন্য, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি এগুলো করতে থাকবে।

বেদের সময় যে যজ্ঞাদি করা হত সেই যজ্ঞগুলো কিভাবে করা হবে তার জন্য ব্রাহ্মণরা পুস্তকাকারে ছোট ছোট নিয়মাবলী রাখতেন। সেগুলোকে বলা হত কল্প। এই কল্পেরই একটা অঙ্গ হয়ে গেল সংস্কার। সেখানে যেমন বিবাহের কথা আছে, তেমনি তৈত্তিরীয় উপনিষদে সমাবর্তন সমারোহের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা সমাপ্তের পর গুরু শিষ্যকে বলে দিচ্ছেন তুমি এবার বাড়ি যাচ্ছ, বাড়িতে বাবা-মার সেবা করবে, তাঁদের ভগবানের মত দেখবে, অতিথিকে ভগবান রূপে সেবা করবে আর স্বাধ্যায় প্রবচন থেকে কখন বিরত হবে না। এগুলো সব সংস্কারের মধ্যে আসছে। আমাদের সবারই মধ্যে যে একটা পাশবিক ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তি রয়েছে যে শক্তি কথায় কথায় আমাদের লাগামহীন বেপরোয়া পশুবৃত্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কখন এর নাম দিচ্ছে যুক্তিবাদী সমাজ, কখন নাম দিচ্ছে মুক্ত সমাজ। এদের না আছে কোন জীবনের আদর্শ, না আছে কোন প্রশিক্ষণ, না আছে কোন নিষ্ঠা। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে বড় বড় নাম দিয়ে তার আড়ালে ভেতরকার পশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতাকে সামনে নিয়ে আসছে। স্মৃতিকাররা এই জিনিষ কখনই হতে দেবেন না। তুমি জীবনকে ভোগ করবে এতে স্মৃতি কখন আপত্তি করছে না, কিন্তু ভোগ করতে গিয়ে তোমার গায়ে যে ময়লা জমছে সেটাকে পরিষ্কার করতে থাক। ময়লা পরিষ্কার করার জন্য এনারা বেদের চৌষটি সংস্কারকে ষোলটি সংস্কারে নামিয়ে দিলেন, যার নাম ষোড়শ সংস্কার। পরবর্তিকালে তন্ত্র কমিয়ে দশটি সংস্কারে নিয়ে এল।

আমাদের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদের যা কিছু চলে সব নিয়ন্ত্রণ করেন দেবতারা। এটা আগেকার দিনের ঋষিরাও মানতেন, ঠাকুরও মানতেন আর আমরাও এটাকে মানি। বৃষ্টি হচ্ছে, এর যে দেবতা ইন্দ্র এখনও সারা ভারত মানে। মৌসুমী আবহাওয়া যখন আসে একটা নিয়ম মেনেই তা আসে, ভগবানও যখন কিছু দেন একটা নিয়মকে অনুসরণ করেই দেন। প্রকৃতি ও ব্যক্তি জীবনের সমস্ত রকমের উত্থানের মধ্যে বিভিন্ন দেবতাদের কৃপা থাকে। যেমন বিদ্যার্জন, বিদ্যার দেবী হলেন সরস্বতী, যতক্ষণ সরস্বতীর কৃপা না হয় তত দিন সে কখন বিদ্যার্জন করতে পারবে না। এই সংস্কার কার্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই দেবতাদের প্রসন্ন করে তাঁদের কৃপাদৃষ্টি অর্জন করা। দেবতারা প্রসন্ন হলে কার্যটা সুসম্পন্ন ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হত। তার সাথে আমাদের আশেপাশে অশুভ শক্তিগুলিকে দমন করে সব দিক দিয়ে সুরক্ষা দিত। আমি যে কাজ করছি সেটা আমার নিজের তরফ থেকে চেষ্টা করতে পারি, পরিবারের তরফ থেকে চেষ্টা করতে পারি, সমাজের তরফ থেকে চেষ্টা করতে পারে, সব দিক দিয়েই ঠিক আছে কিন্তু তার সাথে যদি দেবতাদেরও আশীর্বাদ নিয়ে করা যায় তখন সেই কাজ সব সময় আমাকে সমস্ত রকমের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

জিম করবেটের একটা বইতে আছে, তিনি একটা নরখাদক বাঘকে শিকারের দায়িত্ব পেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছেন। মাল বহনের জন্য তাঁর সাথে দু তিনজন লোকও আছে। এরা সবাই জিম করবেটকে খুব ভালোবাসত। একটা নদী পার হওয়ার সময় সাথের লোকরা জিম করবেটকে বলল, স্যার আপনাকে এখানে আগে একটু অপেক্ষা করতে হবে, এই পাহাড়ে উপরে একটা মন্দির আছে, ওখানে আমরা আগে পূজো দেবো তারপর নদী পার হব। জিম করবেট তখন বর্ণনা করছেন, আমার লোকরা মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়া মানে আমাদের দু ঘন্টার মত সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া। কিন্তু যদি মন্দিরে পূজো দিয়ে এদের আত্মবল বেড়ে যায় সেটা এই দু ঘন্টা সময়ের থেকে অনেক মূল্যবান। ওদের এই আত্মবল বৃদ্ধির জন্য আমি এখানে দু-তিন ঘন্টা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারি। আমাদের হিন্দু ধর্মে কোথাও বলে না যে, তোমাকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে

না, পড়াশোন করার দরকার নেই, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর তাতেই তুমি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে যাবে। বরঞ্চ বলে, তুমি সব রকমের প্রস্তুতি নাও তার সাথে সাথে অশুভ শক্তি যাতে কোন বিষয় না করতে পারে তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। এতে মনের শক্তি বেড়ে যায়। সেইজন্য এখনও পরিবারে যদি কোন বিবাহ ঠিক হয় তখন তাদের কুলদেবতা থেকে শুরু করে পাড়ার যত দেবতা আছে সব দেবতাদের পূজো দেয়।

এই সংস্কার কার্য গুলো যখন করা হয় তখন দেবতাদের একদিক দিয়ে প্রসন্ন করে আশীর্বাদ নেওয়া হচ্ছে, এর সাথে সাথে দেবতারা আমাদের সাংসারিক সমৃদ্ধিও দেন। আমাদের এখনও বিশ্বাস যে কালীপূজার সময় যদি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালান হয় তখন লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন হয়ে সেই গৃহে প্রবেশ করেন। যাদের বাড়ি অন্ধকার থাকে সেই বাড়িতে নাকি লক্ষ্মীদেবী প্রবেশ করেন না। এটাও এক ধরনের সংস্কার। ঠিক তেমনি আমাদের শরীরকে যদি সংস্কার করা হয় তাহলে দেবতারা সাংসারিক সমৃদ্ধি দেন। সংস্কার কার্যের দ্বারা মানুষ সমাজে একটা প্রতিপত্তি ও সম্মানের স্থান পেত। এখনও গ্রাম দেশে যে বালকের উপনয়ন হয়ে যায় সে সবার কাছে খুব সম্মান পেতে থাকে। কোন মেয়ের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তার সম্মান বেড়ে যায়। অথচ বিয়ের আগে সেই মেয়েই যখন কোন ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় তখন তার সম্মানের বদলে বদনাম হয়। কিন্তু সেই ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আলাদা একটা সম্মান বাড়ে। এটা শুধু যে সামাজিক স্বীকৃতি তা নয়, নিজেরও সম্মান ও আত্মমর্যাদা বেড়ে যায়। এই সংস্কারের মাধ্যমে সম্মানের সাথে সাথে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক সুকৃতি তার মধ্যে এসে যায়, তার মানে আরও যেন আর্থ হওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। যজ্ঞ উপবীত হয়ে গেলে যেমন সে এবার বেদান্তের দিকে এগিয়ে গেল, এটা একটা সাংস্কৃতিক সুকৃতি তার লাভ হল। এমন কি বিবাহের দ্বারা দুটো পরিবারের মধ্যে মিলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক দিকে থেকে লাভবান হয়। কিছু কিছু আবর্জনা আমরা জন্মসূত্রেই নিয়ে আসছি, যেমন শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন তার মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক অপবিত্রতা থাকে। মা যতই সম্মানীয়া নারী হন না কেন, কিন্তু যে পদ্ধতিতে শিশু গর্ভে আসছে আর দশ মাস গর্ভে বাস করার পর গর্ভ থেকে নির্গমন হচ্ছে, সামগ্রিক ভাবে এর মধ্যে একটা অপবিত্রতার ভাব জড়িয়ে আছে। তারপর আমরা প্রতিদিন যে কাজই করি না কেন, তার মধ্যে কোন না কোন ভাবে নোংরা আবর্জনা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। সংস্কারের মাধ্যমে এই অপবিত্রতা ও আবর্জনা গুলো পরিস্কার হয়ে যায়। অঙ্গিরস নামে একজন বড় ঋষি ছিলেন, যাঁর নাম আমরা মুণ্ডকপনিষদে উল্লেখ পাই, তিনি এক জায়গায় বলছেন – একটি ছবি আঁকতে যেমন অনেক রঙের ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি একটা মানুষের জীবনকে বৈচিত্রে চিত্রময় করার জন্য বিভিন্ন সংস্কারের দরকার হয়। বিভিন্ন সংস্কার যেন বিভিন্ন রঙ, যার সাহায্যে একটা ব্যক্তিত্বকে চিত্রায়িত করে প্রস্ফুটিত করা হচ্ছে। গৌতম মুনি বলছেন, এই সংস্কারগুলো মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আসলে যতক্ষণ শুদ্ধিকরণ না করা হয় ততক্ষণ ধর্মসাধন বা আধ্যাত্মিক সাধন কোন কিছুই জীবনে শুরু করা যায় না। মূল কথা যদি একটি বাক্যে বলতে হয় তাহলে বলা যায়, এই সংস্কার কার্যগুলো ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা থাকলে মানুষ একটা শান্ত মর্যাদাময় জীবনে বিরাজ করে আর চারিদিকে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়। শান্ত ও শান্তি থাকলে তখনই জীবনকে ঠিক ঠিক আনন্দন করা যায়। আগেকার দিনের যাঁরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। ঠাকুর সহজ উপমা দিয়ে বলছেন – দেখো! গ্রামে কোন বিবাদ হলে বিশ ক্রোশ দূর থেকে রোগা প্যাটকা একটা বামুনকে পাক্কি করে মীমাংসা করার জন্য নিয়ে আসে, গ্রামের কত গোঁফওয়ালা বড় বড় লোক আছে তাদেরকে ডাকে না। ঠাকুরের বাবা ক্ষুদীরাম চট্টোপধ্যায় যখন স্নান করতে হালদার পুকুরে যেতেন তখন গ্রামের কোন মহিলারা পুকুরের ধারে কাছে যেত না। আগে খোঁজ নিয়ে জেনে নিত উনি স্নান করে চলে গেছেন কিনা। এই ব্যক্তিত্ব তখনই আসে যখন এই সংস্কারগুলো করা হয়। মনুস্মৃতিতে যে যোলটা সংস্কারের কথা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করছি।

স্মৃতিশাস্ত্রের যোলটি সংস্কার

প্রথম সংস্কার হল **গর্ভাধান**। মনু পরের দিকে বলবেন, যেটা স্বামীজীও বলছেন – ঈশ্বরের প্রার্থনা না করে যে শিশুকে জগতে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই শিশুটি সমাজের পক্ষে একটি অভিশাপ। আমাদের কাছে

এখন যে স্মৃতিশাস্ত্রগুলো এসেছে সেগুলো এমনিতেই কত প্রাচীন, পণ্ডিতরা বলছেন প্রায় আড়াই হাজার বছর পুরনো। তার মানে এই সংস্কারগুলো যিশু খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হুশ বছর আগে থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছিল। জুলিয়াস সিজার ফ্রান্সের লোকদের বলত বারবেরিয়ান্স, বর্বর জাতি। তারও পাঁচশ বছর আগে এই বিধি গুলো রীতিমত ভারতে অনুশীলন করা হচ্ছিল। গর্ভাধান সংস্কার হল, যখন স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করতেন আমাদের এবার একটি সন্তান হোক তখন স্বামী-স্ত্রীদের একটা বিশেষ পূজা করতে হত। ওই বিশেষ পূজোর পরেই স্বামী-স্ত্রী দুজনের মিলিত হওয়ার নিয়ম ছিল। গর্ভাধান পূজার যে মন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হয় তার মূল অর্থ হল – দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, আমাদের যেন একটি পুত্র সন্তান হোক, পুত্র যেন তেজস্বী হয় এবং বংশের সম্মান ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে পারে।

দ্বিতীয় সংস্কার হল **পুংসবন**। তখনকার দিনে স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের সবারই দুশ্চিন্তা ছিল, গর্ভ তো হয়ে গেল কিন্তু গর্ভটা ঠিক ঠিক সুরক্ষিত থাকবে তো! গর্ভের সুরক্ষার জন্য গর্ভের তৃতীয় কি চতুর্থ মাসে বিশেষ পূজা দেওয়া হত। এখনও দেখা যায় যদিও গর্ভ হয়ে যায় কিন্তু বেশীর ভাগ গর্ভই নষ্ট হয়ে যায়। ডাক্তাররা অনেক ওষুধপত্র দিয়ে গর্ভকে রক্ষার করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়। কেন নষ্ট হয়ে যায় ডাক্তারদের কাছেও কোন সদুত্তর নেই, এটা একটা রহস্য। আগেকার দিনে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। বিশেষ করে শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিটাও অত্যন্ত কম ছিল। এটা অবশ্য দেখা যায় যে কোন উচ্চ সাংস্কৃতিক জাতির লক্ষণ হল তাদের জনসংখ্যার হার খুব কম থাকে। সেইজন্য বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী যারাই খুব উচ্চমানের সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন, দেখা যায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই এদের জন্ম হারটা কমে যায়। এক আধটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ জন্মের হারটা কমে যায়। আমেরিকা, ইউরোপ একটা বিশেষ দিকে খুব উচ্চমানের সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন হয়ে যাওয়াতে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক নেমে গেছে। ব্রাহ্মণরা তাই আশীর্বাদ করত তোমার পরিবার যেন দুধে স্নান করে আর প্রচুর সন্তান হয়। কারণ ব্রাহ্মণদের সন্তান তখন হতই না, খুব উচ্চ সংস্কৃতির ধারক ছিল কিনা। ফলে ব্রাহ্মণদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা ছিল। সেইজন্য প্রথমে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত আমাদের যেন সন্তান হয়। দিনের পর দিন পুরুষ নারী সম্পর্ক হয়ে যাবে এই জিনিষকে এনারা বরদাস্ত করতেন না। মহাভারতের সময় এগুলো সমস্যা হয়ে যেতে, বিশেষ করে যারা আবার ঋষিদের বিয়ে করত। ঋষিদের বছরে বেশীর ভাগ দিনেই এই ব্রত সেই যজ্ঞতে কেটে যেতে, ওই সময় নিজের স্ত্রীর ধারে কাছেই যেতেন না। স্ত্রীর কাছে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য – গর্ভাধান। গর্ভাধান যখন করবে, তার আগে রীতিমত পূজো উপাচার করে তারপর।

পাণ্ডুর উপর যে অভিশাপ ছিল তার পেছনে মূল কারণ ছিল, একজন ঋষি ও তাঁর স্ত্রী দুজনের মধ্যে কামভাব উদয় হল, আমাদের মিলন হোক। কিন্তু ঋষি ও তাঁর পত্নি দেখলেন আমরা তো ঋষি আমাদের কি করে মিলন হবে! ওনারা তখন হরিণের শরীর ধারণ করে নিলেন, ঋষির তাপস বেশ যেন কলঙ্কিত না হয়। পাণ্ডু তখন শিকার করছিল, দেখছে দুটো হরিণ সঙ্গম করছে তাও তীর চালিয়ে দিয়েছে। তখন তাঁরা আতর্নাদ করতে করতে মানুষ রূপ ধারণ করে নিলেন। ঋষি ও তাঁর পত্নি পাণ্ডুকে তখন বলছেন – তুমি রাজা, রাজা হয়ে তোমার এটুকু জানা নেই মৈথুন রত কোন প্রাণীকে বধ করতে নেই! মৈথুন করার সময় শিকারীর তীরে পুরুষ ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে মেয়ে ক্রৌঞ্চের করুণ আতর্নাদে বাল্মীকিও মনে তীর যন্ত্রনা অনুভব করেছিলেন। মিথুনের সময় প্রাণীবধ নিষেধ। কারণ সেই সময় তার মন এত বেশী শরীরের উপরে লেগে আছে যে তাকে বাঁচার জন্য কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। যাকেই মারা হবে বিশেষ করে যখন শিকার করা হয় তখন তাকে বাঁচার একটা সুযোগ দিতে হয়।

জিম করবেট এক জায়গায় বলছেন, তখন তিনি নেহাতই বাচ্চা, একদিন খেতে গিয়ে দেখেন ভালো কিছু খাওয়ার নেই। বাড়িতে থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন গাছে একটা সুন্দর পাখি বসে আছে। তখন জিম করবেট ভাবল আর কোথায় ঘুরে বেড়াব এটাকেই মেরে নিয়ে যাই, বলেই বন্ধুকটা

নিয়ে গুলি করে পাখিটাকে মেরে দিয়েছে। পরে তিনি খুব দুঃখ করে লিখছেন – আজ পর্যন্ত আমি সেই আত্মগ্লানি থেকে বেরোতে পারিনি, একটা বসে থাকা পাখিকে মেরেছি, পাখিটাকে বাঁচার সুযোগ আমি দিলাম না। বাঁচার সুযোগ সবাইকে দিতে হবে, যার জন্য তারা উড়ন্ত পাখিকে মারত। আমার খাদ্যের জন্য একটা পাখিকে মারছি, এটা একটা পাপকর্ম। কিন্তু মৈথুন রত কোন প্রাণী তখন অসহায় অবস্থায় থাকে, কোন দিকে তার মন নেই। ঋষিরা তাই মনকে উঁচু থেকে নীচে নামাতেন না বলে তাঁদের সন্তানও কম হত। যদিও কখন সখন হয়ে যেত সেটা আবার ঋষির বেশে হবে না, অন্য কোন পশুর শরীর ধারণ করে নিতেন। এবার যে গর্ভ হল একে রক্ষা করার জন্য সবাইকে পুংসবন সংস্কার পালন করতে হত।

তৃতীয় সংস্কার হল **সীমন্তোন্নয়ন**। পুংসবন করা হয় প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যে আর সীমন্তোন্নয়ন পরের পাঁচ মাস থেকে আট মাসের মধ্যে করা হত। এরও প্রধান উদ্দেশ্য হল দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা এই গর্ভ যেন সুরক্ষিত হয় এবং জাতক যেন প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ও খুব বড় মেধাবী হয়। তার সাথে প্রার্থনা করা হয় জাতককে যেন চাঁদের মত সুন্দর দেখতে হয়। এখন আর পুংসবন আর সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কোথাও পালন করা হয় কিনা জানা নেই, বলতে গেলে উঠেই গেছে।

চতুর্থ সংস্কার হল **জাতকর্ম**। জাতকর্ম এখনও অনেকেই পালন করে। নাড়ি ছেদনের আগে, অর্থাৎ বাচ্চার সবে মাত্র জন্ম হয়েছে তখন বাবা গিয়ে প্রথম শিশুর মুখ দর্শন করবে। বাবা যখনই সন্তানের মুখ দেখে নিল, এনাদের একটা ধারণা ছিল যে, সেই মুহূর্তে সে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। মহাভারতে এই পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপর খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে। অগস্ত্য মুনি খুব তেজস্বী মুনি ছিলেন। তিনি বিয়েথা না করে তপস্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদিন যেতে যেতে দেখেন গাছের ডালে অনেক ঋষি উল্টো হয়ে ঝুলে আছেন, আর তার নীচে বিরাট গহ্বর। অগস্ত্য মুনি খুব আশ্চর্য হয়ে ঋষিদের জিজ্ঞেস করলেন ‘আপনার কারা, আর কেনই বা এমন ভাবে উল্টো হয়ে ঝুলে আছেন’। ঋষিরা বললেন ‘আরে! আমরা হলাম তোমার পূর্বজরা। তুমি তো বিয়েথা করলে না, তাই তোমার সন্তানও হবে না। আমাদের তাই এই নরকে পতন হতে যাচ্ছে’। ‘তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলুন’। ‘তুমি যত তাড়াতাড়ি পার বিয়ে করে সন্তানের মুখ দেখে নাও’। অগস্ত্য মুনি দেখলেন মহা মুশকিল হয়ে গেল, আমাকে এখন অনেক ঝামেলায় পড়তে হল। তারপর তিনি লোপমুদ্রা বলে এক রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। প্রথমে রাজা তো কিছুতেই অগস্ত্য মুনির হাতে মেয়েকে সমর্পণ করতে চাইছিলেন না। একেই তো কাঙালী, আগেকার দিনে ঋষিরাতো কাঙালীই হতেন। তারপর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন, কোন খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই। রাজার মেয়েকে কি করে এই লোকের হাতে দেওয়া যায়! রাজা তখন আবার একটা কায়দা করলেন, ঋষিকেই বললেন – আপনি যদি এত পরিমাণ অর্থ নিয়ে আসতে পারেন তাহলে এই বিয়ে হতে পারবে। অগস্ত্য মুনি এখন বেরিয়ে পড়লেন। উনি এবার আরেক রাজার কাছে কিছু অর্থ ভিক্ষা করতে গেছেন। ঋষি কিনা তাই বললেন, আমার জন্য আপনি কোন অযথা খরচ করতে যাবেন না, আপনার রাজকোষে যদি অতিরিক্ত অর্থ থাকে তবেই আমাকে দেবেন, অন্য খাতের টাকা থেকে আমাকে কিছু দেবেন না। রাজা তখন তাঁর Accountantকে ডেকে পাঠিয়ে হিসাব দেখাতে বললেন। হিসাবে দেখা গেল রাজ্যে যত আয় ঠিক ততটাই ব্যয়, সুতরাং কোন উদ্ধৃত নেই। সেখানে তিনি একটি পয়সাও পেলেন না। মহাভারতে এই নিয়ে বিরাট লম্বা কাহিনী। যাই হোক কোন ভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তিনি লোপমুদ্রাকে বিয়ে করলেন, সেখান থেকে তাঁদের সন্তান হল। এই জাতকর্মে পিতা সন্তানের মুখ দর্শন করার সময় সন্তানের একটা গুণ্ড নাম দেওয়া হত। আমাদের দেশের লোকেরা বরাবরই বড্ড বেশী হিংসুটে স্বভাবের ছিল। নব জাতকের উপর কেউ যাতে কোন টোটকা-টটকি না করতে পারে সেইজন্য সন্তানের একটা গুণ্ড নাম দিয়ে দেওয়া হত, যে নামটা একমাত্র বাবা আর মা ছাড়া কেউ জানতে পারত না।

পঞ্চম সংস্কার হল **নামকরণ**। এই সংস্কার থেকেই সন্তান সবার সামনে আসতে পারত। জাতকের দশম কিংবা দ্বাদশ দিনে নামকরণ সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ছয় দিনে অর্থাৎ ষষ্টি ব্রত করে নামকরণ করা হয়। আগে দশ বা বারো দিনে করা হত। তবে এই সংস্কারে খুব বড় করে কোন অনুষ্ঠান হত না। তখনকার দিনে

নাম রাখার আবার সব নিয়ম ছিল, ছেলেদের কি নাম হবে, মেয়ে হলে কি নাম রাখা হবে। যেমন মেয়েদের নাম দীর্ঘকার বর্ণ দিয়ে শেষ হতে হবে। প্রথমে তাঁরা পছন্দ করতেন নাম যেন দুটি বর্ণের হয়, যেমন সীতা। ছেলেদের যদি দুটি বর্ণে নাম হয় তাহলে নাকি তাদের জাগতিক ব্যাপারে খুব উন্নতি হবে আর চারটি বর্ণের থাকলে তার ধার্মিকতার ক্ষেত্রে খুব সুনাম হল – যেমন ঠাকুরের নাম ছিল গদাধর। এনাদের আবার ছেলে আর মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে নাম রাখার এক বিরাট ফিরিস্তি ছিল, ছেলেদের এই ধরনের নাম রাখা যাবে না, মেয়েদের এই এই নাম রাখা যাবে না ইত্যাদি। এই ধরনের নাম যদি রাখা হয় তাহলে এই এই সমস্যা হবে। পুরান সাহিত্যের প্রসার হয়ে যাওয়ার পর স্মৃতিশাস্ত্রের নামকরণের এই প্রথাটা পাল্টে গেল। পুরানের সময় থেকে যত দেবী ও দেবতার নাম ছিল তাদের নামে নাম রাখা শুরু হয়ে গেল, যাতে মৃত্যুর সময় তার ইষ্টের নাম উচ্চারণ করতে পারে।

ষষ্ঠ সংস্করণের নাম **নিষ্কমণ**। এই দিন একটা সামান্য পূজা উপাচার করে শিশুকে প্রথম আতুর ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। শুশ্রূত ও চরক সংহিতাতে বলাই আছে কত দিনে বাচ্চাকে সূর্যের আলোতে, বাইরের বাতাসে নিয়ে আসা উচিত। এগুলো করা হত যাতে বাচ্চার কোন সংক্রামক ব্যাধি না হয়।

এরপর **অন্নপ্রাশন** হল সপ্তম সংস্কার। ইদানিং কালে আগের সংস্কারগুলো আর কেউ বেশী পালন করে না, অন্নপ্রাশনটাই মুখ্য অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। মোটামুটি ছয় মাস বয়স হয়ে গেলে শিশুর অন্নপ্রাশন করা হয়। এই দিন প্রথম শিশুকে সামান্য অন্ন মুখে দেওয়া হয়। ডাক্তারি শাস্ত্রেও আজকাল বলা হয় ছয় মাস থেকে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ার পরিমাণটা কমাতে শুরু করতে হয়। ছয় মাস পর্যন্ত শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য শ্রেষ্ঠ এবং এটাই বাধ্যতামূলক ছিল। ছয় মাস থেকে শিশুকে মাতৃস্তন্যের বাইরে একটু একটু করে অন্য জিনিষ খাওয়ান শুরু করতে বলা হয়।

অষ্টম সংস্কার হল **চূড়াকরণ**। চূড়াকরণ হল শিশুর প্রথম ক্ষৌরকর্ম। বলা হয় যে, মায়ের গর্ভে থাকার জন্য মাথার চুলগুলো অশুদ্ধ, এই চূড়াকরণে সেই অশুদ্ধ চুলকে কামিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন রকমের মত আছে কত দিন পরে চুলটাকে ফেলে দিতে হবে। অনেকে দুই বছর পর, কেউ আবার আঠারো মাসের পর ফেলে দেয়।

নবম সংস্কার **কর্ণভেদ**। কর্ণভেদে কান ফুটো করা হয়। সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে কর্ণভেদ করা হয়। অনেকে আবার উপনয়নের সময়তেই কর্ণভেদ করাতেন। তখনকার দিনে কর্ণভেদ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল। এখন অবশ্য এই সংস্কারটা উঠে গেছে, শুধু মেয়েদেরকেই করা হয়। আগেকার দিনে ছেলেদেরও কর্ণভেদ করাটা বাধ্যতামূলক ছিল।

দশম সংস্কার **উপনয়ন ও বেদারম্ভ**। এক সঙ্গেই দুটো করা হত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে আট বছর বয়সে উপনয়ন দেওয়া হত। ক্ষত্রিয়দের এগারো বছর বয়সে আর বৈশ্যদের বারো বছর বয়সে উপনয়ন হত। বেদ পাঠের জন্য গুরুগৃহে তিনটে জাতিই যেতে পারত, যার জন্য এদের দ্বিজ বলা হত। শূদ্রদের উপনয়ন আর বেদারম্ভ হত না। বলা হচ্ছে কাউকে যে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে দেওয়া হল সেটা হয়ে গেলে তার দ্বিতীয় জন্ম। সেইজন্য বলা হয় দ্বিজ। যখন উপনয়ন করে যজ্ঞ উপবীত ধারণ করে নিল তখন গুরু তাঁর বাবা হয়ে গেলেন আর গায়ত্রী হয়ে গেল তার মা। সাধারণতঃ যজ্ঞ উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্র পেয়ে গেলে সে বেদ অধ্যয়নের অধিকার অর্জন করে নিত। বেশীর ভাব ব্রাহ্মণ সন্তানের যজ্ঞ উপবীত হয়ে গেলে তারা গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করতে চলে যেত।

একাদশ সংস্কার হল **সমাবর্তন**। সমাবর্তন হওয়া মানে তার ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষ। সমাবর্তনের মন্ত্রগুলো তৈত্তিরীয় উপনিষদেই আছে, *বেদমনূচ্যচার্যোহন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর।* তোমার বেদ অধ্যয়ন শেষ হয়ে গেছে, এবার তুমি তোমার বাকি জীবনটা কিভাবে কাটাবে তারই একটা নির্দেশিকা এই সমাবর্তন সংস্কারে বলে দেওয়া হচ্ছে। এবারে তোমাকে গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

দ্বাদশ সংস্কার **বিবাহ**। সমাবর্তনের পর গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর হত বিবাহ। বিবাহ সংস্কার পুরোপুরি উপাচার ভিত্তিক সংস্কার, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে পুরুষ আর নারী পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে পবিত্র ভাবে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করার অঙ্গীকার করত। বিবাহ সংস্কারকে অনেকে পাণিগ্রহণ বলেন। কিন্তু স্মৃতিকাররা বিবাহকে পাণিগ্রহণ বলতেন না, এই শব্দটি পরের দিকে এসেছে।

এরপর ত্রয়োদশ সংস্কারে বলছেন **গৃহস্থশ্রম ধর্ম**। গৃহস্থশ্রম ধর্মের আলাদা করে কোন উপাচারের কথা বর্ণনা করা নেই। বিবাহ করা মানেই এবার সে গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করল। তাই দুটোকে আলাদা সংস্কার রূপে কেন বলছেন ঠিক বোঝা যায় না। এমনও হতে পারে, আগেকার দিনে বিবাহ খুব কম বয়সে হত। যেমন আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, ঠাকুরের যখন বিবাহ হচ্ছে তখন ঠাকুরের বয়স তেইশ বছর আর শ্রীশ্রীমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর নাবালিকা কন্যা তার বাপের বাড়িতেই থাকত। তাই বিবাহ হয়ে গেলেই সে গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করেছে না। গৃহস্থশ্রম ঠিক ঠিক শুরু হত দ্বিরাগমনের পর। কন্যা সাবালিকা হয়ে যাওয়ার পর সে শ্বশুর বাড়িতে আসত। এই দ্বিরাগমনও পুরোপুরি বিবাহের মতই আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করা হত। আগেকার দিনে বিবাহটা ছিল সাগাইয়ের মত, আর দ্বিরাগমনটা ছিল বিবাহের মত। পরের দিকে বিবাহ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বেড়ে গেল আর দ্বিরাগমন অনুষ্ঠানের গুরুত্বটা কমে গেল।

চতুর্দশ সংস্কার **বাণপ্রস্থ**। তার ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে, মেয়েদের বিবাহ হয়ে গেছে, ছেলেরাও স্বাবলম্বী হয়ে গেছে। এবার সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবে আমি এখন সংসার থেকে আলাদা হয়ে নির্জন স্থানে বাস করে শুধু ঈশ্বর চিন্তন করব, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে কিনা। যদি স্ত্রী রাজী হয়ে যায় তখন দুজনে মিলে জঙ্গলে নির্জনে ঈশ্বর চিন্তন করতে চলে যাবে। আর স্ত্রী যদি না রাজী হয় তাহলে স্ত্রীর নিজস্ব খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে কোন ভাবেই তাকে ছেলে-মেয়েদের উপর নির্ভর থাকতে না হয়। ছেলে নিজে থেকে দেখলো কি দেখলো না সে দিকে ভাবতে যাবে না, স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অনেকে যে বলে আমাদের দেশে নারীদের সম্মান ও জীবন রক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না, এগুলো সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। নারীদের অত্যন্ত সম্মান করা হত আর এখানে বলছেন তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার পরই স্বামী বাণপ্রস্থে যেতে পারত।

পঞ্চদশ সংস্কার **সন্ন্যাস**। সন্ন্যাস হল, বাণপ্রস্থকেও অতিক্রম করে সে এবার ব্রহ্ম চিন্তন ছাড়া আর কোন কিছু করবে না। বাণপ্রস্থ হল মানসিক ভাবে উপাসনা করার জীবন আর সন্ন্যাস হল শুধু ধ্যানের তাও একমাত্র ব্রহ্মের চিন্তন ছাড়া আর কোন কিছু করবে না। ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন দিকে সন্ন্যাসীর মন থাকবে না। কোন দেবী বা দেবতাকে মানা, কোন উপাচার, আচার কিছু মানবে না, সমাজের কোন ধরনের বন্ধনের মধ্যে আর সন্ন্যাসী জড়াবে না। যার জন্য গুরুত্ব আশ্রমে সমাবর্তন সমারোহের পর যারা সন্ন্যাস নিয়ে নিত তারা এই তিনটে সংস্কার বিবাহ, গৃহস্থশ্রম ও বাণপ্রস্থ থেকে মুক্ত হয়ে যেত। ব্রহ্মচারী থেকে সোজা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস হয়ে যাওয়া মানে সব সংস্কার থেকে সে মুক্ত হয়ে গেল।

শেষ ষোড়শ সংস্কার হল **অন্ত্যেষ্টি সংস্কার**। মৃত্যুর পর দেহকে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেওয়াটাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে দেহকে কবর দিয়ে দেওয়া বা জলে ফেলে দেওয়ার অনুমতি কখনই ছিল না। এমনকি অনেক দুর্গম রক্ষ পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে জ্বালানী কাঠের অভাব সেখানেও সামান্য কাঠ কয়লা সংগ্রহ করে মুখে আগুন সংযোগ করে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হত। অন্ত্যেষ্টির পর সংস্কার বলে আর কিছু থাকে না। শরীরই নেই আর সংস্কার কি করে হবে! কিন্তু কিছু কর্ম থেকে যায় যেমন শ্রাদ্ধাদি কর্ম। শ্রাদ্ধ কর্ম পুরো আলাদা ব্যাপার হয়ে গেল। কিন্তু গর্ভে আসার আগে থেকে এবং যে মুহূর্তে গর্ভে প্রবেশ করল সেখান থেকে শুরু করে এই সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত একটি মানুষের সমগ্র জীবনকে স্মৃতিকাররা এই ষোলটি সংস্কারে বেঁধে দিলেন। পরের দিকে তন্ত্রের এনারা এই ষোলটি সংস্কারকে কমিয়ে দশে নিয়ে এসেছেন। সংস্কার মূলতঃ শরীরকে কেন্দ্র করে চলে। যেমন বাড়ির সংস্কার করা হয় ঠিক তেমনি এই শরীরেরও সংস্কার

করা হয়। মৃত্যুর পর শরীরটাই পুড়ে ছাই করে দেওয়া হয়ে গেল, তাই আর সংস্কারও কিছু বাকী থাকে না। এই ষোলটি সংস্কারের দ্বারা শরীরকে শুদ্ধ পবিত্র রাখা হয়।

দ্বিতীয়োহধ্যায়

মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায় ছিল সংসারোৎপত্তি বিষয়ক। দ্বিতীয় অধ্যায় সংস্কারকে নিয়ে, এই অধ্যায়ে শুধু বিভিন্ন রকমের সংস্কারের দ্বারা কিভাবে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র রাখা হবে তার বর্ণনা করে গেছেন। এই ষোলটি সংস্কার আমরা সংক্ষেপে বলে দিলাম। কিন্তু এগুলোকে কি ভাবে করা হবে সেটাকেই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বলবেন। প্রথমে দিকেই মনু বলছেন –

তেষু সম্যগ্বর্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।

যথাসঙ্কল্পিতংশ্চেহ সর্বান্ কামান্ সমশ্রুতে।।২/৫

মনু বলছেন যদি কেউ এই শাস্ত্রোক্ত কর্মগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করেন তিনি অমরলোক প্রাপ্ত হন আর ইহ জগতেও সঙ্কল্প অনুযায়ী সমস্ত কাম্য বিষয়ের উপভোগও সমর্থ হন। অমরলোককে ভাষ্যকাররা যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন তাতে তাঁরা বোঝাতে চাইছেন যে তাঁরা মুক্তি পেয়ে যান। আবার অনেক ভাষ্যকারদের মতে অমরলোক মানে উচ্চতম স্বর্গ। অর্থাৎ মূল কথা হল যারা এই সংস্কারগুলো ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করেন মৃত্যুর পর তাঁদের সাধারণ গতি না হয়ে উচ্চতম গতি হবে। আর জীবিত অবস্থায় এই সংসারে থাকাকালীন তাঁর যা যা ইচ্ছা সবটাই পূরণ হয়ে যাবে। অন্য কোন বাধার জন্য তাঁর কোন কিছুর প্রাপ্তি যদি না হয় সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু দৈবী বাধা বলে আর কিছু থাকবে না।

বেদকে কেন শ্রুতি বলা হয়

আমরা প্রথম থেকেই শুনে আসছি বেদকে শ্রুতি আর বাকি সব শাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতি। এটা মনুই বলে দিয়ে গেছেন। দশ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

শ্রুতিস্ত বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্ত বৈ স্মৃতিঃ।

তে সর্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ।।২/১০

বেদকে কেন শ্রুতি বলা হয় এই ব্যাপারে আমরা অনেক রকম ব্যাখ্যা পাই। যেমন অনেকে বলছেন গুরুমুখী বিদ্যা, অর্থাৎ গুরুর কাছে শুনে শুনে এই বিদ্যা অধ্যয়ন করা হত বলে বেদকে শ্রুতি বলা হয়। এগুলো কোন ভুল নয়, কিন্তু আসল সংজ্ঞা মনুই প্রথম দিয়েছেন – বেদ বলতে শ্রুতি বোঝায় আর যে কোন ধর্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি। মনুই যে এই সংজ্ঞা প্রথম দিচ্ছেন তা নয়, আগেই ঋষিরা বলে দিয়েছিলেন যে বেদ মানে শ্রুতি আর ধর্মশাস্ত্র মানে স্মৃতি, মনু এখানে ঋষিদের এই বাক্যকে প্রথম লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত কি শ্রুতি না স্মৃতি? আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বেদ কিন্তু পরম্পরাতে বেদ বলে গ্রহণ করবে না। এমনকি গীতাও শ্রুতি নয়, গীতাও স্মৃতি। চারটে বেদই একমাত্র শ্রুতি।

তে সর্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ, এখানে বলছেন শ্রুতি ও স্মৃতির কোন কথাকে বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাবে না। এখানে যদিও বলছেন সর্বার্থেষু, মানে যে কোন ব্যাপারে, তবে ভাষ্যকার বলছেন যে জিনিষগুলোকে আমি আমার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে জানতে পারি বা অন্যান্য ভাবে জানতে পারি সেগুলো জানার জন্য আমার বেদ বা ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হবে না। যে জিনিষগুলো আমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে জানতে পারছি না সেগুলো জানার জন্যই বেদ ও ধর্মশাস্ত্র। যদি এই অর্থে সর্বার্থেষু নেওয়া হয় তাহলে ঠিকই আছে। কিন্তু মূল বক্তব্য হল বেদ ও ধর্মশাস্ত্রকে কোন অবস্থাতেই প্রশ্ন করা যাবে না। যদি তোমার মনে প্রশ্ন ওঠে – ওটা কেন, এটা কেন, তাহলে তুমি এখনও বেদ বা ধর্মশাস্ত্র পাঠের অধিকারী হওনি। ঠাকুর স্বামীজীকে বলছেন – আমার কথা যদি নাই মানিস তাহলে এখানে আসিস কেন? স্বামীজীও বলছেন – এখানে

এলে সব কথাই মানতে হবে নাকি! কিন্তু স্বামীজীরা হলেন উচ্চ আধার। যাঁরা উচ্চ আধারের তাঁদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে। ঠাকুর নিজেও তোতাপুরিকে কত প্রশ্ন করছেন। সাধারণ আধারের যারা তাদের প্রশ্ন করার কোন পাত্রতাই নেই। এই বলা আছে এটাই তুমি করে যাও, এর বাইরে আর কোন কথা নেই। তুমি যদি বল, আমি এটা মানতে পারছি না। তাহলে শাস্ত্র তোমার জন্য নয়, তুমি আসতে পার। স্বামীজীকেও আমেরিকাতে অনেকে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিল। স্বামীজী বক্তৃতা দেওয়ার পর একজন এসে বলছে – আপনি যা বললেন আমি সব কথা মানতে পারছি না। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন – তাহলে এটা আপনার জন্য নয়, আপনি এখন আসতে পারেন। এনারা তাই প্রথমেই পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন – কোন অবস্থাতেই শ্রুতি আর স্মৃতিকে প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ কি? খুব সুন্দর কথা বলছেন – ধর্মো হি নির্বভৌ। ধর্মের উৎপত্তিই শ্রুতি আর স্মৃতি থেকে হয়েছে। শ্রুতি আর স্মৃতিকে মিলিয়েই ধর্মের জন্ম। তুমি যদি এগুলোকে প্রশ্ন কর তাহলে সব কিছুতেই প্রশ্ন উঠে আসবে। তুমি যদি নিজের অস্তিত্বকে প্রশ্ন কর, আমি আছি কিনা, তাহলে তো জগতে কোন কিছুই আর দাঁড়বে না। কোথাও একটা জায়গায় গিয়ে তো তোমাকে দাঁড়তে হবে। একে বলায় হয় অনবস্থাদোষ। একটা জিনিষ আরেকটি জিনিষের উপর আশ্রিত। সেই জিনিষটা আরেকটা জিনিষের উপর আশ্রিত। সেটা আবার আরেকটার উপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু শেষে একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে, কোথাও না দাঁড়ালে তা অনবস্থা দোষ হয়ে যাবে। সেইজন্য বলে একটা জায়গায় গিয়ে থামতে হয়। বহির্জগতের ক্ষেত্রে থামছে ঈশ্বরে গিয়ে, তার মানে সব কিছুর আশ্রয় ঈশ্বর। আর ব্যক্তি ক্ষেত্রে থামছে আত্মার উপর, সব কিছুর আশ্রয় আত্মা। ঠিক তেমনি ধর্মের ব্যাপারে থামে শ্রুতি স্মৃতিতে গিয়ে। তাই শ্রুতি ও স্মৃতিকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। যেমন আমরা আত্মাকে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারিনা, ঈশ্বরকে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারিনা তেমনি ধর্মশাস্ত্রকে নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না, কারণ ধর্মশাস্ত্র এক অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিচ্ছে। যারা প্রশ্ন করবে তাদের জন্য ধর্মশাস্ত্র, আত্মা, ঈশ্বর কোন কিছুই নয়।

সদাচারের সংজ্ঞা

এরপর সদাচারের সম্বন্ধে বলছেন। সদাচার নিয়ে বিরাট বিস্তৃত আলোচনা, আমাদের পক্ষে এখানে সম্ভব নয় সব কিছুকে নিয়ে আলোচনা করা। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যে স্মৃতিকারদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল আর তাঁরা সমস্ত কিছুকে কিভাবে দেখছেন। ধর্মের লক্ষণ কি?

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাপ্তঃ সাক্ষাদ্ ধর্মস্য লক্ষণম্॥২/১২

ধর্মের চারটি লক্ষণ – ১) বেদ, ২) স্মৃতি, ৩) আচার এবং ৪) মনঃপ্রসাদ, মনের প্রসন্নতা। এই চারটির মধ্যে কোন একটা থাকলেই সেখানে ধর্ম হবে। বেদ যদি বলে থাকে তাহলে সেটা ধর্ম। স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র যদি বলে থাকে তাহলে সেটাও ধর্ম। আচার, সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষরা যে আচরণগুলো পালন করছেন, মহাজনো যেন গতঃ স পত্নাঃ, তখন সেটাই ধর্ম। দ্রৌপদীর বিবাহের সময় যুধিষ্ঠির ঠিক এই যুক্তিটাই গ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ ভাই একসাথে দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে পারবে কিনা এর কোন সমর্থন বেদ ও স্মৃতিতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু যুধিষ্ঠির নিয়ে এলেন এই যুক্তি – মহাজনরা যদি পালন করে থাকেন তাহলে সেটাও ধর্ম। এর আগে প্রচেতারা সাতজন মিলে একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। শেষে বলছেন মনের প্রসন্নতা, প্রিয়মাত্মনঃ। ঠাকুর বলছেন, ভুল কাজ করলে মনটা খুঁতখুঁত করে। কিন্তু চোর চুরি করতে পারলে তারও মনে তো প্রসন্নতা আসে। নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবে! কেন হবে না? কারণ এর নামই হল চৌর্যধর্ম। চোর ডাকাতরা তাদের চুরি ডাকাতিটাকেই ধর্ম তৈরী করে নিয়েছে। সেইজন্য তাদের কাছে চুরিডাকাতিতে সাফল্য হলে প্রসন্নতা হবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন পুলিশের হাতে ধরা পরে জেল খাটবে, মার খাবে তখন কি তার মনটা প্রসন্ন হবে? যদি প্রসন্ন না হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে অন্যায় করেছে, অধর্ম করেছে, এই কাজগুলো তাহলে করা যাবে না। যদি কোন মুসলমান তার কোন হিন্দু বন্ধুকে আপ্যায়ন করে বলে, ভাই তোমার জন্য গরুর মাংসের খুব দারুন প্রিপারেশন নিয়ে এসেছি, একটু খেয়ে দেখ। বন্ধু গরুর মাংস খেতে আপত্তি জানাতে মুসলমান

বন্ধুটি বলছে – সে কি! তুমি গরুর মাংস খাও না! কি দারুণ টেস্ট! একবার খেয়ে দেখই না। বেদে কোথাও লেখা নেই যে গরুর মাংস খাওয়া যাবে না। স্মৃতিতে অবশ্য পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে গরুর মাংস খাওয়া যাবে না, তখন আর গরুর মাংস কোন ভাবেই খাওয়া উচিত হবে না। আর যদি স্মৃতিতেও যদি না থাকে তাহলে খাওয়ার আগে যদি মনটা খুঁতখুঁত করে তাহলে কোন মতেই আর গরুর মাংস খাওয়া যাবে না। বেদে যদি পরিষ্কার করে হ্যাঁ কিংবা না বলে দেওয়া থাকে, স্মৃতিতে যদি পরিষ্কার বলে দেওয়া থাকে, এরপর আসছে বড়রা এগুলো পালন করছেন কি করছেন না। এবার এমন একটা পরিস্থিতি এসে গেল, যেমন একজন সন্ধ্যাসী কম্পিউটার চালাবে কি চালাবে না, তখন সেখানে বেদ, স্মৃতি ও আচার থেকে কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। তখন কি হবে? তখন দেখতে হবে সন্ধ্যাসীর মন কি বলছে। যদি কম্পিউটার চালিয়ে মন প্রসন্ন হয় তাহলে চালাও। এইভাবে ধর্মের বিচার করা হয়।

মুসলমানদের কাছে এটাই আবার সমস্যা, ওরা কোরান আর হাদিসের বাইরে যাবে না। মহম্মদ যেটা আল্লার কাছে শুনেছেন আর মহম্মদ নিজে যে আচরণ করেছেন – এর বাইরে মুসলমানদের আর কোন আচার নেই। মহম্মদকে পরে সবাই বলছে – এর পরে তো আমরা বিভিন্ন দেশে যাব তখন তো আপনি থাকবেন না, আর সব কথাও আপনি বলে যাননি, তখন আমরা কিভাবে আমাদের আচার আচরণ ঠিক করব। মহম্মদ তখন বলে দিলেন, যেখানেই যাবে সেখানকার লোকেরা যেটা করে তার উল্টোটা তোমরা করবে। এটা মুসলমানদের উপর রীতিমত আদেশ দেওয়া আছে। যখন মুসলমানরা ভারতে এল তখন এখানকার লোকেরা গরু খায় না, তাই এরা বেশী করে গরু খাবে। এটা এমন কিছু নয় যে মুসলমানদের গরু খেতেই হবে, কোথাও নিয়মে নেই। এগুলো বিচিত্র ব্যাপার। সেইজন্য স্মৃতিকাররা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন ধর্মের ব্যাপারে বেদ, স্মৃতি আর আচার এই তিনটেতে যদি না পাওয়া যায় তাহলে চতুর্থ হল তোমার মন এই ব্যাপারে কি বলছে। সেইজন্য আপৎধর্মে বেদ, স্মৃতি ও আচারে নিষেধ থাকলেও যদি মন বলে এটা করলে আমি এই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব তাহলে সেই কাজ করতে কোন আপত্তি থাকবে না। এরপর বলছেন –

অর্থকামেন্সসক্তানাং ধর্মজ্ঞানাং বিধীয়তে।

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।।২/১৩

যারা অর্থ আর কামে অনাসক্ত হয়ে গেছে, যাদের টাকা-পয়সার দিকেও মন নেই আর কামের দিকেও মন নেই, তাদের জন্যই ধর্মের উপদেশ। এছাড়া ধর্মের উপদেশ হয় না। এখানে ধর্মের মধ্যে মোক্ষকেও ধরা হয়েছে। এর আগেও বলা হয়েছে, অর্থ আর কাম হল এই জগতের সুখ আর ধর্ম পরলোকের সুখ। আর মোক্ষ হল ইহলোক আর পরলোক এই দুটো লোকের পারে চলে যাওয়া। এখানে দুটোকে মিলিয়ে ধর্ম শব্দকে নেওয়া হয়েছে – যারা পরলোকের সুখ চায় তারাও আর যারা মোক্ষ চায় তাদেরকেও ধরা হয়েছে। ধর্মের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল – ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ, ধর্মের ব্যাপারে শ্রুতিই পরম প্রমাণ। মুক্তি, বন্ধন, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর, কর্মফল, পুণ্য, পাপ এই শব্দগুলোর কথা একমাত্র আমরা জানতে পারি শ্রুতি ও স্মৃতি আদি গ্রন্থ থেকে। আচার্য এই ব্যাপারে খুব গোঁড়া, এই শব্দগুলোর উপরে যখনই কেউ কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে, প্রমাণ চাইলে তিনি এক কথায় কেটে উড়িয়ে দিতেন, এগুলোর একমাত্র প্রমাণ আমাদের শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র। তাই এর উপর কোন প্রশ্নই করা চলে না। যুক্তিবাদীদের যুক্তি দিয়ে আর বুদ্ধিমানের বুদ্ধি দিয়ে এগুলোকে জানা যায় না। অন্য দিকে আমরা এর আগে যে বললাম রাজ্য সরকার বলে দিয়েছে মন্দিরে দেবতার কাছে প্রার্থনা কর। এই প্রার্থনা করতে বলা হচ্ছে অর্থ আর কামের জন্য। অর্থ আর কামের জন্য এই জিনিষ অতটা না প্রয়োগ করলেও চলবে, অন্যান্য অনেক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপার যখন আসবে, ধর্ম বলতে পরলোক ও মুক্তি, তখন এর পরম প্রমাণ হল শ্রুতি ও স্মৃতি।

এরপর মনু তখনকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তখনকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম যেমন কুরুক্ষেত্র, মৎস্যদেশ, পাঞ্চাল এগুলোর বর্ণনা দিচ্ছেন, তখনকার ভারতের নদ-নদীর কথা, ব্রহ্মাবর্ত ইত্যাদি অনেকে কিছু বর্ণনা দিয়ে শেষে খুব সংক্ষেপে বলছেন –

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।

স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিযো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ।।২/২৩

কালো হরিণ যে অঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবে বাস করে সেই অঞ্চলটাই ঠিক ঠিক যজ্ঞের দেশ, এর বাইরে বাকি সব দেশ ম্লেচ্ছ দেশ। সাধারণতঃ তখন পশ্চিমে পাকিস্তান থেকে শুরু করে পূবে বাংলা আর দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত কালো হরিণ পাওয়া যেত। এখন তো সব মেরে শেষ করে দিয়েছে। মানে, যেখানেই কালো হরিণ আছে সেটাই যজ্ঞের দেশ। মনু বলছেন ব্রাহ্মণরা এই কৃষ্ণ মৃগের দেশেই বাস করবে। কৃষ্ণ মৃগের দেশের বাইরে ব্রাহ্মণ আর কোন দেশে যাবে না। ব্রাহ্মণদের বলে দেওয়ার পর শূদ্রদের উদ্দেশ্যে বলছেন, শূদ্ররা আজীবিকার জন্য যে কোন দেশেই যেতে পারে। সূতিকাররা শূদ্রদের যেমন একদিকে অনেক রকম ছাড় দিয়ে রেখেছেন, কিন্তু অন্য দিকে অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে যত তোমার স্বাধীনতা বেশী থাকবে অন্য দিকে তত তোমার সামাজিক সুযোগ-সুবিধাও কম হবে, এটাই ছিল সূতিকারদের নির্দেশ। এখানে সবার সমান অধিকার, সমান সুযোগ সুবিধার কোন স্থান ছিল না। মনু মানতেন একই নিয়ম দশ জনের উপর কখনই প্রয়োগ করা যায় না। কনফিউসাসও এই নিয়মকেই মানতেন। কিছু লোককে বেশী লাইসেন্স দিতে হবে, আর যাদের বেশী লাইসেন্স দেবে তাদের সুবিধাও কম দিতে হবে। স্কুলে যেসব ছাত্ররা খেলাধূলাতে পারদর্শী তাদের শারীরিক শক্তি সব সময়ই বেশী হয়, তাই তারা মারামারিটাও বেশী করবে। আবার যারা মেধাবী ছাত্র তারা আবার খেলাধূলাতে পারদর্শী হয় না, তাই তারা মারামারিটাও কম করবে। এই দুই ধরনের ছাত্রের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশিক্ষণ চলবে না, দুজনের জন্যই আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণের দরকার। সবাইকে একই ভাবে চালান যায় না, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবার জন্য একই রকম আচরণ বিধি ঠিক করে দিলে সমাজের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মনুর কাছে এগুলো খুব পরিষ্কার ছিল। ব্রাহ্মণ মানেই তোমাকে যজ্ঞ যাগ করতে হবে। যজ্ঞ-যাগ কোথায় করবে? যেখানে যে দেশে কৃষ্ণ মৃগ বাস করে। কৃষ্ণ মৃগ যেখানে বাস করে না সেখানে ব্রাহ্মণ বাস করবে না। এখানেই ব্রাহ্মণের গতিবিধিকে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হল। কিন্তু তার বিনিময়ে সে সুবিধাও বেশী পাবে। শূদ্রের গতিবিধি অবাধ করে দেওয়া হল, তুমি যেখানে খুশী গিয়ে জীবিকা উপার্জন করতে পার, সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবে তার সুবিধা পাওয়াও অনেক কমে যাবে। লাইসেন্স আর প্রিভিলেজ দুটো সব সময় আনুপাতিক হারে কমবে ও বাড়বে। এটাতে মনু খুব জোর দিয়েছেন।

সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে মনু বলছেন, এই লোকে মানে পৃথিবীতে আর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণাদি তিনটে বর্ণ, মানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যদের ক্ষেত্রে গর্ভাধানাদি সংস্কারের দ্বারা শরীর ও মনকে খুব পবিত্র রাখা দরকার। এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে শূদ্রদের এগুলো করার দরকার নেই। আদিম কাল থেকে ভারতে বাইরে থেকে বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেইজন্য আর্যদের থেকে এদের পৃথক করার জন্য বাইরে থেকে আগত জাতিগুলোকে বলা হত অনার্য। তাই বলে আমেরিকাতে যে আফ্রিকানদের ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করা হত এখানে অনার্যদের কাউকেই সেই রকম গোলাম করে রাখা হত না। এখানে অনার্যদের আলাদা একটা জাতি করে দিয়েছে। আলাদা জাতি করে তাদের বলে দেওয়া হল, দেখো বাপু, তুমি হলে স্বভাবতঃ অশুদ্ধ, তোমার খাওয়া-দাওয়া অশুদ্ধ, তোমার আচার-আচরণ অশুদ্ধ তাই তোমাকে এখানকার সামাজিক সুবিধা গুলো দেওয়া যাচ্ছে না, তুমি আমাদের থেকে দূরে দূরে থাক। পরবর্তী কালে, বিশেষ করে গান্ধীজী আসার পর ভারতের এই জিনিষগুলোর প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। আন্দোলনকাররা যে আন্দোলন করছিলেন, এগুলোকে নিয়েই তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন। আসলে মনু যেটা করে গিয়েছিলেন সেটা আড়াই হাজার বছর আগের সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিস্থিতি অনুযায়ী করেছিলেন। তখন সবে ম্লেচ্ছ জাতিগুলো ভারতে অনুপ্রবেশ করছিল। তাদের না ছিল কোন আচার, না ছিল কোন প্রায়শ্চিত্ত, না ছিল কোন গুচিটা। ফলে

তাদেরকে বলতেন তোমার দূরে দূরে থাক। অন্য দিকে যারা দ্বিজ তাদের বলে দিলেন তোমরা নিজেরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তো থাকবেই তার সাথে নিজেদের শুদ্ধিকরণের জন্য এই ষোড়শ সংস্কার অবশ্যই করবে।

মা-বাবার সমাগমে প্রত্যেক জাতকের মধ্যে কিছু অশুদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই আসে। এই অশুদ্ধিকে শুদ্ধিকরণ করা হবে তখনই যখন গর্ভাধান, চূড়াকরণ, যজ্ঞ উপবীত সংস্কার করা হবে। দ্বিজরা এই সংস্কার গুলোর দ্বারা শুদ্ধিকরণ করবে। মজার ব্যাপার হল মনু কিন্তু যজ্ঞ উপবীত সংস্কার বলছেন না, তার জায়গায় তিনি মৌঞ্জ বন্ধন বলছেন। স্বামীজীও এই জিনিসটাকে উল্লেখ করেছেন। তখনকার দিনে এখনকার মত যজ্ঞ উপবীত ধারণ করত না। তখন কোমরে মুঞ্জ ঘাস ধারণ করত। যারা বেদ অধ্যয়ন করতে যেত তারা মৌঞ্জী বন্ধন করে বেদ অধ্যয়ন করতে যেত। আরও আশ্চর্যের যে এই মৌঞ্জী বন্ধন মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। পরে ধীরে ধীরে মেয়েদের এটা বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক কোন সময় থেকে মৌঞ্জ বন্ধন থেকে যজ্ঞ উপবীতে চলে গেল পরিস্কার করে এখন আর বলা যায় না। মনু এখানে পরিস্কার মৌঞ্জী বন্ধন শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

প্রচণ্ড ভোগবাদীরা বলে এই শরীরে যৌবন থাকতে থাকতে যা কিছু ভোগ করার ভোগ করে নাও। তার মানে যা কিছু ভোগ করতে হবে এই শরীরকে দিয়েই ভোগ করতে হবে। এই শরীরটা হল ঠিক কাঠের মত। কাঠকে যেমন অনেক কিছুতে লাগান যেতে পারে, কাঠ দিয়ে চেয়ার বানান যেতে পারে, টেবিল বানান যেতে পারে, ঠিক এই শরীরকে বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত রূপে তৈরী করা যায়। কি কি কাজের উপযুক্ত করে এই শরীরকে তৈরী করা যায় বলতে গিয়ে মনু বলছেন –

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তনুঃ।।২/২৮

এই শরীর দিয়ে ভোগাদি করা যায় ঠিকই। কিন্তু এই শরীরকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত করা যায়। ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তনুঃ, ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত শরীর তৈরী করতে হলে কি কি করতে হবে বলতে গিয়ে বলছেন – ব্রহ্মচর্য অবস্থায় বেদ অধ্যয়ন করে তার অর্থবোধ পরিস্কার করতে হবে, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সাবিত্রাদি ব্রত বা মধুমাংস বর্জন ব্রত করতে হবে, মধু বলতে মদ বোঝায়, ত্রিসন্ধ্যা হবন ও গায়ত্রী জপ আর তার সাথে দেবতা, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করতে হবে। আর গৃহস্থ অবস্থায় যদি থাকে তাহলে তাকে সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ তার এই শরীরকে ব্রহ্মপদলাভের উপযুক্ত করতে পারে। মনুর এটা একটা বিচিত্র ভাব, তিনি সন্ন্যাসের খুব একটা পক্ষপাতি ছিলেন না। মনু সব সময় গৃহস্থশ্রমের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। মহাভারতেও খুব বেশী সন্ন্যাসের কথা নেই, একটা দুটো যে সন্ন্যাসের কথা আসে সেটাও খুব নেতিমূলক ভাব নিয়েই বলা হয়েছে। এমনকি একজন সন্ন্যাসীকে দেখান হচ্ছে যে কিনা চার্বাকের অনুগামী। সন্ন্যাসীকে গুরুত্ব না দেওয়ার মূল কারণ হল তখন সন্ন্যাসীরা সমাজের বাইরে থাকতেন। পরের দিকে সন্ন্যাসের মর্যাদাকে অনেক উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। যাই হোক এখানে আসল বক্তব্য হল, বিভিন্ন সংস্কারাদির দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকরণ না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির দিকে এগোন যাবে না। এরপর কিছু কিছু সংস্কার কর্ম কিভাবে কখন কখন করতে হবে বলা হচ্ছে। যেমন নাভি ছেদনের আগে জাতকর্ম সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। আর সুবর্ণ, ঘি, মধু দ্বারা প্রশন করা হয়। জাতকের জন্মের দশ বা বারো দিনে শুভ তিথি, মুহূর্তাদি দেখে নামকরণ সংস্কার করতে হবে।

বিভিন্ন বর্ণের জাতকের নামকরণ বিধি

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলাশ্বিতম্।

বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।।২/৩১

ব্রাহ্মণের নাম মঙ্গলসূচক শব্দ দিয়ে রাখতে হবে, ক্ষত্রিয়ের নাম সব সময় বলসূচক শব্দ দিয়ে হবে, ক্ষত্রিয়ের নাম এমন হবে শুনে মনে হবে যেন তার বল আছে। বৈশ্যদের নাম যেন ধনসূচক হয়। শূদ্রের নাম

হবে নিন্দিত বা হীনতাবোধক। এগুলোর জন্যই পরে মনুর খুব সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মনু এই স্মৃতিশাস্ত্র তৎকালীন সভ্য সমাজের জন্য রচনা করেছেন, যে সময় আজকের তথাকথিত সভ্য পাশ্চাত্যবাসীরা স্বামীজীর ভাষায় মুখে কালিঝুলি মেখে গাছের ডালে আর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে, যাদের জুলিয়াস সিজার বলছেন বর্বর। যখন জুলিয়াস সিজার বর্বর বলছেন তারও পাঁচশ বছর আগে মনুর এই নিয়মকানুন চলছিল। ওরাই এদিক সেদিক থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে ভারতে ঢুকেছে, তাদেরকে আলাদা করে রাখার জন্য এছাড়া মনুর কাছে আর কোন পথ ছিল না, নাম শুনলেই যাতে সবাই বুঝতে পারে এরা কোন জাতির। তাই বলছেন –

শর্মবদ্রাক্ষণস্য স্যাদ্ রাক্ষো রক্ষাসমম্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংক্ৰং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্।।২/৩২

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্মা দেওয়া থাকবে। এটাও খুব মজার ব্যাপার ছিল, সব সময় যে উপাধি হিসাবেই শর্মা শব্দের ব্যবহার করতে হবে তা নয়, নামের সঙ্গেও শর্মা দেওয়া হত, যেমন সোমশর্মা, বিষ্ণুশর্মা ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়দের সাথে রক্ষাবাচক উপাধি যুক্ত হবে। যার জন্য দেখা যায় ক্ষত্রিয়দের নামের সাথে সিংহ শব্দ ব্যবহার করা হয়। বৈশ্যের পুষ্টিবাচক শব্দ দিয়ে উপাধি হত। আর শূদ্রদের নামের পেছনে যেন দাস থাকে। পরের দিকে যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হল তখন থেকে শুধু বিনয় ভাব প্রকাশ করার জন্য যারাই বৈষ্ণব হত তারা দাস উপাধি ব্যবহার করত। একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর সব জাতিরাই দাস উপাধি ব্যবহার করত। পরের শ্লোকে স্ত্রীজাতিদের নামের ব্যাপারে মনু বলছেন –

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রুরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমশীর্বাদাভিধানবৎ।।৩/৩৩

স্ত্রী জাতির নাম এমন হতে হবে যাতে সুখপূর্বক এবং খুব সহজে উচ্চারণ করা যায়। মেয়েদের নামের উচ্চারণের সাথে যেন কোন রকম ক্রুর ভাব না থাকে আর নামের অর্থটা যেন স্পষ্ট থাকে এবং মঙ্গলবাচক হয়। কিন্তু মেয়েদের নামের শেষে যেন অবশ্যই দীর্ঘ বর্ণ থাকে। মেয়েদের নাম এমন হবে শুনে মনে হবে যেন আশীর্বাদ করা হচ্ছে।

এরপর বলছেন চতুর্থ মাসে শিশুকে বাইরে নিয়ে আসবে আর ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার করতে হবে। যজ্ঞ উপবীত সংস্কার ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বয়সে, ক্ষত্রিয়দের ছয় বছর বয়সে আর বৈশ্যদের ক্ষেত্রে আট বছর বয়সে করতে হবে। এতে ব্রাহ্মণের বেদের জ্ঞান খুব উচ্চমানের হয়, ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম বেশী হয় আর বৈশ্যদের ধনধান্য বেশী হয়। যজ্ঞ উপবীত হয়ে যাওয়ার পর ব্রাহ্মণ বালক যখন ব্রহ্মচারী হয়ে যাবে তখন তার আবার অনেক রকম নিয়ম পালন করতে হয়। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হস্তে সব সময় দণ্ড ধারণ করে থাকবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর দণ্ড চুল পর্যন্ত লম্বা হতে হবে। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী যদি হয় তার দণ্ড ললাট পর্যন্ত লম্বা হবে আর বৈশ্য ব্রহ্মচারীর নাসিকা পর্যন্ত দণ্ড দীর্ঘ হবে। দণ্ড দেখেই বোঝা যেত কোন বর্ণের ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীদের দণ্ড সব সময়ই সরল (অবক্র) হতে হবে, দণ্ডের কোনও স্থানে ক্ষত থাকবে না, দেখলে যেন প্রীতি ভাব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ লোকের মনে যেন কোন ভীতির সঞ্চার না হয়। এই রকম প্রচুর নিয়ম কানুনের বর্ণনা করা হয়েছে।

নারীদের সংস্কার কিভাবে হত

মেয়েদের বিবাহ সংস্কারে তিনটে সংস্কারকে এক সঙ্গে করে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের বিবাহ হওয়া মানেই তার যজ্ঞ উপবীত সংস্কার, বেদারন্ত সংস্কার আর এই ধরনের সংযুক্ত যা যা সংস্কার আছে এগুলো সব হয়ে যাওয়া। স্ত্রী যখন স্বামীর সেবা করছে তখন সেটাই তার গুরুকুল বাস হয়ে গেল। আমাদের সমাজ হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, এখানে বিয়ের পর মেয়েকে স্বামীগৃহে বাস করতে হয়। মেঘালয়ের দিকে অনেক জায়গায়

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এখনও প্রচলিত। সেখানে বিয়ের পর স্বামী শ্বশুর বাড়িতে থাকে, বাংলাতে যাকে বলে ঘরজামাই। স্ত্রীরা যে গৃহকর্মাদি করছে এটাই তাদের জন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম হয়ে যায়। এই নিয়মগুলোর জন্য অনেকে মনুর খুব নিন্দাবাদ করে। কিন্তু এখানে মনুর কোন দোষ নেই, কারণ মনু ছিলেন আসলে Codifier। মনু আইন প্রণেতা কখনই ছিলেন না। আমাদের পার্লামেন্টও codifier নয়, পার্লামেন্ট হল আইন প্রণেতা, আমরা এখন এই আইন করে দিলাম দেশের সবাইকে এই আইন মেনে চলতে হবে। মনু করলেন কি, সমাজে যে নিয়মকানুন গুলো পালন করা হচ্ছিল, যেগুলো বেশীর ভাগ লোকই পালন করছে আবার কিছু লোক করছে না, সেগুলোকে তিনি সংগ্রহ করে একটা জায়গায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন। এখানে মেয়েদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে সেগুলো তখনকার দিনে এই রকমই হচ্ছিল, মনু শুধু সেগুলোকে একটা জায়গাতে লিপিবদ্ধ করে অনুমোদন করে দিলেন। মনুর সময় মেয়েদের যজ্ঞ উপবীত, গুরুকুলবাস আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করার আদেশ ছিল না। এই নিয়মগুলো বেদের সময় আমরা দেখতে পাইনা, সেই সময় গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত নারীরা এগুলো পুরোদমে পালন করে এসেছেন। বেদে অনেক ঋষিকাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতিতে মেয়েদের এগুলো করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল স্বামীজী এটা মানতেন না। এই কারণেই তিনি মেয়েদের সন্ন্যাস ধর্ম পালনের জন্য সারদামঠ তৈরীর কল্পনা করে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারীর কয়েকটি ব্রত

আসলে এখানে ব্রহ্মচারী ব্রতের উপর আলোচনা চলছে, ব্রহ্মচারীরা কিভাবে জীবন-যাপন করবে সেই ব্যাপারে বলা হচ্ছে। মনু আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ মেয়েদের ব্যাপারে বলতে শুরু করে দিলেন। সেখানে তিনি এই কথাই বলছেন মেয়েদের যজ্ঞ উপবীত, তার বেদারম্ভ, তার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এইভাবে দেখা হবে। এখানে ব্রহ্মচারীদের প্রচুর নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে। এগুলো আজকাল বলতে গেলে উঠেই গেছে, কারণ আগেকার দিনে যেভাবে ব্রহ্মচারীরা গুরুকুলে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করত এখন সেই রকম গুরুকুল প্রথা বলতে গেলে উঠেই গেছে। সামান্য কয়েকটি নিয়ম আমরা আলোচনা করছি। ব্রহ্মচারীদের একটা নিয়মের কথা বলতে গিয়ে বলছেন – ব্রহ্মচারী গুরুর কাছে উপস্থিত হওয়ার পর প্রথমে গুরু তাকে আচারের শিক্ষা দেবেন – অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর সঠিক আচরণ, স্নানাদি ক্রিয়া আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, সমিধা কিভাবে সাজাবে, হবন রোজ কিভাবে করতে হবে, সন্ধ্যা উপাসনা কিভাবে করবে ইত্যাদি। বেদ অধ্যয়ন শুরু করার আগে এবং বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পর, এই দুটো সময় ব্রহ্মচারী গুরুর সমীপে নিজেকে উপস্থাপিত করে এক বিশেষ বিধিতে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গুরুর চরণদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করবে। প্রথমে প্রণাম করে করজোড়ে গুরুর কাছে দণ্ডয়মান হওয়াকে বলা হয় ব্রহ্মাঞ্জলী। ব্রহ্মাঞ্জলী না হওয়া পর্যন্ত বেদের শিক্ষা হয় না। বেদের গুরুকে যখন প্রণাম করা হয় তখন গুরুর বাম চরণ শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এবং দক্ষিণ চরণ বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে প্রণাম করবে। প্রণাম করার পর হাতজোড় করে গুরুর সম্মুখে দণ্ডয়মান হয়ে যাবে, এই পদ্ধতির প্রণামকে বলছেন ব্রহ্মাঞ্জলী। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর বা শিষ্যের নিত্য বেদপাঠ গুরুর আগে এবং বেদপাঠ শেষ হওয়ার পর গুরুকে ব্রহ্মাঞ্জলী করাটা একেবারে বাধ্যতামূলক, আমরা কল্পনাই করতে পারিনা যে ব্রহ্মচারী শিষ্য ব্রহ্মাঞ্জলী করবে না। প্রত্যেক দিন বেদ অধ্যয়নের প্রারম্ভে এবং বেদ অধ্যয়নের শেষ প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ অবশ্যই করতে হবে। বলা হয় বেদ অধ্যয়নের প্রারম্ভে যদি প্রণব উচ্চারণ না করা হয় তাহলে বেদ অধ্যয়ন করে যে জ্ঞান অর্জন হবে সেটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। আর শেষে যদি ওঁ উচ্চারণ না করা হয় তাহলে অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হয়ে যায়। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারকে ঋক থেকে মন্ত্রন করে ‘অ’, ‘উ’ ও ‘ম’ এই ব্যাহতত্রয়কে উচ্চার করেছিলেন। তাই প্রণব যেন পুরো ঋকবেদের সার, আবার ঋকবেদ সম্পূর্ণ বেদের সার। সম্পূর্ণ বেদের সার মানে ঈশ্বরের সার। ঈশ্বরের সার মানে ঈশ্বরের বাচক, তাই প্রণব আর ঈশ্বর দুটো আলাদা কিছু নয়। ঈশ্বরের কৃপা যদি না থাকে তাহলে কোন জিনিষই টিকে থাকবে না। তাই অধ্যয়নের আগে আর অধ্যয়নের শেষ প্রণব উচ্চারণ করতে হয়।

শূদ্র ও নারীর প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ

মনুর সমালোচকদের মনুর বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ হল তিনি শূদ্র আর নারীদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এই স্মৃতিশাস্ত্রগুলো আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। বাইরের দেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ সেই প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহারে যাতে বিদেশীদের প্রভাব না পড়তে পারে তার জন্য কিছু বিধি নিষেধ তখনকার দিনের স্মৃতিকারদের প্রয়োগ করতে হয়েছিল। এর আগেও আমরা দেখলাম মনু ব্রাহ্মণদের বলছেন যে দেশে কালো হরিণের বাস, ব্রাহ্মণ কেবল সেই দেশেই তার জীবিকা নির্বাহ করবে। কিন্তু শূদ্ররা যেখানে খুশী গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। সেইজন্য ব্রাহ্মণরা কালাপানি অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রা করতে পারত না, শূদ্রদের সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে গিয়ে উপার্জন করাতে কোন অসুবিধা ছিল না। স্মৃতিকারদের কাছে এটাই একমাত্র পথ ছিল – তোমার ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের যত ছাড় থাকবে তত তুমি সুযোগ সুবিধা কম পাবে, নিয়ম-কানুন যত তোমার উপর আরোপিত হবে তত তুমি সুযোগ সুবিধা বেশী পাবে। শূদ্রদের মনের উপর কোন নিয়ন্ত্রন ছিল না, ফলে তাদের সুযোগ সুবিধাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শূদ্ররা যেমন খুশী আচরণ করতে পারত, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে পোশাক পরিচ্ছদ যেমন খুশী ব্যবহার করতে পারত। বিয়েও যত খুশী করতে পারত। তাই তাদের সম্মানটও ছিল না। যেমন যেমন তার মানসিকতার উন্নতি হবে তেমন তেমন তার এই বাঁধন ছাড়া ভোগ বিলাসও কমতে থাকবে, সাথে সাথে সম্মানও বেড়ে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – স্মৃতিকারদের উদ্দেশ্য ছিল মনের দিক থেকে যারা একেবারে বর্বর তাদের টেনে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্ব পর্যন্ত নিয়ে আসা।

আজকে ভারতীয় সমাজে কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র আর পার্থক্য করা যাবে না। সবাই বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে, সবাইই আচার ব্যবহার পালেট গেছে। এই পরিবর্তনের কৃতিত্ব পুরোপুরি মনুর প্রাপ্য। মনু এত দিন ধরে আচার ব্যবহারের নিয়ম-কানুনগুলোকে এমন ভাবে বেঁধে দিয়েছেন যে হিন্দুদের মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয় বা শূদ্র বোঝার উপায় নেই। কিন্তু একজন হিন্দু আর মুসলমানকে পরিষ্কার বুঝে নেওয়া যায়। স্মৃতিকাররা শূদ্রদের স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, দেখো ভাই! ব্রাহ্মণরা যে উচ্চতম স্বর্গ পাবে সেই স্বর্গ তুমিও পেতে পার, যদিও তোমার জন্য আলাদা কর্মের বিধান করে দিচ্ছি না, বিধান একমাত্র হল ব্রাহ্মণরা যা কিছু করে সম্মান পাচ্ছে, তোমরাও তাই কর। যেমন ব্রাহ্মণদের স্নানাদির বিধান আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, তুমিও পরিষ্কার থাক। ব্রাহ্মণদের আচার আচরণগুলো তুমি যদি অনুশীলন কর আর তার সাথে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে থাক। তাহলে তুমিও সেই অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে।

নারীদের ব্যাপারে মনু খুব স্পষ্ট ও সচেতন ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন নারীর মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যে, সে যে কোন পুরুষকে উল্টে ফেলে দিতে পারে। অন্য দিকে সমাজের কাছে মেয়েরা ছিল প্রচণ্ড অসহায়। একদিকে অত্যন্ত অসহায়, প্রতি পদে তার সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, অন্য দিকে তার মধ্যে এমন এক ক্ষমতা আছে যার দুর্প্রয়োগে যে কোন পুরুষের জীবন বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে। কোন মেয়ে যদি ঠিক করে নেয় এই পুরুষের আমি বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব, তখন জগতের কোন শক্তি নেই যে সেই পুরুষকে বাঁচাবে। একদিকে অসহায় আরেক দিকে অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্না, এই দুটো বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণে নির্মিত নারীজাতির কথা মাথায় রেখে মনু নারীদের জন্য সব বিধানগুলো তৈরী করেছেন। নারীদের এই অসহ্যতার কথা মাথায় রেখে মনু বিধান করে দিলেন স্ত্রীর সম্পত্তিতে কেউ যেন কোন হস্তক্ষেপ না করে। বিয়ের সময় স্ত্রী তার পিতৃকুল থেকে যা ধন সম্পদ পাবে, বিয়ের পরও যদি বাপের বাড়ি থেকে কোন সম্পত্তি পায় সেটা স্ত্রীর সম্পত্তি, এই সম্পত্তিতে কেউ হাত দিতে পারবে না। আবার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সব কিছুতে স্ত্রীর অধিকার মনু সুরক্ষিত করে দিলেন। আবার অন্য দিকে নিয়ম করে দিলেন কোন নারীকে কোন অবস্থাতেই একা ছাড়া যাবে না। যত দিন নারীর বিবাহ হচ্ছে না তত দিন সে বাবার অধীনে থাকবে, বিয়ের পর স্বামীর অধীনে আর স্বামীর অবর্তমানে ছেলের অধীনে – একেবারে কড়া করে মনু এই বিধান ঠিক করে দিলেন।

আমাদের স্বভাব হল, কোন কিছুর গভীরে না গিয়েই আমরা সমালোচনা করি। ইরানে ১৯৭৭ সালের পর থেকে মৌলবাদীদের নেতৃত্বে অনেক বিপ্লব আন্দোলন চলছিল। চলতে চলতে ১৯৭৯ সালে ইরানে আয়াতুল্লা খোমেনি ফরমান জারি করেন। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইরানের সামাজিক স্তরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। একজন ইরানী মহিলা তিনি ইরানে কিছু দিন পড়াশোনা করেছিলেন, পরে আমেরিকাতে বড় হয়েছেন। তারপর আবার তিনি তেহেরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপনা করতেন। ইরানের এই বিপ্লব পুরোটাই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছিল। তিনি নিজে একজন সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে ইরানের সব রকম ঘটনার খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাতে তদানন্তর ইরানে মেয়েদের উপর গোঁড়া সম্প্রদায়রা অত্যাচারের বিচিত্র রকমের ঘটনা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। বিপ্লবের পরে শারিয়াতি আইনকে সামনে রেখে ইরানের মৌলবাদী সরকার কঠোর ভাবে বিভিন্ন রকম আইন চালু করে দিল। সেখানে নিয়ম আছে মেয়ের নয় বছর হয়ে গেলেই তাকে বিয়ে দিতে হবে। অথচ বিপ্লবের আগে ইরানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল কুড়ি বছর।

মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি বিচিত্র। মানুষের মনে নানান ধরনের বিকৃতি আসে, সব কিছুতেই তার স্বাধীনতা পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। মুম্বাই শহরে অনেক মুসলমান মেয়ে, যারা বড় বড় পোস্টে কাজ করেন, তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারও আছেন, যখন এরা কলেজে পড়াশোনা করত তখন জিন্স আর টীশার্ট পড়ে ঘুরে বেড়াত। এরাই এখন বুরখা আর হিজবু (মাথার স্কার্ফ) পড়তে শুরু করেছে। তারা এখন বলছে এই পোশাক পরিধান করে আমরা মনে অনেক জোর পাচ্ছি। কেন জোর পাচ্ছে, আগে কেন জোর পাচ্ছিল না, সব কথা বোঝা যায় না। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের আচার ব্যবহার প্রচলিত। কিছু দিন আগে ইন্দোনেশিয়াতে একটা ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে ওখানে একটি মুসলিম মেয়ে মাথায় হিজবু ব্যবহার করতে চাইছে, কিন্তু তার বাবা-মা এই নিয়ে মেয়েকে খোঁচা দিয়ে অনেক কথা বলছে। এখানে উল্টো ব্যাপার, সাধারণত বাবা-মায়েরা চায় তাদের ছেলেমেয়েরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুক। ইন্দোনেশিয়া সেকুলার রাষ্ট্র হওয়াতে ওখানকার লোকেরা এগুলোর উপর বেশী জোর দিত না। কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম আস্তে আস্তে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের ব্যাপারে খুব গোঁড়া হয়ে যাচ্ছে।

মনু অন্যান্য জিনিষগুলো নিয়ে বেশী গোঁড়ামি করেননি। ওনার মূল ছিল একদিকে মেয়েরা অসহায়, সেই ক্ষেত্রে তারা যেন সুরক্ষিত থাকে। অন্য দিকে মেয়েদের গোলমাল করার ক্ষমতাটা অসীম। এই জায়গাটাতে মনু মেয়েদের আটকে দিলেন, যাতে সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা না হয়। আমাদের বাৎসায়নের কামসূত্রে বলা হচ্ছে, কোন মেয়ের সাথে যদি তুমি অভিসারে যেতে চাইছ তার আগে দেখে নাও মেয়েটির সুরক্ষার ব্যবস্থাটা কেমন, অর্থাৎ মেয়েটি কতটা সুরক্ষিত। যদি রীতিমত সবল লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে তাহলে তুমি সেই মেয়ের থেকে দূরে থাক। এই ধরনের গোলমাল হওয়ার প্রচণ্ড সম্ভবনাকে মাথায় রেখে মনু মেয়েদের চলাফেরার উপর এই সুরক্ষার ব্যবস্থাটা দিয়ে গেছেন। অন্য দিকে মনুকে আমরা দেখছি তিনি মেয়েদের প্রচণ্ড সম্মানের দৃষ্টিতে সমাজে স্থান দিয়েছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাপ থেকে মুক্তির উপায় ও প্রণবের মাহাত্ম্য

এর আগে আমরা আলোচনা করেছি বেদারম্ভের আগে ওঙ্কার দিয়ে শুরু করতে হবে এবং বেদ অধ্যয়ন শেষেও ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে শেষ করতে হবে। ঋষিরা প্রণবকে খুব গুরুত্ব দিতেন। তারপর বলছেন যে ব্রাহ্মণ একান্তে পবিত্র স্থানে এক মাস ধরে প্রত্যেক দিন এক হাজার ওঁ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ মন্ত্র জপ করবে, সেই ব্রাহ্মণ যত বড় পাপই করে থাকুক না কেন সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু পুরো গায়ত্রী মন্ত্রের কথা বলছেন না, যাই হোক আমরা ধরে নিতে পারি গায়ত্রী মন্ত্রই যদি এক মাস ধরে এক হাজার বার জপ করে তাহলে সে যত পাপ করেছে সব পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। মানুষকে নিন্দা করা স্মৃতির উদ্দেশ্য নয়, স্মৃতি কখনই আদেশ দিয়ে বলবে না যে, তুমি এইটি কর নাহলে নরকে যাবে, নরকের ভয় দেখিয়ে পাপকর্ম থেকে বিরত করার চেষ্টা স্মৃতি কখনই করবে না। পুরান কিন্তু মানুষকে নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে পাপ কাজ

করতে নিষেধ করছে, সেখানে তাই নরকের বিশাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। স্মৃতি সব সময় চেষ্টা করবে মানুষকে কিভাবে টেনে উপরের দিয়ে নিয়ে আসা যায়। স্মৃতি বলবে – তোমার মন খুঁতখুঁত করছে? তুমি কি গর্হিত কাজ করেছ? সব থেকে গর্হিত পাপ কি করেছ? কি কি কাজে সব থেকে গর্হিত পাপ হয় তার একটা তালিকা দিয়ে বলবে তুমি কি এর মধ্যে কোন গর্হিত পাপ করেছ? ঠিক আছে! কোন চিন্তা নেই, তুমি একটা পবিত্র স্থান দেখে বসে পড় আর পুরো এক মাস প্রতি দিন এক হাজার জপ করে যাও। সাপ যেমন খোলস থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তুমিও এক মাসে মহাপাপের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। গায়ত্রীর পুরস্কারাদির চিন্তা ভাবনা এখান থেকেই এসেছে। কোন মানুষ যখনই কোন গর্হিত কর্ম করে বসে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার মনটা অস্থির হয়ে যায়, সব সময় মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকবে। মনু মনের এই অস্থিরতা আর খুঁতখুঁতানিটাকে বন্ধ করে দিচ্ছেন। বেলুড় মঠে এক সময় ব্রহ্মচার্যব্রতে দীক্ষিত হওয়ার পর সব ব্রহ্মচারীরা একত্রে তদানিন্তন অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দকে প্রণাম করতে গেছেন। সেখানে একজন ব্রহ্মচারী অধ্যক্ষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করছে ‘মহারাজ ব্রহ্মচার্যব্রতের এত এত নিয়ম ও নির্দেশিকা পালনের জন্য বলা হয়েছে, যদি কোন কারণে এর উল্লঙ্ঘন হয়ে যায় তখন কি করতে হবে?’ অধ্যক্ষ মহারাজ খুব গম্ভীর ভাবে বলে দিলেন ‘একশ আটবার জপ করে নেবে’। মনুও এখানে ঠিক এটাই করছেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যে স্বীকারোক্তির ব্যাপার আছে। ফাদারের কাছে গিয়ে বলে দিল আমি এই পাপ কাজ করে ফেলেছি। ফাদার তখন একটা শাস্তির বিধান বলে দেন। বিভিন্ন ফাদার আবার বিভিন্ন রকমের শাস্তির বিধান দেবেন। এই ঝামেলা থেকে মনু সবাইকে বার করে দিলেন। সরাসরি বলে দিলেন যদি তুমি মনে কর তোমার জীবনটা গোলমালে ভরা তাহলে তুমি এক মাস ধরে এক আসনে বসে টানা এক হাজার বার ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মন্ত্র জপ করে যাও, এক মাস পরে তুমি সব কিছু গোলমাল থেকে পরিস্কার হয়ে যাবে। ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ হল গায়ত্রী মন্ত্র, হিন্দুদের কাছে এটি শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র। তন্ত্রেও একই কথা বলছে, যদি টানা জপ করা হয় তাহলেই সব কিছুর প্রায়শ্চিত্ত করা হয়ে যাবে। মন থেকে কেউ যদি ঠিক করে নেয় আমি এই করে নিলে পাপ থেকে মুক্ত হব তখন অতটা মনে শান্তি হয় না। কিন্তু যখন শাস্ত্রের দিক থেকে বলে দেওয়া হয় তখন সে শান্তি পেয়ে যায়। মনুবাবা বলে দিয়েছেন হাজার বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিলে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর মনু বলছেন –

যোহধীতেহহন্যহন্যেত্যং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।

স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্তিমান্।।২/৮২

যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিরলস ভাবে তিন বৎসর এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে, বায়ুর মত গতিপ্রাপ্ত হয়ে সে যথেষ্ট গমন করতে পারে এবং আকাশের মত সর্বব্যাপী হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায় অথবা খমূর্তি, মানে নিজের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখনকার দিনে গায়ত্রী মন্ত্র জপই ছিল মুখ্য, আর সবাইকে গায়ত্রী মন্ত্র জপে খুব উৎসাহিত করা হত। বায়ুরূপ হয়ে যাওয়া মানে সেই ব্যক্তি একটা সূক্ষ্ম শরীর পেয়ে যায়, যে শরীর দিয়ে ত্রিলোকে বিচরণ করতে পারে, মানে যোগসিদ্ধি হয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে বলছেন গায়ত্রী জপের দ্বারা মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিতে পারে।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।

সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাত্ সত্যং বিশিষ্যতে।।২/৮৩

অকার, উকার ও মকারাত্মক একাক্ষর ওঙ্কারই হল পরব্রহ্মস্বরূপ, ওঁ ব্রহ্মের পরম বাচক। যাঁরা সত্যি সত্যিই সাধনা করছেন তাঁরা চলতে ফিরতে, খাওয়ার সময়, ঘুমোবার সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে ওঙ্কার জপ চালিয়ে যান। দুটো পদ্ধতি আছে, যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তখন ওঁ উচ্চারণ করে বায়ু ভেতরে গ্রহণ করলেন আবার যখন প্রশ্বাস ছাড়ছেন তখন আবার ওঁ বলে বায়ুকে ত্যাগ করে দিলেন। আরেকটা পদ্ধতি হল, অকার উকার করে দম ভরে বায়ু নিয়ে মকার দিয়ে বায়ুকে ছেড়ে দিল। এটাকেই একেবারে লাগাতার করে যাচ্ছেন, সকাল বিকাল শুধু নয়, সব সময় এই ওঁ জপই করে যাচ্ছেন। এইভাবে ওঙ্কারের জপ করতে করতে

একটা সময় হঠাৎ হৃদয়ে ব্রহ্মের তত্ত্বটা জেগে ওঠে। কারণ ওঁ হল শেষ, ঠাকুর বলছেন – সন্ধ্যা লয় হয় গায়ত্রীতে, গায়ত্রী লয় হয় ওঙ্কারে। ওঁ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তাই শুধু ওঙ্কার জপ করলেই সব কিছু হয়ে যায়। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ওঁ জপ ও ধ্যান করার থেকে বড় আর কিছু হয় না।

আর বলছেন, তিনটে প্রাণায়াম সব তপস্যার থেকে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তিনবার প্রাণায়ামই পরমতপস্যা। সাবিত্রীর থেকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কোন মন্ত্র হয় না। সাবিত্রী হল গায়ত্রী মন্ত্র। মজার কথা বলছেন, চুপ অর্থাৎ মৌন থাকা থেকে সত্য কথা বলা অনেক ভালো। অনেক শাস্ত্রে আবার এর বিপরীত কথাও পাওয়া যায়, অপ্রিয় সত্য যদি হয় সেই সত্য কথা বলার থেকে চুপ করে থাকা ভালো। আমার মৌনতার জন্য যদি কারুর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, আমার মৌনতার জন্য অন্যরা সত্যটা জানতে পারছে না, সেইজন্য মৌন থাকাটা সব সময় ঠিক নয়। এখানে ওঙ্কারের স্তুতি করতে গিয়ে চারটে ব্যাপারকে নিয়ে আসছেন। প্রথম ওঁ ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ পথ। দ্বিতীয় প্রাণায়াম সবচেয়ে বড় তপস্যা, প্রাণায়াম করলে আর কঠোর তপস্যা করতে হবে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই প্রাণায়াম। ভালো গুরুর কাছে প্রশিক্ষণ না নিয়ে নিজে থেকে কখনই প্রাণায়াম করা উচিত নয়। তৃতীয় গায়ত্রী মন্ত্র থেকে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নেই। গায়ত্রী মন্ত্রও গুরুর কাছ থেকে নিতে হয়। গুরু পরম্পরায় গায়ত্রী মন্ত্র প্রাপ্ত না করে জপ করলে কোন ফল হয় না। ইদানিং অবশ্য যাঁরা বিভিন্ন আশ্রমাদি থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন তাতেও এই একই ফল হবে, গায়ত্রী মন্ত্রে আর দীক্ষা মন্ত্রে কোন তফাৎ নেই। চতুর্থতঃ, যদি মনে হয় কোথাও অন্যায় হচ্ছে, কারুর প্রতি অবিচার হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রে মৌন থাকার চেয়ে সত্য কথা বলা শ্রেয়। মনু অবশ্য অপ্রিয় সত্য কথা কখনই বলতে দেবেন না। এরপর ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে অনেক কিছু বর্ণনা করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে খুব মূল্যবান একটা কথা বলছেন –

ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে দূরে থাকা, নাকি ভোগ মিটিয়ে নেওয়া?

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।

বিষয়েষু প্রজুষ্ঠানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।।২/৯৬

স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় বিষয়ের জগতে বিচরণ করে। আমি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের প্রতি অবাধ বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি আবার ইচ্ছে করলে গায়ের জোরে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ছেড়ে দেওয়া অথবা গায়ের জোরে বিষয় থেকে টেনে নিয়ে আসা, এর মধ্যে কোনটা ভালো? দুটো পথ আছে, স্বামীজী বলছেন I have conquered every temptation by fight or flight। লড়াই করে অথবা পালিয়ে। মনু এখানে বলছেন, বিষয় থেকে তোমার ইন্দ্রিয়কে যদি দূরে সরিয়ে রাখ তাহলে কোন দিন তুমি ইন্দ্রিয়কে বশে এনে সংযমিত করতে পারবে না। এই জিনিষগুলো আমাদের অতি প্রাচীন বিতর্কিত বিষয়। একটা হল ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসা, আরেকটা ইন্দ্রিয়ের ছোটখাটো ভোগ গুলো মিটিয়ে দিয়ে শান্ত করে দেওয়া। গীতায় ভগবান বলছেন বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রস বর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।। নিরাহার মানে বিষয় থেকে যদি তুমি দূরে সরেও যাও কিন্তু বিষয়ের রস থেকে সরতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন যে কামিনী-কাঞ্চনকে জয় করেছে সেতো মহাপুরুষ। একজন সন্ন্যাসী মঠে থাকছেন, সেখানে তিনি তো কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরেই থাকছেন, তাই বলে কি সন্ন্যাসী মহাপুরুষ হয়ে গেলেন! মনু এক পয়সাও বিশ্বাস করবে না, তুমি কামিনী-কাঞ্চন থেকে শুধু দূরে দাঁড়িয়ে আছ কিন্তু এই তুমি উল্টে পড়লে বলে, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। গীতাও এই কথা বলছে, কারণ তোমার মধ্যে বিষয়ের রস তো থেকে গেছে। খবরকাগজ, টিভিতে যে সাধুবাবাদের কত কেলেঙ্কারির খবর হচ্ছে তার পেছন এই একটাই কারণ। মনে করছ বিষয় থেকে সরে এসে তুমি বিরাট কিছু হয়ে গেছ। সাধনার একটা সময় তুমি দূরে চলে গেলে, জঙ্গলে বা হিমালয়ে চলে গেলে। কামিনী-কাঞ্চন ভোগের কোন সুযোগই আর রইল না। সাধনা করে করে একটা সময় মনে করছে আমি ইন্দ্রিয়গুলোকে জয় করে নিয়েছি। ঠিকই মনে করছে, একটা সময় সে সত্যিই জয়ী হয়, এতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু রসটা তার গুঁকিয়ে যায়নি। রস

থাকার জন্য যেমনি একটু সামান্যতম সুযোগ পেয়ে যাবে তখন এতদিনের যেটুকু বাদ পড়ে গেছে সেটুকুকে নিয়ে বাঘের মত বাঁপিয়ে পড়বে, কেউ তাকে আর সামলাতে পারবে না।

তাহলে উপায় কি? বিষয়েষু প্রজ্ঞানি, বিষয়ের সাথে খুব করে আগে জড়িয়ে থাক আর জ্ঞান শক্তি দিয়ে নিজেকে ওখান থেকে সরাতে থাক। এছাড়া হবে না। এই বিষয়ভোগটা ক্ষতিকারক, এই বিবেক বিচার দিয়ে নিজেকে ওখান থেকে সরাতে হয়। আসলে মন হল সব ইন্দ্রিয়ের রাজা, সেইজন্য একমাত্র মনই ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলোকে মন যতক্ষণ না বশীভূত করতে পারছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলো কখনই নিয়ন্ত্রণে আসবে না। আমি যদি বিষয় থেকে দূরে চলে যাই, তখন বিষয় কিন্তু মন থেকে চলে যাচ্ছে না, আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। লাটু মহারাজ বিহারের ছাপড়া জেলার লোক ছিলেন। গ্রামে মদ খাওয়ার সংস্কারটা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কলকাতায় আসার পর যখন থেকে তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে দক্ষিণেশ্বর থাকতেন তখন তাকে মাঝে কলকাতায় যেতে হত। যাতায়াতের পথে এক জায়গায় মদের ভাটিখানা ছিল। লাটু মহারাজ তাই অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যেতেন, যার জন্য তাঁকে অনেকটা পথ বেশী হাঁটতে হত। এটা হল নিষ্ঠা, খারাপ কিছু নয়। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে তুমি যখন ইন্দ্রিয়জগতে বিষয়ের মধ্যে ডুবে আছ তখন তোমার জ্ঞানশক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে সরাতে হবে। এটাই একমাত্র দৃঢ় পথ। এটাও আবার খুব বিতর্কিত বিষয়। অনেকে বলবেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে পড়ে না থেকে তুমি একান্ত হয়ে যাও, নির্জনে থেকে থেকে ঈশ্বরের ভজনা করতে থাক, তাঁকে প্রার্থনা কর, ভক্তি কর, সাধনা কর, করতে করতে একবার যখন তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবে তখন কি হবে? রস বর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টী নিবর্ততে।। একবার যদি তুমি পরমকে দেখে নাও তাহলে রস থাকলেও তোমার ইচ্ছাটাই চলে যাবে, তখন বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের কিছু করতে পারবে না।

এনাদের এইটাই সিদ্ধান্ত, তুমি বিষয়ের মধ্যেই ঘুরঘুর করতে থাক, আর তার সাথে ক্রমাগত চেপ্টা চালিয়ে যেতে হবে কি করে এর থেকে বেরোতে হবে। যোগশাস্ত্রে বলছে সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, তুমি সত্য কথা বলবে, কারকে অহিংসা করবে না, চুরি করবে না, কারুর থেকে কোন দান উপহার নেবে না। তুমি যদি এখন হিমালয়ে একটা গুহায় খিল দিয়ে ভেতরে ঢুকে থাক তখন সেখানে সত্য কথাটা বলবে কার সাথে! অপরিগ্রহ কারুর কাছ থেকে কোন উপহার নেবে না। যদি তুমি সমাজে লোকের মধ্যে নাই থাকো তাহলে অপরিগ্রহ হবে কি করে! এই দুটো মত প্রথম থেকে চলে আসছে – একটা মত হল বিষয় থেকে সরে এস, আরেকটা মতে বলবে, না, ওখানে থেকে বিচার করে করে সরে আসতে হয়। এই দুটো মতকে মিলিয়েও চলা যায়। কখন কিছু দিনের জন্য আলাদা থাকা হল, তখন সেখানে বিচার করার শক্তি বাড়ে। কিন্তু মনু গৃহস্থ ধর্মকে বেশী সামনে নিয়ে আসছেন, সেইজন্য গৃহস্থ যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের দিকে এগোয় তখন সেটা তার কাছে সহজ হয়। ঠাকুরও বলছেন গৃহস্থদের অনেক সুবিধা, সংসারে থেকে সাধনা করা মানে কেল্লার ভেতরে থেকে লড়াই করা। সন্ন্যাসী হওয়া মানে কেল্লার বাইরে থেকে যুদ্ধ করা, যা সব সময় বিপজ্জনক। মোঘলরা যখন রাজস্থানের কেল্লাগুলো আক্রমণ করত তখন যারা কেল্লার বাইরে বেরিয়ে এল তারা লড়াইটা ভালো করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রাণ সংশয়ের সম্ভবনাটাও বেড়ে যাবে। তাই সন্ন্যাসীদের পতনের কথাই মানুষ শুনতে পায়, গৃহস্থের পতন হয়েছে কখন শোনা যায় না। সন্ন্যাসী আবার অনেক উঁচুতে যেতে পারে। যে উঁচুতে উঠতে পারে পতন তারই হওয়ার সম্ভবনা।

যখন মানুষ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যত বিষয় আছে তার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, গুটিয়ে নেওয়া মানে বিষয়গুলিকে ভালোও বলবে না, খারাপও বলবে না, যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে ভালো-খারাপের বাইরে চলে গেছে, খেতে হবে তাই খাচ্ছি, আবার পোশাক-আশাক যেমন একটা হলেই হল, শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই ঠিক আছে। এদেরকে বলে জিতেন্দ্রিয়। সব ইন্দ্রিয় বশে আছে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের একটি বিষয়ে প্রতি বিষয়াসক্ত হয়ে আছে তাহলে ফুটো চামড়ার পাত্রে জল রাখলে যেমন সব জল আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ঠিক তেমনি ওই একটি বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সব বাকি সব কটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে টেনে বার করে দেবে। একটা কোন বিষয়ে যদি কারুর দুর্বলতা থাকে সেটাই তাকে আর সব কটা ইন্দ্রিয়কে নিয়ে পথে বসিয়ে দেবে। কোন

যোগীর যদি গানের প্রতি বিশেষ শখ থাকে তাহলে নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যাবে সে আর যোগের পথে এগোতেই পারবে না।

বহিঃইন্দ্রিয় সমুদয়, গীতায় যাকে ইন্দ্রিয়গ্রাম বলছে, সেই ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনকে মানুষ অবশ্যই সংযম করবে। কিন্তু শরীরকে কষ্ট দিয়ে যেন মন আর এই ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযম না করে। নিজের বুদ্ধিকে জাগ্রত করে ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে। এর সাথে ব্রাহ্মণ যেন সকাল আর বিকাল এই দুই বেলা গায়ত্রী মন্ত্রের জপ অবশ্যই করে। এমনিতে বলা হয় কম করে সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা আগে এবং সূর্যোদয়ের পর আধ ঘণ্টা টানা এই এক ঘণ্টা জপ করতে হয়। ঠিক এই ভাবে বিকালেও এক ঘণ্টা জপ করবে। মনু বলছেন, সকালের এক ঘণ্টা জপের দ্বারা রাত্রিবেলার কৃত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। আর সন্ধ্যা বেলা জপের দ্বারা দিনের বেলা যত পাপ করেছে সেগুলো ঠিক হয়ে যায়। গায়ত্রী জপ বা মন্ত্র জপ পাপের শুদ্ধির জন্য। পাপ বলতে এখানে কারুর সাথে অন্যায় কিছু করার কথা বলা হচ্ছে না, শরীর ধারণ করা মানেই অনেক রকম পাপ কাজ বাধ্য হয়েই করতে হয়। আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, রাষ্ট্রায় চলাফেরা করছি এতেই অনেক প্রানীর জীবনহানি হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া করছি তাতেও কত প্রানের নাশ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সবই পাপ। এইভাবে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমরা অনেক পাপ করে থাকি। মনে মনে কারুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকা, রেগে থাকা এটাও পাপ। এই পাপ সমুদয়ের নাশ হয় গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা। সকালে জপ করছি তাতে রাতের সব পাপ ঠিক হয়ে গেল, সন্ধ্যাবেলা জপ করছি তাতে দিনের সব পাপ পরিষ্কার হয়ে গেল।

আসলে যতক্ষণ শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ কোন ভালো কাজ তো করাই যায় না, উপরন্তু যে কাজই করা হোক না কেন সব কাজই বৃথা হয়ে যায়। অশুদ্ধি জমে থাকা অবস্থায় যা কিছু কাজ করবে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের ত্রিসন্ধ্যা জপ করতে বলা হত, সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যায়, তা নাহলে ব্রাহ্মণের মধ্যে তেজ আসবে না। এখানে মনু ঠিক ব্রাহ্মণ বলছেন না, এখানে শব্দটা নিয়ে আসছেন দ্বিজ। দ্বিজ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজনকেই বোঝাচ্ছেন। শূদ্র শব্দটাকে আমাদের এখন পুরোপুরি মাথা থেকে নামিয়ে দিতে হবে। মনুর সময়কার শূদ্ররা এখনকার দিনে এই তিনটে বর্ণের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে। এখন সবাই দ্বিজ, বর্তমান সমাজে শূদ্র বলে কিছু নেই। যারা এখন লেখাপড়ার কাজ করছে তারাই ব্রাহ্মণ, প্রশাসনের কাজে যারা নিযুক্ত তারাই ক্ষত্রিয়, আর যারা ব্যবসা বাণিজ্য করছে তারা সবাই বৈশ্য। আগে শূদ্রের যত কর্ম ছিল সেগুলো সব এখন বৈশ্যরা নিয়ে নিয়েছে। যেমন শূদ্রদের একটা প্রধান কাজ ছিল ঘরদোর পরিষ্কার করা, সেগুলো এখন করছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন। এগুলো সরবরাহ করছে বৈশ্যরা। সেইজন্য শূদ্র বর্ণের ধারণাটা আমাদের এখন ভুলে যেতে হবে, শূদ্র এখন এই তিনটে বর্ণের মধ্যে মিশে গেছে। বর্তমান যুগে শূদ্র বলে পরিচয় দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকরিতে সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার জন্য। পরম্পরাগত শূদ্র বংশ থেকে কেউ যদি আইএএস হয়ে যায় সেতো এখন কর্মের দিক দিয়ে ক্ষত্রিয় হয়ে গেল, তার সব কাজকর্ম ক্ষত্রিয়ের মতই হবে।

মনুর সময় জীবন অন্য রকমের ছিল। তোমাকে এখন দ্বিজ বানানো হয়েছে, মুঞ্জ পরান হয়েছে, উপনয়ন করান হয়েছে, তুমি যদি এখন সকাল, দুপুর ও বিকাল এই ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ যদি না করো তখন তুমি শূদ্রের মত বহিষ্কারের যোগ্য হয়ে যাবে। শূদ্রকে যেমন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, কেন ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না? কারণ তুমি পরিষ্কার নও, তুমি অশুদ্ধ। সেই রকম যে দ্বিজ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছে না সেও অশুদ্ধ, তাই তাকে বহিষ্কার করবে, শূদ্রকে যেভাবে বহিষ্কার করা হয় ঠিক সেইভাবে তাকে বহিষ্কার করবে।

জপ-ধ্যানের উদ্দেশ্য

অপাং সমীপে নয়তো নৈত্যকং বিধিমাঙ্কিতঃ।

সাবিত্রীমপ্যধীয়াত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।।২/১০৪

দ্বিজ নির্জন অরণ্যে গিয়ে নদী, দীঘি, ঝরণা প্রভৃতি জলাশয়ের কাছে গিয়ে, ইন্দ্রিয়সংযম করে অনন্য মনে প্রণবের সাথে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবেন। আমরা যারাই জপধ্যান করি বেশীর ভাগের কাছে জপধ্যান করার উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। হয় গুরুর আঙা পালন করা আর নয়তো সবাই জপ করে আমাদের জপ করতে হবে, এর বাইরে জপ করার যে একটা উদ্দেশ্য আছে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। ব্রহ্মচার্য হওয়ার সময় ব্রহ্মচারীকে একটা মন্ত্র দেওয়া হয় যেখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে – আমি যে জপধ্যান করছি এর একটাই উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা। এখানে মনু বলছেন – যখন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবে তখন তুমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে জপ করবে, মন কোন দিকে নড়াচড়া করবে না। কিন্তু তার সাথে বলছেন নৈত্যকং, গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা আমার নিত্যকর্ম তাই আমি জপ করছি। আমাদের মঠে জপধ্যানের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা। এখানে বলছেন তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকবে, যদিও ব্যাপারটা একই। আমাদের সবারই জপধ্যানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা। যদি কেউ ঠিক করে থাকেন আমার জপধ্যানের উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বর দর্শন করা, তখন এগুলো মুখের কথাই হয়ে থাকবে। কারণ ঈশ্বর দর্শনই যদি উদ্দেশ্য হয় তখন কেবল সকাল বিকাল একশ আটবার নিশ্চয়ই জপ করবে না। তাকে সারাটা দিন পুরো এই জপধ্যানের উপরই লেগে থাকতে হবে। কিন্তু যখন নিজের মনকে একাগ্র করার উদ্দেশ্য নিয়ে জপধ্যান করা হয় তখন ওই একাগ্র চিত্তের সাহায্যে মনটা আমার সারাদিন সজাগ থাকে। একাগ্র চিত্ত করাটা একটা প্রাত্যহিক অনুশীলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। একাগ্র চিত্ত হতে হতে মানুষ ক্রমশ শুদ্ধি লাভ করতে থাকে, যত শুদ্ধি হতে থাকবে তত সে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। এই শুদ্ধি প্রাপ্তির প্রচেষ্টা যে দ্বিজ নিয়মিত করবে না সেই দ্বিজের প্রতি তোমার ব্যবহার হবে শূদ্রের মত।

বেদবিদ্যা লাভের যোগ্যতার বিচার

বেদারম্ভ হয়েছে বলে এখন ব্রহ্মচারীর ধর্মের কথা চলছে। একজন আচার্যের কাছে কোন ব্রহ্মচারী বেদ অধ্যয়ন করতে এসেছে, সেই আচার্য বা গুরুর উদ্দেশ্য বলছেন –

ধর্মার্থো যত্র ন সত্যাতং গুরুশ্চা বাপি তদ্বিধা।

তত্র বিদ্যা ন বপুব্যা শুভং বীজমিবোষরে।।২/১১২

যদি দেখ শিষ্যের মধ্যে ধর্ম নেই আর অর্থ নেই, তাহলে সেই শিষ্যকে বিদ্যাদান করা সঙ্গত হবে না। এটা আশ্চর্যের যে এখানে কেন ‘অর্থ’ শব্দটা নিয়ে এসেছেন ঠিক পরিষ্কার নয়। হয়তো বোঝাতে চাইছেন, যার টাকা পয়সা আছে তা সত্ত্বেও সে বেদ অধ্যয়ন করতে আসছে তার মানে বিদ্যার প্রতি তার আগ্রহ আছে। যার টাকা পয়সা নেই তার ধর্মের ভাব আছে। যেটা আমরা সত্যকামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। সত্যকাম যখন গুরুর কাছে বিদ্যার্জনের জন্য গিয়েছে তখন গুরু তাকে জিজ্ঞেস করেছেন তুমি কোন গোত্রের। সত্যকাম গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করার পর গুরুর কাছে বলছে আমার মা জানে না আমার কি গোত্র। গুরু তখন বলছেন – ব্রাহ্মণ ছাড়া এই রকম সত্য কথা কেউ বলতে পারে না। এটাই ধর্ম। শ্রীশ্রীমা বলছেন যার আছে সে মাপো, যার নাই জাপো। তার মানে অর্থ থাকতে হবে, অর্থ না থাকলে ধর্ম থাকতে হবে। কামের তো কোন প্রশ্নই নেই, কারণ সে ব্রহ্মচারী ধর্মে দীক্ষিত। কিন্তু যার না আছে অর্থ, না আছে ধর্ম এই রকম শিষ্যকে যদি বেদ শিক্ষা দাও সেটা হবে উষরে বীজ বপনের মত। তার মানে, তার না আছে আচার-ব্যবহার, না আছে শুভ সংস্কার, না আছে ধর্মের ভাব। অন্য দিকে টাকা-পয়সাও নেই। যার টাকা-পয়সা আছে, তার মানে তার বংশের একটা সংস্কৃতি আছে, সে প্রাচুর্যের সুখ ত্যাগ করে গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে এসেছে। তার মধ্যে অভদ্র আচরণের সংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু সেটাকে অনুশাসনের দ্বারা শুধরে নেওয়া যেতে পারে। এখানে আবার বলছেন ধর্মার্থো যত্র, তার মানে হতে পারে ধর্ম আর অর্থ দুটোই থাকতে হবে। আসলে মূল ভাব হল যারা অপদার্থ তাদেরকে বেদের শিক্ষা দেবে না।

এখানে আবার বলছেন গুরুজি বাপি, ধর্ম আর অর্থ না থাকতে পারে কিন্তু আমি গুরুর সেবা করে সেটা পুষিয়ে দেব। না আছে তার অর্থ, না আছে ধর্ম আর না আছে সেবার ভাব। ধর্ম ও অর্থের সাথে সেবার ভাব হল তৃতীয় শর্ত। এই তিনটেই হল বেদ শিক্ষা লাভের ঠিক ঠিক পাত্রতা। এই তিনটে যদি না থাকে, বা একটা যদি না থাকে তাকে বলা হচ্ছে অপাত্র। অপাত্রে কখনই বিদ্যা দান করতে নেই।

বিদ্যায়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।

আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ।।২/১১৩

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যা দান না করে অর্থের অভাবে অভুক্ত থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নিক কিন্তু তবুও এই রকম অপদার্থ অপাত্রে বিদ্যা দান যেন না করে। অপাত্রে বেদকে দান করতে খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করা হচ্ছে। বিদ্যা বলতে এখানে সরস্বতী শব্দ আনছেন না, বিদ্যা বলতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণকে বলছেন –

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাং সেবধিস্তেহস্মি রক্ষ মাম্।

অসূয়কয়া মাং মা তাস্তথা স্যাং বীর্যবত্তমা।।২/১১৪

মানুষ যখন প্রচুর অধ্যবসায় আর সাধনার দ্বারা কোন বিদ্যা অর্জন করে তখন সেই বিদ্যাটা তার কাছে একটা বিরাট সম্পদ। যে পিএইচডি করছে কিংবা মাস্টার ডিগ্রী করছে, ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা করার জন্য তাকে খাটতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শেষের এই চার পাঁচ বছর চোখ-কান বুজে যে নিষ্ঠা ও অমানুষিক পরিশ্রম করে যখন এই ডিগ্রী পাচ্ছে তখন এটাই তার কাছে এক বিরাট সম্পদের মত হয়ে যায়। তার এই সম্পদকে চোর ডাকাতরা নিতে পারবে না, ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা এর উপর কর বসাতে পারবে না। আগেকার দিনে, এমনকি এখনও গ্রামের দিকের অনেক হাসপাতালে কম্পাউন্ডরা রোগীর চিকিৎসার জন্য এটা সেটা অনেক কিছুই করে দিচ্ছে, তাদের কোন প্রশিক্ষণও নেই, তবুও অনেক কিছুই করে দিচ্ছে। কিন্তু ইদানিং মানুষ অনেক সচেতন হয়ে গেছে। এখন যদি হাতুড়ে ডাক্তাররা কোন সার্জেনকে এসে বলে ডাক্তারবাবু আমাকে কিডনীর অপারেশনটা শিখিয়ে দিন। তখন শল্য চিকিৎসা বিদ্যার দেবী এসে শল্যবিদ ডাক্তারকে বলবে – দেখো আমি হল্যাম শল্য চিকিৎসা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি মরে যাও বাপু তবু আমাকে অপাত্রে ছেড়ে দিও না, এরা কাকে কাকে মেরে বেড়াবে ঠিক নেই। আমি তোমার সম্পদ, তোমার মধ্যে আমি প্রতিষ্ঠিত, তোমার অধিকার আছে যাকে তাকে এই বিদ্যা হস্তান্তর করার, কিন্তু এরকমটি তুমি করতে যেও না।

এই শ্লোকে এটাই বলছেন, সেবধিস্তেহস্মি রক্ষ মাম্, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার নিধিস্বরূপ, তুমি আমাকে যত্নপূর্বক রক্ষা কর। অসূয়কয়া মাং মা, যারা আমার নিন্দা করে তার কাছে আমাকে ছেড়ে দিও না। অনেক সময় দেখা যায় বাবা-মা তাদের মেয়ের একটা বাড়িতে বিয়ের ঠিক করেছে, মেয়েটি জানতে পেরে বাবা-মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে – বাবা গো! আমাকে ওই বাড়িতে বিয়ে দিও না। কিংবা বিয়ে দেওয়ার পর বাপের বাড়ি এসে কাঁদছে – ওরকম বাড়িতে কেন আমায় বিয়ে দিতে গেলে। ঠিক সেই রকম বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলছেন – এমন কোন কারণ আছে আমাকে ছেড়ে দিও না, যে আমার মূল্যের ব্যাপারে অজ্ঞ, আমার নিন্দা করে। যদি ধর্ম, অর্থ আর সেবার ভাব না থাকে তাহলে সে এই বিদ্যা পাওয়ার যোগ্য নয়। আমাকে ভরণ-পোষণ করার যোগ্যতা তার মধ্যে নেই। যদি তুমি আমাকে এই রকম অপাত্রের হাতে আমাকে ছেড়ে দাও আমি নষ্ট হয়ে যাব। যদি ঠিক পাত্র দান কর তাহলে আমি বীর্যবত্তমা, তাহলে আমি বীর্যবৎ হব। বীর্যবৎ হওয়া মানে, মানুষ যখন তার সঞ্চিত টাকা বিনিয়োগ করতে যায় তখন ভালো করে দেখে নেয় এখানে টাকা রাখলে আমি কত সুদ পাব, যখন ম্যাচিওরড হবে তখন কত রিটার্ন পাব। আগে মানুষ শেয়ার মার্কেট ও মিউচুয়াল ফাণ্ডে টাকা রেখে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। এখন টাকা রাখার আগে তাই সব খোঁজ খবর নিয়ে সেখানেই টাকাটা বিনিয়োগ করে যাতে আমার টাকাটা বাড়তে থাকে। বিদ্যাও বলছে, আমাকে এমন লোকের কাছে দিও না যেখানে আমি দুর্বল হয়ে যাব, কারণ সে আমার সম্মান জানে না। কিন্তু উপযুক্ত

লোকের কাছে আমাকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে আমি দিনে দিনে বীর্যবন্ত হব। আমাদের দেশে যত নামকরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ আছে ভর্তি করার আগে সেখানে অনেক রকম পরীক্ষার দ্বারা সেরা ছাত্রদের বেছে তাদের সংস্থায় ভর্তির সুযোগ দেয়। এর একটাই কারণ, বিদ্যা যাতে বীর্যবন্তী হয়। কিন্তু ইদানিং অনেক সংস্থা বিদ্যাকে টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য প্রচুর টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ছাত্রদের ভর্তি করাচ্ছে। বেশীর ভাব ছাত্রের মনোভাব হলে কিভাবে একটা ডিগ্রী নিয়ে একটা মোটা মাইনের চাকরী পেতে পারি। ভালো শিক্ষকরা তাদেরকেও পড়াবেন, তাতে তাঁরা কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ তিনি যদি দেখেন কোন ছাত্রের মধ্যে বিদ্যার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ আছে, তারও ইচ্ছা আছে চাকরী না করে আমি রিসার্চ করব, তার হয়ত ইচ্ছা আছে মাইনে কম হোক কিন্তু আমি প্রফেসর হয়ে শিক্ষা জগতেই থাকব। তখন এই ধরনের প্রফেসররা এই সব ছাত্রের কাছে তাঁদের বিদ্যাটা পুরো ঢেলে দেন। কারণ তিনি জানেন, আমি যে বিদ্যাকে নিয়ে এত বড় হয়েছি, আমার কাছে সেই বিদ্যাকে গ্রহণ করার জন্য সৎ পাত্র এসে গেছে। অধ্যাপনার জীবনে এই ধরনের ছাত্র খুব কম পাওয়া যায়, যারা বিদ্যাটাকে গ্রহণ করতে চাইছে। এই ধরনের ছাত্রের হাতে পড়ে বিদ্যা বীর্যবন্তী হয়। যখন ওই বিদ্যাকে অন্য কাজে লাগান হচ্ছে তখন বিদ্যা বীর্যবন্তী হয় না।

আমেরিকাতে একটা বাধ্যতামূলক নিয়ম আছে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে, বা ভূগোল, অর্থনীতি নিয়ে ডিগ্রী কোর্সে পড়ছে তাদের সবাইকে দর্শনের মত একটা কোন বিষয় নিতে হয় অথচ তারা এই সাবজেক্টটাকে একেবারেই পছন্দ করে না। আমাদের শাস্ত্র মতে হল, তুমি যদি এই সাবজেক্টের শিক্ষক হও তাহলে এই ধরনের ছাত্রদের পড়াতে যেও না, এই বিদ্যা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বেদের ব্যাপারে এখানে যেটা বলা হচ্ছে এর মধ্যে কিছুটা তফাৎ এসে যাচ্ছে। কারণ আমেরিকাতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র বা অঙ্কের ছাত্রের কাছে দর্শন শাস্ত্র পাট টাইম। কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে একমাত্র এটাই তার সাবজেক্ট, আর বছরের পর বছর অধ্যয়ন করে যেতে হবে, আর এটাই তার সারা জীবনের সাধনা, পরম্পরাতে যেটা চলে আসছে তার মতই তাকে চলতে হবে। তখন আবার বেদ লেখা হতো না, বেদ গুরুমুখী বিদ্যা, তাই একটা অপাত্রে যদি বেদের বিদ্যা চলে যায়, পুরো বিদ্যাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বেদের বিদ্যা অত্যন্ত মূল্যবান এবং গূঢ় বিদ্যা, যে বিদ্যার উপর মানবজাতির পুরো কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুষ্টি নির্ভর করে আছে, অন্য কোন বিদ্যার উপর সমাজ এতটা নির্ভরশীল নয়। সেইজন্য স্মৃতিকাররা আগে থাকতেই গুরুকে সাবধান করে দিচ্ছেন, এই বিদ্যা কখন অপাত্রে দান করবে না।

ব্রহ্ম যন্তননুজাতমধীয়নাদবাপুয়াৎ।

স ব্রহ্মস্তুয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে।।২/১১৬

কোন গুরু নিজেই বেদাভ্যাস করে যাচ্ছেন, সেটাকে শ্রবণ করে করে একজন লোক পুরো মুখস্ত করে নিল। দ্বিতীয়, গুরু শিষ্যদের বেদ অধ্যয়ন করিয়ে যাচ্ছেন, বাইরে একজন বসে শুনে শুনে সেই বিদ্যাটাকে অর্জন করে নিল। মনু বলছেন, এটা অত্যন্ত গর্হিত পাপ। কেন গর্হিত পাপ? এই পাপকে বলছেন ব্রহ্মস্তুয়, ব্রহ্মবিদ্যা চুরি, যত রকমের চুরি হতে পারে, সব চুরির থেকে বড় চুরি হল ব্রহ্মবিদ্যা চুরি। এই গর্হিত পাপের ফলে সে অবশ্যই নরকে যাবে। একে আমরা অনেকটা কপি রাইটের মত বলতে পারি, যদিও উপমাটা খুব জুতসই হয় না। লেখক যখন কোন কিছু রচনা করেন, সেই রচনা কিংবা বইটা তখন সেই লেখকের কপি রাইট হয়ে গেল। অন্য কেউ যদি লেখকের অনুমতি ছাড়া ছাপিয়ে বাজারে বার করে তখন লেখক আদালতে অভিযোগ করতে পারে, যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে পুরো ক্ষতিপূরণ লেখককে দিতে হয়। বেদবিদ্যাটাও অনেকটা তাই, এই বিদ্যা পরম্পরাতে চলছে। গুরুর কাছে থেকে শিষ্যকে বেদ পড়তে হচ্ছে, তাকে দক্ষিণা দিতে হচ্ছে, দক্ষিণা দেওয়ার অনেক রকম নিয়ম আছে কিভাবে দক্ষিণা দিতে হবে, এইভাবে তখন কপি রাইট চলে গেল শিষ্যের কাছে, যে শিষ্য বেদকে মুখস্ত করে নিয়েছে। কেউ যদি আড়াল থেকে শুনে শুনে বেদ মুখস্ত করে নেয় তখন তার কপি রাইটের আইন উল্লঙ্ঘন করা হয়ে যাবে।

গুরুজনরা সামনে এলে উঠে দাঁড়ানোর রীতি

উর্দ্ধং প্রাণা হ্যৎক্রামন্তি যুনঃ স্থবির আয়তি।

প্রতুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে।।২/১২০

কোন যুবক বসে আছে, সেখানে কোন বয়স্ক ব্যক্তি যদি এসে যান তখন সেই যুবকের প্রাণ উপরের দিকে উঠে আসে। প্রাণ যদি কারুর উপরের দিকে উঠতে থাকে, আরেকটু বেশী যদি উপরের দিকে উঠে যায় তাহলে তার প্রাণ সংশয় হয়ে যাবে। বয়স্ক ব্যক্তি আসার পর যুবক যেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাল সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ আবার নীচের দিকে নেমে আসবে, আর তাঁকে যদি প্রণাম করে তাহলে প্রাণ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমার থেকে কোন বরিষ্ঠ ব্যক্তির আগমন হয়েছে, আমি বসে থাকলে আমার প্রথম কাজ হল উঠে দাঁড়ান, দ্বিতীয় সুযোগ থাকলে তাঁকে প্রণাম করে নিতে হবে। প্রণাম যদি নাও করা হয় অন্ততঃ সে যেন উঠে দাঁড়ায়। উঠে না দাঁড়ালে প্রাণ উপরের দিকে উঠতে থাকবে, প্রাণ উপরের দিকে উঠতে থাকলে শক্তি ক্ষয় হয়। সেইজন্য আমাদের রীতিতে বাসে ট্রেনে বৃদ্ধদের দেখলে বসার জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, বাড়িতে এলে তাঁকে বসার জন্য আসন দিতে হয়, গুরুজনকে দেখলে উঠে দাঁড়াতে হয়। কেন এই রীতিটা আমাদের পরম্পরাতে চলে আসছে তার ব্যাখ্যা মনু এখানে করে দিলেন, প্রাণ উপরের দিকে উঠে চলে আসে। সুসংস্কৃতি ও ভদ্র আচরণের দ্বারা সমাজকে স্থিতিশীলতা দেওয়ার জন্য মনু অনেক কিছু চাইতেন যে এই রকমটা হোক, তার জন্য তিনি একটা ব্যাখ্যাও দিয়ে দিতেন। সেই ব্যাখ্যাটা বাস্তবিক নাকি মানুষের মনে ভয় দেখানোর জন্য, এটা কিন্তু স্পষ্ট নয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল গুরুজনকে দেখে অবশ্যই উঠে দাঁড়াবে আর পারলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে। এটা করলে প্রাণ স্বাভাবিক থাকে এবং তোমার জীবনও মসৃণ ভাবে এগিয়ে চলবে।

পথ ছেড়ে সম্মান দেওয়ার পর্যায়ক্রম

এরপর বলছেন এক অপরকে কিভাবে সম্বোধন করবে। এগুলো এক এক অঞ্চলে এক এক রকম রীতি মেনে চলা হয়, সেইজন্য এর খুব একটা গুরুত্ব নেই। এরপর বলছেন রাষ্ট্রায় কে কাকে পথ দেবে –

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।

স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পস্থা দেয়ো বরস্য চ।।২/১৩৮

রথ, তা যে কোন ধরনের রথই হোক না কেন তাকে আগে যেতে দিতে হবে। কারণ পশু দ্বারা রথ চালান হচ্ছে বলে তাকে এই অগ্রাধিকার দিতে হয়। আমি রাষ্ট্রার মাঝখান দিয়ে চলেছি আর একটা ঘোড়ার গাড়ি আমার পেছনে পেছনে আসছে, আমাকে রাষ্ট্রা থেকে সরে এসে ঘোড়ার গাড়িকে রাষ্ট্রা দিতে হবে। যে কোন গাড়িকে আগে রাষ্ট্রা ছেড়ে দিতে হবে। নব্বুই বৎসর থেকে বেশী বয়স্ক ব্যক্তি যদি আসে আগে তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। কেউ যদি অসুস্থ থাকে, রোগী বা কেউ মাল বহন করছে, কোন নারী যদি থাকে, আর স্নাতক অর্থাৎ বিদ্যার্থী যদি থাকে, রাজা এবং বর, যে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এদেরকে আগে পথ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এদের মধ্যে অগ্রাধিকারের আবার তারতম্য আছে –

তেষাস্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতক পার্থিবৌ।

রাজ-স্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্।।২/১৩৯

এরমধ্যে সব থেকে অগ্রাধিকার পাবে রাজা আর স্নাতক। রাজা আর স্নাতক যখন রাষ্ট্রা দিয়ে যাবে তখন সে কিন্তু কাউকে পথ দেবে না। তার মধ্যে আবার বলছেন স্নাতক আর রাজা যদি রাষ্ট্রায় মুখোমুখি হয়ে যায় তখন স্নাতককে রাজা আগে পথ ছেড়ে দেবে, স্নাতক চলে যাওয়ার পর রাজা যেতে পারবে। ব্রাহ্মণ যুবক, হাতে দণ্ড নিয়ে চলেছেন, দণ্ড দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইনি একজন ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর জন্য সবাইকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। অন্য অন্য স্মৃতিশাস্ত্রে আরও কড়া করে বলা হয়েছে – রাজা হয়ত রথে করে যাচ্ছে, যদি দেখে নেয় সামনে থেকে স্নাতক আসছেন তখন রাজাকে রথ দাঁড় করিয়ে রথ থেকে নেমে আসতে হবে। স্নাতক

রাষ্ট্রা পেরিয়ে যাবার পর রাজা আবার রথে আরোহণ করবে তারপর রথ চালিয়ে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে যাবে। এই দেশে তখন বিদ্যার প্রতি এত সম্মান ছিল। কিন্তু আজ আমরা বিদ্যাকে কোথায় নামিয়ে এনেছি। রিচার্ড ফাইনম্যান বিরাট বড় বিজ্ঞানী ছিলেন। তখনও তার খুব নামডাক হয়নি, সবে অধ্যাপনা শুরু করেছেন। সেই সময় তিনি একবার এক জিউ পরিবারের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে বলছেন, আজকে আমার বিরাট সৌভাগ্যের দিন, আজ আমেরিকার একজন আর্মি জেনেরালের সাথে দেখা হল আর এই দেখো আমার একজন অধ্যাপকের সঙ্গেও এখন দেখা হয়ে গেল। রিচার্ড ফাইনম্যান লিখছেন – এই সমাজ বিদ্যাকে কত সম্মান দেয়, একজন সাধারণ প্রফেসর আর আর্মির এক জেনেরালকে সমান দৃষ্টিতে দেখছেন, এই সমাজ কোন দিন নষ্ট হতে পারবে না। বিদ্যাকে যে সমাজ সম্মান দেয় সেই সমাজের মধ্যে এমন এক শক্তির বিকাশ হয় যে সেই সমাজকে কেউ কোন দিন কিছু করতে পারবে না। ভারত চিরদিনই বিদ্যাকে প্রচণ্ড সম্মান দিত। মনু ব্রাহ্মণকে যে সম্মানটা দিচ্ছেন সেটা বিদ্যার জন্য। এমন কি রাষ্ট্রা দিয়ে যখন ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী অর্থাৎ ব্রহ্মচারী দণ্ড হস্তে যাবেন তখন রাজাকে বলা হচ্ছে তোমাকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, আগে ওই ব্রহ্মচারী স্নাতককে যেতে দাও। এমনকি নব্বুই বছরের বৃদ্ধ যাচ্ছেন, কন্যা যাচ্ছে, রোগী যাচ্ছে, বর যাচ্ছে, সর্ব্বাইকে স্নাতককে আগে পথ ছেড়ে দিতে হবে। স্নাতকের পেছনে রাজা, তারপর বাকিরা যাবে। সাধারণ মানুষ সবার শেষে।

তুমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, সংস্কারের দ্বারা সুসংস্কৃত হয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও

মনু এই ব্যাপারে একেবারে প্রচণ্ড দৃঢ় যে মানুষ যদি শুদ্ধ পবিত্র না থাকে তাহলে সে পশুর মত। একটা সংস্কৃতিকে পশুস্তর থেকে তুলে উপরের দিকে নিয়ে আসতে কত হাজার বছর লাগে। মনু এটাই দেখিয়েছেন, মানুষ বিভিন্ন সংস্কারের দ্বারা পশুস্তর থেকে উন্নীত হয়ে কিভাবে মানুষের স্তরে আসতে পারে আবার মানুষের স্তর থেকে দেবতার স্তরে পৌঁছাতে পারে। আমরা যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা করছি এখানে এই সংস্কারের কথাই বলা হচ্ছে। মনুস্মৃতির এই একটা সমস্যা আছে, এখানে অনেক রকম শ্লোক মিলে মিশে গেছে, একটা বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করতে করতে দুম্ করে অন্য একটা বিষয়কে নিয়ে আসা হয়েছে, একটু পরেই আবার সেই আগের বিষয়ে চলে যাবে। এদিক থেকে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনেক গোছান। মনুস্মৃতি আলোচনার উদ্দেশ্য হল ভারতের মানুষ জীবনকে নিয়ে কি ভাবতেন, উচ্চতম জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা কি ধরনের জীবন-যাপনের প্রণালীকে অনুসরণ করতেন দেখা। ইদানিং জেহাদ, মানববোমা এই ধরনের শব্দ সম্বন্ধে আমরা সবাই ধাতস্থ হয়ে গেছি। যারা নিজেদের জেহাদী বলছে, মানববোমা তৈরী করে বিধর্মীদের মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে, এদের একটা স্পষ্ট জীবনদর্শন আছে – আমরা হলাম এই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি, এই জগতের অধিপতি হলাম আমরা। বর্তমানের যে পাশ্চাত্য শক্তি নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী বলে মনে করছে, এরা প্রথম থেকেই এক বর্বর জাতির অনুচর, আমাদের কাছে এরা কিছুই নয়। এই চিন্তা-ভাবনাগুলো এদের রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে। তার সাথে সাথে এরা বিশ্বাস করে, আল্লাই একমাত্র সত্য, আল্লার কাছে পৌঁছানই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মহম্মদ হলেন আমাদের নেতা যিনি আমাদের আল্লার কাছে নিয়ে যাবেন। জেহাদ হল ওখানে পৌঁছানোর পথ আর শহীদ হয়ে যাওয়াটা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন – *জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম*, আবার অন্যত্র বলছেন *জিত্বা শত্রুন্ ভুঞ্জ্য রাজ্যং সমৃদ্ধম্*, তুমি যদি মরে যাও তাহলে স্বর্গ লাভ করবে আর যদি জয় লাভ কর তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পেয়ে গিয়ে সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য ভোগ করবে। জেহাদীরাও এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের পথটা আলাদা। এদের জীবনের আদর্শই হল ইসলামের জন্য আমি শহীদ হতে চাই। সমস্ত জেহাদীদের কাছে এটা পরিষ্কার, আল্লাই সত্য, আল্লার কাছে পৌঁছানই জীবনের একমাত্র ধর্ম, মহম্মদ আমাদের নেতা যিনি আমাদের ওখান পর্যন্ত নিয়ে যাবেন আর জেহাদ হল এর পথ। শহীদ হয়ে যাওয়াটা সব থেকে বড় ধর্ম।

মনু ঠিক সেই ভাবেই হিন্দুদের একটা দর্শন দিচ্ছেন। সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, কিন্তু মায়ার আবরণের জন্য তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট জীব রূপে ভাবছ। তোমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব

কিছুকে পরিষ্কার করে যদি শুদ্ধি করা হয় তাহলে এই মায়ার মিথ্যা আবরণ যা কিনা তোমার সত্য স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে, সেই মিথ্যা আবরণটা সরে গিয়ে আবার তোমার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মুসলমানরা যেটা বলছে, জেহাদটাই পথ, শহিদ হয়ে যাওয়াটাই ধর্ম, মনুস্মৃতিতে ঠিক তাই বলা হচ্ছে তবে অন্য ভাবে। তোমার এই যে বর্তমান শরীরটা আছে, এটাকে মারতে হবে। যিশুরও একই বাণী – The old man has to die। মনু বা যিশু এখানে নিজেকে মানববোমা বানিয়ে বা গুলি করে কাউকে মারতে বলছেন না। এই শরীরে, মনে, ইন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে যে অপবিত্রতার ভাব আছে এটাকে সংস্কার করতে হবে। এগুলো যেমন যেমন সংস্কৃত হবে তেমন তেমন সে প্রার্থনা ও ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হবে। ধ্যান ও প্রার্থনার জন্য প্রস্তুতি হয়ে গেলে তখন কিন্তু সে তার জীবনের যে উদ্দেশ্য, যেখানে তার পৌঁছানোর কথা সেখানে পৌঁছাতে পারবে। অন্যান্য ধর্মের সাথে এখানে হিন্দুদের বিরাট তফাৎ, হিন্দুদের ধর্ম অত্যন্ত শান্ত ও অহিংস ধর্ম। যার জন্য পদে পদে মনু হিংসা করাকে নিন্দা করবেন। সংস্কার বিধিকে অবলম্বন করে যে যত সুসংস্কৃত সে তত উন্নত।

মনুর কাছে উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করা। তুমিই সেই শুদ্ধ আত্মা, পূর্ণব্রহ্ম, তোমার এই স্বরূপকে জানতে হবে। জানার পথ হল শুদ্ধতা আর পবিত্রতা। শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়ে যে যত শুদ্ধ পবিত্র হবে সে তত তার নিজের স্বরূপকে জানার ব্যাপারে এগিয়ে যাবে। মনুর কাছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেন তিনি যিনি সব সংস্কার বিধিকে সম্পন্ন করে নিজেকে শুদ্ধি করে নিয়েছেন। যাঁর সব শুদ্ধি হয়ে গেছে তিনি তো খুব সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে গেলেন। ইসলামে কে সব থেকে সম্মানিত – যদি কেউ বলে আমি, আমার পুরো পরিবার, আমার পুরো গ্রাম, আমার পুরো জেলা ইসলামের জন্য শহিদ হয়ে যাবে, সে তত সম্মানিত তাতে কোন সন্দেহই নেই। যে ধর্ম যেটাকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে, যে সেই ধর্ম যত পালন করবে সে তত সম্মান পাবে। যেমন বৈষ্ণবদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা সাধনা হল বিনয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁর বিনয় যত বেশী সে তত শ্রেষ্ঠ। হিন্দু সমাজে যার যত বেশী সংস্কার হয়ে সে তত বেশী শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদের মধ্যে তাই সন্ন্যাসীদের বেশী সম্মান। সবারই মৃত্যুর আগে পনেরটি সংস্কার করতে হত। সবারই পনের নম্বর সংস্কার হত না, তেরো নম্বর সংস্কার পর্যন্ত গৃহস্থের জন্য, তারপরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কিন্তু যার পনের নম্বর সংস্কার হয়ে গেছে সে আরও শুদ্ধির দিকে চলে গেল, আর সন্ন্যাস হল পনের নম্বর সংস্কার এবং শেষ সংস্কার অর্থাৎ ষোল নম্বর সংস্কার হল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

এখন এক একটি অবস্থায় তাকে যে সংস্কার পালন করতে হচ্ছে, যেমন ব্রহ্মচারী অবস্থায় সে কিভাবে থাকবে, স্ত্রীকে স্বামী কিভাবে দেখবে, আচার্যকে কিভাবে দেখবে, মাকে কিভাবে দেখবে এগুলোও সব সংস্কারের মধ্যে পড়ছে। ব্রহ্মচারী যদি তার ধর্ম পালন না করে তাহলে আচার্য তাকে আশ্রম থেকে বার করে দেবেন, তার মানে তার ব্রহ্মচর্য অসম্পূর্ণ থেকে গেল, তার সংস্কারও শেষ হল না। হিন্দু মতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা হয় সংস্কার দিয়ে, যার যত বেশী সংস্কার হবে সে ততো শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদের সংস্কার স্বাভাবিক ভাবেই বেশী হবে, তাদের যজ্ঞ উপবীত হবে, তাদের বেদারম্ভ আছে, সমাবর্তন সমারোহ আছে। এর বাইরে তাদের কত জপ-ধ্যান, আজকে এই উপবাস, আজকে অমুক পার্বণ কত কি সংস্কার বিধি পালন করতে হয়, সেই কারণে ব্রাহ্মণদের সম্মানও সবার থেকে বেশী। মনুস্মৃতির এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে না পেরে মনুর বিরুদ্ধে অযথা গালমন্দ করা হয়। আজকে যার ক্ষমতা প্রতিপত্তি বেশী তাকেই আমরা সম্মান করি, প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রপতি তাই তাঁর সম্মান বেশী। এনাদের কাছে ছিল যার যত বেশী সংস্কার হয়েছে তার সম্মান তত বেশী। সংস্কার বলতে মানসিক স্তরের সংস্কার নয়, শারীরিক দিক দিয়ে যার সংস্কার বেশী হয়েছে সেই কিন্তু বেশী সম্মানের পাত্র। আমরা যে ১৩৮ নম্বর শ্লোকে আলোচনা করেছি সেখানে দেখছি কাকে কাকে রাষ্ট্রায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পথ ছেড়ে দিতে হবে। পরের শ্লোকে বলছেন – তেষাস্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতক পার্থিবৌ আগের শ্লোকে যে ব্যক্তিদের নাম করা হয়েছে তাদের যদি এক কালে পথের মধ্যে দেখা হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে রাজা আর স্নাতককে সর্বাপেক্ষা মান্য করা হবে। স্নাতক মানে গুরুগৃহ থেকে যার সমাবর্তন সংস্কার অল্পকাল আগে সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু পরের শ্লোকে বলছেন রাজা আর স্নাতক যদি একত্রে উপস্থিত হয় তাহলে স্নাতক রাজার থেকে বেশী সম্মান পাবেন। এই শ্লোকে এটাই দেখানো যে তৎকালীন সমাজ বিদ্যাকে কত বেশী সম্মান দিত।

প্রথম থেকেই বিশেষ কোন উৎসবে পার্বনে বেলুড় মঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বড় বড় ওস্তাদ শিল্পীদের নিয়ে আসার রেওয়াজ ছিল। স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সময় একদিন এই রকম কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বড় শিল্পী এসেছিলেন। আরতির পর উনি প্রায় এক ঘণ্টা পুরনো মন্দিরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ গান শুনতে শুনতে ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে গেছে। অনুষ্ঠানের শেষে মহাপুরুষ মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, আর তাঁর সামনে সামনে দুজন কম বয়সী সাধুও সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। নামার সময় ওই গায়কের কণ্ঠকে বিকৃত করে নকল করতে করতে নামছিলেন। একেই অল্প বয়সী তার উপর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত না বুঝলে যা হয় – কি গাইছে! খালি এ্য এ্য এ্য করে যাচ্ছে। দুজনের কেউই দেখেনি যে মহাপুরুষ মহারাজ পেছনেই রয়েছেন। মহাপুরুষ নিজের ঘরে এসে সেবককে বললেন – আমি আজই মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমি আর বেলুড় মঠে থাকব না। সেবকরা শুনে তো প্রচণ্ড অবাক হয়ে ঘাবড়ে গেছে। সেবকদের মহারাজ বলছেন – ‘যে স্থানে বিদ্যার সম্মান নেই সেখানে কখন ঠাকুর অবস্থান করবেন না’। ঠাকুর যখনই শুনতেন অমুকের মধ্যে এই বিদ্যাটা ভালো, একজন খুব সুন্দর রুদ্রবীণা বাজাতেন, ঠাকুর তাঁকে দেখতে ছুটে গেলেন, বিদ্যাসাগরের অত গুণের কথা শুনে তিনি ছুটে গেলেন বিদ্যাসাগরকে দেখতে। গিরিশ ঘোষের কাছে পৌঁছে গেলেন সে নাকি ভালো নাটক লেখে আর অভিনয় করে। ঠাকুর ছিলেন গুণগ্রাহী। মহাপুরুষ মহারাজ তাই বলছেন, এই মঠে বিদ্যার সম্মান আর নেই, ঠাকুর আর এখানে নেই, ঠাকুর যেখানে নেই আমিও সেখানে নেই। সেবকরা মহারাজের কথা শোনার পর মঠে আলোড়ন পরে গেছে। ডাইনিং হলে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কে এই রকম করেছেন যে, মহাপুরুষ বলছেন মঠ ছেড়ে চলে যাবেন। এই দুজন ব্রহ্মচারী তো ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে গেছে। ব্রহ্মচারী দুজন পরে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করল, আমাদের প্রচণ্ড ভুল হয়ে গেছে। দুজন তখন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে পায়ে ধরে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিল – আমরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালো বুঝি না বলে ভুল করে ফেলেছি, আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে, আর কোন দিন এই ভুল হবে না। এইভাবে কোন ভাবে পরিস্থিতি সামল দেওয়া হয়েছিল।

শুধু ভারতেই নয়, যে কোন প্রাচীন সভ্যতার এটাই চরিত্র যেখানে বিদ্যার সম্মান সবার উপরে রাখা হয়। জুহুদের মধ্যেও দেখা যায় তারাও বিদ্যাকে, সে যে কোন বিদ্যাই হোক, খুব বেশী সম্মান দেয়। এর পর আচার্য কত প্রকারের হয় তার একটা বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথমে বলছেন –

আচার্য কত রকমের এবং মায়ের স্থান

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিজঃ।

সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে।।২/১৪০

যিনি শিষ্যের যজ্ঞ উপবীত করান, আর তার সাথে কল্পবিদ্যার শিক্ষা দেন, কল্প বিদ্যা হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ইত্যাদি ছাড়া বেদাঙ্গ এবং বেদ পড়ান তাঁকে বলা হয় আচার্য। তাহলে আচার্য কে? যিনি বেদ, বেদাঙ্গ পড়ান এবং যজ্ঞ উপবীত করান। আগেকার দিনে আচার্যের কাছে যখন কেউ বিদ্যার্জনের জন্য যেত তখন আচার্যই তাকে যজ্ঞ উপবীত দিয়ে দীক্ষা দিতেন, যজ্ঞ উপবীতটা চিহ্ন, আমার এই শিষ্য এখন ব্রহ্মচারী অবস্থায় আছে। বেলুড় মঠে যখন প্রথম কেউ প্রবেশ করে তখন প্রথমে তার মস্তক মুণ্ডিত করিয়ে দেওয়া হয়, তার মানে সে এখন ব্রহ্মচারী। এর কিছু দিন পর তাকে উপনয়ন করিয়ে দেওয়া হয়, তারও কিছু দিন পর তাকে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতে দেওয়া হয়। যিনি শিষ্যকে যজ্ঞ উপবীত ধারণ করিয়ে দিতেন আর বেদ অধ্যয়ন করাতেন, বেদের সাথে কল্প, কিভাবে যজ্ঞাদি করতে হবে শিক্ষা দিতেন তাঁকে আচার্য বলা হত।

একদেশস্ত বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।

যোহদ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে।।২/১৪১

এঁরাই যখন জীবিকার জন্য যজ্ঞ উপবীত না করিয়ে কোন শিষ্যকে বেদের কিছু অংশ অধ্যয়ন করিয়ে দিলেন, কিংবা কেবল বেদাঙ্গ গুলি অধ্যয়ন করাতেন এঁদেরকে বলা হয় উপাধ্যায়। একদেশ শব্দের আবার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে, শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ অংশের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু উদ্দেশ্য কিছু উপার্জন করা।

নিষেকাদীনি কর্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।

সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুচ্যতে।।২/১৪২

যিনি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যেমন বিধি তেমনই করান, তাঁকে বলছেন গুরু। তিনটে স্তরের কথা বলছেন – আচার্য, উপাধ্যায় আর গুরু। এখানে অনেক সময় পিতাকেও গুরু রূপে গণ্য করা হয়, কারণ পিতাও অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিষগুলো করিয়ে দিতেন। তবে পিতাকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। গর্ভাধান সংস্কারের মত সংস্কার যে সব সময় গুরুই এসে করিয়ে দিতেন তা নয়, অনেক সময় বাবাও করিয়ে দিতেন। তাই পিতাকেও গুরু বলা হত। এর পরের স্তর হল –

অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মথান্।

যঃ করোতি ব্রূতো যস্য তস্যত্বিগিহোচ্যতে।।২/১৪৩

যাঁরা কোন একটা ব্রত নিয়ে কারুর কোন সংস্কার অনুষ্ঠান বা পূজো করিয়ে দেন এঁদেরকে বলা হত ঋত্বিক। ইদানিং যাঁরা পুরোহিতের কাজ করে তাঁদেরকেই তখনকার দিনে ঋত্বিক বলা হত। এর পর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন –

উপাধ্যায়ন্ দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।

সহস্রং তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে।।২/১৪৫

দশজন উপাধ্যায়ের থেকে একজন আচার্য শ্রেষ্ঠ। উপাধ্যায় হলেন তিনি, যিনি জীবিকার জন্য বেদের কিছু অংশ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, আর যিনি উপনয়ন করালেন আর বেদ অধ্যয়ন করাচ্ছেন তিনি আচার্য। আর একশ আচার্য থেকে পিতা শ্রেষ্ঠ। সহস্র পিতা থেকে একজন মা শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরম্পরাতে মাকে কত সম্মান দেওয়া হয় কল্পনাই করা যায় না। আগেকার দিনে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণকেই দক্ষিণাদি নিয়ে বেদ অধ্যয়ন করাতে হত, তাদেরও তো পেট চালাতে হত। শিষ্যের যার যেমন ক্ষমতা ছিল সেই রকম দক্ষিণা দিত। যাদের একেবারেই কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তারা গুরুর আশ্রমে থেকে গুরুর সেবা ও অন্যান্য কাজ করে দিত। উপাধ্যায় বললে ঠিক ঠিক বোঝা যায় যে উনি এখনকার স্কুলের মাস্টারমশাইদের মত। কিন্তু এর আবার ব্যতিক্রমও আছে, সেটাই পরের শ্লোকে বলে দিচ্ছেন –

আচার্য পিতার থেকে শ্রেষ্ঠ কেন

উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোগরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।

ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাস্বতম্।।২/১৪৬

বাবা এই দেহের জন্ম দিয়েছেন, জৈবিক শরীর দিচ্ছেন তাই তিনি শ্রেষ্ঠ এতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু যে আচার্য ব্রহ্মের উপদেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন দিচ্ছেন তিনি পিতার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। তার কারণ পিতা এই দেহটা দিয়েছেন, এই দেহ দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষকে সে অর্জন করবে, শ্রেষ্ঠ জিনিষকে অর্জন করা মানে ভালো, সুস্থ, নীরোগ, সবল শরীর দিয়ে এই জীবনের যা কিছু ভোগ করার করবে। কিন্তু আচার্য যিনি ব্রহ্ম উপদেশ দিচ্ছেন, বেদজ্ঞ তৈরী করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করে দিচ্ছেন, যা স্বর্গে গিয়েও ফল দিতে থাকবে, সেইজন্যই আচার্য শ্রেষ্ঠ। শ্লোকে বলছেন আচার্য ব্রহ্মজন্ম দিচ্ছেন, এখানে ব্রহ্মজন্ম বলতে দীক্ষা দেওয়া হতে পারে, উপনয়ন করিয়ে দেওয়া হতে পারে বা এমন আচার্যও হতে পারেন যিনি ঈশ্বরের চেতনা জাগ্রত করে দিচ্ছেন। যে চেতনার ফলে বুঝতে পারে এই যে জীবন-যাপন করছি এটা কিছুই

নয়, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই আসল। এর যে কোন একটাকেই ব্রহ্মজন্ম বলা যেতে পারে। এর মধ্যে আমি যাকেই মনে করব ইনি আমার ব্রহ্মজন্ম দিয়েছেন তখন তিনিই সবার থেকে শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরের প্রার্থনা ব্যতিরেকে সন্তান সমাজের অভিশাপ

পরের শ্লোকটি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল, অনেক জায়গায় তিনি এই শ্লোকটি উল্লেখ করতেন। এইসব শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আমাদের পূর্বজরা সব কিছুকে কিভাবে দেখতেন –

কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।

সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্ যদ্ যোনাভিজায়তে।।২/১৪৭

যে বাবা মা কামে বশীভূত হয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, সেই সন্তান পশুর মত এবং মায়ের গর্ভে থেকে শরীরের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত করে তার কোন মূল্যই নেই। স্বামীজীও খুব কঠোর ও কড়া ভাষায় বলছেন – ঈশ্বরের প্রার্থনা ছাড়া যে শিশু জন্ম নিচ্ছে সে সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপ নিয়ে এসেছে। এরপরেই অবশ্য মনু বলছেন যে বিধিপূর্বক জন্ম নেয়, অর্থাৎ বাবা মা নানা রকম সংস্কারাদি করার পর সন্তানকে নিয়ে আসছেন, সেই সন্তান অজর অমর। কারণ এই সন্তানই একেবারে বেদ শিক্ষার অধিকার নিয়েই জন্ম নিয়েছে। বেদ অধ্যয়নের যে অধিকারী তার তো মোক্ষের দ্বার খোলা আছে। হিন্দুদের পরম্পরাতে একটা প্রথাই আছে গর্ভে সন্তান এলে মা যেন সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আর ঈশ্বরের খুব স্মরণ মনন করতে থাকে। কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে কাম ভাবনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, এই কাম থেকে যখন সন্তান হবে তখন সেই সন্তানের মধ্যে শক্তি ও তেজ থাকবে না। ঈশ্বরের প্রার্থনা ছাড়া সন্তানের মধ্যে শক্তি ও তেজ আনা যায় না। তবে ভারতে এখনও যেখানে যৌথ পরিবার আছে সেখানে মানা হয়, যেভাবেই গর্ভে সন্তান এসে থাকুক না কেন, যেমনি জানা গেলে গর্ভে সন্তান এসে গেছে তখনই বাড়িতে নিয়মিত পূজা-পাঠ, অর্চনা চলতে থাকে, যাতে সমস্ত রকমের দোষ, পাপ পরিস্কার হয়ে যায়। নতুন যে আসছে তাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ রূপে ঈশ্বরের কৃপা রূপেই গ্রহণ করতে হয়। সেইজন্য এখনও হিন্দুরা জাতি হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি।

চারটি বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব নিরূপণ

অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।

তমপীহ গুরুং বিদ্যাৎ শ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া।।২/১৪৯

এতক্ষণ সন্তান নিয়ে বলছিলেন, সেখান থেকে দুম্ করে গুরুর বিষয়ে চলে গিয়ে বলছেন বেদের সামান্য অংশও অধ্যয়ন করিয়ে যদি কেউ কারুর উপকার সাধন করেন তবে সেই উপকারের জন্য তাঁকেও গুরু বলেই জানবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনু বলছেন – পুরাকালে অঙ্গিরা নামে এক ঋষির কনিষ্ঠ পুত্র হয়েও সে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বেদ অধ্যয়ন করিয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি দাদাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। ভাগবতেও আমরা এই রকম দৃষ্টান্ত পাই যেখানে কপিল মুনি নিজের মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আর মা পুত্রকে নিজের গুরু রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য অনেক জায়গায় বিধান আছে সন্ন্যাসী নিজের মাকেও প্রণাম করবে না, মায়ের সামনে নত মস্তক হয়ে মাটি স্পর্শ করে প্রণাম করবে গর্ভধারিণী বলে। কারণ সন্ন্যাসী জগদগুরু, সবাই তাঁর সন্তান।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্যতঃ।

বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।।২/১৫৫

ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক হয় জ্ঞানের আধিক্যের দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বীর্যবত্তা, শৌর্য, ক্ষমতা ইত্যাদির দ্বারা। তার মানে যুদ্ধে কাকে সেনাপতি করা হবে? যেমন ধৃষ্টদ্যুম্ন, বয়সে অনেকের থেকে কনিষ্ঠ ছিল কিন্তু তাকেই পাণ্ডবদের সেনাপতি করা হয়েছিল। বৈশ্যদের মধ্যে যার ধন সম্পদ বেশী তাকেই

শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। জন্মের দিক থেকে জ্যেষ্ঠ মনে করা হয় শূদ্রদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে এখন কেউ যদি বলে আমার প্রচুর ধনসম্পদ আছে আমি বড়লোক, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে বৈশ্যের সংস্কার রয়েছে। আবার কেউ যদি বলে আমি সবার থেকে বয়সে বড় তাই আমারই সম্মান পাওয়ার অধিকার, তখন বুঝে নিতে হবে এর মধ্যে শূদ্রের সংস্কার প্রবল। ঠিক তেমনি যিনি জ্ঞানীকে বড় মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ আর যিনি ক্ষমতাবান লোককে বেশী বড় মনে করেন তিনি ক্ষত্রিয়। একজন নতুন পাশ করে আসা ছোকরা আইপিএস অফিসার যখন থানায় ঢুকবে তখন পঞ্চাশ বছরের ওসিকে সেলাম ঠুকতে হবে, পুলিশ মানেই ক্ষত্রিয়। এখানে বলা যাবে না আমি তোমার থেকে বয়সে বড়। শুধু তাই নয়, জামাই যদি আইপিএস অফিসার হয়ে থাকে আর শ্বশুর যদি থানার দারোগা হয় তখন অন্ ডিউটি মুখোমুখি হয়ে গেলে জামাইকে শ্বশুর সেলাম ঠুকতে বাধ্য থাকবে যতই তুমি বয়স ও সম্পর্কের থেকেই সিনিয়র হও না কেন। আইপিএস মানেই ক্ষমতায় ও শক্তিতে সে বড়। ব্যবসায়ীরা যখন এক জায়গায় জুটেবে তখন যার টাকা, মূলধন বেশী সেই বেশী সম্মান পাবে। যে বৈশ্যের টাকাই নেই সে আর কিসের বৈশ্য হবে। যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রের কোন জ্ঞান নেই সে আবার কিসের ব্রাহ্মণ। এই ভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলি। পরেই আবার বলছেন –

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।

যো বৈ যুবাণ্যধীযানন্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।।২/১৫৬

মাথার চুল সাদা হয়ে গেলেই কেউ বৃদ্ধ হয়ে যায় না, আর মাথার চুল সব পড়ে গিয়ে কেশহীন হলেই বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানে যদি কেউ বড় হয় তখন দেবতারাও তাকেই বৃদ্ধ বলে অভিহিত করেন। যেমন এর আগে আমরা কপিল মুনির দৃষ্টান্ত পেলাম। আমাদের চোখের সামনেই আছেন স্বামীজী, মাত্র তিরিশ বছর বয়সে জগতবাসীকে উপদেশ দিলেন। ভারত পরিক্রমার সময় স্বামীজী ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক যুবক, কিন্তু তখনই তাঁকে মানুষ সম্মান দিচ্ছেন, বিদ্যার প্রতি এই সম্মান। শুধু ভারতেই নয়, বিদ্যার এই সম্মান সব জায়গাতেই। তাই বলছেন শুধু চুল পেকে গেছে বলেই তুমি সম্মান পাবে না।

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।

যশ্চ বিপ্রোহনধীযানন্তয়ন্তে নাম বিভ্রতি।।২/১৫৭

খেলনার জন্য তৈরী করা কাঠের হাতি নামেই হাতি এই হাতি দিয়ে কোন কাজ হবে না, আর হরিণ শিকার করার পর তারই চামড়া দিয়ে খেলনা হরিণ তৈরী করা হয়, ওটাও নামেই হরিণ, এই হরিণ দিয়ে কিছু হয় না। তেমনি যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করে না, বেদের জ্ঞান যে ব্রাহ্মণের নেই সে নামেই ব্রাহ্মণ এই ব্রাহ্মণ কোন কাজের না। কাঠের হাতি, চামড়ার হরিণ আর মুর্থ ব্রাহ্মণ সমান। যদিও এখানে সন্ন্যাসীর কথা বলা হচ্ছে না, তবে সন্ন্যাসীও যদি মুর্থ হয়, যদি ব্রাহ্মবিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেই সন্ন্যাসী নামেই সন্ন্যাসী। সম্মান কিন্তু সব ব্রাহ্মণই পাচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর বলছেন অগস্ত্য মুনি এক গঙ্গুষে সমুদ্র পান করে নিয়েছিলেন বলে এখনও ব্রাহ্মণদের সম্মান করা হয়, কারণ অগস্ত্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। আচার্য শঙ্কর সন্ন্যাসী ছিলেন, স্বামীজী সন্ন্যাসী ছিলেন তাই সব সন্ন্যাসীকেই সম্মান করা হয়। এখান থেকে মনু আবার অন্য আরেক বিষয়ে ঢুকে পড়ছেন –

শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ

নারুন্তদঃ স্যাদার্তোহপি ন পরদ্রোহকর্মধীঃ।

যয়াহস্যোদ্বিজতে বাচা নাহলোক্যাং তামুদীরয়েৎ।।২/১৬১

যিনি জীবনে ধর্ম অর্জন করতে চাইছেন, যিনি ধর্মাভিলাষী তাঁর জন্য এই শ্লোকটি খুব মূল্যবান। কারুর কথায়, ব্যবহারে বা অন্য ভাবে যদি কেউ দুখী ও পীড়িত হয়ে যায় তবুও সে যেন তাকে প্রত্যুত্তরে কোন দুঃখ না দেয় বা তার কোন দোষের উল্লেখও যেন না করে। এমন কোন কর্ম করবে না যাতে অপরের কোন ক্ষতি

হয় আর এমন কোন কথা বলবে না যাতে কেউ মর্মে আঘাত পায়। এই ধর্মাচরণই স্বর্গপ্রাপ্তির সুগম পথ। যদি কারুর কাছ থেকে দুঃখ বা কষ্ট পেয়ে থাকেন তাকে দুঃখ দিতে নেই। ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তি যার সাথে বন্ধুত্ব করে নেন, পরে তার খারাপ কিছু দেখলে তার সামনে বা পেছনে তাকে কখন কিছু বলবেন না এবং কারুর সাথে আলোচনাও করবেন না। মনুও ঠিক এই কথাই এখানে বলছেন। এটাই একজন ঠিক ঠিক ভদ্রলোকের সঠিক আচরণ। এগুলো খুব উচ্চ আদর্শের কথা। সত্যিকারের সংস্কৃতির চেতনা যার মধ্যে জেগেছে, সে যদি কাউকে ভালোবাসে, সে যে কেউ হতে পারে, বাবা, মা, বন্ধু, তার থেকে যদি সে কোন আঘাত পায় প্রথমবার সহ্য করে নেবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও সহ্য করে নেবে, পরেও একই জিনিষ হলে আস্তে করে সে সরে আসবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে যে পাল্টা কষ্ট দেব এই মানসিকতা তার মধ্যে কখনই আসবে না। আসলে আমরা কেউই ভদ্র নই, তাই বাপ ছেলেকে গালাগাল দিলে ছেলেও বাপকে গালাগাল দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভাই দাদাকে, দাদা ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে, সবাই সবাইকে গালাগালই দিতে থাকে। কারণ এরা কেউই ভদ্রলোক নয়। যে সন্তান বাবাকে একবারও সম্মান করে থাকে, বাবা যদি তিরস্কার করে দুটো খারাপ কথা বলে দিলে সন্তানকে সহ্য করে নিতে হবে। যদি খুবই আপত্তিজনক কথা হয় তাহলে সে সরে আসবে। মা ও ছেলে বা মেয়ের সাথে কথা কাটাকাটি একটু আধটু হয়েই থাকে কিন্তু ভাষা কখনই খারাপ হবে না। এখানে এটাই বলছেন বড়রা দুটো কথা বলে দিলে সহ্য করে নিতে হয়। যাকে আমি ভালোবেসেছি, ভুলবোঝাবুঝিতে বা জেনেগুনেও যদি সে কষ্ট দেয় তাকে কখনই পাল্টা কষ্ট দেওয়া কখনই আমার উচিত কাজ হবে না। পাল্টা কষ্ট দিলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। মনু আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন – যে আপনার অপরিচিত সেও যদি কোন ভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেলে তখনও তাকে পাল্টা কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। সে আমার একটা ক্ষতি করে দিল বলে আমিও তার একটা ক্ষতি করে দেব, কখনই তা করা ঠিক হবে না। প্রতিহিংসার ভাব, আমাকে এর বদলা নিতে হবে, যারা নিম্ন মানের তাদেরই এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা আসে। তৃতীয় বলছেন, এমন কোন কথাও বলবে না যাতে লোকটি মর্মে আঘাত পায়। সংস্কৃতি চেতনা না জাগলে ভদ্র হওয়া যায় না। আমাদের সবারই ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করছেন তিনি হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি সাক্ষাত ভগবান। আমি যাকে কষ্ট দিচ্ছি আর সেই কষ্টটা যদি একবার তার চৈতন্য স্তরে গিয়ে পৌঁছে যায় তাহলে আমি কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে যাব, আর আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী এনারা একেবারে শুদ্ধ পবিত্র, সেইজন্য আমাদের কোন আচরণে এনারা যদি কষ্ট পেয়ে যান, সে যদি সন্ন্যাসীও হয়, তাকে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না। মনু এখানে আধ্যাত্মিকতার স্তর থেকে না বলে সাধারণ ভাবে বলছেন – এই তিনটে, প্রতিহিংসা, কষ্ট দেওয়া আর কটু কথা বলা, তোমার স্বর্গপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। পরের শ্লোকে সহ্য করার ক্ষমতার প্রশংসা করে বলছেন –

সম্মান ও অপমানকে ব্রাহ্মণ কি ভাবে দেখবে

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজতে বিষাদিব।

অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা।।২/১৬২

মানুষ যেমন বিষকে ভয় পায়, একজন ব্রাহ্মণ তেমনি সম্মানকে ভয় করবে। সম্মান জিনিষটা খুব লোভের কিন্তু অন্য দিকে খুব বিপজ্জনক, কারণ সম্মান পেতে পেতে মানুষের অহঙ্কারটা বেড়ে যায়। আর এই অহঙ্কারই মানুষের পতনের কারণ হয়। সেইজন্য মনু বলছেন – অপমান অবমাননাকে সব সময় যদি ব্রাহ্মণ অমৃতের মত আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে আর তার বদলে যদি সে কারুর কোন ক্ষতি না করে তবেই ব্রাহ্মণ মহৎ হয়। মূল কথা হল ব্রাহ্মণ সব সময় সম্মানকে বিষের মত আর অপমানকে অমৃতের মত দেখবে। এখানে ভাষ্যকাররা বলছেন অপমানকে অমৃতের মত আর সম্মানকে বিষের মত দেখলে জ্ঞানীর মধ্যে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হবে। আরেকটা ব্যাপার হল জ্ঞানী যখন সম্মানের ব্যাপারে সজাগ হয়ে যায় তখন তার চেষ্টা থাকে কিভাবে এই সম্মানকে ধরে রাখা যায়। সম্মানকে ধরে রাখতে গিয়ে অনেক সময় জ্ঞানীকে একটু এদিক সেদিক করে চালাকি, কপটতাদির সাহায্য নিতে হয়। জ্ঞানী যে সম্মান পেতে চাইছে সেটাও সেই কামনা-বাসনারই সন্তান।

কামনা-বাসনা যার আছে সে আর কত উন্নতি করবে! তবে এগুলোর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, যখন জ্ঞানী সম্মান প্রত্যাশা করে না অপমানই আমার প্রাপ্য, তখন জ্ঞানী ধীরে ধীরে নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নেয়। বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে নেওয়ার ফলে জ্ঞানী অন্তর্জগতে বেশী করে প্রবেশ করতে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল সম্মানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ফলে যখনই সে অপমান পেতে শুরু করে তখনই বহির্জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে অন্তর্জগতের দিকে যাত্রা শুরু করে। এখানে যারা ব্রাহ্মণ, যারা আধ্যাত্মিক জগতের রাজা তাদেরকে নিয়ে কথা হচ্ছে। সেইজন্য তাদের একভাবে বলা হচ্ছে যাতে তুমি আরও বেশী করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হও। সম্মান এমন একটা জিনিষ, পেলেই মনে হবে আরও যেন পাই, সম্মান যত আসতে থাকে ততই মনটা বহির্জগতেই ঘুরঘুর করতে থাকে। বহির্জগতের মন বিচরণ করা মানে তার যোগ সাধনার অগ্রগতি বিলম্বিত হওয়া, হয়তো বা ওখানেই সাধনার ইতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সম্মানকে বিষতুল্য আর অপমানকে অমৃততুল্য দেখলে মানুষ সহিষ্ণু হয়ে যায়, সহিষ্ণু হয়ে গেলে কি অবস্থা হয় –

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতে।

সুখং চরতি লোকেহসিদ্ধবমন্তা বিনশ্যতি।।২/১৬৩

এখানে কিন্তু যেচে অপমানিত হওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, যদি তিনি অপমানিত হয়ে যান এবং অপমানিত হয়ে যদি প্রতিহিংসা না করেন। অপমানিত হওয়াতো যে কোন সময় হচ্ছে করলেই হওয়া যায়, বাজারে সজীওয়ালা পাঁচ টাকা চেয়েছে তাকে চার টাকা দিলেই অপমান করে দেবে। মনু এইভাবে যেচে অপমানিত হওয়ার জন্য বলছেন না। অপমানিত হতে পারি নাও হতে পারি, কিন্তু আমাকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। যদি কেউ অপমানিত করে দেয় সেখানে কোন প্রতিক্রিয়া করবে না। যারা কোন প্রতিক্রিয়া করে না তাদের কি হয় সেটাই এক শ্লোকে বলছেন – এরা সুখে নিদ্রা যায় এবং সুখে নিদ্রা থেকে জাগরণ হয় আর সুখং চরতি, সুখেই জীবনটা চলতে থাকে। **অবমন্তা বিনশ্যতি**, কিন্তু যিনি অপরকে অপমান করেন তাঁর বিনাশ অবশ্যাস্তি। আমাকে কেউ অপমান করল, আমি অপমানকে সহ্য করে নিলাম এমনকি আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াও হল না, মাথা নত করে সব শুনে নিলাম। এবার কিন্তু ওই লোকটি, যে আমাকে অপমান করেছে, প্রচণ্ড ঝামেলায় পড়ে গেল, এর আর বাঁচার কোন আশাই নেই, বিনাশ অবশ্যাস্তি। যিনি মাথা পেতে সব অপমান সহ্য করে গেল তিনিই সুখে নিদ্রা যান, নিদ্রা থেকে জাগেন আর তার জীবন সুখেই চলতে থাকে। এখন এই শ্লোকটি পড়ে কেউ যদি বলে, আমি চাই না তার বিনাশ হোক তাই আমিও তাকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছি, এগুলোই কপটতার লক্ষণ। প্রথম কথা প্রতিহিংসা কখনই করবে না, দ্বিতীয় প্রতিহিংসাতে যদি না যাও তাহলে দেখবে তোমার জীবনটা সুখে ও শান্তিতে ভরে যাবে। তৃতীয় কথা হল, যে তোমাকে অপমান করেছে সমূলে বিনাশ হতে তার আর দেবী নেই।

এই সব শ্লোক হল যাঁরা একেবারে শুদ্ধ চরিত্রের। শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ সব কিছু মাথা পেতে নিয়ে নেন। শুদ্ধ চরিত্রের লোককে যদি কেউ অপমান করে দেয় তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। অপমান সহ্য করা খুব কঠিন। নিজেকে সংস্কার না করলে এই উচ্চ আদর্শ গুলো অনুশীলন করা যায় না। সেইজন্য বলা হয় নিজেকে সংস্কার করা। একটা পোড়ো বাড়ি, তাকে সংস্কার করে বাসপোযোগ্য করা কত কঠিন কাজ। একটা নতুন জিনিষকে দাঁড় করান অতি সহজ, কিন্তু পুরনো কোন জিনিষকে তার প্রাচীন কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে যদি সংস্কার করতে হয় তখন সেটাই খুব দুরূহ কাজ হয়ে ওঠে। নীলাম্বর বাবুর বাড়ি বা স্বামীজীর পৈতৃক ভিটাকে সংস্কার করে আজকে এই অবস্থায় নিয়ে আসতে সবাইকে কত কৌশল, কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। মুম্বাইতে কয়েক বছর আগে সন্তাসবাদীরা বোমা মেরে লোকাল ট্রেনের কয়েকটা বগিকে উড়িয়ে দিয়েছিল। এতে প্রচুর লোক মারাও গিয়েছিল। রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়াররা এইটা দেখানোর জন্য যে আমরা কারকে ভয় পাইনা, আমরা কত শক্তিশালী, বললেন এই রেলের বগিগুলোকে আবার আমরা দাঁড় করিয়ে দেব। তখন ইঞ্জিনিয়াররা বলেছিলেন একবার যদি নতুন ইম্পাত বোমার আঘাতে বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, সেই ইম্পাতকে যখনই নতুন করে দাঁড় করাতে তখন তার পঁচিশ শতাংশ জোর কমে যায়। কোন ভাবেই ইম্পাতের আগের সেই শক্তি

নিয়ে আসা যাবে না। আমরা হলাম সব পোড়ো বাড়ি, একে নতুন করে সিমেন্ট দিয়ে দাঁড় করান খুব কঠিন কাজ। সৃষ্টিতে প্রথম যখন আমার আবির্ভাব হয়েছে তখন থেকে আমরা কত রকমের দুষ্কর্ম করে এসেছি। এখানে আমাদের বলা হচ্ছে তোমাদের অন্য রকম হতে হবে। কিন্তু সেই দুষ্কর্মের বোঝা যাবে কোথায়। মনুও জানতেন আমরা সবাই পোড়ো বাড়ি, এদের সংস্কার করার দরকার। কিভাবে সংস্কার করতে বলছেন? তোমাকে কেউ যদি অপমানিত করে দেয়, তুমি সেই অপমানকে সহ্য কর। যদি সহ্য করে নাও তাতে তুমি শান্তিতে ঘুমোবে, শান্তিতে খেতে পারবে, শান্তিতে কাজকর্ম করতে পারবে। আর যে অপমানিত করেছে সেতো শেষ হয়ে গেল। ব্রহ্মচারীদের ধর্মের অনেক কথা বলে একটা শ্লোকে খুব মজার কথা বলছেন –

ব্রহ্মচারীর মুখ্য কর্ম

আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।

যঃ ব্রহ্ম্যপি দ্বিজোহধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোহন্বহম্।।২/১৬৭

ব্রহ্মচারী এখন গুরুগৃহে বাস করছে, তার এখন পুষ্পমালা ধারণ করা নিষিদ্ধ। আসলে ব্রহ্মচারীদের কোন ধরণের শৃঙ্গার করতে নেই, পুষ্পমালা, দেহে সুগন্ধি লাগান এগুলো ভোগের জিনিষ। এগুলো ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হয়। যেমন পুষ্পমালা, চন্দন, অগুরু এগুলো ভোগের জিনিষ তাই ভগবানকেই অর্পণ করা হয়। এই শ্লোকে বলছেন যে জিনিষগুলো ব্রহ্মচারীর পক্ষে ধারণ করা নিষিদ্ধ, কোন দ্বিজ যদি সেই জিনিষগুলো ধারণ করে প্রত্যেক দিন বেদ অধ্যয়ন করে তাহলে সেই দ্বিজ তার পদনখের অগ্র থেকে সারা দেহ দিয়ে পুরোপুরি ব্রহ্মচারী। কথামতে আমরা ঠাকুরের এই ভাবটাই পাই। ঠাকুর বলছেন ভবনাত্ম পান মাছ ত্যাগ করেছে, তাতে কি হল। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ। আবার বলছেন – সিংহ মাংস খায় কিন্তু বারো বছরে একবার মাত্র রমণ করে। কিন্তু চড়ুই পাখি কাঁকড় খায় সারাদিন রমণ করতে থাকে। আসলে দেখতে হবে আমাদের মনটা কোথায় আছে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে শাস্ত্রে যদি কোন সময় বিরোধী কথা আসে তখন সেই কথাতে কখন সংশয় করে তর্কবিতর্ক করতে নেই। বিরোধী কথা বলে তাকে ফেলে দিতেও নেই, তখন বুঝতে হবে একটা জিনিষকে স্তুতি করার জন্য আরেকটাকে নিন্দা করা হচ্ছে। এখানে ব্রহ্মচারীকে পুষ্পমালা ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, আবার বলছেন ব্রহ্মচারী যদি পুষ্পমালাও ধারণ করে আবার অন্য দিকে বেদ অভ্যাস নিয়মিত করে যাচ্ছে তাতেও কিন্তু সেই পুরোদমে ব্রহ্মচারী। তাহলে ব্রহ্মচারী পুষ্পমালা ধারণ করবে কি করবে না? এখানে একটা জিনিষকে স্তুতি করার জন্য বিপরীত কথা বলছেন। এই শ্লোকে বেদ অভ্যাসকে স্তুতি করা হচ্ছে। পুষ্পমালা ধারণ করার অনুমতি এখানে দেওয়া হচ্ছে না। এই কারণেই বলা হয় গহনা কর্মণো গতিঃ। একবারও বলা হচ্ছে না যে ব্রহ্মচারী পুষ্পমালা ধারণ করতে পারে, বলছেন কিন্তু বেদ অভ্যাসকে স্তুতি করার অর্থে বলছেন। কিভাবে স্তুতি করছে? যদি ব্রহ্মচারী পুষ্পমালাও ধারণ করে কিন্তু অন্য দিকে বেদ অভ্যাস নিয়মিত ভাবে করে যাচ্ছে তাহলে সেটা দোষের মধ্যে গণ্য হবে না। একজন বেদ অভ্যাস করছে আবার পুষ্পমালাও ধারণ করছে, আরেকজন পুষ্পমালা ধারণ করছে না, অন্য দিকে প্রত্যেক দিন নিয়মিত ভাবে বেদ অভ্যাস করছে না। তাহলে দুজনের মধ্যে কে ভালো? অবশ্যই যে বেদ অভ্যাস করছে। তার মানেই পুষ্পমালা ধারণ করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

সাধক কবি তাঁর গানে বলছেন ‘আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মরি। আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে শঙ্করী।। নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ। সুরাপানাদি বিনাশী নারী।। এসব পাতক না ভাবি তিলেক ব্রহ্মপদ নিতে পারি’।। গানের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে দুর্গা নামে মহাপাতকও পার হয়ে যায়। মহাপাতক পার হয় কি হয় না আমাদের জানা নেই। কিন্তু গানের মাধ্যমে দুর্গা নামের মাহাত্ম্যকে খ্যাপন করা হচ্ছে। দুর্গা নামের উপর জোর দেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে দুর্গা নাম করছে, দুর্গার ভাব যার মধ্যে আছে সে কখনই মহাপাতক হওয়ার মত কোন কাজ করতে পারবে না। আমরা যদি মনে করি মহাপাতক হওয়ার মত কাজ করে দুর্গা নাম করে উদ্ধার পেয়ে যাব, এভাবে কোন দিন কেউ উদ্ধার হয়নি আর হবেও না। মহাপাতকের মত কাজ করে দুর্গা নাম করতেই পারবে না, আটকে যাবে। জপের ক্ষেত্রেও বলা হয় যে, জপের

এত শক্তি যে সকাল-বিকাল দুবেলা এক হাজার জপ করলে সব গোলমাল ঠিক হয়ে যাবে। এবার আমি যদি সব সময় কুকর্ম করে যাই আর মনে করছি সকাল বিকাল হাজার বার জপ করে নেব, কিন্তু প্রকৃতিই আমাকে জপের আসনে বসতে দেবে না, আটকে যাব। যদি কুকর্ম করে জপ করে তাহলে কি সে পার পেয়ে যাবে? পেয়ে যেতেও পারে, কিন্তু করতেই পারবে না। যদি করে তাহলে বুঝতে হবে সে অন্তর থেকে পাপকর্ম করেনি, কোন পরিস্থিতির চাপে পড়ে হয়ত তাকে ওই কাজ করতে হয়েছে। যেমন একজন অফিসে ঘুষ নিচ্ছে, কিন্তু রোজ ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলছে – আমি খুব অভাবে পরে দায়গ্রস্থ হয়ে পড়েছি, তুমি এমন করে দাও যাতে আমাকে আর ঘুষ নিতে না হয়। যদি তার প্রার্থনা আন্তরিক হয় তাহলে ওই পাপটা আর তার লাগবে না। কারণ এখন যে পাপকর্ম করছে একটা পরিস্থিতি বশতঃ তাকে করতে হচ্ছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পরে যে কুকর্ম করছে তার পাপ তার কখনই লাগে না। কিন্তু ভালোবেসে অন্তর থেকে জেনে বুঝে কুকর্ম করছে, এরা ছাড় পাবে না। যাই হোক, এখানে দূর্গা নামের স্তুতি করা হয়েছে, ঠিক তেমনি বেদাভ্যাসের স্তুতি করে বলা হচ্ছে বেদাভ্যাস করে তুমি যাই করো না কেন কোনটাই দোষের মধ্যে গণ্য হবে না।

ব্রহ্মচারীর কিছু বিধি-নিষেধ

এখান থেকে শুরু করে মনু ব্রহ্মচারীদের জন্য অনেক নিয়মের কথা পর পর বলে গেছেন। ব্রহ্মচারীকে কি কি ধারণ করতে হবে, কি কি কর্ম করতে পারবে না ইত্যাদি। এই রকম একটি শ্লোকে বলছেন –

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।।২/১৭৫

গুরুর কাছে ব্রহ্মচারী বাস করবে এবং গুরুকূলে বাস করার সময় ব্রহ্মচারী নিজের তপঃ বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয় সংযম করবে। ইন্দ্রিয়সংযম করাটা উদ্দেশ্য নয়। লোকেরা যে কাম, লোভ, ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়ের সংযম করছে এর উদ্দেশ্য হল তপঃ বৃদ্ধি। তপঃ বৃদ্ধি না হলে শাস্ত্রের কথা ধারণা হয় না। তারপর বলছেন, নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ, রোজ সকালে স্নান করবে। স্নান করে পূজা করবে, বেদাভ্যাস করবে। আবার বলছেন, মধু, মাংস খাবে না, কোন ধরণের আচার খাবে না, কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না, পুষ্পমালা ধারণ করবে না আর কোন নারীসঙ্গ করবে না এবং কোন অবস্থায় কোন জীবের হিংসা করবে না। ব্রহ্মচারী দেহে তেল মাখবে না, চোখে কাজল লাগাবে না, পাদুকা ব্যবহার করবে না, ছাতা ধারণ করবে না। কোন ভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভজনিত কর্মে নিজেকে জড়াবে না। ব্রহ্মচারী কোন মতেই নাচ, গান, বাজনাতে আসক্ত হবে না। এই রকম অনেক কঠোর নিয়মাদির কথা বলে বলছেন –

দ্যুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথান্তম্।

স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালন্তমুপাঘাতং পরস্য চ।।২/১৭৯

ব্রহ্মচারী জুয়া খেলবে না, আর লোকের সাথে অযথা বকব্ বকব্ করবে না। ব্রহ্মচারী কক্ষণ কারুর নিন্দা করবে না, আলস্য করবে না, মিথ্যা বাক্য বলবে না। আর নারীর দিকে কক্ষণ ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাবে না। কোন স্ত্রীর প্রতি যে কোন মানুষের দৃষ্টি পড়তেই পারে, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন দৃষ্টিপাত হচ্ছে তখন তার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিপাতে কোন দোষ হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়টা দোষের। কারণ তখন মনে ইচ্ছা জেগেছে – একটু তাকিয়ে দেখে নিই। ব্রহ্মচারীদের এই নিয়মগুলো সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী কোন নারীর দিকে আকাজ্জার দৃষ্টিতে, আহা একে পেলে হত, এই মনোভাব নিয়ে যেন দৃষ্টিপাত না করে। এই রকম আরও বলছেন, ব্রহ্মচারী সব সময় একাই শয়ন করবে আর সব কটি ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখবে। যদি না রাখে তাহলে সে চ্যুত হয়ে যাবে। বিরাট লম্বা তালিকা দিয়ে যাচ্ছেন। তখনকার দিনে বেদ অধ্যয়নই ছিল প্রধান, সেইজন্য ব্রহ্মচারীদের মনকে এমন ভাবে সংঘটিত করা হত যাতে তার মন একটুও এদিকে সেদিক না গিয়ে পুরো বেদের উপর নিবদ্ধ থাকতে পারে আর বেদের জ্ঞানকে যাতে গ্রহণ করতে পারে। এমন কি আচার্য যদি নাও বলে থাকেন তাও ব্রহ্মচারী নিয়মিত বেদ অভ্যাস করবে আর শাস্ত্র নিয়মিত

অধ্যয়ন করে যাবে। আর আচার্য যদি নাও আদেশ দেন তাও সে আচার্যের সেবাতে সব সময় লেগে থাকবে। শাস্ত্র অধ্যয়ন আর আচার্যের সেবা না করলে ব্রহ্মচারীর জীবন বৃথা হয়ে যাবে।

এরপর গুরুর ব্যাপারেও ব্রহ্মচারীকে অনেক কিছু বলছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল — গুরু যখন থাকবেন না, অর্থাৎ গুরুর অবর্তমানে গুরুর নামের উচ্চারণ যেন না করা হয়। গুরুর হাঁটাচলা, কথা বলার ঢঙ এগুলো যেন ব্রহ্মচারী কখন নকল না করে। শুধু গুরুর ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন গুরুজনদের নিয়ে এগুলো করতে নেই। যে শিষ্য গুরুর প্রতি দুরাচারণ করে তার ইহকাল ও পরকাল দুটোই বিনষ্ট হয়ে যায়। যেখানে গুরুর নিন্দা হয় সেখানে কান বন্ধ করে রাখতে হবে আর সেখান থেকে উঠে চলে আসবে। ব্রহ্মচারীর কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এই বোধ যখন এসে যাবে তখন গুরুর যুবতীর স্ত্রীর পাদস্পর্শ করে কখনই প্রণাম করবে না। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা একাধিক বিবাহ করতেন। শেষ পক্ষের স্ত্রীর বয়স স্বাভাবিক ভাবেই কম হত। এদিকে শিষ্যের মধ্যে যৌবন এসে গেছে, গুরুপত্নি হয়তো শিষ্যের থেকে ছোট। তাই সাবধান করে দিচ্ছেন, গুরুপত্নি যদি যুবতী হয় তাহলে কখনই তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবে না। এই কথা বলে খুব মূল্যবান কথা বলছেন —

নারীর ব্যাপারে ব্রহ্মচারীর প্রতি কিছু সাবধান বাণী

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।

অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।।২/২১৩

এই সব শ্লোকের জন্য মনুকে অনেক সমালোচনা করা হয়। মনু বলছেন পুরুষকে পথভ্রষ্ট করে বিপথে নিয়ে যাওয়াটাই স্ত্রীদের স্বভাব। যাঁরা বিদ্বান পুরুষ তাঁদেরকেও মেয়েদের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকা দরকার, তা নাহলে কোথায় নিয়ে গিয়ে একেবারে ছিটকে ফেলে দেবে কিছু করার থাকবে না।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।

প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্ৰোধবশানুগম্।।২/২১৪

নারী যদি একবার কাম কিংবা ক্রোধে বশীভূত হয়ে যায় এবার সে কি যে করবে তার কোন ঠিক নেই। পুরুষ যতই বিদ্বান হোক, ধর্মমুখী হোক সেই নারী তাকে কুমার্গে প্রবৃত্ত করে ছাড়বেই ছাড়বে। নারীদের এই স্বভাবকে নিয়ে অনেক কাহিনী ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। কোন নারী হয়তো কোন পুরুষের উপর রেগে গেছে, নিজে হয়তো সেই পুরুষের কিছুই করতে পারবে না কিন্তু অন্য কারকে খুব কায়দা করে মিষ্টি ব্যবহার করে তাকে দিয়েই লোকটির সর্বনাশ করিয়ে ছাড়বে। সেইজন্য পুরুষ নিজেকে যতই বিদ্বান ও জিতেন্দ্রিয় মনে করে থাকুক না কেন তাদের স্ত্রীলোকদের সন্নিধানে বাস করা কখনই উচিত নয়। ঠাকুর বলছেন — মেয়েরা এখানে এলেই আমি বলতাম মা তোমার লেজ দেখাও।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।২/২১৫

মা, ভগিনী বা কন্যার সাথে কোনও পুরুষ নির্জন গৃহাদিতে একান্তে বাস করবে না। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এত বলবান যে তারা সাধারণ মানুষ তো কোন ছাড়, শাস্ত্রজ্ঞ ও আত্মসংযমী পুরুষকেও টেনে নিয়ে পথে নামিয়ে দেবে। এখানে ভাষ্যকার আবার যুবতী শব্দটা সংযোজন করে দিয়েছেন, কিন্তু শ্লোকে যুবতী শব্দটা নেই। শ্লোকে যদিও মা শব্দ বলছে, কিন্তু ভাষ্যকাররা যুবতী শব্দ লাগিয়ে সৎমার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তাই মা যদি যুবতী হয়, বোন যদি যুবতী হয় এবং কন্যা যদি যুবতী হয় তাহলে এদের কারুর একজনের সাথে একা ঘরে কোন অবস্থাতেই থাকবে না। মনু জানতেন এভাবে ছেড়ে দিলে গোলমাল ঘটবেই, তাই বলে দিচ্ছেন আলাদা থাকতে হবে।

তখনকার দিনে গুরুপত্নীদের নিয়ে অনেক সমস্যা হত। গুরুদের সেই সময় অনেক স্ত্রী থাকত। কনিষ্ঠ পত্নী একেবারেই ছোট আর তার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছে। যুবতী স্ত্রী দেখছে তার শিষ্যগুলো সব অল্প বয়সী ছোকড়া, তার মন স্বাভাবিক ভাবেই সব সময় এই ছোকড়া শিষ্যগুলোর উপরেই পড়ে থাকবে। মহাভারত গুরুই হয়েছে এই ধরনের কাহিনী দিয়ে। গুরু অনেকদিনের জন্য বাইরে গেছেন। শিষ্যকে বলে গেছেন গুরুপত্নীর দেখাশোনা করতে। শিষ্যকে গুরুপত্নী বলছেন – তোমাকে তো আমার সেবা করতে বলে গেছেন, তুমি আমার কাম পরিতৃপ্ত কর। শিষ্য গুরুপত্নীকে বলছেন – গুরু আমাকে সেবা করতে বলেছেন ঠিকই কিন্তু শাস্ত্র সম্মত সেবাই করতে বলে গিয়েছেন। আপনার সঙ্গ করতে বলেননি। শিষ্য পড়ে একজন বড় ঋষি হয়েছিলেন। যাই হোক, শিষ্যের কথা শুনে গুরুমাতা প্রচণ্ড ক্রোধ বশীভূত হয়ে গিয়ে বলে দিল আমি বদলা নিয়ে ছাড়ব। পরে গুরু ফিরে আসার পর শিষ্য বলেছে – গুরুমা আমাকে এই রকম আদেশ করেছিলেন কিন্তু আমি সেই আজ্ঞা পালন করিনি। গুরু শুনে শিষ্যের প্রতি খুব খুশী হয়ে বর দিলেন। এরপর স্নাতক হওয়ার পর ভিক্ষার জন্য শিষ্যকে পাঠান হয়েছে। গুরুমা তাকে এমন একটা জিনিষ নিয়ে আসতে আজ্ঞা দিলেন যে তাতে তার মৃত্যুর সম্ভবনা। কিন্তু গুরুও তার যোগশক্তি দিয়ে সেই শিষ্যকে রক্ষা করেছিলেন। এই ছিল তখনকার দিনের গুরুপত্নীদের দুরবস্থা। সেইজন্য মনুও শিষ্যদের জন্য খুব কড়া কড়া সব বিধান ঠিক করে দিলেন। তার মধ্যে ছিল –

কামং তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।

বিধিবদ্বন্দনং কুর্মাদসাবহমিতি ব্রবন্।।২/২১৬

যুবক শিষ্য যদি গুরুপত্নীকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে তাহলে যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ না করে পাদসংলগ্ন ভূমিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলবে ‘আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করছি’।

ব্রহ্মচারীদের জন্য কত কঠিন নিয়ম ছিল, যেমন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করতে কোন কারণে যদি বিলম্ব হয়ে যায় বা সূর্যোদয়ের পর শয্যা ত্যাগ করে তাহলে সারাদিন তাকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবে আর রাত্রিবেলা উপবাস করবে। আবার যদি কোন কারণে দ্বিপ্রহরে ঘুমিয়ে পড়ার পর সূর্যাস্তের পর সেই নিদ্রা ভাঙে তাহলে তাকে সারা রাত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে আর পরের দিন দিবাভাগে উপবাস করবে। আচার্য, মা, বাবা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এদের কোন ভাবে কটু বাক্য দ্বারা যেন আঘাত না করে বা অন্য ভাবে কোন দুঃখ না দেয়। আচার্য হলেন পরমাত্মার প্রতিমূর্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্তি, মা হলেন পৃথিবীর মূর্তি আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজেরই প্রতিমূর্তি। সেই হেতু এনারা সবাই দেবতা, এনাদের কখন কষ্ট বা আঘাত দিতে নেই। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে যে যন্ত্রণা ভোগ করেন, পিতা বাল্যাবধি সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা যে ক্লেশ ও সন্তানের বেদধ্যাপনাদির ব্যবস্থাপনা হেতু যে কষ্ট সহ্য করেন, শত বৎসরেও সন্তান পিতামাতার সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। মা-বাবা ঐরাই হলেন ভূর্ভবঃ স্বঃ। তাই এনাদের সেবা সব সময় করে যেতে হয়, এনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে নেই। মনু এরপর চারটে জিনিষের সম্বন্ধে বলছেন –

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।

অমিত্রাদপি সদ্ভৃতমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।।২/২৩৯

অমৃত যদি বিষযুক্ত হয় তাহলে বিষটুকু সরিয়ে অমৃতকে গ্রহণ করবে, বালকের মুখে যদি কোন ভালো কথা অর্থাৎ হিত বচন শুনে থাক তাহলে সেটা গ্রহণ করবে, শত্রুর মধ্যকার সদাচার ও সচ্চরিত্রের গুণ দেখে শিক্ষা নেবে আর অপবিত্র স্থানে বা আধারে সুবর্ণ বা বহুমূল্যাদি দ্রব্য পড়ে থাকে সেটা অবশ্যই গ্রহণ করবে। ঠিক তেমনি বিপদ যদি হয়ে যায় তাহলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের থেকেও ব্রাহ্মণ যেন বেদ অধ্যয়ন করে। বেদ অধ্যয়নটাই উদ্দেশ্য। এখানে মূল বক্তব্য হল, ভালো জিনিষ যেখানেই যা পাবে সেখান থেকেই তার সারটুকু অবশ্যই গ্রহণ করবে। এই হল দ্বিতীয় অধ্যায়। এরপর তৃতীয় অধ্যায় কিছুটা গৃহস্থধর্মকে নিয়ে।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়ে গৃহস্থদের জন্য কিছু কিছু কর্মের বিশেষ করে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি কিভাবে করবে, শ্রাদ্ধাদি কর্ম কিভাবে করবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গৃহস্থধর্ম শুরু হওয়ার আগে সে এত দিন গুরুগৃহে থেকে বেদাধ্যয়ন করেছে। বেদাধ্যয়ন তাকে কত দিন করতে হবে সেই ব্যাপারে প্রথমেই বলছেন –

বেদ অধ্যয়নের সমাপ্তি কাল

ষট্‌ত্রিংশাদিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।

তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা।।৩/১

ব্রাহ্মণ ছত্রিশ বছর পর্যন্ত গুরুর কাছে থেকে বেদ অধ্যয়ন করবে। এই ছত্রিশ বছর তাকে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে। আমরা যদি ধরে নিই শিষ্য বাবা-মার কাছ থেকে নয় বছর বয়সে গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে গিয়েছে, তাহলে তাকে পয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত গুরুর কাছে শুধু বেদই অধ্যয়ন করে যেতে হয়েছে। শিষ্য অবশ্য ইচ্ছে করলে একটা কি দুটো বেদ অধ্যয়ন করেও গুরুগৃহ থেকে চলে আসতে পারত। বেদের অর্দ্ধ ভাগও যদি তাকে অধ্যয়ন করতে হয় তাহলেও তাকে আঠারো বছর অধ্যয়ন করতে হবে। আঠারো বছর না অধ্যয়ন করলে তারও অর্দ্ধ ভাগ অর্থাৎ নয় বছর পড়তে হত। অর্থাৎ এক একটি বেদের জন্য নয় বছর ধার্য করা ছিল। কিন্তু সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শি হতে হলে ছত্রিশ বছর গুরুর কাছে পড়ে থাকতে হবে। ভারতের মাটিতে এই তপস্যা ছিল বলেই অত ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও দেশটা দাঁড়িয়ে ছিল। আজ সেই তপস্যাও নেই দেশের দুরবস্থাও সেই রকম হয়েছে। এখন তো বাড়িতে থেকে বাবা-মায়ের কাছে আদর যত্নে লালিত-পালিত হয়ে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু তখন ছত্রিশ বছর শুধু গুরুর আশ্রমেই থাকতে হত। গুরুর আশ্রমে সেই খাওয়া-দাওয়া কোথায় পাবে! বেশীর ভাগ শিষ্য তো ভিক্ষা করে যা আনত সেটাই গুরুর সাথে ভাগযোগ করে গ্রাসাচ্ছদন করতে হত। আর গুরুর সামান্য কিছু জমি জায়গা থাকলে শিষ্যকে তার চাষবাশও করতে হত। সেই চাষবাশ আর ভিক্ষা করে যা জুটত সেটুকুতে সন্তুষ্ট হয়ে ছত্রিশ বছর ধরে শুধু বেদ অধ্যয়ন করে যেতেন। বংশ পরম্পরা ধরে শুধু বেদই অধ্যয়ন করে যেতেন। আজকে আমরা যে বেদ ছাপা অক্ষরে পাচ্ছি, আট হাজার বছর ধরে এই তপস্যার জন্যই পাচ্ছি। ব্রাহ্মণদের যখন কেউ নিন্দা করে, গালাগাল দেয় তখন এই তপস্যার ব্যাপারটা তাদের মাথায় রাখা উচিত। সাধারণ মানুষ তো কোন ধারণাই করতে পারবে না, এমনকি তথাকথিত বড় বড় সাহিত্যিকরাও তাদের কাহিনী, গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের অতি জঘন্য ভাবে হয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণরা যে কি প্রচণ্ড ত্যাগ তপস্যার দ্বারা পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে দাঁড় করিয়ে ভাবীকালের মানবজাতির জন্য সংরক্ষিত করে গেছেন, সেই ব্যাপারে এদের কোন ধারণাই নেই। পৃথিবীর অন্য কোন সংস্কৃতির পেছনে এই ত্যাগ তপস্যা পাওয়া যায় না। পয়তাল্লিশ বছর বিয়ে না করে গুরুগৃহে পড়ে থেকে বেদ অধ্যয়ন করে যাওয়াটা কোন মামুলি ব্যাপার হতে পারে না। তার উপর কত রকমের বিধি নিষেধ, তেল লাগাবে না, জুতো পড়বে না, ছাতা নেবে না ইত্যাদি। তোমার যদি এই তপস্যার শক্তি না থাকে তাহলে তুমি একটি বেদ নয় বছর অধ্যয়ন করে বেরিয়ে এস। দুটি বেদ হলে আঠারো বছর অধ্যয়ন করতে হত।

ছত্রিশ বছর পর বেদ অধ্যয়ন শেষ করে এবার ব্রহ্মচারী সংসারধর্ম পালন করতে গৃহস্থশ্রমে ফিরে এসেছে। আমরা যদি ধরে নিই নয় বছর বয়সে সে গুরুগৃহে গিয়েছিল, তাহলে এখন তার পয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে, এই বয়সে বিয়ে আর কি করবে! দুটো বেদ অধ্যয়ন করলে সেই সম্মান পেতেন না, কম করে তিনটে বেদ অধ্যয়ন না করলে কেউ সম্মান করত না। অনেকে তাই ঋক, সাম ও যজুর্বেদ এই তিনটে বেদ অধ্যয়ন করে চলে আসত। তাও ছত্রিশ বছর বয়স হয়ে যেত। সে যাই হোক, ছত্রিশ আর পয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করে জীবনের কি আনন্দ উপভোগ করবে! আমরা যে ত্রয়ী শব্দটা পাই, এই তিনটে বেদকেই অনেকে অধ্যয়ন করে গৃহস্থশ্রমে চলে আসতেন। চারটে বেদ অধ্যয়ন করার পর তার দ্বারা সংসার ধর্ম পালন করা খুবই দুরূহ।

এই ছত্রিশ বছরের মধ্যে তারা কেউ মা-বাবাকে দেখতে আসত কিনা, পরস্পরায় কোথাও আমরা এই তথ্য পাইনা। সাধারণতঃ কেউই আসত না। কারণ খুব নামকরা ঋষিরা যাঁরা আচার্যের কাজ করতেন তাঁদের বেশীর ভাগই অনেক দূরে দূরে থাকতেন, শিষ্যরাও অনেক দূর দূরান্ত প্রদেশ থেকে আসত। সেইজন্য তখনকার দিনে নিয়মিত বাড়িতে আসা-যাওয়া করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মচারীর স্বগৃহে আগমন ও তার যোগ্য ভাবী স্ত্রীর লক্ষণাদি নিরূপণ

তং প্রতীতং স্বধর্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ।

স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা।।৩/৩

বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে শিষ্য এবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন। সমগ্র বেদকে তিনি এখন ধারণ করে আছেন। পিতা তাঁর এই বেদজ্ঞ পুত্রকে তখন একটা আসনে উপবেশন করিয়ে কণ্ঠে মালা পড়িয়ে এবং মধুপর্কের দ্বারা পুত্রের পূজা করবেন। পিতার অভাবে কোন আচার্য তাঁকে এইভাবে পূজা করে সম্মানিত করবেন। পিতা বা আচার্য তাঁর পাদস্পর্শ করছেন না, কিন্তু মালা ও মধুপর্ক দিয়ে পূজা করছেন। কারণকে মধুপর্ক দেওয়া মানে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে অভিবাদন করা।

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর এবার তিনি শুভ লক্ষণা কোন কন্যাকে বিবাহ করবেন। বিবাহ করার আগে দেখে নিতে হবে তিনি কি রকম নারীকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন, কি কি লক্ষণ থাকলে নারীকে বিবাহ করবেন আর কি কি লক্ষণ থাকলে বিবাহ করবেন না, এই ব্যাপারে মনু এক বিশাল তালিকা দিয়েছেন। এত বিস্তৃত ভাবে এগুলো জানার এখন প্রয়োজনীয়তা নেই। যেমন একটা শ্লোকে বলছেন –

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যা নাধিকাজ্জীং ন রোগিণীম্।

নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিজ্জালাম্।।৩/৮

যাঁরা বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে এসেছেন, এনারা সবাই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন। তাই এঁদের সহধর্মিণীও সেই রকমটি হতে হবে। কোন্ ধরণের মেয়েদের বিবাহ করতে নিষেধ বলতে গিয়ে বলছেন – কপিল বর্ণের অর্থাৎ মেয়ের শরীরের রঙ যদি তামাটে হয় তাহলে বিবাহ করবে না। শরীরে কোন অঙ্গ যদি বেশী বা কম থাকে, যেমন অনেকের পাঁচটার জায়গায় ছটি বা চারটি আঙুল থাকে, তাহলে বিয়ে করবে না। মেয়ের যদি নানা রকমের রোগ থাকে, সব সময় রুগ্ন থাকে তাহলে তাকে বিয়ে করবে না। গায়ে যদি একেবারেই লোম না থাকে আবার যদি খুব বেশী লোম থাকে তাহলে বিয়ে করবে না। যে নারী বাচাল অর্থাৎ অতিপ্রগলভ তাদের বিয়ে করবে না। যাদের বিড়ালচক্ষু তাদের বিয়ে করবে না। এগুলো সাধারণ লোকদের বলা হচ্ছে না, যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করে এসেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে। আসলে কি হয়, আমরা জানি মহাজনরা যে পথে গমন করেন বাকীরাও সেই পথেই যাবেন, তাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাদের বিয়ে করবেন বাকীরাও তাদেরকেই বিয়ে করবে। ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ পুরুষের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণগুলো দেখাটাই প্রধান হয়ে গেল। তাই বলে এই ধরণের মেয়েদের যে বিয়ে আদৌ হতো না তা নয়, সব রকম মেয়েরই বিয়ে হত। যে কোন পিতার কন্যা থাকলে তার সব থেকে বড় দায়িত্ব হল যে করেই হোক কন্যাকে পাত্রস্থ করা। হিন্দু সমাজে প্রাচীন কাল থেকেই এই ধারণাটা চলে আসছে যে মেয়েকে যে করেই হোক একটা বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। সেইজন্য কন্যা থাকা মানেই কন্যাদায়গ্রস্ত হওয়া। একেবারেই যদি উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী করে বিয়ে দিত। এর চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় বাংলাতে, যে ব্রাহ্মণ চিতায় উঠতে যাচ্ছে তার সাথেই বিয়ে দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত থেকে উদ্ধার পেত। ধর্মের মূল ভাব ও উদ্দেশ্যটা হারিয়ে গেলে সমাজে তখন এই দুরবস্থা হয়। আমাদের স্মৃতিকাররা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বিধি নিয়ম ঠিক করে দিলেন, যেমন বলে দিলেন মেয়েদের কখন একা থাকতে দেবে না, পেছনে এর একটা উদ্দেশ্য আছে। এটাকেই সবাই ধরে নিল মেয়েদের যে করেই হোক একটা বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে একটা লোক আর কিছুক্ষণ পরেই মরে যাবে, তাকে চিতায় তুলে দেওয়া হবে, পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলে তার সাথেই বিয়ে করিয়ে দেওয়া

এটাকে কেউই সমর্থন করতে পারে না। এই মেয়ের ভবিষ্যৎ কেউ ভেবে দেখল না, যার পরিণতিও পাওয়া গেল – সমাজে অনাচার বেড়ে গেল। এই ধরনের সমস্যা তখন ছিল।

এরপর বলছেন, শুধু তাই নয়, মেয়েদের নামেরও অনেক ব্যাপার আছে। মেয়ের নাম যদি কোন নক্ষত্রের নামে যেমন আদ্রা, রেবতী, স্বাতী ইত্যাদি বা গাছপালার নামে হয় যেমন কদলী, আমলকী ইত্যাদি তাহলে সেই মেয়েকে বিয়ে করবে না। আরও আছে যদি নদীর নামে হয়, যেমন গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী হয় তাহলেও বিয়ে করবে না। কিন্তু এটা আশ্চর্যের, কারণ গঙ্গা নামটা মেয়েদের মধ্যে খুব প্রচলিত। এছাড়া পাহাড়ের নাম যদি হয় বিষ্ণু ইত্যাদি, শ্লেচ্ছদের নাম যদি হয় যেমন চণ্ডালী, বর্বরী ইত্যাদি, পাখির নামে যদি থাকে শারিকা, কোকিলা, ময়না, টিয়া ইত্যাদি তাহলে এই সব মেয়েদের বিয়ে করা যাবে না। সাপের নামে, দাসীর নামে, দূতের নামে যদি নাম হয় তাহলে বিয়ে করবে না। তার সঙ্গে যদি নাম শুনে ভয়ঙ্কর মনে হয় তাহলেও বিয়ে করবে না।

তার সাথে আবার বলছেন মেয়ে যদি খুব মোটা হয় তাহলেও বিয়ে করবে না এবং খুব শীর্ণকায় যদি হয় তাহলেও বিয়ে করবে না। খুব লম্বা ও খুব বেঁটে মেয়েকেও বিয়ে করবে না। মেয়ের বয়স যদি বেশী হয় তাহলে সেই মেয়েকে বিয়ে করবে না। মেয়ে যদি কোন অঙ্গহীন হয়ে থাকে, একটা চোখ নেই, কান নেই, হাত বা পা নেই তাহলে সেই মেয়েকে বিয়ে করবে না। এরমধ্যে মজার হল, বলছেন কলহপ্রিয়া অর্থাৎ ঝগড়াটে মেয়েকে কখনই বিয়ে করবে না। এই রকম একটা লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে কোন্ কোন্ মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না।

সবর্ণাহুত্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।।২/১২

এখানে শ্লোকে বলছেন বিবাহ যখনই করবে সব সময় প্রথমে সবর্ণাতেই করবে। পরে অবশ্য এক জায়গাতে নিয়ম করা হয়েছে সাত পুরুষ পর্যন্ত মেয়ের রক্তের যেন কোন সম্পর্ক না থাকে। আর তার বাইরে সবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মেয়ে, ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ের মেয়েকে বিয়ে করবে। অন্য দিকে বলছেন – কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ, প্রথমে তো বলে দিলেন সর্বাহুত্রে সবর্ণাতেই বিয়ে করবে কিন্তু যদি মনে হয় বিয়ে করে কামের ঠিক ঠিক পূর্তি হচ্ছে না, আমার আরেকটি স্ত্রী চাই, তখন সে এক ধাপ নীচে গিয়ে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। এই হল ঠিক ঠিক ধর্মতত্ত্ব। স্বীকৃত যে বিয়ে, যে বিয়ের পর স্ত্রীকে ধর্মপত্নী বলা হচ্ছে, সেই বিয়ে সব সময় সবর্ণা হতে হবে। অর্থাৎ প্রথম বিবাহ কখনই অন্য বর্ণে করা যাবে না, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে এক ধাপ নীচে যাওয়া যেতে পারে। ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্মণকেও করতে পারে আবার ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকেও করতে পারে। ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় বিবাহ ক্ষত্রিয়কেও করতে পারে আবার বৈশ্যকেও করতে পারে। কিন্তু বৈশ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়, কারণ বৈশ্যের পর নীচে আর কোথায় যাবে! কারণ এর কয়েকটি শ্লোকের পরেই বলছেন কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে, খুব দূরবস্তার মধ্যে যদি চলে যাও বা কোন বিপদেও যদি পড়ে যাও তাও কিন্তু কখনই শূদ্রার সঙ্গে বিবাহ করা চলে না।

এখানে উপদিশ্যতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, উপদিশ্যতে বলতে বোঝায়, আগের আগের যে শাস্ত্র আছে বা ইতিহাস আছে সেখানেও কোনও বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিপদ কালে শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়নি। আমরা এর আগেও বলেছি যে, মনু নিজে কোন বিধান দিচ্ছেন না, প্রায়ই লোকেরা এটা ভুল মনে করে যে মনুই সব বিধান তৈরী করে গেছেন। সূতিশাস্ত্রে বিধান সমূহ তৈরীর পেছনে মনুর কোন হাতই নেই, মনু শুধু বলছেন আমাদের আগের আগের যে নিয়ম-কানুন আছে, সামাজিক প্রথা আছে, মহাভারতাদি ইতিহাসে যে কাহিনী দেওয়া হয়েছে সেখানে কোথাও কিন্তু আমরা এই আদেশ পাচ্ছি না যে, বিপদ হলে তুমি শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ করতে পার। এখানে আমাদের আবার মনে রাখা উচিত তখনকার দিনে শূদ্র বলতে বোঝাত যারা আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কোন নিয়ম-কানুন পালন করত না। এই নিয়মগুলো পালন না করার

জন্য তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত। বর্তমান যুগে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা পাল্টে গেছে, তাই এই ধরনের নিয়মের এখন কোন মূল্যই নেই। সব থেকে বড় কথা হল, এখানে এই নিয়মগুলো তাদের জন্যই বলা হচ্ছে যাঁরা ছত্রিশ বছর বা সাতাশ বছর গুরুগৃহে থেকে বেদ অধ্যয়ন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এনারা একজন শূদ্রকে বিয়ে করবেন কল্পনাই করা যায় না। এত উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন বংশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিক্ষাহীন, অসংস্কৃত বংশের কোন মেয়েকে বিয়ে করবেন কোন প্রশ্নই নেই। বর্তমান যুগে সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখনকার শূদ্ররা যে কাজ করত এখন সব ধরনের লোকেরা সেই কাজই করে যাচ্ছে। আগেকার দিনে যারা নাচ গান করত তাদের শূদ্র বলা হত। তাহলে বোম্বের সিনেমার সব হিরো হিরোইনরাই শূদ্র, সেইজন্য এই সব নিয়মের প্রাসঙ্গিকতা এখন নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর বলছেন বিয়ে কত রকমের হয়। স্মৃতিকাররা সবাই মোটামুটি আট রকমের বিয়ের কথা বলে গেছেন।

বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।

আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ।।৩/২৭

কন্যার পিতা কোন শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচার সম্পন্ন পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান করে নিজের কাছে নিয়ে এসে পাত্রকে যথাযোগ্য বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদির দ্বারা অর্চনা করবে এবং তার সঙ্গে নিজের কন্যাকে পাত্রের কাছে সম্প্রদান করবে। এই ধরনের বিবাহকে বলছেন ব্রাহ্মবিবাহ। এই বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলা হয়। এখনও যেটা দেখা যায় বেশীর ভাগই ব্রাহ্মবিবাহ মতে হয়। কন্যার বাবা অনুসন্ধান করে বেড়ায় কোথায় একটা ভালো ছেলে পাওয়া যাবে। ভালো ছেলের সন্ধান পেলে মেয়ের বাড়ির তরফ থেকে ছেলের বাড়িতে উপহার সামগ্রী পাঠান হয়। এগুলো সবই ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণ।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃতিজে কর্ম কুব্বতে।

অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে।।৩/২৮

কোথায় হয়ত যজ্ঞ হচ্ছে, সেই যজ্ঞে পুরোহিত রূপে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করার জন্য কোন যুবক ঋত্বিককে হঠাৎ দেখে মেয়ের বাবা যদি অলঙ্কারাদি সহ কন্যাকে সেই ঋত্বিককে সম্প্রদান করেন তখন সেই বিবাহকে দৈববিবাহ বলা হয়। এখানে ব্রাহ্মবিবাহ ও দৈববিবাহের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয়নি। ব্রাহ্মবিবাহে পাত্র অনেক বেশী গুণ সম্পন্ন, সে একজন বেদজ্ঞ, পূজো অর্চনার মধ্যে সে বেশী থাকে না। দৈব বিবাহে বলছেন জ্যোতিষ্টোমাদি বিস্তৃত যজ্ঞ, অর্থাৎ পাত্র পূজারীর মতন, যজ্ঞে ঋত্বিকের কাজ করছে তখন মেয়ের বাবা তাকে পছন্দ করে নিজের মেয়েকে সম্প্রদান করে দিচ্ছেন। দৈববিবাহ থেকে আরেক ধাপ নীচে আর্ষ-বিবাহ।

একং গোমিথুনং দ্বৈ বা বরাদাদায় ধর্মতঃ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে।।৩/২৯

শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী যখন পাত্রের কাছ থেকে এক জোড়া বা দুই জোড়া গোমিথুন, মানে গরু ও বলদ বা ষাঁড় গ্রহণ করে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয় তখন তাকে আর্ষ-বিবাহ বলা হয়। মনে করা যাক, একটা মেয়ে আছে, মেয়ের বাবা হয়তো আর্থিক সম্পন্ন নয় বা আর্থিক সম্পন্ন হতেও পারে, অন্য দিকে একটা ছেলের সন্ধান আছে। ছেলেটি বিয়ে করার মত উপযুক্ত মেয়ে পাচ্ছে না। তখন মেয়ের বাবা গিয়ে পাত্রকে বলবে – আমি একটা যজ্ঞ করব, তুমি আমাকে একটা গরু বা এক জোড়া বলদ দান কর। এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা হচ্ছে লোভে পরে মেয়ের বাবা পাত্রের কাছে গরু চাইছেন না, তিনি একটা যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন বা তুমি আমার মেয়েকে দান কর। ওই গরু বা বলদ মেয়ের সম্পত্তি হয়ে যাবে। আর যজ্ঞের জন্য যদি নেওয়া হয় তাহলে যজ্ঞে সেটা খরচ হয়ে যাবে। এই ভাবে যদি কোন পাত্রের সাথে বিবাহ হয় তখন তাকে আর্ষ-বিবাহ বলে। আর্ষ মানে ঋষিদের বিবাহ। এখানে পাত্রের তরফ থেকে কন্যাপক্ষকে কিছু দেওয়া হচ্ছে।

সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।।৩/৩০

চতুর্থ বিবাহ হল প্রাজাপত্য বিবাহ। কন্যার বাবা কোন সুপাত্রকে ডেকে এনে নিজের কন্যা ও বরকে বলে দিলেন ‘যাও তোমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম পালন কর’। এখানেও বস্ত্র অলঙ্কারাদি দান করে পূজা করে কন্যা দান করে দেওয়া হচ্ছে। এটাকে বলা হচ্ছে প্রাজাপত্য বিবাহ। ব্রাহ্মবিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র খুব উচ্চ গুণসম্পন্ন, সে বেদজ্ঞ হওয়াতে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে কন্যার বাবা তার পূজাদি করছেন।

এই চার ধরনের বিবাহকে তখনকার দিনে খুব সম্মানীয় বিবাহ বলে মনে করা হত। এরপরের চার ধরনের বিবাহকে এনারা খুব একটা পছন্দ করতেন না এবং নিন্দার দৃষ্টিতেই দেখা হত।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।

কন্যাপ্রদানাং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে।৩/৩১

পঞ্চম বিবাহ হল আসুরবিবাহ। মেয়েকে যে কোন উপায়ে পাওয়ার জন্য শাস্ত্র নির্দেশ অমান্য করে প্রচুর অর্থ সম্পদ দিয়ে কিনে নেওয়া হয়। এই ধরনের বিবাহকে খুব নিন্দা করা হয়। আসলে যখন সমাজে মেয়ের সংখ্যা কমে যায় তখন এই ধরনের উপায় অবলম্বন করে। আসুরবিবাহে লোভের ব্যাপার থাকে কিন্তু আর্থ বিবাহে লোভের ব্যাপার থাকে না। আর্থ বিবাহে বলা হয় আমি যজ্ঞ করতে যাচ্ছি তুমি গোধন দিয়ে আমার মেয়েকে গ্রহণ কর। এর মধ্যে লোভের কোন কিছু নেই। আসুরবিবাহে মেয়েকে পেতে হবে তার জন্য মেয়ের জ্ঞাতিভাইদের সাথে বাড়ির লোকদেরও অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে বশে নিয়ে আসে। এই প্রথা অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে যেখানে মেয়ে পক্ষকে টাকা-পয়সা দেওয়া হয়। এখানে মেয়েকে ক্রয় করে নেওয়ার একটা ব্যাপার হয়ে থাকে।

ইচ্ছ্যান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবা।৩/৩২

ষষ্ঠ গান্ধর্ববিবাহ। ছেলে মেয়ে এক অপরকে ভালোবেসে বাবা-মাকে না জানিয়ে নিজেরাই বিয়ে করে নিয়েছে। এই ধরনের বিবাহকে বলা হয় গান্ধর্ববিবাহ। বর্তমান যুগে বেশীর ভাগ বিবাহই গান্ধর্ববিবাহ। এই ধরনের বিবাহ শাস্ত্র অনুসারে রীতিমত অনুমোদিত যদিও বলছেন কামসম্ভবা, অর্থাৎ কিনা এই বিবাহ পরস্পরের মিলন বাসনা থেকে সম্ভূত এবং কামই এই বিবাহের প্রযোজক। মহাভারতে শকুন্তলা আর দুশ্যন্তের বিবাহ পুরোপুরি গান্ধর্ববিবাহ মতেই বলা যায়।

হত্বা চ্ছিত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।

প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।।৩/৩৩

সপ্তম রাক্ষস-বিবাহ। কন্যাপক্ষের সবাইকে মারধোর করে পিটিয়ে দিয়ে মেয়েকে তুলে নিয়ে বিয়ে করে নিল। কিন্তু এখানে একটা শর্ত আরোপ করা হয়েছে, মেয়েটি কিন্তু ক্রন্দন করতে থাকবে – ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। মেয়েটি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছে – বাবা! আমাকে রক্ষা কর। এইভাবে মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়ে বিয়ে করাকে বলছেন রাক্ষস-বিবাহ। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম কাশীরাজের মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারমধ্যে একটি মেয়ে আবার আরেক রাজাকে ভালোবাসত। এই ধরনের বিয়েকেও অনুমোদন করা আছে কিন্তু এগুলোকে উৎসাহিত করছেন না। শ্রীকৃষ্ণ আর রুক্মিণির বিবাহকে কোন্ ধরনের বিবাহ বলা যেতে পারে? একদিকে দুজন দুজনকে ভালোবাসত সেইজন্য গান্ধর্ববিবাহ বলা যেতে পারে আবার জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অনেকে একে রাক্ষস-বিবাহও বলতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে বাবা! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর বলে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে দেখা যায়নি।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশাষ্টমোহধমঃ।।৩/৩৪

অষ্টম হল পৈশাচবিবাহ, যেটা অত্যন্ত নিন্দিত বিবাহ ছিল। মেয়েটি হয়তো ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে বা মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে আছে অর্থাৎ এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে যে অবস্থায় মেয়ে তার শীল রক্ষা করতে পারছে না। সেই সময় কেউ যখন তার উপর সমাগম করছে তখন তাকে বলছেন পৈশাচবিবাহ। এই অষ্টম বিবাহ একেবারেই ঘৃণিত। পৈশাচবিবাহকে আমাদের সুতিকাৱরা স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু এই ধরনের বিবাহ যে হয় না তা নয়, প্রায়ই হয়ে থাকে। ভালো করে খতিয়ে দেখলে পুরানেও এই ধরনের বিবাহের কাহিনী পাওয়া যাবে। এরপর ব্রাহ্মণদের বিবাহের কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

অভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে।

ইতরেষাং তু বর্ণানামিতরেতরকাম্যয়া।।৩/৩৫

ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করে তবে তিনি শুধু মাত্র জলের সঙ্কল্প নিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে পারে। তার মানে ব্রাহ্মণ পিতা মেয়ের হাত ধরে ছেলের হাতে দিয়ে জলের সঙ্কল্প নিয়ে বলে দিলেন – আমি তোমাকে আমার এই কন্যাকে সম্প্রদান করলাম। এতেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এই ধরনের বিবাহ এখনও দেখা যায়, ছেলে আর মেয়ে দুজনে পালিয়ে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে দিয়ে নিজেরা বিয়ে করে নেয়। মন্দিরে যে বিয়ে হয় সেটা অনেকটা এই ধরনের। এখানে ব্রাহ্মণ পিতা যদি চান তাহলে তিনি তাঁর কন্যাকে শুধু জলের সঙ্কল্প নিয়ে কোন ছেলের হাতে তুলে দিয়ে যদি বলে দেন আমি তোমার হাতে এই মেয়েকে সমর্পণ করলাম, তাতেই বিয়ে হয়ে যাবে। এখানে অগ্নিসাক্ষী করা বা অন্যান্য কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের দুই পক্ষের অনুরাগ অনুসারে শুধু বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ শুধু যদি কথা দিয়ে বলে দেয় এই তোমাদের বিয়ে হল, তাতেই বিয়ে হয়ে যেত। বিয়ের ব্যাপারে এনারা খুব উদার ছিলেন। এখানে অবশ্য বাবা-মার ভূমিকা থাকতে হবে, ছেলে-মেয়ে নিজেরা ঠিক করলে হবে না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের বাবা যদি বলে দেয় এই নাও আমার মেয়েকে তোমার কাছে দিলাম, তখন আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না। তাতেই বিয়ে হয়ে যাবে।

আট রকমের বিবাহের যে কথা বলা হল, এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, দৈব, আর্ষ আর প্রাজাপত্য এই চার ধরনের বিবাহকেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই চার ধরনের বিবাহের পর এদের যে সন্তান হবে এরা সাধারণতঃ ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন আর মাননীয় ও সজ্জন হয়। মনু অনেক জায়গায় এমন কিছু কথা বলে দিয়েছেন যেমন এই কাজ করলে তোমার উপর ভগবান বিরূপ হয়ে যাবেন, বা তোমার এই এই ধরনের ক্ষতি ও বিপদ হয়ে যাবে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে একটু ভয় দেখান, যাতে তারা কোন ধরনের উল্টোপাল্টা কাজ না করে। এখানে যেমন বলছেন এই চার ধরনের বিবাহিত দম্পতির যে সন্তান হবে এরা ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ও সজ্জন হবে, এটাও কিছুটা সত্যের দিক থেকে আর কিছুটা ভয় দেখান যাতে সমাজে অনাচার বৃদ্ধি না হয়।

শুরু হয়েছিল ব্রহ্মচারী অবস্থা থেকে, গুরুগৃহে তাঁকে বেদ অধ্যয়ন করতে হয়েছে। বেদ অধ্যয়ন শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসার পর তার হয়ে গেল বিবাহ। এবার বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিভাবে থাকবে সেই ব্যাপারে কিছু কিছু শ্লোকে বলে দেওয়া হচ্ছে। তুমি ছিলে ব্রহ্মচারী, তারপর হয়েছে বেদজ্ঞ, তারপর তুমি বিয়ে করলেই সব কিছুর বাঁধন তোমার খুলে দেওয়া হচ্ছে না। বিবাহিত জীবনকেও সংযমিত রাখার জন্য কোন্ কোন্ দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে সেটাও মনু বেঁধে দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মাসের মধ্যে দুটো দিন মাত্র ধার্য করে দিচ্ছেন, এই দুটো দিনই তুমি স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে পারবে আর বাকি দিনগুলো ব্রহ্মচারীর মত থাকবে। এই দুটো দিনের বাইরেও যদি স্ত্রীর কাছে যাও তাহলে তুমি পাপ করবে। এমনি সাধারণ ব্রাহ্মণদের জন্যই মনু একেবারে নির্দিষ্ট কতকগুলো দিন ঠিক করে দিয়েছেন, যে দিনগুলোতে স্ত্রীর

কাছে যাওয়া নিষেধ। যার হিসাব করলে দেখা যাবে মাসে চব্বিশ থেকে পঁচিশ দিন স্ত্রীর কাছে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। এই দিনগুলোতে তুমি যদি যাও তাহলে তুমি পাপ কর্ম করবে। ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে মনু খুব কড়া কড়ি করেছেন, কারণ তিনি জানতেন ব্রাহ্মণদের দ্বারাই ধর্ম রক্ষা হবে তাই তাদের এত সামলে রাখছেন। এরপর আমরা মনুর বিখ্যাত দুটি শ্লোককে নিয়ে আলোচনা করছি –

নারীজাতির প্রতি সম্মানেই পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণ

যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তদ্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।৩/৫৬

যে গৃহে নারীর পূজা হয় সেই গৃহে দেবতারা বাস করেন। যে গৃহে নারীর পূজা হয় না সেই গৃহের সব শুভ কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। ভারতের দুরবস্থার মূলে এই একটি শ্লোককে পালন করা হয় না বলে। স্বামীজীও বার বার বলছেন ভারতে নারীকে সম্মান দেওয়া হয় না বলে ভারতের এই দুরবস্থা। এখনও এর কোন পরিবর্তন হয়নি। রোজ সকালে খবরের কাগজে যেসব খবর চোখে পড়ে সেগুলো সত্যিই খুব পীড়াদায়ক। গতকালই কাগজে বারাসতের একটি খবর বেরিয়েছে, যেখানে একটি মেয়েকে দশজন মিলে শ্লীলতাহানি করেছে। কোন রাজনৈতিক নেতা আবার বললেন মেয়েরা এই ধরনের অশ্লীল পোশাক পড়ে রাষ্ট্রায় বেরোয় কেন! সেই নিয়ে আবার সারা দেশে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভদ্রবাড়ির মেয়ের আচরণে যেমন শীল থাকবে তেমনি তার পোশাক-আশাকেও শীল থাকতে হবে। মনু ঠিক এটাই বলছেন। মনু দু দিকেই বলছেন। যে সমাজ মেয়েদের সম্মান দেয় না সেই সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে বলছেন, মেয়েদের খুব সামলে রাখতে হবে। বিয়ের আগে বাবা, বিয়ের পর স্বামী আর প্রৌড়ে পুত্রের অধীনে রাখতে হবে, মেয়েদের এই তিনজনের অধীনের বাইরে রাখলে সমাজ গোলায় যেতে বেশী দেরী হবে না। তার সাথে আবার বলছেন যে গৃহে নারীর সম্মান নেই সেই গৃহের সমস্ত শুভ কর্ম বিফল হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, পরের শ্লোকে বলছেন –

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যশু তৎ কুলম্।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।৩/৫৭

যে বংশে নারী শোকে চোখের জল ফেলে সেই গৃহের কুলই নাশ হয়ে যায়। জাময়ো মানে যে কোন নারী, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধু সে যেই হোক, সে যদি কষ্ট পেয়ে অথবা শোকগ্রস্ত হয়ে অশ্রুপাত করে তাহলে সেই বংশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। যামী থেকে জামাই শব্দ এসেছে। মেয়েরা তো কথায় কথায় চোখের জল ফেলে, মনু এখানে সেই চোখের জলের কথা বলছেন না। এখানে বলছেন মনের ঠিক ঠিক কষ্টে চোখের জল ফেলা। যে কুলে কোন নারী শোক পায়না, আনন্দে বসবাস করে সেই কুলের বৃদ্ধি হবেই হবে। বাংলার মেয়েদের বাড়িতে মা বলে সম্বোধন করা হয়, আদরিণী শ্যামা এই শব্দটা একমাত্র বাংলার নারীদের ক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা ব্যবহার করেন। অন্য কোন রাজ্যে বাড়ির মেয়েকে এই সম্মান দেওয়া হয় না। এই বিধান কিন্তু মনুই করে গেছেন। এরপর মনু একটা লম্বা তালিকা দিয়ে বলছেন, যারা নিজের বংশের মঙ্গল চায় যখনই কোন বিশেষ পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়, যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি, তারা যেন যত সম্বন্ধী নারী আছে তাদের যেন বিশেষ ভাবে সম্মানিত করে। কিছু দিন আগেও গ্রাম দেশে দেখা যেত বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানে যত মেয়েরা আসত তাদের সবাইকে শাড়ি বা কোন উপহার দিয়ে বিদায় করত। এখনও বিবাহাদিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে যত মেয়ে আছে সবাইকে প্রণামীর শাড়ি দেওয়ার রীতি চলে আসছে। মেয়েদের এইসব ব্যাপারে মনু খুব কড়া বিধান দিয়ে গেছেন। মেয়েদের যদি সুখী না রাখতে পার তাহলে বংশের সর্বনাশ হতে বাধ্য। আর বলছেন –

সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা ভর্তা ভার্যা তথৈব চ।

যস্মিন্বেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।।৩/৬০

শেষ পর্যন্ত সেই কুলেরই সমৃদ্ধি হয় যে কুলে স্ত্রী স্বামী থেকে সুখী থাকে, স্বামী স্ত্রী থেকে সুখী থাকে। উভয় উভয়ের থেকে সুখী যদি না থাকে তাহলে সেই পরিবারে শান্তি কখনই আসবে না। এইসব বলে মনু পরিষ্কার বলছেন স্ত্রীকে যদি রুচি সম্মত ভাবে বস্ত্র ও আভরাণাদির দ্বারা দীপ্তিমতি না করা হয় তাহলে সেই স্ত্রী কখনই কোন ভাবে স্বামীকে পরিতৃপ্ত করে আনন্দ বর্দ্ধন করতে পারবে না। অর্থাৎ স্ত্রী যদি খুশী না থাকে তাহলে পতি যে গর্ভাধান করবে সেটা কিন্তু হবে না। মোদ্দা কথা হল স্ত্রীকে এবং পরিবারে যত মেয়ে আছে সবাইকে খুব আদর ও সম্মান দিয়ে রাখতে হবে, এই ব্যাপারে মনু অত্যন্ত কড়া বিধান দিয়ে গেছেন। কোন ভাবেই মেয়ে যেন কষ্ট না পায়, পরিবারের কোন মেয়ে যদি কষ্ট পায় তাহলে ওই কুলের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। এরপরে একটি খুব মূল্যবান শ্লোকে বলছেন –

কুলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয় বিদ্যাচর্চা দ্বারা

মন্ত্রতন্ত্র সমৃদ্ধানি কুলান্যল্পধনান্যপি।

কুলসজ্জ্যাক্ষং গচ্ছন্তি কৰ্ষন্তি চ মহদ্যশঃ।।৩/৬৬

এখানে মন্ত্র মানে বেদমন্ত্র। বলছেন, পরিবারে ধন-সম্পদের স্বাচ্ছল্য হয়ত নেই কিন্তু বিদ্যাচর্চা আছে, পরিবারে বেদমন্ত্রের জ্ঞান আছে তাহলে সেই পরিবারের যে সম্মান হবে সেটা বেদমন্ত্রের উপর নির্ভর করেই হবে। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, যদি পরিবারে বিদ্যার চর্চা থাকে তাহলে সেই পরিবারই কুলের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। অর্থ সম্পদ দিয়ে কখন কুলের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয় না। তখনকার দিনে বিদ্যাচর্চা মানে বেদচর্চা। পরিবার বা বংশের প্রসিদ্ধি ও নাম-যশ সব সময় বিদ্যার জন্যই হয়। গঙ্গানাথ বা ছিলেন সংস্কৃতের বিরাট পণ্ডিত। তাঁদের পরিবার শিক্ষার জগতে খুব নামকরা ছিল। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁর মেয়েকে এই পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলের মা রাজী হননি, পরিষ্কার বলে দিলেন সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর কখন মিলন হয় না, এই পরিবারে বিদ্যার চর্চা ছাড়া আর কিছুই হবে না। ওনার ছেলে আদিত্যনাথ বা তখনকার দিনের আইসিএস ছিলেন। তিনি ছেলের বিয়ে দিলেনই না, নিজের কুলকে তিনি এত শ্রেষ্ঠ কুল বলে মনে করতেন। তুমি রাজা হতে পার কিন্তু তোমার পরিবারে বিদ্যার চর্চা নেই।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যপস্করঃ।

কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।।৩/৬৮

এরপর আসছে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যাপার। জীবন-ধারণ করতে গেলে সবারই পাঁচটি পাপ লাগবে। মনু বলছেন পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য, গৃহস্থ না চাইলেও পাঁচ রকম ভাবে পাপ তার লাগবে। উনুন জ্বালান হচ্ছে তখন কিছু না কিছু প্রাণী মারা যাবে, জাঁতা বা শিল-নোড়াতে কিছু মশলা পেষণ করা হচ্ছে তখন কিছু প্রাণী মারা যাচ্ছে, উদখুল, ঢেকি বা হামানদিস্তায় গম, ধান পেষণ করা হয় তখনও কিছু প্রাণী মারা যাবে, ঘরদোর ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে তাতেও কিছু প্রাণী মরবে, পাত্র বা কলসীতে জল ভরছে তখন কিছু প্রাণী মরছে। মহাভারতে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন – নিঃশ্বাস নেয় অথচ মৃত কে? যুধিষ্ঠির উত্তরে বলছেন, যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না। আমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ যদি না করি, আমার শাস-প্রশ্বাস চলছে কিন্তু মৃত। প্রতিদিন এই পাঁচটা জিনিষের দ্বারা আমরা পাপ কাজ করছি – ১) উনুন, ২) শিল-নোড়া, ৩) ঝাঁটা, ৪) হামানদিস্তা আর ৫) জলের পাত্র। এই পাঁচ ভাবে মানুষ নিত্য হিংসা করছে। এই পাঁচটি পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকে নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হয়। এই পাঁচটি যজ্ঞ হল –

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলিভৌতো ন্যজ্ঞোহতিথিপূজনম্।।৩/৭০

সংস্কৃত ভাষার এটাই বৈশিষ্ট্য, ছোট্ট একটা কথার মধ্যে অনেক কথা বলে দেওয়া যায়। পঞ্চ মহাযজ্ঞই হিন্দুদের ঠিক ঠিক গৃহস্থ ধর্ম। যদি প্রশ্ন করা হয় হিন্দুদের কি ধর্ম? এক কথায় এর উত্তর হল পঞ্চ মহাযজ্ঞ। আমি হিন্দু কেন? কারণ আমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করি।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রথম হল – অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ, বেদ অধ্যয়ন করা এবং বেদ অধ্যয়ন করান হল ব্রহ্মযজ্ঞ। ইদানিং কালে যে কোন শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করাকেই ব্রহ্মযজ্ঞ রূপে গণ্য করা হবে। যেমন সকালে উঠে আমি গীতা পাঠ করছি, চণ্ডী পাঠ করছি বা রামায়ণ-মহাভারত পড়ছি, কথামৃত পাঠ করছি, এটাই ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয় যজ্ঞ – পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্, তর্পণ করা হল পিতৃযজ্ঞ। আগেকার দিনে সবাই নদী, পুকুর আর কূয়োতে স্নান করত। নদী আর পুকুরে তর্পণ করার সমস্যা ছিল না। কূয়োতে যখন স্নান করত তখন ঘটিতে জল নিয়ে সূর্যের অভিমুখ হয়ে পিতৃদের নামে তর্পণ করত। নিয়মিত যে তর্পণ করা হচ্ছে এটাই পিতৃযজ্ঞ বা খাওয়ার সময় পিতৃদের উদ্দেশ্যে কিছু অন্ন ও জল দেওয়াটাও পিতৃযজ্ঞ। তৃতীয় যজ্ঞ – হোমো দৈবো, নিয়মিত হোম করা। তখনকার দিনে সবাই নিয়মিত হোম করতেন, এটাই দৈবযজ্ঞ। এখনকার দিনে হোম মোটামুটি উঠেই গেছে, তার জায়গায় এসেছে নিয়মিত গৃহদেবতা বা কুলদেবতার পূজা অর্চনা। কুলদেবতাকে রোজ ধুপধুনো, ফুল দেওয়া, ভোগ দেওয়া এগুলোই এখন দৈবযজ্ঞ। চতুর্থ যজ্ঞ – বলিভৌতো, ইতর প্রাণীদের কিছু খাওয়ানোকে বলা হয় ভূতযজ্ঞ। গরুকে কিছু খাওয়ানো, পাখিকে কিছু খাওয়ানো, পিপড়ে কিছু খাওয়ানো এগুলো ভূতযজ্ঞ। পঞ্চম যজ্ঞ – ন্যজ্ঞোহতিথিপূজনম্, অতিথিকে অন্ন জল দিয়ে যখন পূজা করা হয় তখন সেটাই ন্যজ্ঞ। ন্যজ্ঞকে অনেক সময় মনুষ্য যজ্ঞও বলা হয়।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের পেছনে যে পাঁচটা পাপের কথা বলা হয়েছে, সেখানে পাপ না বলে অন্য ভাবেও বলা যেতে পারে – আজকে আমি যে অবস্থায় আছি, এর পেছনে পাঁচটা আলাদা শক্তি কাজ করছে। আমার যারা পূর্বজরা ছিলেন তাঁদের জন্য আজকে আমি এই জৈব শরীর পেয়েছি। সেইজন্য তাঁদের প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতার ভাব থাকতে হবে। আজকে আমি যে সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করছি এই সংস্কৃতি আমি ঋষিদের কাছ থেকে পেয়েছি। আজকের হিন্দু ধর্মের যে সম্মান, যে উচ্চমানের সংস্কৃতিকে আমরা ধারণ করে আছি এই সংস্কৃতির পেছনে ঋষিদের অবদান রয়েছে। আবহাওয়া, ঠিক সময় বৃষ্টি হওয়া, ফসল উৎপন্ন হওয়া এগুলো সব দেবতাদের জন্য হয়। ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হলে ফসল হবে না, ফসল না হলে আমরা জীবন-ধারণ করতে পারবো না। অন্য দিকে আমার চারিপাশে যে মানুষগুলো রয়েছে এদের জন্যই আজকে আমি সমাজে টিকে আছি। পুলিশ যদি না থাকে তাহলে চোর-ডাকাতদের থেকে আমি রক্ষা পাবো না, সৈন্যরা দেশের সীমান্তে পাহারা দিচ্ছে বলে বিদেশী শত্রুরা আমাদের দেশকে আক্রমণ করতে পারছে না, বন্ধুরা যদি পাশে না থাকে তাহলে আমার দৈনন্দিন জীবন স্বচ্ছন্দ ভাবে চলতে পারবে না, বাড়িতে আমার স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানরা রয়েছে এরা না থাকলে পরিবারে আমি স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারতাম না। ছোট ছোট প্রাণী, যেমন মাছেরা তাদের প্রাণের বিনিময়ে আমাদের খাদ্য রূপে নিজেদের আহুতি দিচ্ছে, ছাগলের মাংস যখন খাচ্ছি তখন সেখানেও একটা প্রাণী তার জীবনকে উৎসর্গ করছে। চাল, গম, ডাল যে খাচ্ছি এগুলোর মধ্যেও প্রাণ রয়েছে। এই পাঁচটা আলাদা শক্তি আছে বলে আমরা আজ এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এই পাঁচটার মধ্যে একটা শক্তিকে যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে আজকে আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাটা আর থাকত না। প্রথম হলেন আমাদের পূর্বজরা, দ্বিতীয় ঋষিরা, তৃতীয় দেবতারা, চতুর্থ আমার চারিপাশের মানুষজন আর পঞ্চম আমার নীচে যেসব প্রাণীরা রয়েছে, এরা যদি না থাকত তাহলে আমার এই শরীরই চলতে পারতো না। দুধে ব্যাকটেরিয়া আছে বলে দই হচ্ছে, আমাদের পেটে ব্যাকটেরিয়া আছে বলে খাদ্য হজম হচ্ছে। এই পাঁচজনের জন্য আজকে আমার এই শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইজন্য এই পাঁচজনের ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

নিয়মিত শাস্ত্রাদি পাঠ করা মানে ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হওয়া। নিত্য পূজো অর্চনার দ্বারা দেবতাদের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। যখন আমরা তর্পণ করছি বা পিতা বা ঠাকুরদার নামে কোন ভাল কাজ করা হচ্ছে তখন পিতৃঋণের দায় থেকে মুক্ত হচ্ছি। যখন অতিথি সেবা করা হচ্ছে, সবার সাথে যখন ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে

তখন আমরা নৃশংখ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন পশুপাখিকে কিছু খাওয়ালে প্রাণীদের শংখ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল গতিমুখর আধুনিক শহুরে জীবনে এর অনেক কিছু করা সম্ভব নয়। প্রথম পিতৃযজ্ঞ করা যাবে না, ফ্ল্যাট কালচারে আমি কোথায় তর্পণ করতে যাব। দ্বিতীয় নৃযজ্ঞ, এখন রোজ কোথা থেকে আমরা অতিথি ধরে নিয়ে আসব। ফ্ল্যাট কালচারে ভূতযজ্ঞও করা সম্ভব নয়। এই অসম্ভবতাকে অন্য ভাবে একটু সাজিয়ে নিলে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা সম্ভব হয়ে যায়। তিন বছরে বা এক বছর কিংবা ছয় মাসে কোথাও আমরা একটা দান করে দিতে পারি। কোন আশ্রমে আমরা পূর্বপুরুষদের নামে একটা কিছু দান করে দিতে পারি। তীর্থে গিয়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কিংবা গরীবদের ভোজন করিয়ে দেওয়া যায়। অন্য দিকে আমাদের সবাই কোন না কোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি, পাড়ার কোন সংস্থার সাথে জড়িয়ে আছি, পূজোর সময় বা অন্য কোন সময় গরীবদের খাওয়ানোর জন্য বা বস্ত্র বিতরণের জন্য একটা ডোনেশান দিয়ে দিলাম। এটাও কিন্তু নৃযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। ঠিক তেমনি অনেক পশু সংরক্ষণ সমিতি আছে, গোশালা আছে সেখানে কিছু একটা ডোনেশান দেওয়া যেতে পারে, তাতে ভূতযজ্ঞের একই ফল হবে। এইভাবে আমাদের উপার্জনের একটা সামান্য অংশ, তিন শতাংশ, পাঁচ শতাংশ বা দশ শতাংশ দান করতে পারি। অন্য দিকে পূজো আমরা সব জায়গাতেই করতে পারি। আর শাস্ত্র অধ্যয়নও সব জায়গায় করা যায়। ঋষিযজ্ঞ আর দেবযজ্ঞ সহজেই করা যায়, বাকি তিনটেকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি।

যে হিন্দু পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে না সে কিন্তু হিন্দু নয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য হল ঐদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানান। মানুষ যে পেশাতেই থাকুক না কেন সব জায়গাতেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রয়োজন আছে। যেমন একজন ম্যানেজমেন্ট লাইনে আছেন, সেখানে তার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের উপর নিয়মিত অধ্যয়ন করাটাই তাঁর ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ হয়ে যাবে। ব্রহ্মযজ্ঞের পরেই দেবযজ্ঞ, ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যারা তার বরিষ্ঠ পদাধিকারী, যাঁদের নির্দেশে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে, ঐদের সম্মান দিতে হবে। আশেপাশে তাঁর যত সহকর্মীরা আছেন তাদের সাথে ভালো ভাবে ব্যবহার করা, কি করলে তাদের ভালো হয় সেই ব্যাপারে সচেষ্টি থাকতে হবে, এটাই নৃযজ্ঞ। যারা পিওন, সুইপার তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, বছরে একদিন তাদের কোন স্পেশাল উপহার দিলাম, তাদের বাড়ির লোকদের খোঁজ-খবর নেওয়া, এটাই ভূতযজ্ঞ হয়ে যাবে। আর পিতৃযজ্ঞ, আগে আগে যাঁরা এই সংস্থাতে কাজ করে গেছেন, এনারা কাজ করে গেছেন বলে এই সংস্থা এখনও দাঁড়িয়ে আছে আর সেইজন্য তিনি কাজ করতে পারছেন, তাঁদের বছরে একদিন আমন্ত্রণ করে সাম্মানিক কিছু অনুষ্ঠান করা। এইভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ সব ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে।

মনুস্মৃতিতে অতিথির ব্যাপারে মহাভারতের মতকেই অনুসরণ করা হয়েছে। যদি তুমি গরীব বা নির্ধন হও আর অতিথিকে যদি আপ্যায়ন করে অন্নজল দিয়ে সেবা না করতে পার কিন্তু স্বাধ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ আর দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ পূজা অর্চনা অবশ্যই করবে। ব্রহ্মযজ্ঞ আর দৈবযজ্ঞ এই দুটো যজ্ঞ যেন কোন অবস্থায় বন্ধ না করে। সন্ন্যাসীরাও তাই করেন, তাঁরা পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ বন্ধ করে দেন কিন্তু ব্রহ্মযজ্ঞ আর দৈবযজ্ঞ অবশ্যই প্রত্যেক দিন করবেন। সন্ন্যাসীরা যে স্বাধ্যায়, শাস্ত্র পাঠ, পূজা অর্চনা এই দুটো যজ্ঞের ভাব নিয়ে রোজ করে যাবেন। সাধারণ মানুষদের জন্য বলছেন, যদি তোমার খাওয়া-দাওয়া নাও জোটে এই দুটো স্বাধ্যায় আর পূজা অর্চনা কোন অবস্থায় ছেড়ে দেবে না।

গৃহস্থশ্রম বাকি তিনটে আশ্রমের প্রাণবায়ু

যথা বায়ুং সমাপ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।

তথা গৃহস্থমাপ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমঃ।।৩/৭৭

যস্মাৎ ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।

গৃহস্থৈরেব ধার্যন্তে তস্মাজ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।।৩/৭৮

এর আগে জীবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল, যার মধ্যে প্রাণ বায়ু সঞ্চালন হয় সেই জীব। তার মানে যারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তারাই জীব, প্রাণ বায়ু না চললে তাকে জীব বলা যাবে না। যেমন বৃক্ষকে যদিও বলা হয় তার প্রাণ আছে কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে প্রাণ বায়ু চলাচল করে না। এই শ্লোকে এটাই বলছেন – যেমন প্রাণ বায়ুকে আশ্রয় করে এই শরীরের সব কার্য সম্পন্ন হচ্ছে, ঠিক তেমনি গৃহস্থ আশ্রমকে আশ্রয় করে বাকি আশ্রম গুলো চলে। ব্রহ্মচার্যশ্রম, বাণপ্রস্থশ্রম আর সন্ন্যাসাশ্রম, এই তিনটে গৃহস্থশ্রমের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গৃহস্থ যদি ঠিক না থাকে এই তিনটে আশ্রম চলতে পারবে না। সন্ন্যাসীরা কোন উপার্জন করেন না, তাই তাঁদের গৃহস্থের দানের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। বাণপ্রস্থিকে ভিক্ষা কে দেবে? গৃহস্থই দেবে। আগেকার দিনে ব্রহ্মচারীরা আশ্রমে থেকে বেদ অধ্যয়ন করতেন, তাঁদের আশ্রম চালান, জীবন নির্বাহ করার জন্য গৃহস্থরাই ছিলেন একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং সংসারে যাঁরা আছেন সেই সব গৃহস্থদের এটা একটা বিরাট দায়িত্ব। এই তিনটে আশ্রমের দায়িত্ব গৃহস্থের উপরই বর্তায়। সেইজন্য গৃহস্থদের এই ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। গৃহস্থ যদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ ঠিক ঠিক না করে, অর্থোপার্জন যদি না করে তাহলে সমাজে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অন্য দিকে সন্ন্যাসী যদি না থাকে তাহলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে যাবে, বাণপ্রস্থি যদি না থাকে ত্যাগের ভাব হারিয়ে যাবে আর ব্রহ্মচারী যদি না থাকে তাহলে পরের প্রজন্ম যে তৈরী হয়ে সমাজ ও দেশের সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এই তিনটে আশ্রমকে যদি সুষ্ঠু ভাবে পরিপালন না করা হয় তাহলে আস্তে আস্তে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এক কথায় বলা যেতে পারে পুরো সমাজ দাঁড়িয়ে আছে গৃহস্থের উপর। এই কারণে মনুর এই বিধান খুবই সাধুজনোচিত। মনু কখনই বিশেষ একজনকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু বিধান দেন না, পুরো সমাজকে মাথায় রেখে তিনি বিধান দিয়ে গেছেন। কেউ যদি বলে আমি এদের দায়িত্ব নিতে পারবো না, আমি আমার গৃহস্থশ্রমকেই সামলাব – তুমি দায়িত্ব যদি না নিতে চাও তাহলে তোমাকে কে জোর করে দায়িত্ব চাপাবে। তোমাকে দিয়ে তো কেউ জোর করে কিছু করাতে পারবে না। কিন্তু সমাজের কথা মাথায় রেখে এটা তোমার দায়িত্ব – সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থি আর ব্রহ্মচারী এই তিনটে আশ্রমের তুমি আশ্রয়, তোমাকে এই ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে।

বলছেন এমন কি এই তিনটে আশ্রম জ্ঞানও যেটা পায় সেটাও কিন্তু গৃহস্থ থেকেই পায়। আগেকার দিনের ঋষিরা আমাদের গৃহস্থের মতই থাকতেন। শিক্ষকতা এবং অন্যান্য যে শিক্ষাদি দেওয়া হত সব গৃহস্থরাই দিতেন। মনু সেইজন্য গৃহস্থকে খুব সম্মান দিচ্ছেন। সত্যিই তাই, মনুর কাছে গৃহস্থ এত সম্মানীয় ছিল যে তাঁর কাছে সন্ন্যাসের কোন মূল্যই ছিল না। এটা অবশ্য ঠিকই যে মনু কোথাও সন্ন্যাসের উপর বেশী জোর দেননি। এর একটা কারণও ছিল, যদিও সন্ন্যাস ধর্ম চিরদিনই ছিল কিন্তু তখনকার দিনে সন্ন্যাস ব্যাপারটা এখনকার মত এত গুরুত্ব ছিল না। মনুর কাছে গৃহস্থশ্রম খুব উচ্চ স্থান পেয়েছে। তিনি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছেন যে পুরো সমাজটাই দাঁড়িয়ে আছে গৃহস্থশ্রমের উপর। এর আগে গৃহস্থশ্রমে মা-বাবার সেবা, আচার্যের সেবা এগুলো যা কিছু করা হচ্ছে, সন্ন্যাসীরা এগুলো তো করতেই পারবে না।

নির্ধনও অতিথি সেবা করতে পারে – অতিথি কে এবং কে অতিথি নয়

তৃণানি ভূমিরূদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনুতা।

এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।৩/১০১

এরপর বলছেন, যদি তুমি খুব গরীবও হও কিন্তু অতিথিকে বসার জন্য মাটি আর তৃণ তোমার থাকবেই। আগেকার দিনে গ্রামের দিকে অনুষ্ঠানে অনেক লোককে আমন্ত্রণ করা হলে সবাইকে বসার জন্য আসন দিতে পারত না, কিন্তু কিছু খড় আঁটির মত বেঁধে করে বসতে দিত। মনু বলছেন, খড় বা তৃণতো তোমার আছেই, ওতেই অতিথিকে বসার জন্য দিতে পারবে। আর পা ধোওয়ার জল, পান করার জল এবং মিষ্টি কথা এগুলো সবার কাছেই থাকে, এরজন্য তোমাকে কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না। মহাভারতেও আমরা এই কথা পাই। যুধিষ্ঠির যখন বারো বছরের জন্য ভাইদের নিয়ে বনে গমন করছেন তখন ঋষিরা তাকে জঙ্গলে কিভাবে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হবে বলছেন। এগুলো সব সময় করতে বলা হচ্ছে, এটাই

গৃহস্থদের ধর্ম। তুমি নির্ধন গরীব হতে পার, কিন্তু এই জিনিষগুলো সবারই কাছে থাকে – ভূমি, এক আঁটি খড়, পা ধোয়ার জল, পান করার জন্য জল আর মিষ্টি কথা। এই দিয়েই অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পারবে। শুধু অতিথিকেই নয় সবাইকেই মিষ্টি কথা দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয়। বাড়িতে ভিখারী এলে তাকেও মিষ্টি কথা দিয়ে বিদায় করতে হয়।

একরাত্রস্ত নিবাসনুতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

অনিত্যং হি স্থিতো যস্মানুস্মাদতিথিরুচ্যতে।।৩/১০২

যে ব্রাহ্মণ শুধু এক রাতের জন্য অপরের গৃহে বাস করেন, তাঁকে অতিথি বলে। তাঁর স্থিতি অনিত্য, হঠাৎ করে এসে গেছেন আর অ-তিথি, যাঁর কোন তিথি নেই, একটা তিথি ছাড়া দ্বিতীয় তিথিতে তিনি থাকবেন না, তাঁকেই অতিথি বলছেন। স্বামীজী বিদেশে এই জিনিষটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। আমাদের ভারতে সবার কাছে এটা কত আনন্দের হত যদি কোন দিন তার বাড়িতে অতিথি এসে যেতেন। অতিথি হল আমাদের কাছে নারায়ণ, অতিথি দেবো ভব – এই ভাবটাকে স্বামীজী খুব তুলে ধরেছিলেন। অতিথির সংজ্ঞা দিয়ে মনু একটা লম্বা তালিকা দিয়েছেন কারা অতিথি রূপে গণ্য হবে না। একই গ্রামের লোক যদি এসে রাত্রিবাস করে তাহলে কিন্তু সে অতিথি হবে না। যারা সহাধ্যায়ী বা চাটুকার অর্থাৎ হাস্যকৌতুক করে এমন ব্রাহ্মণকে অতিথি রূপে গণ্য করা হবে না। স্ত্রী জীবিকার জন্য বাইরে থাকে, হঠাৎ করে এসে গেছে সেখানে তাকে অতিথি রূপে গণ্য করা যাবে না। তখনকার দিনে নিরগ্নি অর্থাৎ যারা অগ্নির ব্যবহার করতেন না যেমন ছিল আবার কিছু ব্রাহ্মণ অগ্নিকে সাথে নিয়ে চলতেন। ব্রাহ্মণ যদি অগ্নি নিয়ে চলেন, নিজে ভিক্ষা করে সেই অগ্নিতে রান্না করে আহার করেন, এই ধরনের ব্রাহ্মণকেও অতিথি হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কোথাও যাচ্ছে, যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে গেছে, সামনেই যে গৃহ পেল সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিল, এরাই হল ঠিক ঠিক অতিথি। এই ধরনের অতিথিদের জিজ্ঞাসাও করা হত না, আপনি কোথা থেকে আসছেন, বাড়ি কোথায়, কোথায় যাচ্ছিলেন। বাড়িতে অতিথি রূপে কারুর আগমনকে বাড়ির লোকেরা নিজেদের খুব সম্মানিত বোধ করত আর অতিথিদের খুব সম্মান দিয়ে সেবা-যত্ন করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার এও বলছেন –

উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।

তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যম্নাদিদায়নাম্।।৩/১০৪

যে গৃহস্থরা খাবারের লোভে বা দারিদ্র্যবশতঃ অন্য গ্রামে বারে বারে অন্ন ভোজন করতে অতিথি রূপে পৌঁছে যায় তারা মরে পশু হয়। অতিথিসেবার অনেক নিয়ম আছে। যেমন অতিথিকে সবার আগে ভোজন করাতে হবে, অতিথিকে সেবা করার পর বাকিদের সেবা করতে হবে। অতিথি ছাড়া বাড়িতে কাদের সবার আগে ভোজন করাতে হবে বলতে গিয়ে বলছেন –

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।

অতিথিভ্যোহগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্।।৩/১১৪

এদেরকে অতিথির আগে খাওয়াতে হবে – নববধূ, পুত্রবধূ, কুমারী মেয়ে, বালক, রোগী এবং গর্ভবতী নারী। বাকিরা অতিথিকে খাওয়ানোর পরে খাবে। এখানেই বোঝা যায় মনু মেয়েদের কত সম্মান দিয়েছেন, অথচ কিছু লোক মনুর সম্বন্ধে কত বিরূপ মন্তব্য করে।

অতিথিপূজা প্রসঙ্গে গৃহে অন্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির পূজার ব্যাপারে বলছেন – রাজা, গুরু, স্নাতক অর্থাৎ যিনি সবেমাত্র বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন কিন্তু এখনও গৃহস্থ হননি, জামাতা, শ্বশুর ও মাতুল এঁরা যদি এক বছর পর গৃহে আগমন করেন তাহলে এঁদের সবাইকে মধুপর্ক কর্ম দিয়ে সম্মান করতে হবে। মধু, দই, ঘি প্রভৃতি মিশিয়ে মধুপর্ক তৈরী করা হয়, মধুপর্কের সাথে মাংস অথবা পায়েসাম্বের ব্যবস্থা করা হত, একে

বলা হয় মধুপর্ক কর্ম। এখানে দেখার ব্যাপার হল তখনকার দিনে জামাতা, শ্বশুর, মাতুল এদের কত সম্মান দেওয়া হত। এরপর শ্রাদ্ধের নিয়ম নিয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

শ্রাদ্ধাদি কর্ম

শ্রাদ্ধের যত নিয়ম আছে তার বিস্তারিত উল্লেখ করে একটা মজার ব্যাপার বলছেন, শ্রাদ্ধে কায়দা করে কেবল বন্ধু-বান্ধবদেরকেই খাওয়াবে না। কাদের নিমন্ত্রণ করা হবে সেই ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন, যে ব্রাহ্মণের এই এই গুণাবলী থাকবে তবেই তাঁকে শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন করবে। শ্রাদ্ধ মানে একটা বড় যজ্ঞ, সেখানে বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য শুধু বন্ধুদের ডেকে খাওয়ানো চলবে না। বন্ধুত্ব যদি বাড়াতে হয় তাহলে টাকা-পয়সা দিয়ে বাড়ানো যায়, শ্রাদ্ধের অন্ন খাইয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে যেও না। শ্রাদ্ধের অন্নের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কাকে কাকে শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়ানো যাবে না বলতে গিয়ে বলছেন, তোমার শত্রুকে কখনই শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াবে না, তার সাথে তোমার বন্ধুকেও শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াবে না। তোমার শত্রুও নয় মিত্রও নয়, তার মানে ব্রাহ্মণদেরকেই শুধু খাওয়াবে। শ্রাদ্ধের অন্ন খাইয়ে যারা বন্ধুত্ব করতে চায়, যেমন আমার সাথে কারুর ঝগড়া-বিবাদ আছে, শ্রাদ্ধের সময় তাকে নিমন্ত্রণ করে বশে আনা, এগুলো করতে নেই এতে তাদের খুব পাপ লাগে। ঠাকুর যেন শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নিষেধ করেছে তার উৎস মনুস্মৃতির এই শ্লোকটা। শ্রাদ্ধে পরিচিত, বন্ধু এদের আমন্ত্রণও করবে না, তাদের খাওয়াবেও না। তখনকার সময় নিয়ম ছিল যারা ব্রাহ্মণ শুধু তাঁদেরই শ্রাদ্ধে আমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। আগেকার দিনে শ্রাদ্ধমিত্র একটা গালাগাল শব্দ ছিল, শ্রাদ্ধ দিয়ে যে মিত্রতা করে – শত্রুকে বশে আনার জন্য, বন্ধুদের কৃতার্থ করার জন্য শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়ানোটা খুবই নিন্দনীয় ছিল। পুরো গ্রামবাসীকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করছি সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু এখানে বিশেষ কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে কিংবা কয়েকজন শত্রুকে ডেকে এনে খাওয়াতে নিষেধ করা হচ্ছে। শ্রাদ্ধে কাকে কাকে খাওয়াতে হবে মনুস্মৃতিতে তার পুরো একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি না পাওয়া যায় তবেই বন্ধুদের খাওয়ানো যাবে। কিন্তু শত্রুকে কোন মতেই শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়ানো যাবে না। সম্পূর্ণ বেদজ্ঞাতা, আর যারা বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছেন, এঁদেরকেই শ্রাদ্ধে খাওয়াবে। বলছেন, একটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যদি শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াতে পারো তাহলে জেনে নাও তোমার সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। এখানে একশ কুড়িটা শ্লোক ধরে শুধু বলে গেছেন শ্রাদ্ধে কাকে কাকে খাওয়াবে আর কি কি খাওয়াবে। অন্যান্য ধর্ম শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যকে বোঝে না, মানেও না কিন্তু শ্রাদ্ধ কর্ম হিন্দুদের কাছে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। তবে বৈষ্ণবরা উৎসবের মত করে এটাই তাদের শ্রাদ্ধ, শ্রীশ্রীমাও এটাই বলছেন বৈষ্ণবদের উৎসবটাই শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধান্ন খাওয়ার পর যে ব্রাহ্মণ সেই দিনই আবার অন্ন ভোজন করে তাহলে সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর হয় শূকর হয়ে নয়তো ক্রিমি হয়ে জন্মাবে। আসলে এই নিয়মগুলো করা হয়েছে লোভ দমন করার উদ্দেশ্যে। শ্রাদ্ধ হল অত্যন্ত একটা পবিত্র সংস্কার, শ্রাদ্ধের ভোজনকে কোন পার্টি বা পিকনিকের ভাব নিয়ে যেন না দেখা হয়। তুমি একটা অত্যন্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছ, সেখানে লোভে পরে তুমি খেতে যাচ্ছ না। এই পবিত্র ভাবকে বজায় রাখার জন্য শ্রাদ্ধে এত রকমের নিয়ম-বিধি আরোপ করা হয়েছে। সেইজন্য ঠাকুর প্রথমেই নিষেধ করে দিয়েছেন শ্রাদ্ধের অন্ন খাবে না। সেইজন্য শ্রাদ্ধে জ্ঞাতীদের ডেকে খাওয়ানো মনুস্মৃতি অনুসারে সম্পূর্ণ নিষেধ।

শ্রাদ্ধের সময় তিল দান খুব শুভ, যেমন যেমন তিল দান করা হবে সেই অনুসারে পিতৃরা স্বর্গে বাস করতে পারেন। শ্রাদ্ধে যদি পুঁটি মাছ দেওয়া হয় তাহলে পিতৃরা দুই মাস সন্তুষ্ট থাকেন। হরিণের মাংস দিলে তিন মাস যাবৎ পিতৃরা সন্তুষ্ট থাকেন। ভেড়ার মাংস দিলে চার মাস আর পাখির মাংস দিলে পিতৃরা পাঁচ মাস পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন। ছাগলের মাংস দিলে ছয় মাস আর পৃষত নামে এক প্রকার হরিণের মাংস দিলে সাত মাস পর্যন্ত পিতৃরা সন্তুষ্ট থাকেন। এণ নামে হরিণের মাংস দিলে আট মাস, রুরু নামে হরিণের মাংস দিলে নয় মাস যাবৎ পিতৃরা সন্তুষ্ট থাকেন। বন্য শূকরের মাংস ও মহিষের মাংসের দ্বারা পিতৃগণ দশমাস এবং খরগোশ ও কচ্ছপের মাংসের দ্বারা পিতৃরা এগারো মাস পরিতৃপ্ত থাকেন। গোদুগ্ধ ও পায়সের দ্বারা পিতৃগণ সম্বৎসরকাল

তৃপ্তি সুখ ভোগ করেন। এইভাবে বলছেন কালশাক (বেতো শাক) মহাশঙ্ক নামে এক ধরনের আঁশযুক্ত মাছ, রক্তবর্ণের ছাগলের মাংস ইত্যাদি দিলে পিতৃরা সারা জীবনের মত পরিতৃপ্ত হয়ে যান। পাকা মেষ অর্থাৎ বুড়ো মেষ, যার কান বিরাট লম্বা, এত লম্বা যে জল খাওয়ার সময় মেঘের কান জলকে স্পর্শ করে নেয়, এর মাংস যদি দেওয়া হয় তাহলে পিতৃরা বারো বছর তৃপ্ত থাকেন। আর লাল ছাগলের মাংস দিলে পিতৃগণ অনন্ত কালের জন্য তৃপ্ত হয়ে যান। আমরা সবাই জানি হিন্দুরা নিরামিমাষি, কিন্তু কেউই মনুষ্যত্ব একবারও খুলে দেখেনি। খাদ্যের তালিকায় রুই মাছের নামও আছে, কিন্তু এতে বেশী দিন পিতৃরা সন্তুষ্ট থাকেন না। দুম্বা অর্থাৎ লাল ছাগলের মাংস যদি নিয়ে আসা যায় তবেই পিতৃরা অনন্ত কালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান। এই রকম বিরাট তালিকা দেওয়ার পর বলছেন –

যদেব তর্পয়ত্যন্ডিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।

তেনৈব কৃৎস্নমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্। ৩/২৮৩

নিত্য স্নানের সময় জল দিয়ে যদি পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয় তাহলে এর আগে যত রকমের পিতৃশ্রাদ্ধের কথা বলা হল, এর সব ফল এই তর্পণেই পেয়ে যায়। একটা হল শ্রাদ্ধকর্ম আরেকটা হল তর্পণ। তর্পণ আমাদের প্রত্যহ করতে হবে। এগারো দিনে বা তেরো দিনে, যার যে রকম নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী শ্রাদ্ধ সবাইকেই করতে হবে এতে কোন ব্যতিক্রম করা চলবে না। কিন্তু তর্পণ যদি নিত্য করা হয়, যেমন মহালয়ার দিনে অনেকেই নদীতে তর্পণ করেন, সেটাই যদি রোজ করে তাহলে পিতৃরা খুব সন্তুষ্ট হন। এইসব বলার পর ভৃগু মুনি বলছেন গৃহস্থের জন্য যেগুলো ঠিক ঠিক যজ্ঞ সেগুলো বলা হল। একটা হল পঞ্চ মহাযজ্ঞ আর অন্য দিকে শ্রাদ্ধাদি যজ্ঞ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

পরের অধ্যায় জীবিকা লক্ষণ। এই অধ্যায়ে বলা হচ্ছে মানুষ নিজের জীবন ধারণের জন্য কিভাবে জীবিকা চালাবে, অর্থোপার্জন কিভাবে করবে। যদিও এই অধ্যায়ের নামে দেওয়া হয়েছে জীবিকা লক্ষণ কিন্তু এর মধ্যে আরও অন্য অনেক বিষয়কে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এটা বিশেষ কিছু দোষের নয়, কারণ সব কিছুই মিলেমিশে রয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণদের জীবিকার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক নিয়ে আলোচনা করছি। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের জীবন নিয়ে।

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।

দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ। ৪/১

যদিও দ্বিজ বলতে ব্রাহ্মণকে বোঝায় কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জনকেই দ্বিজ বোঝাত। এর আগে আমরা একটা শ্লোকে পেয়েছিলাম যেখানে বলা হচ্ছে দরকার হলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের কাছেও বেদ অধ্যয়ন করতে পারবে। উপনিষদেও আমরা এই ধরনের কিছু ঘটনার উল্লেখ পাই যেখানে রাজা ব্রাহ্মণকে বলছে এই বিদ্যা আগে আমাদের কাছেই ছিল। বর্তমানে আমাদের কি করে একটা ধারণা হয়ে গেছে যে ব্রাহ্মণদের কাছেই শুধু বেদ ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা সেই রকম ছিল না, যে কোন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিনজনই বেদ জানত। এখানে বলছেন, জীবনের যত আয়ু তার চতুর্থাংশ অবশ্যই গুরুর কাছে অতিবাহিত করতে হবে। এর আগেও আমরা পেয়েছি একজন ব্রাহ্মচারী কম করে সাতাশ বছর, নয়তো ছত্রিশ বছর গুরুর কাছে থেকে পুরো বেদ মুখস্ত করত। হিসাব করলে দেখা যায়, যদি নয় বছর বয়সে গুরুর কাছে যায় তাহলে তাকে তার পয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বেদ অধ্যয়নের জন্য গুরুর কাছে থাকতে হত। এখানে বলছেন, তোমার জীবনের চতুর্থাংশ সময় গুরুর কাছে অবশ্যই থাকতে হবে। একজন মানুষের যদি গড় একশ বছর আয়ু ধরে নেওয়া হয় তাহলে তাকে পঁচিশ বছর গুরুর কাছে থাকতে হত। তার মানে তিনটে বেদ মুখস্ত করার

জন্য প্রত্যেকটি বেদের জন্য নয় বছর করে সাতাশ বছর এমনিতেই গুরুগৃহে বাস করতে হত। মূল বক্তব্য হল তোমার জীবনের একটা বড় অংশ যেন গুরুকুলে অতিবাহিত হয়।

তখনকার দিনে গুরুকুল ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকারই কথা। কিছু গুরুকুল নিজের গ্রামের কাছেই থাকতে পারে, কিছু গুরুকুল দূরে থাকতে পারে আবার কিছু গুরুকুল, বিশেষ করে নামকরা ঋষিদের গুরুকুল অনেক দূরে থাকত। একবার গুরুকুলে চলে গেলে কত দিন পর বা কত দিন অন্তর আবার বাড়িতে আসতে পারত তার কোন বিবরণ আমরা পাই না। আবাসন বিদ্যালয়ে এখন যেমন ছুটিছাটা আছে, গুরুকুলে সেই রকম কোন ছুটির অবকাশ হত কিনা আমাদের জানা নেই। তবে সাধারণতঃ যেটা জানা যায় একবার গুরুকুলে চলে এলে তারা সেখানেই শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পড়ে থাকত। সেইজন্য এদের উপর মা-বাবার বেশী প্রভাব পড়ত না। আট-নয় বছরে গুরুকুলে চলে আসার কুড়ি বছর হয়ত সেখানেই থাকত, যার জন্য এদের জীবনটা খুবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যেত। পরে বাড়িতে আসার পর মা-বাবার প্রতি আসক্তিটা হয়ত থাকত না, কিন্তু তাদের শিক্ষা সমাপনের পর প্রশিক্ষণ দেওয়া হত *মাতৃদেবো ভব পিতৃদেব ভবো*, তুমি এতদিন এখানে শিক্ষা লাভ করে তোমার গৃহে ফিরে যাচ্ছ, তার মানে এই নয় যে তোমার বাবা-মার দেখাশোনা করবে না, তাঁদের দেবতার মত পূজো করবে। কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা কোথাও পাই না। অনেক কাহিনীতে আমরা এর কিছু বিবরণ যেটা পাই সেটা তাঁরা উপনিষদকে আধার করেই লিখেছেন কিন্তু উপনিষদে বা মহাভারতে আমরা যে সামান্য কাহিনী পাই সেখানে পরিষ্কার করে কোথাও বলা নেই যে গুরুকুলে ছাত্ররা টানা থাকতেন বা মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন কিনা। মনুস্মৃতি আজ থেকে তিনশ খ্রীষ্টপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, তার মানে চব্বিশ শ বছর আগে এটাই প্রচলিত ছিল, তাই মনুস্মৃতিকে আমরা কখনই ভারতীয় সংবিধানের মত বলতে পারিনা যে একটা আইন করে দিয়ে বলে দেওয়া হল তোমরা এবার থেকে এই আইন পালন পালন করতে থাক। যে নিয়মগুলো সমাজে পালন করা হয়ে আসছিল সেটাকেই স্মৃতিকাররা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

শিক্ষা সমাপ্তের পর জীবনের দ্বিতীয় ভাগ গৃহস্থশ্রমে অতিবাহিত করতে হত। অর্থাৎ পঁচিশ বছর গুরুকুলে থাকার পর এর পরের পঁচিশ বছর গৃহস্থশ্রমে থেকে গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে বলা হচ্ছে। তবে এই বিভাজন যে সব সময় একেবারে সমান সমান হত তা নয়। প্রথম পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য, এরপর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গৃহস্থ, পঞ্চাশ বছর থেকে বাণপ্রস্থ আর বাকী পঁচিশ বছর সন্ন্যাস। যদি একশ বছর আয়ু ধরা হয় তাহলে একটা মানুষকে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত বাড়ির বাইরেই থাকতে হত। এরপর বলছেন ব্রাহ্মণ কিভাবে থাকবে, যদিও এই জিনিষগুলো এখন আর পালিত হয় না তবুও আমাদের জেনে রাখার দরকার।

উত্তম, মধ্যম, সাধারণ ও সর্বোত্তম জীবিকা

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে মিলিয়ে সমাজে তিন ধরনের মানুষে বিভাজন করা হয়েছে – উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ। সাধারণ মানুষের জন্য ছয় রকমের জীবিকার কথা বলা হয়েছে, এর নামই হল ষট্‌কর্মা। এরা এই ছয় রকম কাজের বাইরে কোন কাজ করবে না। এই ষট্‌কর্মার মধ্যে প্রথম হল ঋত। ঋতের আগেকার একটা পরিভাষা ছিল যেটা এখন অবলুপ্ত হয়েছে সেটা হল উষ্ণ ও শিল। উষ্ণ ও শিলকে যখন মিলিয়ে দিত তখন সেটা হয়ে যেত উষ্ণশিল। ক্ষেতে থেকে ফসল গোলায় নিয়ে আসার পর ক্ষেতে কিছু শস্য পরে থাকে। ক্ষেতে পরে থাকা শস্যকে পাখির মত খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে আসাকে বলা হচ্ছে উষ্ণ। বাজারে বিক্রি করার জন্য গরুগাড়ি থেকে শস্য ওঠা-নামা করার সময় গুদামের বাইরে রাস্তার উপর কিছু শস্য পড়ে যায়, সেই শস্যকে যখন একটা একটা করে বেছে নেওয়া হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে শিল। বলছেন যাঁরা এই উষ্ণশিল করে জীবন ধারণ করে এনারা হলেন অমৃত, এঁদের উপরে আর কেউ নেই। যাঁরা এই উষ্ণ ও শিল করছেন এটাই ঋত, এর থেকে আর পবিত্র জীবন-ধারণ আর কোন জীবিকার দ্বারা হতে পারেনা।

ষট্‌কর্মার দ্বিতীয় হল অযাচিত – নিজে থাকে কেউ এসে ব্রাহ্মণকে কিছু দিয়ে গেল। তৃতীয় ভিক্ষা, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছে। চতুর্থ কৃষিকর্ম। পঞ্চম বাণিজ্য আর ষষ্ঠ হল সুদ। এখানে লক্ষণীয়

যে চাষবাস, বাণিজ্যের সাথে সুদের ব্যবসা করার অনুমোদনও ছিল। ইসলাম ধর্মে সুদের কারবার একেবারে নিষিদ্ধ। মহাভারতে আবার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুদের হার কি রকম হয় নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।

যারা মধ্যম শ্রেণীর তাদের তিন ধরনের জীবিকা – যজ্ঞ করানো, অধ্যয়ন করানো আর দান গ্রহণ করা। দান মানে অযাচিত ভাবে যেটা এসে যাবে। কিছু ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা যজ্ঞ করিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন, কিছু ব্রাহ্মণ ছাত্রদের বেদ অধ্যয়ন করিয়ে উপার্জন করতেন। আবার কিছু ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি এই দুটোর কিছুই করতেন না, কেউ যদি কিছু দান করেন সেটাই গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। উত্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শুধু যজ্ঞ করাতেন আর অধ্যয়ন করাতেন, দান কখনই গ্রহণ করতেন না। এই তিন শ্রেণী – উত্তম, মধ্যম ও সাধারণের উপরে হলেন সর্বোত্তম। সর্বোত্তম জীবিকাতে শুধুই বেদ অধ্যাপনা করে জীবন নির্বাহ করবেন। এনারা যজ্ঞও করবেন না। শুধু বেদ অধ্যয়ন করাতে গিয়ে শিষ্যরা সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু দেবে তাই দিয়েই তাঁদের জীবন চলত। সর্বোত্তমের আরেকটা নাম ব্রহ্মসত্র।

এই চারটে শ্রেণী সাধারণ, মধ্যম, উত্তম ও সর্বোত্তমের কথা বলে ব্রাহ্মণদের বলছেন, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসত্র করে জীবন নির্বাহ করছেন তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসত্র সম্পন্নকারী ব্রাহ্মণের কাছে আর কেউ নেই, তাঁকে যদি অনুরোধ করা হয় আপনি আমার একটা যজ্ঞ করে দিন, তিনি সেই অনুরোধ কখনই গ্রহণ করবেন না, তাঁকে যদি কিছু দান গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন তিনি তা গ্রহণ করবেন না। তিনি শুধু বেদ অধ্যাপনা করে যাবেন। সারা জীবনে কটি আর ছাত্রকে বেদ পড়ানোর জন্য পাবেন, সর্বসাকুল্যে হয়তো চার-পাঁচটি ছাত্র পেতেন। এই কটি ছাত্র কিছু দক্ষিণা দেবে, বেদ শিক্ষান্তে আবার কবে বেড়াতে বেড়াতে গুরুগৃহে আসবে তখন কিছু প্রণামী দেবে – এই সামান্য দক্ষিণার উপর যাঁরা জীবন ধারণ করছেন তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা ঋত করেন, অর্থাৎ উজ্জ্বল বৃত্তি করে জীবন নির্বাহ করছেন তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। কিন্তু এনারা শুধু উজ্জ্বল বৃত্তিই করে যান, উজ্জ্বল বৃত্তির বাইরে অন্য কিছু করবেন না। এঁদেরকে খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ রূপে গণ্য করা হত। আমাদের ঐতিহ্যে যে ব্রাহ্মণকে এত সম্মান দেওয়া হয়, এই কারণেই সম্মান দেওয়া হত। এর পরে একটা শ্লোকে বলছেন –

সন্তোষেই পরম সুখ

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ।।৪/১২

যদিও ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে কিন্তু সব গৃহস্থের জন্যই এই শ্লোকটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। তুমি যদি জীবনে সুখ পেতে চাও তাহলে সব কিছুতে নিজেকে সন্তোষের অবস্থায় রাখ। এটাকেই পরের দিকে আমাদের পরম্পরাতে ছোট করে বলে দেওয়া হয়েছে সন্তোষ হি পরমং সুখম্। আমাদের হিন্দুদের এটা একটা চিরন্তন দর্শন – পরম সন্তোষকে যদি ধারণ করে নিতে পার আর সংযম যদি পালন কর, এর থেকে বড় আর কিছু হয় না। তুমি তোমার সামর্থ্য ও সুযোগ অনুযায়ী যা কিছুই উপার্জন কর না কেন তাতেই সন্তোষ থাকবে। ভাষ্যকাররা এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন – পঞ্চ মহাযজ্ঞ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন তার বেশী অর্থ উপার্জন করার দরকার নেই। ঋষিযজ্ঞের জন্য যতটুকু শাস্ত্র রাখার দরকার, দেবযজ্ঞের জন্য পূজা করতে যেটুকু দরকার, সেই রকম পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এগুলো করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার তার বেশী অর্থ উপার্জন করতে যেও না। ঠাকুর একেই বলছেন – টাকা-পয়সাতে কি হয়, দুটো ডাল-ভাত হয় আর সাধুসেবা হয়। পরের দিকে আমাদের কিছু কিছু ঋষিতুল্য কবিরা বলছেন – আমার পরিবারজন আর সাধুপুরুষরা যাঁরা এসে যান তাঁদের সেবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই আমার হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে ভাষ্যকাররা বলেছেন পঞ্চ মহাযজ্ঞের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার ততটুকু উপার্জন করার দিকেই নজর দেবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞের খরচের বাইরে কিছু রাখার দরকার নেই।

সন্তোষমূলং হি সুখং, সুখের একমাত্র কারণই হল সন্তোষ। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাবে আত্মহত্যার ঘটনা, খুনের ঘটনা, এ ওকে মার্ডার করেছে, এই গ্রামের লোক ওই গ্রামের লোকেদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, চারিদিকে শুধুই অশান্তি আর অশান্তি। আগও হয়তো এই রকমই ছিল, টিভি আর খবরের কাগজ এত ছিল না বলে জানা যেত না, কিন্তু তাহলেও কোথাও একটা সন্দেহ হয়, সত্যিই কি তখন এত গোলমাল ছিল। সব গোলমালের মূলে অসন্তোষ। যদি সুখ চাও তো সন্তোষকে ধারণ কর। দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ, দুঃখের মূল হল এর বিপরীত। যখনই নিজেকে অপ্রসন্ন মনে হবে ভালো করে তাকালে দেখা যাবে কোথাও একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে আছে, আমি যেটুকু পাচ্ছি কোথাও অজান্তে মনে মনে আমি তার থেকে বেশী চাইছি। আর সব সময় নিজেকে নিয়েই তো অসন্তোষ দানা বাঁধে না, বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, এদের কে ঘিরে অনেক চাওয়া-পাওয়ার খেলার মধ্যেও অসন্তোষ জমাট বাঁধে। আমার ছেলে আছে, তার জন্য এই করতে হবে, সেই করতে হবে, ভালো টিউটরের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা না করতে পারলেই অসন্তোষ। একবারও ভাবি না যে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাব, এরপর যতটা হবার হবে। কিন্তু আমরা পারিনা, পারি না বলেই দুঃখ পাচ্ছি। কারুরই দুঃখের আর শেষ নেই।

ব্রাহ্মণ কিভাবে কর্ম করবে

বেদোদিতং স্বকং কর্ম নিত্যং কুর্যাদতদ্রিতঃ।

তদ্বি কুবন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্। ৪/১৪

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য বলছেন তাঁরা কিভাবে কাজ করবে। বেদে যে আশ্রমবিহিত নিত্যকর্মের কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত কর্ম প্রতিদিন অনলস ভাবে সম্পাদন করবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী এইভাবে সব কাজ করে তাহলে সে কিন্তু পরম গতি লাভ করবেই, মানে মোক্ষ লাভ করবে। এখানে গীতা থেকে মনুস্মৃতি আলাদা ভাবে তার মত খ্যাপন করছে। গীতাতে দুটো পথের কথা বলা হয়েছে – জ্ঞানমার্গ আর কর্মমার্গ। মনুস্মৃতি সম্পূর্ণ কর্মমার্গের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে জ্ঞানমার্গের স্থান খুব সামান্য আর সন্ন্যাসের উপর খুব একটা জোর দেওয়া হয়নি। এইসব বিচার করে বলা যেতে পারে মনুস্মৃতিই হল ঠিক ঠিক গৃহস্থদের ধর্ম। মনুস্মৃতি বলেই দিচ্ছে বেদে যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথা বলা হয়েছে, এই ধর্মকে যেভাবে তোমাকে পালন করতে বলা হয়েছে সেইভাবে ঠিক ঠিক পালন করে যাও এতেই তোমার পরম গতি হবে। এখন পরম গতি বলতে তুমি যদি মোক্ষ মনে কর তাহলে তাই হবে, যদি ঈশ্বর দর্শনকেই পরম গতি মনে করে তাহলেও তাই হবে, যদি স্বর্গপ্রাপ্তিই তোমার চরম লক্ষ্য হয় তাহলে তাই হবে, যদি ভালো পরিবারে জন্ম গ্রহণ করাই তোমার পরম গতি মনে হয় তাহলেও তাই হবে। কিন্তু এগুলোকে পাওয়ার জন্য তোমাকে একটাই কাজ করতে হবে, তাহল স্বধর্ম পালন। এটাই এখানে বলা হচ্ছে বেদোদিতং স্বকং কর্ম, বেদে যেমনটি কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই কর্ম আলস্য ত্যাগ করে নিষ্ঠা সহকারে, যথা শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী পুরো প্রাণ দিয়ে প্রতিদিন করে যেতে হবে, তার বাইরে গেলে চলবে না, যদি কর তবে তোমার পরমাং গতিম্ হবেই। পরের শ্লোকেও ব্রাহ্মণদের জন্য বলছেন –

নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্মণা।

ন বিদ্যমানৈশ্বৰ্য্যে নার্ত্যামপি যতন্ততঃ। ৪/১৫

বলছেন, ব্রাহ্মণ! তুমি কখনই গান-বাজনা প্রভৃতির দ্বারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা করবে না, বিষয়ী লোকেরা গান-বাজনাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। বলছেন তোমার আপদ-বিপদ থাকুক আর নাই থাকুক যার তার কাছ থেকে যেখান-সেখান থেকে অর্থ গ্রহণ করবে না। শূদ্রদের যজ্ঞ করে অর্থ আয় করবে না, যদিও তখন অনেকেই শূদ্রদের যজ্ঞ করাত, এতেই বোঝা যায় শূদ্রদের জন্য যজ্ঞ করা তখন নিষেধ ছিল না।

মনুস্মৃতির এই শ্লোকটি খুব উল্লেখনীয়। ব্রাহ্মণকে বলে দেওয়া হচ্ছে – তোমার যতই আপদ বিপদ থাকুক না কেন আজীবনে লোকের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেবে না, যেমন ডাকাত, সাগলার, ঘুষখোর এদের থেকে কখনই দান নেবে না। কার কাছ থেকে দান গ্রহণ করা হচ্ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার রাজনীতি অত্যন্ত নোংরা রাজনীতি। বিশ্বখ্যাত একজন ধর্মীয় নেত্রী সেবামূলক কাজের জন্য অত্যন্ত নোংরা ধরণের লোকদের থেকে দান গ্রহণ করতেন। তাঁর ধর্ম সম্প্রদায় থেকে তাঁকে টাকা বানাবার এক মেশিন তৈরী করা হয়েছিল। ঈশ্বরের পথে যাঁরা অনেক দিন আছেন তাঁদের কিছু তো ভালো দিক থাকেই। কিন্তু এই সব ব্যাপারে এই মহিলার অনেক দুর্নাম ছিল। বিশ্বের যারা নামকরা ক্রিমিনাল, এমনকি যুদ্ধ অপরাধীরা, যারা হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে, তাদের কাছ থেকে তিনি কোটি কোটি ডলার ডোনেশান নিতেন। ভদ্রমহিলাকে একবার কেউ প্রশ্ন করেছিলেন আপনি এত ব্যাকমানি কেন নিচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বললেন সেটাই তখন খুব নামকরা উক্তি হয়ে গিয়েছিল – Does money have colour? টাকার কি কোন রঙ আছে নাকি? মনু কিন্তু এই ব্যাপারে খুব দৃঢ়, তিনি এই রকম লোকের কাছ থেকে ডোনেশান নেওয়াতে কখনই অনুমতি দেবেন না। মনু পরিষ্কার বলবেন হ্যাঁ, টাকার রঙ হয় – টাকার কালো রঙ হয়, টাকার লাল রঙ হয়, টাকার সাদা রঙও হয়। কালো রঙের টাকা আর লাল রঙের টাকা কখন দান হিসাবে গ্রহণ করবে না। এই ব্যাপারে মনু একেবারে খুব কঠোর ছিলেন। একেবারে নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন নার্ত্যমপি, তুমি যদি খুব আর্ত অবস্থায়, খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে যাও তবুও কিন্তু তুমি এই ধরণের লোকের দান নেবে না। মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, বর পক্ষ প্রচুর টাকা পণ চাইছে। মেয়ের বাবা পুলিশের লোক। একজন এসে বলে দিল, আরে আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? এই নিন দু লাখ টাকা, এটাকে ঘুষ বলে মনে করবেন না। এই টাকা কি নেওয়া যাবে? কোন মতেই নয়। এখানে এসে বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। কোন জায়গায় নেওয়াটা ঠিক হবে, কোন অবস্থায় নেওয়া যাবে না, এগুলো বিচার করা খুব কঠিন হয়ে যায়। কোন কোন জায়গায় মনুস্মৃতি একেবারে গোঁড়া, এটা হবে না তো একবার বলে দিলে আর কোন মতেই হবে না। এখানে বলে দিচ্ছেন খুব আপদে বিপদে পড়ে গেলেও এই রকম কাজ করবে না। যখন এর ওর কাছ থেকে টাকা নিতে শুরু করে তখন মানুষ বুঝতে পারেনা সে কোন জালে ফাঁসতে যাচ্ছে। সেইজন্য মনু সাবধান করে দিচ্ছেন ঘোর বিপদের মধ্যেও যদি পরে যাও তাও কারুর কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করা তো দূরে থাকুক মনে মনে চিন্তাও করবে না। পরের শ্লোকে বলছেন –

মনের চাঞ্চল্যতাই আসক্তির লক্ষণ

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।

অতিপ্রসক্তিধৈতেষাং মনসা সন্নিবর্তয়েৎ।।৪/১৬

ইন্দ্রিয়ের যে চারটি বিষয় – রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও গন্ধ এই বিষয়গুলিতে কখনই কাম-বাসনা নিয়ে উপভোগের জন্য আসক্ত হবে না। আমি গান শুনতে ভালোবাসি, খুব ভালো কথা। কিন্তু আসক্তি নিয়ে গান শুনতে নিষেধ করা হচ্ছে। আসক্তি নিয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ভোগ করলেই গোলমাল হতে বাধ্য। বিষয়গুলির প্রতি আসক্তি যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে জোর করে বিষয়ের দোষ চিন্তা করে করে বিষয় থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে আসতে হবে।

তাই বলে কেউ যদি মন্দিরে রোজ সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজন শুনতে ছুটে আসছে, এটা তখন ইন্দ্রিয়াসক্তি হবে না। বিয়ে বাড়ির ভোজে বা কোন পার্টিতে খাওয়া-দাওয়া করার পর মনের মধ্যে একটা চঞ্চলতার ভাব জেগে ওঠে। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সবাই গল্প, আড্ডা, ইয়ার্কি করতে চায়। সিনেমার শো ভাঙার পর, কিংবা সার্কাস দেখতে গেছে, তাজমহল দেখতে গেছে, দেখার পর দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। কিন্তু বেলুড় মঠে সন্ধ্যাবেলা আরতির ভজন শুনে ঠাকুরকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলে মনটা শান্ত হয়ে যায়, এখানে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি না পেয়ে কমে যাচ্ছে। যে জিনিষ ভোগ করার পর চিন্তের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় সেটাই ইন্দ্রিয় সুখ। যে জিনিষ করার পর চাঞ্চল্য কমে যায় সেটাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সুখ। এখানে

আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হচ্ছে না। যে কাজ করলে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় তার কথা বলা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের ভোগের বিষয় সামনে চলে এলেই সাধারণ মানুষের সবারই মধ্যে চঞ্চলতা বেড়ে যায়। চারটে ইয়ং ছেলে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হঠাৎ যদি তাদের সামনে দিয়ে কোন যুবতী মেয়ে চলে যায় এদের কথা বলার জোরটা সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। মেয়েটিকে শোনানোর জন্য বাড়ছে না, এমনিতেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়ে যায়, এটাই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক খেলা। এটা ইন্দ্রিয়ের খেলা নাকি আধ্যাত্মিক ব্যাপারের খেলা একমাত্র বোঝা যাবে মনের চাঞ্চল্যতাটা বাড়ছে না কমছে। বেলুড় মঠে পঙ্কতি ভোজনে ভক্তরা রোজ লাইন করে প্রসাদ খাচ্ছেন, খুবই সামান্য আয়োজন কিন্তু খাওয়ার আগে ব্রহ্মার্চণং আর খাওয়া শেষ হলে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এতেই সবার মন শান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিকনিকে যদি এই ধরনের খাওয়াও দেওয়া হয় তাতেও চাঁচামেচি হবে আর মাংস পোলাও খেয়েও চাঁচামেচি তো হবেই। যখন আমরা কীর্তন শুনছি বা ভজন শুনছি তখন আমাদের মনটা আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন সিনেমার গান করছি বা শুনছি তখন মনের ভাবটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। এরপর বলছেন নিজের ব্যক্তিত্বকে কিভাবে রক্ষা করবে –

মানুষের আচরণ ঠিক হয় পাঁচটি জিনিষকে কেন্দ্র করে

বয়সঃ কর্মগোহর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।

বেষবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচেরেদিহ।।৪/১৮

সংসারে, সমাজে তুমি কি রকম ভাবে চলাফেরা, মেলামেশা করবে বলা হচ্ছে। পাঁচটি বিষয় আমাদের সবার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানকে সূচিত করে। প্রথম হল বয়স, তোমার বয়স অনুযায়ী সবার সাথে আচরণ করবে। দ্বিতীয় তুমি কেমন কাজ করছ তাই দিয়ে তোমার মর্যাদার মান নিরূপিত হবে। যেমন, একটা কলেজের ছেলে এখন সে ইউনিয়ন করবে, ইনকুবা জিন্দাবাদ করবে, মেয়েদের পেছনে দৌড়াবে, রেস্টুরেন্টে খাবে। কয়েক বছর পর সেই ছেলেটিই এমএ পাশ করে সেই কলেজেই লেকচারার হয়ে এসেছে, এবার কিন্তু তাকে এই কাজগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যে তার কর্মটা পাল্টে গেল। এতদিন সে ছিল ছাত্র, এখন হয়ে গেল শিক্ষক। এরপর সে হয়তো কলেজের কোন ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে গেল, এরও কয়েক বছর পর সে হয়তো কলেজের সহাধ্যক্ষ হয়ে গেল, এইভাবে যত তার কর্মটা পাল্টে যেতে থাকবে তার ব্যবহারটাও পাল্টাতে থাকবে। বয়স আর কর্মের পর তৃতীয় হল অর্থ। মানুষের টাকা-পয়সা যেমন যেমন বাড়তে বা কমতে থাকবে সেই অনুসারে তার ব্যবহারটাও পাল্টাতে থাকবে। চতুর্থ শাস্ত্রজ্ঞান আর পঞ্চম বংশ, কোন কাজ করার আগে দেখে নাও তুমি কোন বংশের লোক।

এই পাঁচটিকে কেন্দ্র করে তিনটে জিনিষ চলবে। প্রথম হল বৈশিষ্ট্য, আপনি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবেন সেটা নির্ভর করবে আগে যে পাঁচটা বিষয় বলা হল তার উপর। দ্বিতীয় কথাবার্তা, আমার কি ধরনের কথাবার্তা বলা উচিত এটাও নির্ভর করবে ওই পাঁচটি বিষয়ের উপর। সব শেষে তৃতীয় হল বুদ্ধির ব্যবহার। স্কুলের ক্লাশ ওয়ানের বাচ্চা বাচ্চা ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে এটা জানা কথা। কিন্তু ইউনিভার্সিটির স্পিরিচুয়াল হেরিটেজের ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্ররা যদি এখন মারামারি করে তাহলে সেটা কখনই স্বাভাবিক হবে না। কর্মের দিক দিয়ে এরাও ছাত্র কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে মারামারি করাটা একেবারেই অশোভনীয়। কলেজের আঠারো বছরের মেয়েকে যদি দেখতে সুন্দর না লাগে, সাজগোজ যদি না করে, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ যদি না করতে পারে তাহলে মেয়ে হিসাবে তার কোন মর্যাদা নেই, এটাই আঠারো বছরের একটা মেয়ের ধর্ম। নারী মানেই সৌন্দর্য। বর্তমান যুগে একটা মেয়েকে যদি দেখতে সুন্দর না দেখায় তাহলে তার ব্যক্তিত্বে অনেক ত্রুটি ধরা পড়বে। কিন্তু এবার তার বিয়ে হয়ে গেল, এখন কিন্তু তাকে নিজেকে পাল্টে ফেলতে হবে। বিয়ের পরেও আঠারো বছরের কলেজের মেয়েদের মত পোশাক চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা কিন্তু একেবারেই অশোভনীয়। এরপর হল কথাবার্তা। এতদিন তুমি বাবা ছিলে, সন্তানদের প্রতি তোমার কথাবার্তার মধ্যে একটা অনুশাসনের ভাব ছিল। এখন তুমি দাদু হয়ে গেছ, দাদু যদি নাতির উপর ক্রোধ করে তাহলে

বুঝতে হবে তার কিছু গোলমাল আছে। ঠাকুরদা মানেই নাতি যত দুষ্টুমি অবাধ্যপনা করুক না কেন সবটাই তাকে সহ্য করতে হবে। সহ্য করাটাই দাদুর কাজ। সব শেষে বুদ্ধির ব্যবহার। একটা বাচ্চা ছেলের চঞ্চলতাটাই স্বাভাবিক অবস্থা, একটা যুবকের সব সময় রণং দেহি ভাব – চল আজকে ক্লাশ বন্ধ করে দাও, চল আজকে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করি – এটাই এদের স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা কখনই এই ধরনের ব্যবহার করবে না।

এই পাঁচটা বিষয়কে আমাদের খুব ভালো করে বুঝে নিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই রকম আচরণ করতে হবে। বয়স, কর্ম, সম্পত্তি আমার কেমন, শাস্ত্রজ্ঞান আর বংশ। *অভিজ্ঞানস্য* মানে কুল বা বংশ, যেমন বলা হয় – মনে রেখো তুমি কোন বংশের লোক। আমার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে অগোছালো ভাব, কোন কিছুই সামলে রাখতে পারছি না, বাস্তব, আলমারি খোলা ছেড়ে দিচ্ছি, চাবি দিতে ভুলে যাচ্ছি – এগুলো কখনই করা উচিত নয়। এর সাথে আপনি হয়তো একটা অতি সাধারণ পরিবারের সদস্য কিন্তু এদিকে আপনার গায়ে সব সময় খুব দামী দামী পোষাক-আশাক। বুঝে নিন আপনার সর্বনাশ হতে বেশী দেরী নেই। মনু বলে দিচ্ছেন তোমার টাকা-পয়সা, সম্পত্তি কেমন আছে আগে বুঝে নিয়ে তোমার কথাবার্তাও সেই রকম হবে, বেশভূষাও সেই রকম হবে। দামী দামী না হোক কিন্তু রুচি সম্মত হবে, এতেই তোমার ব্যক্তিত্বে শ্রী থাকবে। আজকাল টিভিতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বপ্ন বিক্রী করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা কত রকমের প্রসাধন লাগাচ্ছে, কত সুন্দর সুন্দর পোষাক পড়ছে, হিরোমার্কা ছেলেরা কত দামী দামী মোটর সাইকেলে হুঁশ-হাঁশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে একজন মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক একটা মোটর সাইকেল কিনেছেন। এই মোটর সাইকেল নাকি দেশে কয়েকজনের কাছেই আছে, যার দাম কুড়ি লাখ টাকা। খুব বিশেষ ধরনের মোটর সাইকেল, আড়াই'শ কিলোমিটার গতি বেগে নাকি যেতে পারে। ভদ্রলোক মোটর বাইকটা কিনে খুব খুশী। একজন মহারাজকে খুব গর্ব করে বলছে, আমার জীবনে স্বপ্ন ছিল এই মোটর বাইকটা কিনি। পঞ্চাশ বছর বয়সে এই ধরনের স্বপ্ন দেখে তার পেছনে এত টাকা খরচ করে ইয়ং সাজাটা একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় কি!

এই জগতে বিচরণ করতে গেলে এই তিনটে জিনিষকে ওই পাঁচটি বিষয়ের অনুযায়ী চলতে হবে – বেশভূষা, কথাবার্তা আর বুদ্ধি। যেমন তোমার বয়স হয়েছে, সেই অনুসারে তোমার পোশাক-আশাক হবে, বয়সের মর্যাদা অনুযায়ী তোমার কথাবার্তা হবে আর বয়স অনুসারে তোমার বুদ্ধির ব্যবহার হবে। তুমি যে ধরনের কর্ম নিযুক্ত আছ সেই অনুযায়ী তোমার বেশভূষা, কথাবার্তা আর বুদ্ধির ব্যবহার চলবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবহার এক রকম হবে, যে মুর্থ ব্রাহ্মণ তার আরেক রকম ব্যবহার হবে। সন্তোষের কথা যেটা বারো নং শ্লোকে বলা হয়েছে এর সাথে এই আঠারো নং শ্লোক সরাসরি যুক্ত – কেমন তোমার বয়স, কেমন তোমার কর্ম, যেমন তোমার টাকা, যেমন তোমার জ্ঞান আর কেমন তোমার বংশ – এই পাঁচটার উপর নির্ভর করে তেমন তোমার বেশভূষা, তেমন তোমার কথাবার্তা আর কেমন তোমার বুদ্ধির প্রয়োগ। এর সাথে ব্রাহ্মণদের খুব সুন্দর কথা বলছেন, কয়েকটা জিনিষ আছে যেগুলো পালন করলে কতকগুলি জিনিষ বৃদ্ধি পায় –

বুদ্ধির বিকাশ, অর্থ বৃদ্ধি এবং হিত সাধনের উপায়

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরণ্যাশু ধন্যানি চ হিত্যানি চ।

নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষ্যেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্।।৪/১৯

তিনটে জিনিষের বৃদ্ধির কথা বলছেন – বুদ্ধির বিকাশ হয়, অর্থ সমাগম বৃদ্ধি হয় আর জীবনের পক্ষে যেটা হিত সেটা পাইয়ে দেয়। যখন মানুষ কিছু কিছু বিশেষ শাস্ত্রকে নিত্য অধ্যয়ন করে তখন তার বুদ্ধির বিকাশ হয় – যেমন ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরান, স্মৃতিশাস্ত্র, মীমাংসা শাস্ত্র, এই ধরনের শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে বুদ্ধির বিকাশ হয়। অর্থশাস্ত্র পড়লে, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৃহস্পতি ও শুক্ল প্রণীত নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। আর আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করলে জীবনে হিত সরাসরি পাওয়া যায়। যেমন

আয়ুর্বেদ জানা থাকলে নিজের শরীর কিসে ভালো থাকবে জানা যাবে আবার শরীরে রোগব্যাদি হলে তার উপশম করার উপায়টা জানা থাকার জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে, জ্যোতিষশাস্ত্র জানা থাকলে কখন কি কাজ করতে হবে, কখন কোন কাজ করা যাবে না, এই ব্যাপারে আগে থাকতেই প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া যায়। নিগমকে ভাষ্যকাররা বলছেন বেদার্থাববোধক, অর্থাৎ নিরুক্তকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু আমরা এখানে নিগমকে বেদ অধ্যয়ন রূপেই বিবেচনা করতে পারি। বেদ অধ্যয়ন মানুষের অদৃষ্টকে ভালো করে, মৃত্যুর পর যে সে উত্তম লোকে বা উচ্চ স্বর্গে বা উত্তম যোনিতে জন্ম নেবে সেটা বেদ অধ্যয়নের দ্বারা হয়। মনু ব্রাহ্মণদের বলছেন এই কটি শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করবে। যে ব্রাহ্মণ নিজের বুদ্ধির বিকাশ করতে চায়, ধনবর্ধন চায় আর হিতসাধন করতে চায়, হিতসাধন আবার দুই রকমের হয় – দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, এই চারটে জিনিষের বর্ধনের জন্য সেই ব্রাহ্মণকে অবশ্যই এই কটি শাস্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করে যেতে হবে।

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।

তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানধ্বস্য রোচতে।।৪/২০

মানুষ যেমন যেমন শাস্ত্রের নিয়মিত অভ্যাস করতে থাকে তেমন তেমন তার সেই শাস্ত্রের অর্থটা সুস্পষ্ট হয়। *বিজ্ঞানধ্বস্য রোচতে*, যেমন যেমন শাস্ত্রের অর্থ স্পষ্ট হতে থাকে তেমন তেমন তার জ্ঞান নির্মল হতে থাকে আর শাস্ত্রের প্রতি ভালো লাগার ব্যাপারটা জেগে যায়। এগুলো সবই অভ্যাস ও অনুশীলনের ব্যাপার। যেমন যেমন আপনি কোন জিনিষ অভ্যাস করবেন তেমন তেমন সেই জিনিষটা ভালো লাগতে শুরু করবে। প্রত্যেককেই বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্ম করতে হয়। কারুর কারুর তার নিজের কর্মক্ষেত্রে যে কর্মটা করছে সেটা করতে ভালো লাগে আবার অনেকের ভালো লাগে না। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালো লাগতে শুরু করে আবার অনেকের ক্ষেত্রে ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কখনই হবে না। যেমন যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকবে তেমন তেমন তার শাস্ত্রের প্রতি রুচি বৃদ্ধি হতে থাকবে, রুচি বৃদ্ধি হওয়া শুরু করলে তেমন তেমন শাস্ত্রের অর্থ স্পষ্ট হওয়া শুরু হয়। শাস্ত্রের অর্থ যত স্পষ্ট হতে থাকবে ততই শাস্ত্রের প্রতি রুচি উৎপন্ন হবে। মূল কথা হল শাস্ত্রের অভ্যাস নিয়মিত করে যেতে হবে। যারাই নিজেদের জ্ঞান নির্মল করতে চাইছে তাদের প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে দিনে আধ ঘন্টা কি এক ঘন্টা করে কয়েকটা বিশেষ বইকে ঠিক করে নিয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন করা। যাদের বাড়িতে যেমন যেমন সংস্কার আছে, সেই সংস্কার অনুযায়ী কেউ গীতা অধ্যয়ন করতে পারে, কেউ শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করতে পারে বা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গ্রন্থাদির যে কোন একটা রোজ পারায়ণ করে যেতে পারে। মন্ত্র ও শ্লোকগুলো পাঠ করতে করতে অনুবাদটাও দেখে নিচ্ছে। এইভাবে চার-পাঁচটি বইকে ঠিক করে নিয়ে নিয়মিত পাঠ করে যেতে পারে। এটা গেল নিত্য পাঠের সূচি। এর সাথে শাস্ত্রের একটা বিষয়কে ধরে রেখে সেই বিষয়ের উপর বিভিন্ন শাস্ত্র কি বলছে জেনে নেওয়া। তার সঙ্গে মানসিক বিনোদনের জন্য কিছু বাইরের বইও পাঠ করতে হয়। যাদের বিদ্যার প্রতি আগ্রহ নেই, বিদ্যা চর্চা করে না, আস্তে আস্তে তারা পাথরের মত জুবুজু হয়ে যায়। বুদ্ধিবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি আর হিতবৃদ্ধির জন্য এই শাস্ত্রগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করে যেতে হয়।

ঋষিযজ্ঞং দেবজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্বদা।

ন্যযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।।৪/২১

হাপয়েৎ, মানে কোন অবস্থাতেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ ত্যাগ করবে না। এর আগে আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ঋষিযজ্ঞ হল নিয়মিত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা, তার সাথে ধ্যান করা। দেবযজ্ঞ হল বিভিন্ন উপাচারে কিছু কিছু দেব-দেবীর পূজা করা, গৃহদেবতার পূজা, ইষ্টদেবতার পূজা করা, গঙ্গাস্নান করা, আটকে প্রসাদ খাওয়া, এগুলো সব দেবযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। ভূতযজ্ঞ হল প্রতিদিন কিছু পশুপাখীদের খাওয়ানো বা কিছু অর্থ আলাদা করে সরিয়ে রেখে বছরের শেষে যেসব সংস্থায় পশুপাখীদের নিয়ে কাজ করা হয় তাদের সেটা ডোনেশান করাটাও ভূতযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। ন্যযজ্ঞ হল অতিথিদের সেবা করা, তাদের কিছু খাওয়ানো বা

গরীব মানুষের সেবা করা। রোজ রোজ অতিথি কোথায় খুঁজতে যাবে, তার চেয়ে বরং কিছু অর্থ আলাদা করে সরিয়ে রেখে বছরে একদিন যখন পাড়াতে কোন পূজা হবে বা বস্ত্র বিতরণ হবে সেখানে সেই জমান অর্থটা দান করে দেওয়া। শেষে পিতৃযজ্ঞ, পিতৃদের উদ্দেশ্যে একটু অন্নজল দেওয়া। এসব প্রথা এখন উঠে গেছে, সেইজন্য কিছু টাকা আলাদা করে রেখে দেওয়া হল, পরে সেই অর্থ কোন সেবামূলক সংস্থাকে পিতৃদের নামে দান করে দেওয়াটাও পিতৃযজ্ঞের মধ্যে গণ্য হবে। ঋষিযজ্ঞ আর দেবযজ্ঞ করতে টাকা লাগে না, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ আর পিতৃযজ্ঞ করতে কিছু টাকা লাগে। পারিবারিক আয় থেকে যদি শতকরা এক ভাগও আলাদা করে রাখা হয় তাহলে দশ হাজার টাকায় একশ টাকা হিসাবে বছরে বারো'শ টাকা হয়ে যাবে। এই টাকার একটা অংশ পিতৃদের নামে বৃদ্ধাশ্রমে কিংবা গরীবলোকের সেবায়, একটা অংশ যাবে পশুপাখীদের সেবায় আর বাকিটা অতিথি সেবায় যাবে। এটুকু করতে আমাদের কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু আমরা মানসিক ভাবে এতই দুর্বল যে টাকা দেখলেই আমাদের চোখ ঝাঁঝাড়া হয়ে যায়। সমস্যা হল পঞ্চাশ হাজার রোজগারে যদি শতকরা দুটাকা হিসেবে ধরা হয় তাহলে সেটা মাসে হাজার টাকা হয়ে যায়, বছরে বারো হাজার টাকা, তিন বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা। ছত্রিশ হাজার টাকা আমি দান করব ভাবলেই মানুষের চোখটা ঝাঁঝাড়া হয়ে যায়। তখন হিসাব করবে দু বছর ওই টাকা রেখে দিলে আমার একটা গাড়ি কেনা হয়ে যাবে। টাকা দান করতে সমস্যা হয় না, সমস্যা হল এক সঙ্গে দানের টাকার পরিমাণটা হিসাব করলেই চোখটা ঝাঁঝাড়া হয়ে যায়। ঈশ্বর যেমন নিজের ঐশ্বর্য দেখে ভুলে যান তেমনি মানুষ নিজের টাকা দেখে নিজেই ভুলে যায়। মনুষ্যত্বে যা কিছু বলা হচ্ছে এগুলো জীবনে অনুশীলন করার জন্যই বলা হচ্ছে। বলে দিচ্ছেন, কোন অবস্থায় এই পাঁচটি যজ্ঞ যেন ত্যাগ না হয়। মানুষের মনে যতক্ষণ ত্যাগের ভাব না জাগে, নিঃস্বার্থ যতক্ষণ না হতে পারছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিকতার কোন প্রশ্নই নেই।

কোন ধরনের অতিথিকে সেবা করতে নেই

পঞ্চ মহাযজ্ঞকে এত সম্মান দেওয়া হয় যে, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা এটাকে জ্ঞান চোখে দেখেন। এমনকি সন্ন্যাসীদের বলছেন তাঁদের বাকী যজ্ঞগুলো করতে হয় না কিন্তু ঋষিযজ্ঞ আর দেবযজ্ঞ অবশ্যই করতে হবে। এর মধ্যে আবার কিছু কিছু শর্ত রেখে দিয়ে বলছেন কোন্ কোন্ অতিথিদের সেবা করবে না। এদেরকে আসুন আসুন! কেমন আছেন ইত্যাদি বাক্য মাত্র দ্বারা আপ্যায়ন করে বিদায় করতে হয়। এখানে বলে দিচ্ছেন কাদের সঙ্গ বা খাতির করতে নেই –

পাখণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।

হৈতুকান্ বকব্ভীংশ্চ বাঙমাত্রোগাপি নার্চয়েৎ।।৪/৩০

প্রথম বলছেন পাখণ্ডি, পাখণ্ডি হল যারা বেদের কথার বিরুদ্ধে কাজ করে অথচ তপস্বীর বেশভূশা ধারণ করে আছে। দ্বিতীয় বিকর্মস্থান, যারা অন্য ধরনের কর্ম করে, যেমন বৌদ্ধরা। তখনকার দিনে এনারা বৌদ্ধদের একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। তৃতীয় বৈড়ালব্রতি, যারা চালাকির দ্বারা অপরকে আকৃষ্ট করার জন্য ধর্মাচরণ করে। একটা কাহিনী আছে, একটা বিড়াল বুড়ো হয়ে যাওয়ার পর আর ইঁদুর ধরতে পারছিল না। কি করবে ভেবে একটা মালা নিয়ে দেখাচ্ছে আমি আর হিংসা করি না শুধু মালা নিয়ে ভগবানের নাম করি। ইঁদুরগুলো সাহস করে কাছে আসতেই গপ্প করে খেয়ে নিত। সেই থেকে এই ধরনের লোকেদের নাম হয়ে গেল বিড়াল তপস্বী, সংস্কৃতে বৈড়ালব্রতী। এদেরকে আপ্যায়ন করে খাওয়ালে কোন পুণ্য হয় না। কথামাত্র দিয়ে আপ্যায়ন করে এদের বিদায় করে দিতে হয়। চতুর্থ শঠ, একদিকে এরা মুর্থ আবার অন্য দিকে বেদের কথাকে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ যারা নাস্তিক তাদেরকে শঠ বলছেন। পঞ্চম হৈতুকান্, হৈতুবাদী (বেদের ধর্মকে না মেনে যারা তর্ক করে)। হৈতুবাদী হল এখনকার দিনে যারা যুক্তিবাদী। এদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে নেই। ষষ্ঠ হল বকব্ভী, বক এক পায় দাঁড়িয়ে ধ্যান করার ভান করছে আর অন্য দিকে মাছ শিকার করে যাচ্ছে, এদেরকে বাংলায় বলে বকধার্মিক। এদেরকে কোন খাতির করতে নেই, এদের খাতির করলে কোন পুণ্য পাওয়া যাবে না। অন্য একটা শ্লোকে বলছেন –

ন সীদেৎ স্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধা শক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি।।৪/৩৪

মনুস্মৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আত্মহিত

যাঁরা স্নাতক বা পণ্ডিত এই শ্লোকে তাঁদের সাবধান করে বলছেন – যদি নিজের বিদ্যা দান করে কোন প্রতিগ্রহ পাওয়ার ক্ষমতা হয়ে যায় তাহলে তুমি কোন অবস্থাতেই দুখী থাকবে না। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন কোন ভাবেই যেন তোমার মধ্যে হতাশার ভাব না আসে। উচ্চতর ব্রাহ্মণদের বলছেন তুমি বেদ অধ্যাপনা করে যা দক্ষিণা পাবে তাই দিয়ে তোমার জীবন নির্বাহ করবে, আর উজ্জ্বলিত বৃত্তি হল সাধকদের জন্য। আর বলছেন তোমার কাছে যদি সামান্য টাকা-পয়সাও থাকে তাহলেও কিন্তু তুমি কখনই জীর্ণ ও নোংরা বস্ত্র ব্যবহার করবে না। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, তোমার যে বিদ্যা আছে সেই বিদ্যার দ্বারাই নিজেকে সর্বদা রক্ষা করবে, ছেঁড়া বস্ত্র, মলিন বসন কখনই পরিধান করবে না। ঠাকুরও নিষেধ করছেন, ছেঁড়া কাপড় পড়তে নেই। আর এমন ভাব কখন থাকবে না যে লোকে দেখে তোমাকে মনে করবে তুমি খুব অভাবগ্রস্ত। তোমার বিদ্যার ক্ষমতা আছে, সেই বিদ্যা দিয়েই তুমি সব কিছুর প্রতিকার কর, তুমি অধ্যাপনা করে কিছু উপার্জন কর। এই কথা বলে বলছেন যাঁরা স্নাতক তাঁরা যেন নিজেকে সব সময় ফিটফাট রাখে। কিভাবে ফিটফাট রাখবে? দাঁত নিয়মিত ব্রাশ করবে, চুল উশখো-খুসকো যেন না থাকে, পরিপাট করে মাথার কেশকে ঠিক রাখবে, নিয়মিত দাড়ি কামাবে, একটু আধটু ক্রেশ সহ্য করার ক্ষমতা রাখবে, সাদা বস্ত্র ব্যবহার করবে কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করবে না। স্বাধ্যায় নিয়মিত করবে। আর আত্মহিতের জন্য সর্বদা তৎপর থাকবে।

মনুর কাছে মুক্তি বা জীবনের অন্যান্য উদ্দেশ্য গৌণ। যদিও অনেকে মনে করেন অন্যান্য শাস্ত্রের মত মনুস্মৃতিরও উদ্দেশ্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে মনুস্মৃতির পার্থক্য যদি বিচার করি তাহলে দেখতে পাব মনু আত্মহিতের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। আত্মহিতের উপর জোর দেওয়াটাই মনুস্মৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মহিতের উপর জোর দেওয়া মানে, তোমার শরীরকে সব সময় রোগমুক্ত রাখবে, তোমার পোশাক-আশাক ঠিক রাখবে, তোমার আচরণ দ্বারা বাকিরা তোমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছে সেই দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। এগুলো ঠিক ঠিক অনুসরণের দ্বারা তোমার বুদ্ধিবৃত্তির যেন বিকাশ হয়, তোমার ব্যবহার যেন মার্জিত হয়। এইসব করার পর শেষে বলে দেবেন কিভাবে তুমি মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। মনুস্মৃতিতে মুক্তির ব্যাপার অনেক পরের কথা। গীতা যেমন প্রথম থেকেই মোক্ষের উপর বেশী জোর দিচ্ছে, এখানে তা নয়। আগে তুমি এগুলো করবে। কি করবে? চুল সুন্দর করে আঁচড়াবে, রোজ দাড়ি কাটবে, দাঁত ব্রাশ করবে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিধান করবে, পরিধেয় বস্ত্র যেন কোন অবস্থাতেই ছেঁড়া ফাটা না থাকে, শরীরের প্রতি যত্ন নেবে, সব কিছুতে সজাগ থাকতে হবে আর এখান থেকেই তোমার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়। বাইরে থেকে ঘুরে এসে আপনি চটিটা কিভাবে রাখছেন সেটা দেখেই বোঝা যাবে মনের কোন স্তরে আপনি বিচরণ করছেন।

হোস্টেলের ছাত্রদের খাওয়ার পরে তাদের থালা দেখে বলে দেওয়া যায় কে কত নম্বর পায়। দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছাত্রদের এই কথাই একদিন বলছিলেন। ছাত্ররাও শুনে খাওয়ার পর মজা করে তাদের এঁঠো থালা এনে অধ্যক্ষকে দেখিয়ে যেত। একটি ছাত্রের থালা খুবই অপরিষ্কার ছিল, থালা দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটির মন গোছান নয়। ছেলেটিকে অধ্যক্ষ বলেই দিলেন ‘তোমার তো কোন দিনই ভালো নম্বর পাওয়ার কথা নয় দেখছি’। মজার ব্যাপার হল একদিন ছাত্রদের হোস্টেলে গিয়ে অধ্যক্ষ সবার বিছানা দেখছেন। একটি ছাত্রের বিছানার পরিপাটি দেখে বলছেন ‘এই বিছানাটা কার? এর রেজাল্ট খুব ভালো হবে’। এমনই কপাল বিছানাটা ওই ছেলেটারই, যাকে কদিন আগে অধ্যক্ষ বলেছিলেন তোমার দ্বারা কোন দিন ভালো রেজাল্ট হবে না। এই ধরনের বিরাট বৈপরিত্য সচরাচর দেখা যায় না, তার থালা এতই নোংরা যে দেখেই বোঝা যায় তার মনটা খুবই চঞ্চল অথচ বিছানা এমন টিপটপ যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আসলে সত্যিই ছেলেটি অনেক নীচের দিকে ছিল, কিন্তু শেষের দিকে এমন সে খাটল যে পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট

করে বেরিয়ে এল। অধ্যক্ষ কিন্তু দুটো কথাই ঠিক বলেছিলেন, ছাত্রটির মনটা আসলে খুবই চঞ্চল প্রকৃতির কিন্তু একেবারেই যে গোপলায় চলে গিয়েছিলে তা নয়। ও যখন লাগবে তখন নিজেকে একটা স্তরে তুলে নিয়ে আসতে পারবে। ইংরেজরাও নিজেদের পোষাকের ব্যাপারে খুব সচেতন, অনেককে বলতে দেখা যায় এর dress sense দারুণ। এগুলো হল লক্ষণ, তার মনটা কতটা সংগঠিত – Externally disorganized persons are always internally disorganized। যারা বাইরে ছিমছাম পরিপাটি নয় তাদের ভেতরটাও অগোছালো। এখানে স্নাতক পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কথা বলা হচ্ছে, এঁদের সব কিছু চুল থেকে পায়ের চপ্পল পর্যন্ত একেবারে ফিটফাট থাকা বাধ্যতামূলক। গৃহস্থদেরও অবশ্যই এইভাবে ফিটফাট থাকতে হবে, বিশেষ করে মেয়েদের। মেয়েদের সঙ্গে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ থাকবে তাতে সব সময় ছোট্ট আয়না, ফেসপাউডার, লিপস্টিক রাখবে। এটাই নারীর ধর্ম, কারণ মেয়েদের মন সাধারণতঃ বেশী চঞ্চল, তাই তাদের মনকে সব সময় চাঞ্চল্যরহিত রাখার জন্য সব কিছুতে পরিপাটির দরকার হয়। স্বামীর মৃত্যু বা সন্তানের মৃত্যু নারীকে একেবারে উদভ্রান্ত করে দেয়।

এই উদভ্রান্ত ভাবটা ধরা পরে সব সময় শরীরের লক্ষণে। এই জিনিষটাকে প্রথম ধরল ব্রিটিশ আর্মিরা। ব্রিটিশ আর্মিরা ধরল ঠিক উল্টো ভাবে। মস্তিষ্ক বা মন যদি disorganized হয় তাহলে তার শরীরটাও disorganized হবে। এর উল্টোটা কি হবে? শরীরকে যদি organized করে দেওয়া যায় তাহলে মনও organized হয়ে যাবে। ব্রিটিশরা তাদের নামকরা স্কুল গুলোতে এইটাকে প্রয়োগ করল, ছেলেগুলোকে রীতিমত ট্রেনিং দিতে শুরু করল যাতে তাদের শরীর একেবারে organized থাকে। দ্বিতীয় যেটা প্রয়োগ করল সেটা তাদের মিলিটারিতে, শুধু লেফট রাইট করিয়ে করিয়ে জংলী ট্রাইবাল গুলোকে বানিয়ে দিলে পুরো দস্তুর মিলিটারি অফিসার। যার জন্য এরা যখন নিজের দেশ থেকে বিশ্ব জয় করতে বেরোল সারা বিশ্বকে জয় করে নিল। কারণ যাদের শক্তি ছিল, হিন্দু বলুন মুসলমান বলুন এবং অন্যান্য দেশের যত রাজা ছিল, এদের এই ডিসিপ্লিনটা ছিল না। এদের যুদ্ধ কৌশল ছিল ঠিকই কিন্তু এই ডিসিপ্লিন না থাকতে তারা ইংরেজ সৈন্যদের কাছে মার খেয়ে গেল।

রুডিয়র্ড কিপ্লিং, যিনি জঙ্গল বুক লিখেছেন, প্রথমে মিলিটারিতে ছিলেন। উনি অনেক ভালো ভালো বই লিখেছেন। আফগানিস্তানকে একমাত্র টাইট করতে পেরেছিল ব্রিটিশ সৈন্যরা। রুডিয়র্ড কিপ্লিং এই নিয়ে আবার খুব মজার গল্প লিখছেন। আফগানের কিছু লীডাররা এসে ব্রিটিশ মিলিটারির কর্তাদের সাথে কথা বলছে, সেই ব্রিটিশ আর্মি তাদের মার্চপাস্ট দেখাচ্ছে। মার্চপাস্টে মিলিটারি ঘোড়াগুলোর কুচকাওয়াজ দেখাচ্ছে, যেমন যেমন কমাণ্ড দিচ্ছে ঠিক সেই রকম ভাবে এক ছন্দে ঘোড়াগুলো পা ফেলে ফেলে চলেছে। আফগান লীডাররা দেখে বলছে – বাবা! ঘোড়াগুলোও কথা মেনে চলে, আমাদের কথাতো মানুষরাই মানতে চায় না। ইংরেজরা বলছে – বুঝে নাও এবার, আমরা এমন লোক যে, আমাদের আদেশ ঘোড়া পর্যন্ত মানে। সঙ্গে সঙ্গে আফগানরা ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে নিল। এই নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। ব্রিটিশরা উল্টোটা করে দেখিয়ে দিল এদের শরীরকে যদি organized করে দেওয়া যায় তাদের মনটাও organized হয়ে যাবে।

যখন মানুষের মধ্যে কোন ধরনের শোক আসে, বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, টাকা পয়সা চলে গেছে, স্বামী বা স্ত্রী বা সন্তান মারা গেছে, এই শোক তার মস্তিষ্ককে পুরো নষ্ট করে দেবে। কারুর স্বামী মারা গেলে, কিংবা সন্তান মারা গেল, যার যাবার সেতো চলে গেল কিন্তু মনুষ্যত্বের মূল ধর্ম আত্মহিতেশু এটাকে কোথায় লাগাতে হবে? যার নিজের লোক মারা গেছে সেতো বলছে আমার আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। এতো ঠিকই কথা, কিছু করতে তো ইচ্ছেই করবে না। তবে যেটা সহজ সেটাতো করতে পার। সেইজন্য ভারতীয় বিধবারা কোন শৃঙ্গার করবে না কিন্তু টিপটপ্ থাকতে কোথাও নিষেধ করা হচ্ছে না। প্রথমে তোমার জীবনটাকে একটা শৃঙ্খলে বদ্ধ কর। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বাভাবিক ভাবেই বলবে আমি আর কার জন্য রান্না করতে যাব। আরে তোমাকে তো বাঁচতে হবে তুমি তোমার নিজের জন্য রান্না করবে। নিজের জন্য ভেবে না পারলে ঠাকুরকে মনে করে তাঁর জন্য রান্না কর। তাতেও যদি তোমার মন সায় না দেয় তাহলে মনে কর আমার স্বামী

এখনও সূক্ষ্ম শরীরে আছেন। তাঁর জন্য একটা থালায় খাবার সাজিয়ে নিবেদন করে পরে কাউকে খাইয়ে দেবে। পিতৃযজ্ঞে তো এটাই করতে বলা হয়েছে। সব কিছুই আগে হল একটা ডিসিপ্লিন লাইফ। মনু বলছেন আত্মহিত, আমার নিজের ভালো আগে করতে হবে। চুল আঁচড়ান থেকে শুরু করে জুতো ব্রাশ পর্যন্ত সব কিছুকে ডিসিপ্লিন করে নিজেকে একজন dignified ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে হবে। এই dignified ব্যক্তিত্ব যদি না হয় তাহলে কোন দিন জপ ধ্যানও ঠিক মত হবে না, শাস্ত্র কোন দিন অধ্যয়ন হবে না, সামাজিক মর্যাদা কোন দিন আসবে না আর নিজের মধ্যে শান্তিও কোন দিন পাবে না। মেয়েগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা নখের পালিশ করেই যাচ্ছে। আমরা দেখে অনেকেই হাসবো। এদের একটাই সমস্যা শরীরের প্রতি প্রীতিটা বড্ড বেশী কিন্তু ডিসিপ্লিন। একটা নেল পলিশ অতক্ষণ ধরে ঘষতে থাকা কতটা ধৈর্যের দরকার। একদিকে শরীরের প্রতি প্রীতি, অন্য দিকে ধৈর্য। আধ্যাত্মিক পুরুষ সব সময় তার মধ্যে এই ধৈর্যটাকেই দেখবেন। যেমনি মানুষ ধৈর্যকে অবলম্বন করে নিজেকে organized করে নেবে তেমনি তার ভেতর থেকে শক্তি জেগে যাবে। এরপর কতকগুলো সাধারণ নিয়মের ব্যাপারে বলছেন, এর মধ্যে কিছু কিছু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়।

নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যাস্তং কদাচন।

নোপসৃষ্টং ন বারিষ্ঠং ন মধ্যং নভসো গতম্।।৪/৩৭

সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় সূর্যের দিকে তাকাতে না এবং গ্রহণ যখন হবে তখনও সূর্যের দিকে তাকাতে না। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য দেখতে না আর আকাশে মধ্যবর্তী অবস্থায় স্থিত সূর্যকে দেখতে না। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়টা হল আসলে সন্ধ্যাবন্দনার সময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে হিন্দুরা কখনই উৎসাহিত করে না। সূর্যগ্রহণ যখন হয় তখন সেটা একটা বিশেষ পূজার সময়। বিজ্ঞানীরা এখন অবশ্য বলছে ওই সময় সূর্যের দিকে তাকালে চোখের ক্ষতি হতে পারে। এমনিতেই এই পাঁচটা অবস্থায় – সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্যগ্রহণ, প্রতিবিম্বিত সূর্য আর মধ্য গগনের সূর্য চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কটি অবস্থায় তুমি যদি সূর্যের দিকে তাকাও তাহলে বাপু তোমার চোখটি খারাপ হবে। এগুলোও আসলে আত্মহিতের জন্যই বলা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারটাকে এনারা ধর্মের সঙ্গে অনুমোদন করে দিলেন। এর পরের শ্লোকটি আরও মজার –

ন লঙঘয়েদ্বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।

ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বং রূপমিতি ধারণা।।৪/৩৮

গরু, বাছুর, ছাগল দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকলে সেই দড়িকে লঙ্ঘন করে কখন যাবে না। কারণ গরু যদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে তখন হাঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে তোমার অনেক কিছুই হতে পারে। মহাভারতে মাক্ষি গীতাতে এই ধরনের একটা ঘটনার খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। মাক্ষি বলে একজন লোক ছিল। অনেক কিছু করতে গিয়ে তার প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে কিন্তু কোনটাতেই তার কিছু সুবিধা হচ্ছিল না। শেষে সব কিছু বিক্রী করে দুটো বাছুর কিনেছে। বাছুর দুটোকে চাষের কাজে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য দুটোর কাঁধে একটা ডাঙা বেঁধে ক্ষেতের মধ্যে দৌড় করছে। বাছুর দুটো হঠাৎ মাঠ থেকে সোজা রাস্তায় উঠে দৌড়াতে শুরু করেছে। রাস্তার মাঝখানে একটা উট বসে ছিল। উটের ঘাড়ের কাছ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন হঠাৎ উটটা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে পড়তেই ডাঙা বাঁধা বাছুর দুটো উটের ঘাড়ের মধ্যে আটকে গিয়ে সেই শুদ্ধ উঠে পড়েছে। উট দেখছে আমার ঘাড়ের উপর দুটো কি লাফালাফি করছে, সেই ভয়ে উটও প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করেছে। বাছুর দুটো চেষ্টা করে যাচ্ছে আর উটও দৌড়ে কোথায় পালিয়ে গেল মাক্ষি আর খোঁজই পেল না। মাক্ষি তখন কাঁদতে শুরু করেছে, যা কিছু সম্বল ছিল সব বিক্রী করে দুটো বাছুর কিনেছিলাম, এখন আমার সব চলে গেল। সেখান থেকে মাক্ষি আধ্যাত্মিক পথে চলে এল। সেটা আবার আলাদা কাহিনী। কিন্তু এই সমস্যা সব সময় হতে পারে। গরুটা বসে আছে আমি দড়িটা ডিঙিয়ে যাচ্ছি তখনই হঠাৎ গরুটা উঠে পড়ল, আমিও হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাত পা ভেঙে পড়ে রইলাম। এই ধরনের ঘটনা যে কোন সময়ই হতে পারে। তার সঙ্গে বলছেন যদি বৃষ্টি পড়তে থাকে তখন কখনই দৌড়াতে না। এগুলো ধর্মীয় কোন ব্যাপার নয়, আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে,

কারণ তোমার শরীরটা সব থেকে মূল্যবান। আর জলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে কখন তাকাবে না। বলছেন, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই রকমই।

জলের প্রতিবিম্বের দিকে কেন তাকাতে নিষেধ করছেন আমাদের কাছে ঠিক জানা নেই। তবে গ্রীক পুরানে নার্সিসাস নামে একটা কাহিনী আছে। নার্সিসাস দেখতে খুব সুন্দর ছিল। একদিন জলের প্রতিবিম্বে নিজের ছবি দেখে নিজেকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলেছে – আমি দেখতে এত সুন্দর! জলের ধার থেকে সে আর উঠতেই চাইছে না। সবাই এসে তাকে কত ভাবে বোঝাচ্ছে, কিন্তু সে সেখান থেকে নড়ছেই না। দিন গিয়ে রাত, রাত গিয়ে দিন জলের ধারেই বসে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওই জলের ধারেই নার্সিসাস মারা গেল। আফ্রিকান পরম্পরাতে একটা টোটকার কথা শোনা যায়। টোটকার মজার ব্যাপার হল কোন লোককে আপনি যদি তার ক্ষতি করতে চান তাহলে কায়দা করে একটা পাত্রে জল রেখে তার সামনে রেখে দিন। লোকটি পাত্রের জলে যখন তার প্রতিবিম্ব দেখতে থাকবে তখন কোন রকমে জলটা নাড়িয়ে দিতে হবে। নাড়িয়ে দিতেই লোকটির প্রতিবিম্ব ভেঙে গেল, এবার তার কিছু না কিছু সর্বনাশ হবেই। নামকরা লেখক সোমারসেট মং এর একটা কাহিনী আছে যার মূল থীমই হল যখন মানুষটা তার ছবি দেখছে তখন জলটাকে নাড়িয়ে দেওয়া। গ্রীকের নার্সিসাসের কাহিনী আর আফ্রিকার টোটকার ব্যাপারটাও এখানে মনুস্মৃতিতে ঠিক খাপ খায় না। ঠিক বলা যায় না মনু কেন জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে নিষেধ করছেন। একটা হতে পারে জলে চেউ উঠতে থাকে, সেই সময় নিজের ছবিটাও বিচিত্র ভাবে নড়তে থাকে, নিজের বিকৃত ছবি দেখাটা খুব একটা ভালো নয়। এগুলো সবই আত্মহিতের মধ্যেই আসছে।

তারপর বলছেন – রাস্তা দিয়ে যেতে যদি দেখ মাটির ঢিপি আছে, গরু আছে, দেব-দেবীর প্রতিমা আছে, ব্রাহ্মণ আছে, ঘি আছে, মধু আছে, পিপ্পল বৃক্ষ আছে, এগুলো সবই পবিত্র জিনিষ, এগুলোকে সব সময় নিজের দক্ষিণ দিকে রেখে যাবে। সেইজন্য প্রথম থেকে আমরা যে বাম দিক দিয়ে চলি এটাই ঠিক। এরপর একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে শুধু বলে গেছেন দাঁত কিভাবে ব্রাশ করবে, স্নান কিভাবে করবে, হাত, পা, মুখ, চোখ কিভাবে ধোবে। এর সাথে বলছেন সন্ধির (রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হচ্ছে বা দিন শেষ হয়ে রাত্রি আসছে) সময় খাওয়া-দাওয়া করবে না। সন্ধির সময় কখন বাইরে বেরোবে না। ভূমি অর্থাৎ মাটিতে কিছু লিখবে না। নিজে যে মালা গলায় বা মাথায় পরিধান করেছে নিজে হাতে করে কখন সেই মালা ফেলবে না। যে বাড়িতে কেউ থাকে না, বা কেউ নেই সেই বাড়িতে কখন রাত্রিবাস করবে না। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের কখন ঘুম থেকে তুলবে না। এই ধরনের অনেক বিধি নিষেধ বলছেন। এর মধ্যে একটা বলছেন, রসগোল্লা, দইবড়া এই ধরনের খাবারের রস নিংড়ে কখন খাবে না। অনেকে বলেন যে, রসগোল্লাতে যে ছানা থাকে সেটা হজম করা খুব কঠিন কিন্তু রসটা থাকে বলে সহজে হজম হয়ে যায়। পরের শ্লোকে বলছেন –

ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃতস্নেহং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ।

নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ।।৪/৬২

এখানে স্নেহ মানে যে কোন তরল পদার্থ যেটা কোন জিনিষকে পিচ্ছিল করে দেয়, তেল, ঘি, রস সবটাই স্নেহ পদার্থ। আমাদের ধারণা তেলের জিনিষ নিংড়ে নিতে হয়, কিন্তু এখানে তা করতে বারণ করছেন। যেমন ভাষ্যকাররা বলছেন রসগোল্লা, দইবড়া এগুলো নিংড়ে খেতে নেই। একটাই কারণ হতে পারে একটা জিনিষ দিয়ে রান্না করা হয়েছে, সেই জিনিষটার একটা সম্মান আছে। *নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ*, খুব বেশী পেট ঠেসে খেতে নিষেধ করা হচ্ছে। *নাতিপ্রগে*, খুব সকালবেলায় আহাৰ করতে নেই। ইদানিং একটা রেওয়াজ হয়েছে বেশীর ভাগ স্কুল সকাল ছটা সাতটায় শুরু হয়ে যায়। তার মানে বাচ্চাকে ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পেট ভরে খাইয়ে স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে। অনেক বাচ্চা তো ওই সকালে ভাত খেয়ে বেরোচ্ছে। এটা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক আর ধর্মীয় দিক দিয়েও নিষিদ্ধ। খুব সকালে পেট ভরে খেতে নেই। আর বেশী সন্ধ্যা হয়ে গেলে খেতে নেই এবং সন্ধ্যা বেলায় দুবার তো কোন মতেই খাওয়া যাবে না। ঠাকুরও বলছেন,

দুপুরে বারুদ ঠাসা থাকে আর রাত্রিতে হাঙ্কা থাকে। কিন্তু ইদানিং আমাদের জীবনযাত্রা এমনই যে, জিনিষটা উল্টে গেছে, দিনের বেলা অল্প একটু খেয়ে যে যার কাজে চলে যাচ্ছে আর রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে প্রচুর রকমের খাওয়ার সাজিয়ে পেট ঠেসে খায়। যাঁরা প্রচুর জপ-ধ্যান করেন সন্ধ্যার পর এবং অনেক রাত্রে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করলে তাঁদের অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। গুজরাতের দিকে সূর্যাস্তের পর সবাই খেয়ে নেয়। খাওয়া-দাওয়া করে সবাই বেরিয়ে পড়ে। পূর্বাঞ্চলে ঠিক উল্টোটা হয়, এখানে সবাই বেরিয়ে, আড্ডা মেয়ে বাড়ি ফিরে রাত দশটা এগারোটায় সময় থাকে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মানুষ ছাড়া বেশীর ভাগ প্রাণীই রাত্রিবেলা খায় না। যেমন পাখীরা রাত্রিবেলা খায় না, গরু, মোষ এরাও রাত্রিবেলা খায় না। একমাত্র নিশাচর প্রাণী পেঁচা, বাদুড়, চিতাবাঘ, শেয়াল ছাড়া সব প্রাণী সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে নেয়। মানুষ হল দিনের প্রাণী, দিনের প্রাণীদের যদি রাত্রিতে খেতেই হয় তাহলে খুব অল্প পরিমাণ খেতে হয়। আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, এখানে যা কিছু আলোচনা হচ্ছে এগুলো যে আমাদের সবাইকে পালন করতে হবে তার কোন মানে নেই। আড়াই হাজার বছর আগেকার নিয়ম-কানুন তখনকার দিনের পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরী হয়েছিল, বিশেষ করে যারা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে চাইছে তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্য এই ধরনের কিছু নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন। তবে আমাদের এগুলো শুনে রাখা ভালো। এখানে যা যা কথা বলা হয়েছে এগুলো একটাও ভুল কিছু বলা হয়নি। দুটো ব্যাপার – যে কথাগুলো বলছেন তার একটা কথাও ভুল নয়, প্রত্যেকটি কথাই গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তব সম্মত এবং খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের সব কিছু পালন করতে বলা হচ্ছে না, কারণ আমাদের জীবনধারাটাই পাল্টে গেছে। বেলুড় মঠেই ঠাকুরের ভোগ গরমের সময় নামে রাত নটা বেজে পাঁচ মিনিটে। খাওয়া শুরু হতে হতে প্রায় সোওয়া নটা হয়ে যায়। এরপর বলছেন –

ন কুবীত বৃথা চেষ্টাং ন বার্যঞ্জলিনা পিবেৎ।

নোৎসঙ্গে ভক্ষয়োক্তক্ষ্যান্ন জাতু স্যাৎ কৃতুহলী।।৪।৬৩

যে কাজে কোন ফল হয় না, যে কাজ গুলোকে বৃথা কাজ বলা হয়, সেই ধরনের কাজের জন্য কোন চেষ্টা করবে না। কিছু কিছু কাজের ফল আমরা প্রত্যক্ষ পাই, কিছু কাজের ফল পরোক্ষ অর্থাৎ পরে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি জানা থাকে এই কাজের কোন ফল নেই তখন ওই কাজ করতে নেই। *বার্যঞ্জলিনা পিবেৎ*, হাতে করে অর্থাৎ অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল পান করবে না। অনেকগুলো কারণ হতে পারে, অঞ্জলিবদ্ধ হাতে জল পান করলে জামা কাপড় ভিজবে যেতে পারে। এগুলো কিছুটা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, কিছুটা আচরণ, কিছুটা ধর্মীয়, সব মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়মগুলো তৈরী করা হয়েছিল। আরও মজার ব্যাপার বলছেন, খাবার জিনিষ কোলে রেখে কখন থাকে না। কিন্তু ইদানিং ট্রেনের খ্রী টায়ারে সবাইকে কোলে রেখেই খেতে হয়, কিন্তু মনু পুরোপুরি নিষেধ করছেন। *ন জাতু স্যাৎ কৃতুহলী*, কোন ব্যাপারে বেশী কৌতুহল দেখাতে যাবে না। আগ বাড়িয়ে অপরের ব্যাপারে কৌতুহল হওয়াটা খুব অভদ্র আচরণ। এগুলো বাচ্চাদের স্বভাব, সংস্কৃতি মানেই হল ছেলেমানুষিকে সংস্কার করা। এর আগে যেমন বলেছিলেন বয়স তোমার যেমন তোমার আচরণও তেমন হবে। বয়স, বিদ্যা, অর্থ, কুল ও কর্ম এগুলোর উপর নির্ভর করবে তোমার আচরণ, তোমার পোষাক ও তোমার কথাবার্তা।

ন নৃত্যেদথবা গায়েন্ন বাদিত্রাণি বাদয়েৎ।

নান্ষেটয়েন্ন চ ক্ষেডেন্ন চ রক্তো বিরাবয়েৎ।।৪।৬৪

আগেকার দিনে যারা দ্বিজ ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এদের নৃত্য ও গান-বাজনা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কিছু দিন আগেও ব্রাহ্মণ পরিবারে কেউ গান করলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকতেন, আর নাচ! কল্পনাই করা যায় না। আগেকার দিনে তাই যাত্রা থিয়েটারে নারী চরিত্রগুলো ছেলেরাই অভিনয় করত। এখানে লৌকিক গান ও নৃত্যের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বেদের সাম গান যেটা হত সেগুলো দেবতাদের স্তুতি ছিল। এর সাথে কিছু কিছু জিনিষ করতে নিষেধ করছেন, যেমন নিজের

জজ্ঞাতে চাটি মেরে আওয়াজ করবে না, দাঁতে দাঁত ঘসে অস্ফুট শব্দ করবে না, পশুপাখীর কণ্ঠস্বর নকল করে কাউকে ডাকবে না। কাঁসা, রূপোর পাত্র যদি কোন কারণে ভেঙে যায় তাহলে ওই ভাঙা পাত্র ছাড়া অন্য কোন ধাতুর ভাঙা পাত্রে খাবে না। যেমন স্টীল, এ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ বা চীনা মাটির বাসন যদি ফাটা থাকে তাহলে ওই ফাটা পাত্রে কখনই খাওয়া-দাওয়া করা যাবে না। যে বাসনগুলো নিজের পছন্দের নয় বা বাসনের সৌন্দর্য নেই, ওই বাসনেও খাবে না। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর কি ধরনের বাসনে খাওয়া-দাওয়া করছ এটাতেও খুব নজর দিতে হয়, সেইজন্য সাবধান করে দিচ্ছেন।

অপরের ব্যবহৃত জিনিষ কখনই কেন ব্যবহার করতে নেই

উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈ ন ধারয়েৎ।

উপবীতমলঙ্কারং ব্রজং করকমেব চ।।৪/৬৬

এই শ্লোকটি খুব মূল্যবান একটি শ্লোক, সবাইকে এই নিয়মগুলো পালন করা উচিত। উপান বলতে বোঝায় চটি, জুতা, খড়ম জাতীয় পাদুকা। বলছেন অপরের ব্যবহৃত, বিশেষ করে পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদের ব্যবহৃত চটি, জুতা, খড়ম কখনই ব্যবহার করবে না। চ বাসশ্চ, অপরের ব্যবহৃত বস্ত্র কখনই পরিধান করবে না। তবে গুরুপ্রদত্ত গুরুর ব্যবহৃত দ্রব্য সেটা আলাদা জিনিষ। আধ্যাত্মিক গুরু ছাড়া আর কারুর ব্যবহৃত পাদুকা, বস্ত্রাদি কখনই ব্যবহার করা চলবে না। বন্ধুরও কোন ব্যবহৃত জিনিষ ব্যবহার করা যাবে না। ধৃতমন্যৈ ন ধারয়েৎ, অপরের ব্যবহৃত কোন জিনিষই ধারণ করবে না। উপবীতমলঙ্কারং, অপরের পৈতে, অন্যের যে কোন ধরনের আভূষণ কক্ষণ ধারণ করবে না। ব্রজং, একজনের মালা অপর কেউ ধারণ করবে না। যদি তুমি সন্ন্যাসী হও তাহলে অপর সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলুও ধারণ করবে না। এমনকি সন্ন্যাসী অপরের আসনেও বসবেন না।

এই শ্লোকে যা বলা হয়েছে এগুলো সবাইকে অবশ্যই পালন করে যেতে হবে। খুব দরকার থাকুক, অভাব থাকুক যাই থাকুক না কেন অপরের ব্যবহৃত জিনিষ কখনই ব্যবহার করতে নেই। এর মধ্যে দুটো ব্যাপার রয়েছে, একটা ব্যাপার হল মানুষকে সম্মান দেওয়া আর নিজের সম্মান বাড়ান। নিমন্ত্রণ বাড়িতে যেতে হলে ভালো গয়নাগাটি পড়ে নিজেকে সাজাব যাতে সবাই আমাকে সম্মান করে। কিন্তু আমার সেই রকম ভালো অলঙ্কার নেই, তাই অপরের থেকে ধার করে এনে নিজেকে সাজালাম। প্রথম কথা হল এখানে অপরের সম্মান ধার করে নিজেকে সম্মানিত করার চেষ্টা করছি, এটা আমার জন্য কখনই ভালো নয়। দ্বিতীয় হল তন্মাত্রার ব্যাপার। আমি যখন কোন জিনিষ ব্যবহার করছি তখন আমার তন্মাত্রা, আমার চিন্তা ভাবনা, মানসিক ও চারিত্রিক প্রভাব সব কিছু সেই জিনিষের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। আমার জুতো, রুমাল, পোশাক, চশমা, কলম, ঘড়ি সব কিছুতে আমিই ভরে আছি, এগুলো আমারই সম্প্রসারিত সত্তার প্রতিমূর্তি। যখন কেউ আমার ব্যবহৃত জিনিষ গ্রহণ করছে তখন সে আমার শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করছে। আমরা কখন কি চাইব অপরের শরীরের মধ্যে ঢুকে যেতে? এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সবাই মনে করি বন্ধু বন্ধুর জিনিষ কেন ব্যবহার করতে পারবে না!

দ্বিতীয় ব্যাপার হল এর মধ্যে উচ্ছিষ্টের ব্যাপারটাও এসে যায়। কাউকে যখন কিছু অর্পণ করে দেওয়া হয়ে গেল বা কারুর উদ্দেশ্যে কোন কিছু নির্দিষ্ট করে রাখা হয় তখনই কিন্তু সেটা উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন চারজন বসে আছে। কাপে করে চা এনে এক এক করে দেওয়া হচ্ছে। একজনকে একটা কাপ এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন ‘আমি তো চা খাই না’। এবার ওই কাপটাই পাশের জনকে দেওয়া হল। এটা কখনই উচিত নয়, যখনই কোন কিছু কাউকে অর্পণ করে দেওয়া হল সেটা উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ এই জিনিষগুলো বোঝেও না, বুঝতেও চায় না। সন্ন্যাসীরা এই ব্যাপারে খুব সজাগ থাকেন। তাই বাইরে কোন অনুষ্ঠানাদিতে গেলে তাঁদের অনেক সমস্যা হয়ে যায়। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করতে চাইছেন, এসব ব্যাপারে তাঁদের খুব সজাগ থাকতে হবে, তা নাহলে তন্মাত্রা আর উচ্ছিষ্টের এই ব্যাপার গুলো তাঁদের

আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতিতে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করবে। সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলো বোঝা যায় না। আমাদের ভেতরে বাইরে অশুদ্ধিতে ভরে আছে যেগুলো আমরা এমনি অবস্থাতে ধরতেই পারি না। কিন্তু যে মুহূর্তে ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন শুরু করবে তখন এই ব্যাপার গুলো খুব প্রভাবিত করে – অপরের বিছানায় বসা, অপরের চেয়ারে বসা, অপরের কোন কিছু ব্যবহার করতে গেলে তখন খুবই প্রভাব ফেলবে। এই কারণে মনুষ্যতির এই শ্লোকটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান শ্লোক। বিমর্ষ, হতাশাগ্রস্ত, বিষাদগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত, গোলমেলে অশান্ত লোক এদের সঙ্গে কিছু দিন মেলামেশা করলে কদিন পরে আপনিও এদের মত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে A man is known by the company he keeps। এখানে আর known নয় you will become। আপনি যাদের সঙ্গে থাকছেন কদিন পরে ধীরে ধীরে তাদের মত হয়ে যাবেন। পাখার বাতাস যেমন হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি জিনিষ তাদের নিজের নিজের তন্মাত্রা ক্রমাগত ছেড়েই যাচ্ছে। এর ফলে এক অপরকে সব সময় প্রভাবিত করে যাচ্ছে। দুর্বল প্রকৃতির লোকরা সবার আগে প্রভাবিত হয়। আর এদের ব্যবহৃত জিনিষ যদি কেউ গ্রহণ করে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে তো আরও সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বেলুড় মঠে ভক্তরা ঠাকুরের মন্দিরে, মঠ অফিসে ঘুরতে পারবে কিন্তু সাধু নিবাসে তাদের কখনই প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সাধুদের খাবার জায়গাও সবার থেকে আলাদা। এখানেও তন্মাত্রার ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে এই নিয়ম করা হয়েছে। কাউকে ছোট করা বা অসম্মান করার জন্য নয়, কারণ এছাড়া কোন পথই নেই। খাওয়া-দাওয়াটা হিন্দুদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। খাওয়াটা ভেতরে যাচ্ছে, আর মলমূত্র বাইরে যাচ্ছে। যেটা ভেতরে যাচ্ছে সেটার গুরুত্ব বেশী আর মলমূত্র যেটা বিসর্জন করা হচ্ছে সেটার কম গুরুত্ব। ফলে হিন্দুরা খাওয়ার সময় রীতিমত চারিদিকে ঘেরা দেবেই, খাওয়ার সময় তাকে কেউ যেন না দেখতে পায়। কিন্তু যখন মলমূত্র ত্যাগ করবে তখন মাঠে ঘাটে খোলা জায়গায় যেখানে খুশি বসে যাবে। এটা আবার বিদেশীরা সহ্য করতে পারে না, তাদের কাছে ব্যাপারটা উল্টো, খাওয়া-দাওয়া সবার সামনে আর মলমূত্র বিসর্জন গোপনে। যেটা ভেতরে যাচ্ছে সেটা হিন্দুদের কাছে খুব প্রাইভেট ব্যাপার। কারণ তাদের কাছে মন হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, আমাকে খাওয়ার সময় কেউ যেন না দেখে। যেটা বাইরে যাচ্ছে সেটার ব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে বলছেন –

লোষ্টমদী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।

স বিনাশং ব্রজত্যাগ সূচকোহশুচিরেব চ।।৪/৭১

কোন কাজ নেই বসে বসে মাটির ঢেলা ভেঙে যাচ্ছে, এই কাজকে বলছেন লোষ্টমদী – মাটির ঢেলা নিয়ে পিষে যাওয়া। তৃণচ্ছেদী, দাঁত দিয়ে ঘাসের ডগা ছিঁড়ে যাচ্ছে, নখখাদী, দাঁত দিয়ে নখ খোঁচা, যে লোক সূচক অর্থাৎ যারা খল, খলের সংজ্ঞা দিতে ভাষ্যকার বলছেন যারা পরের কান ভাঙায়, অন্যের দোষ থাকুক আর নাই থাকুক অপরের নিন্দা করে বেড়ায় আর অন্তরে বাইরে অশুচি এদের খুব শীঘ্রই বিনাশ হয়ে যায়। এগুলো হল নিরর্থক কাজ, কোন কাজ নেই বসে বসে মাটির ঢেলা ভেঙে যাবে, নখ খুঁটতে থাকবে, তা নাহলে গাছের পাতা ছিঁড়তে থাকবে ইত্যাদি। সূচক বলতে ঠিক ঠিক বোঝায় যারা কারুর সত্যিকারের দোষ দেখেছে সেটা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। যাকে আপনি ভালোবেসেছেন তার যদি কোন দোষ দেখে থাকেন তাহলেও সেটা কাউকে বলতে নেই, আর যাদের সাথে পরিচিতি নেই তাদের কোন কিছু খারাপ জিনিষকে নিয়েও আলোচনা করতে নেই।

অশুচির ব্যাপারে ভাষ্যকার বলছেন বাহ্যভন্তরশৌচরহিতঃ, বাইরে আর আভ্যন্তর শৌচ নেই তাদের অশুচি বলছেন। তার মানে, যারা নিয়মিত স্নান করে না, নিয়মিত বস্ত্রাদি ধৌত করে না, খাওয়া-দাওয়ার পর ঠিকমত হাত পা ধৌত করে না ইত্যাদি। এর সাথে যাদের অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের শুদ্ধি নেই তাদের বিনাশ হতে খুব দেরী হয় না। প্রথমই শুরু করেছেন খুব স্থূল জিনিষ দিয়ে – অনর্থক কাজ মানে, ঘাস ছেঁড়া, দাঁত

দিয়ে নখ খোটা, মাটির ঢেলা ভাঙা, গাছের পাতা ছেঁড়া বা এমনিই হাত-পা নেড়ে যাওয়া এগুলো কখনই করতে নেই। মূলতঃ এই ধরনের অনর্থক কাজ যারা করতে থাকে তারা চঞ্চল মনের। বসে বসে আঙুল দিয়ে হাতের কলমটাকে আমি নাড়িয়ে যাচ্ছি। আসলে আঙুলের পেশীগুলো কলমটাকে নাড়িয়ে যাচ্ছে। পেশীগুলোকে চালনা করছে আমার মস্তিষ্ক। তার মানে মস্তিষ্ক কাজ করছে বলেই পেশীগুলো কাজ করছে। আমি জানি আর নাই জানি আমার মস্তিষ্ক কাজ করছে, তবেই পেশীগুলো নড়ছে, তবেই হাত নড়ছে, তবেই কলমটা নড়ছে। এই কাজগুলো অনর্থক কাজ। অনর্থক কাজ যখন করছি তখন আমার মন চঞ্চল হয়ে আছে। মস্তিষ্ক কাজ করা মানে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়ে যাওয়া। অনর্থক কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের কত শক্তি যে বেরিয়ে যাচ্ছে কল্পনাও করতে পারবো না। যেমন একটা লোক বসে বসে পা নেড়ে যাচ্ছে, তাকে যদি এখন বলা হয় ‘আচ্ছা ভাই তুমি তো পা নেড়ে যাচ্ছ, এক কাজ কর তুমি পাটা গুণে গুণে নাড়ো তো’। পাঁচ থেকে সাত গুণতে গুণতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমাদের যে কোন কাজই দু ভাবে হয়ে থাকে Conscious Action and Unconscious Action। প্রথম প্রথম জপ করতে বসলে একশ আট বার জপ করতে করতেই ঘুম এসে যাবে। অথচ যোগীরা দিনে লক্ষ লক্ষ জপ করে যাচ্ছেন, একশ আট বার কখন জপ হচ্ছে বুঝতেই পারেন না, কারণ মন্ত্রটা চলে গেছে unconscious stageএ। কিন্তু তখনও মস্তিষ্ক কাজ করে যাচ্ছে, মস্তিষ্ক কাজ না করলে যোগীর ব্যক্তিত্ব পাল্টাচ্ছে কি করে! ঠিক তেমনি যখন Conscious Action করছি, নখ খোটা, পা নাচান ইত্যাদি তখনও মস্তিষ্কের শক্তি অপচয় হয়ে যাচ্ছে। যে লোকটির মস্তিষ্কের শক্তি অযথা বেরিয়ে যাচ্ছে, সে আর বড় কাজ কি করে করবে! সেইজন্য আস্তে আস্তে এরা নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তেমনি যাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তর গুণে নেই এরাও ধীরে ধীরে বিনাশের দিকে এগিয়ে যায়। এগুলোই হিন্দুদের চিরন্তন ধারণা। প্রথমেই নিষেধ করে দিচ্ছেন, এগুলো করবে না। আবার অন্য দিকে মনের ব্যাপারে বলার পর দৈনন্দীন জীবনের নিরাপত্তাকে রক্ষা করার জন্য বলছেন –

নিরাপত্তার জন্য যেগুলো পালনীয়

অদ্বারেণ চ নাভীয়াদ্ গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্।

রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ॥৪/৭৩

যে সকল গৃহ প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত সেই সব গৃহে সর্বদা সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। আমরা অনেক সময় সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য পাঁচিল ডিঙিয়ে হঠাৎ করে ঘরের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে যাই। এই ধরনের মজা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। এক নতুন জামাই একাই শ্বশুর বাড়িতে এসেছে। মেয়ের বিয়ের পর শ্বশুর দুটো এ্যালসেশিয়ান কুকুর পুষেছে, যেটা জামাইও জানতো না। জামাই সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য সদর দরজা দিয়ে না এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকতেই একটা কুকুর এসে গলাটা কামড়ে ধরে শেষ করে দিল। জামাইর চোঁচামেচি, কুকুরের আওয়াজ শুনে লোকজন বেরিয়ে এসে দেখে এই কাণ্ড, জামাই শেষ। শ্বশুর বাড়ির একজন গুলি করে কুকুরটাকে মেরে দিল। কুকুরটাকে মেরে দিল কিন্তু তার সাথে জামাইটাও তো গেল। মনু সেই কবে বলে দিচ্ছেন, যদি দেখ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তাহলে কখনই পাঁচিল টপকে ভেতরে আসবে না। দ্বিতীয় সাবধান করছেন, রাত্রিবেলা চলেফেরা করার সময় গাছের গুঁড়ির ধারে কাছে যাবে না। প্রথম কথা অন্ধকারে কোথায় কোন শেকড় বেরিয়ে আছে তাতে হেঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মারাত্মক ধরনের চোট পেতে পারো। দ্বিতীয়তঃ কোন পশু বা সাপ, পোকামাকড় সেখানে থাকতে পারে তোমার জানার কথা নয়। সেইজন্য রাত্রিবেলা গাছের গোড়ার একেবারে কাছে যাবে না। সূতি মানুষকে একদিকে উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে আবার দৈনন্দীন জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে অতি সাধারণ ব্যাপার গুলোকেও অবহিত করে দিচ্ছে। আমরা এখানে মনুসূতির সব কিছু আলোচনা করছি না, কিন্তু একটা দুটো শ্লোকের মাধ্যমেই বোঝা যায় যে সারা দেশের মানুষকে সব কিছুর ব্যাপারে কিভাবে সূতি নিবিড় ভাবে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের অনেক কিছুই বলছেন যেমন – পাশা কখন খেলবে না, জুতোকে হাতে করে কখন নিয়ে যাবে না, বিছানার উপর বসে বা শুয়ে কখন খাওয়া-দাওয়া করবে না। আবার বলছেন সূর্যাস্তের পর তিল জাতীয় কিছু খাবে না। আসলে তিল

শরীরকে ঠাণ্ডা করে। সূর্যাস্ত হওয়া মানে এবার তাপ কমে গিয়ে ঠাণ্ডার ভাব আসবে, তিল খেলে শরীরটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে সর্দিকাশি হতে পারে। এগুলো পুরোপুরি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। এঁঠো মুখে কখন কোথাও যাবে না। খেতে বসেছি সেই সময় যদি ডাকাতও এসে পড়ে তাহলেও এঁঠো মুখে দৌড়াবে না। এছাড়া বলছেন –

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ।

আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপুয়াৎ।।৪/৭৬

বলছেন যদি সুদীর্ঘ জীবন পেতে চাও তাহলে সব সময় ভোজনের পূর্বে দুটো পা ভিজিয়ে ভোজন করবে। এখানে স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন যারা ভেজা পায়ে ভোজন করে তারা দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। তার মানে খাওয়ার আগে ভালো করে পা ধুয়ে নাও, পা ধুয়ে এবার খেতে বস। ইদানিং কালে তো বেশীর ভাগ জায়গায় চেয়ার-টেবিলে জুতো পড়েই সবাই খাওয়া-দাওয়া করে। আবার অনেক জায়গায় ডাইনিং হলে জুতে খুলে রেখে চেয়ার-টেবিলে গিয়ে খেতে বসতে হয়। আসলে আগেকার দিনে বেশীর ভাগ লোক খালি পায়েই চলাফেরা করত বলে পায়ে প্রচুর ধুলোকাদা লেগে থাকত। লোকেরা যাতে নোংরা পায়ে খেতে না বসে যায় তাই ধর্মের দিক দিয়ে একটা বিধান তৈরী করে দিলেন। ভারত হল ধর্মের দেশ, কোন বিধানকে পালন করাতে হলে সেই বিধানকে ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে না দিলে ভারতে সেই বিধান কেউ গ্রহণ করবে না। সেইজন্য কেউ যদি ধাপ্পাবাজী করতে চায় সেও সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে ধর্মের মোড়ক দিয়ে শুরু করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি দেশের জন্য কিছু করতে চায়, আমি দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব, দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতে চাই, তাহলে যে কোন একটা ধর্মের আশ্রয় নিয়ে নিলে তার ফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পেতে শুরু করবে। সত্যিই যদি কারুর ইচ্ছে থাকে আমি দেশের পরিবর্তন করব যাতে কেউ কখন কোন ঘুষ না দেয়, ঘুষ না নেয় তাহলে অবশ্যই তাকে ধর্মের সাহায্য নিতে হবে। গান্ধীজী ঠিক তাই করলেন, তাই বলা হয় একমাত্র গান্ধীজীই ভারতের নাড়ীটা ধরতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী ছাড়া আর কেউই ভারতের নাড়ীর গতি প্রকৃতিকে ধরতে পারলো না। যার জন্য নেহেরু বলতেন – ভারতকে কোন কিছু বোঝাতে হলে আমাকে শুধু গান্ধীজীকে বোঝাতে হবে। গান্ধীজী যদি রাজী হয়ে যান তবেই পুরো দেশ মেনে নেবে। ধর্মের নামে যা কিছু বলা হবে ভারত সেটাই কোন প্রশ্ন না করে মানতে শুরু করে দেবে। যেমনি মনুস্মৃতি বলে দিল খাওয়ার আগে পা ধুয়ে খেতে বসবে, সারা ভারত তাই এখনও পা না ধুয়ে কখন খেতে বসবে না। অবশ্য এতে স্বাস্থ্যের ব্যাপারটাও জড়িয়ে রয়েছে।

তার সাথে বলছেন নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ, ভেজা পায়ে কখন ঘুমোতে যাবে না। কারণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। যদিও মনুস্মৃতিতে পা ধুয়ে শুতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর অনেক আগে পুরানোও এই ধরনের নিষেধযুক্ত কাহিনী পাওয়া যায়। কাশ্যপ পত্নি দিতি একবার ইন্দ্র বধার্থে এক সন্তান লাভের জন্য বড় তপস্যা করছিল। কিন্তু কাশ্যপ মুনি মনে মনে তপস্যার উদ্দেশ্য সফল হোক চাইছিলেন না। কারণ এদের তুলনায় ইন্দ্রের অনেক ভালো গুণ আছে আর দিতির সন্তানগুলো দৈত্য, এদের হাতে ক্ষমতার রাশ চলে গেলে অনেক বিপদ হয়ে যাবে। ইন্দ্রও জানতেন যে তাঁকে বধ করবার জন্য দিতি এক সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য খুব জোর তপস্যা করে চলেছে। ইন্দ্রও তাই একটা ফাঁক খুঁজছিল যাতে করে তপস্যাটা সফল না হয়। কিছুতেই তপস্যার কোন ফাঁক ইন্দ্র খুঁজে পাচ্ছিল না। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ ইন্দ্র লক্ষ্য করল সারা দিন তপস্যায় ক্লান্ত হয়ে দিতি রাত্রিবেলা পা না ধুয়ে বিছানায় বিশ্রাম করতে চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ফাঁক পেয়ে গেল। তপস্যার অনিয়মের ছিদ্র দিয়ে ইন্দ্র এবার দিতির শরীরের মধ্যে ঢুকে গর্ভে পৌঁছে গিয়ে গর্ভের সন্তানটিকে সাতটি টুকরো করে দিয়েছে। টুকরো করে দিতেই গর্ভের সন্তানটি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। ইন্দ্র তাকে বলছেন মা রুদ্রঃ তুমি কেঁদো না। ইন্দ্রকে আবার গর্ভের সন্তান জিজ্ঞেস করছে তুমি কে? ইন্দ্র বলছে আমি তোমার ভাই। সত্যিই ইন্দ্র তার সৎভাই। সাতটা টুকরো করেও ইন্দ্র ভরসা পেল না। সেই সাত টুকরোকে আবার সাতটা করে টুকরো করেছে। এবার একটা শিশুর জায়গায় ঊনপঞ্চাশটি শিশুর জন্ম নিয়েছে। সবাই প্রচণ্ড শক্তিদ্র ও ক্ষমতালী। এরাই হলেন মরুৎ। আমাদের এই পৃথিবীত যত রকম বাতাস চলে, ঝড় বয়

এদের সবারই আলাদা আলাদা দেবতা হলেন এই ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ। দিতির গর্ভটা ছিল অতি শক্তিশালী। কাশ্যপ মুনির আশীর্বাদ এবং বর লাভ করে গর্ভে এই সন্তান এসেছে। এরা সবাই দৈত্য বংশের এবং ইন্দ্রকে বধ করবার জন্যই দিতি এই গর্ভ ধারণ করেছিল কিন্তু এরা হয়ে গেল ইন্দ্রের ভক্ত। কেন এই রকম হল? কারণ তাদের মা পা না ধুয়ে ঘুমোতে চলে গিয়েছিলেন। এখান থেকে হয়ে গেল পা না ধুয়ে ঘুমোতে না যাওয়ার বিধি। পা ধুয়ে যাবে কিন্তু ভেজা পায়ে বিছানায় যাবে না। পা ধুয়ে ভেজা পা'কে ভালো করে মুছে নিয়ে বিছানায় যাবে। এটাই দেখার বিষয়, হিন্দুদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আর জন্মের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ধর্ম দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মনুস্মৃতিতে রাজার স্থান কত নীচে

মণি মল্লিককে ঠাকুর একবার বলেছিলেন রাখালদের দেশে খরাতে খুব জলের কষ্ট তুমি যদি একটা পুকুর কাটিয়ে দাও। এই কথা বলেই ঠাকুর আবার বলছেন তুমি তো আবার তেলি। মণি মল্লিক খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন – বললেই হয় পুকুর কাটিয়ে দিতে হবে আবার তেলি ফেলি বলা কেন। অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা। কিন্তু তেলিদের ব্যাপারে এই ধরণের ধারণা কোথা থেকে চলে এসেছে আমাদের জানা নেই। কিন্তু তেলিদের ব্যাপারে একটা প্রচলিত মত আছে যে তেলির ধন এমন ভাবে লুকনো থাকে যে কেউ টের পায় না। সরসে পিষিয়ে যেমন তেল বার করে, তেমনি তেলিরা পয়সা বার করতে এত কুশল যে ওদের ধারে কাছে কেউ যেতে পারবে না, তার উপর আবার পয়সাকে আড়াল করে রাখতে ওদের মত এত দক্ষ কেউ নেই। সেই থেকে প্রচল হয়ে আছে যে ওদের কাছ থেকে কেউ পয়সা আদায় করতে পারবে না। এখান থেকেই এই প্রবাদ তৈরী হয়েছে। তেলিরা যে কত নীচ জাতি সেটা মনুস্মৃতির এই শ্লোকেই বোঝান হচ্ছে –

দশসূনাসনং চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।

দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমো নৃপঃ।।৪/৮৫

দশ জন কশাই অর্থাৎ পশুবধ ও মাংসবিক্রেতার সমান একজন কলু। দশ কলুর সমান একজন মদ বিক্রেতা, বারবণিতাদের বাড়িতে যারা কাজকর্ম করে তাদের দশজন সমান একজন মদ বিক্রেতা আর দশ বেশ্যাজীবী সমান একজন রাজা। সরকারী প্রশাসনের একেবারে মাথায় যাঁরা বসে আছেন তাঁরাই আজকের দিনের রাজা, অর্থাৎ বলতে চাইছেন আইএএস, আইপিএস এরা দশ বেশ্যাজীবীর সমান। এরা কতটা খারাপ হতে পারে দেখান হচ্ছে।

মানুষ আয়ু, প্রজ্ঞা, কীর্তি ও ব্রহ্মতেজ কিভাবে লাভ করবে

এরপর মনু হিসেব করে মেলাচ্ছেন যে, যে কশাই দশ হাজার পশু মেরেছে তার সমান হল একজন রাজা। সুতরাং রাজার যে দান গ্রহণ করবে স্বাভাবিক ভাবেই নরকে তার গমন হবে। এইসব কথা বলার পর নরকের একটা বিরাট তালিকা দিচ্ছেন। পুরানে নরকের বর্ণনা আরও অনেক বিস্তৃত ভাবে করা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের জন্য বলছেন –

ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যত ধর্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।

কায়ক্লেশাংচ তনুলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ।।৪/৯২

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম মুহূর্তে অর্থাৎ রাতের শেষ প্রহরে শয্যা ত্যাগ করবে, ত্যাগ করে ধর্ম ও অর্থের পশ্চাতে যে কারণভূত, এর পেছনে কি শক্তি আছে সেটাকে নিয়ে মনে মনে আলোচনা করবে বা চিন্তা করবে। সেই সঙ্গে কি পরিমাণ ধর্ম ও অর্থ সম্পাদনে কি পরিমাণ শারীরিক ক্লেশ হতে পারে তারও বিবেচনা করবে। তার মানে শরীরটাকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায়। বলছেন, ব্রাহ্মমুহূর্তই বেদের তত্ত্বার্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময়। এই সময়টাই হল নিজের সারা জীবন, আজকের সারা দিনটা কিভাবে অতিবাহিত করতে হবে তার প্রস্তুতি নেওয়ার উপযুক্ত সময়। যাঁরাই আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করতে চাইছেন তাদের সবাইকেই রাতের শেষ ভাগে উঠে

প্রথমে ধ্যান করতে হবে, যে শাস্ত্রগুলো অধ্যয়ন করা হয়েছে তার তত্ত্বার্থ নিয়ে চিন্তন করতে হবে, এর সাথে নিজের উপার্জিত অর্থ সদ্ব্যয় করে কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যায়, ধর্ম জীবন কিভাবে পরিচালিত করা যায়, শরীরটাকে কিভাবে সুস্থ রাখা যেতে পারে, এইসব চিন্তন তখনই করতে হবে।

এইসব করার পর উষাকালে গাত্রোথান করে বাহ্যাব্যস্তর শৌচাদি কর্ম সম্পন্ন করবে। শৌচাদির দ্বারা শরীর মনকে শুদ্ধ করার পর টানা একাধ্র চিন্তে সকাল সন্ধ্যা দুই বেলায় জপ-ধ্যান করবে। আগেকার দিনে জপ মানে গায়ত্রী জপই প্রধান ছিল। গায়ত্রী জপের নিয়ম ছিল উষাকাল অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে করতে হত আবার সূর্যাস্তের কিছু আগে থাকতেই গায়ত্রী জপ শুরু করে সূর্যাস্ত হওয়া পর্যন্ত করতে হত। সেইজন্য রাত্রিতে গায়ত্রী জপ করা নিষেধ ছিল। তাই ব্রাহ্মমুহুর্তে সূর্যোদয়ের আগে ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে, তারপর গায়ত্রী জপ। এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে বলছেন –

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদীর্ঘমায়ুরবাপুয়ুঃ।

প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ।।৪।৯৪

আগের আগের যাঁরা ঋষিরা ছিলেন তাঁরা দীর্ঘ আয়ু লাভ করতেন, প্রখর বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান ছিলেন, নাম-যশ ও কীর্তি পেয়েছিলেন আর ব্রহ্মতেজে তেজস্মান ছিলেন। এগুলো তাঁরা কিভাবে পেয়েছিলেন? দীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদীর্ঘমায়ুরবাপুয়ুঃ, ঋষিরা দীর্ঘকাল ধরে সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করতেন। তাহলে ঋষিরা অনেকক্ষণ ধরে জপ-ধ্যান করার জন্য লম্বা আয়ু পেলেন, অনেক দিন তাঁরা বেঁচে থাকতেন আর পেলেন বুদ্ধি, কীর্তি, যশ এবং ব্রহ্মতেজ। কথামতে ঠাকুর কেশবের সম্বন্ধে বলছেন কেশবের এতো মানযশ হল ধ্যানটুকু ছিল বলে। ঠাকুর আবার বলছেন ঋষিরা ভোরবেলা কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে চলে যেতেন, সারা দিন তপস্যা করে সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরে একটু ফলমূল খেতেন। ঠাকুরের এই কথাই মনু বলছেন। মনুস্মৃতি রচিত হয়েছে আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে, তখনই মনু বলছেন আগেকার ঋষিরা। তাহলে ভারতে ঋষিদের এই পরম্পরা কত পুরনো ভেবে দেখুন। এখানেই বোঝা যায় আমাদের এই ঐতিহ্য কত প্রাচীন। কিন্তু এই প্রজন্মের এতই দুর্ভাগ্য যে তারা এর কিছুই জানে না, জানার কোন আগ্রহও নেই। সেই ঋষিরা টানা জপ-ধ্যান করে পেলেন লম্বা আয়ু, প্রজ্ঞা, কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজ। আজ থেকে কেউ যদি ঠিক করে নেয় আমি রোজ সকাল বিকাল এক ঘণ্টা করে টানা জপ-ধ্যান করব। এক বছর করে দেখুক, বছর ঘুরতেই তার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে, তার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী প্রায়ই বলতেন, একটা আশ্রমে একটা বাচ্চাও যদি ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান করে, ওই আশ্রমে কোন দিন কোন সমস্যা হবে না। বিভিন্ন আশ্রমের মহন্তরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্তাদের কাছে এলেই ওনারা দুই তিনবার শোনার পরেই বলতেন – শোন! সাধুদের বল গিয়ে ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান করতে। সমস্যা হচ্ছে? বুঝতে হবে আশ্রমে ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান হচ্ছে না। গৃহী ভক্তরাও যদি বরিষ্ঠ মহারাজদের কাছে কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হন তাঁরাও বলে দেন আগে ভালো করে জপ ধ্যান কর। প্রথম পাঁচ হাজার দিয়ে শুরু করতে বলেন, এক মাস পাঁচ হাজার করে জপ করে এস তারপর তোমার সমস্যার কথা শুনবো। কেউ খাটতেই চায় না। যে কোন লোক যদি দিনে পাঁচ হাজার রাতে পাঁচ হাজার করে জপ করে, তার কি কোন সমস্যা থাকতে পারে! নিজে থেকেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সবাই জানে জপ-ধ্যান করলে সমস্যা হয় না, কিন্তু করতে পারে না। তখন সে যাকে ভালোবাসে সে যদি বলে তখন সে করতে বাধ্য হয়। যারা তা সত্ত্বেও করছে না তাদের এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এই শ্লোকটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি শ্লোক।

এর আগেও মনুস্মৃতির ব্যাপারে আলোচনার সময় বলা হয়েছিল যে, মনুস্মৃতিতে সব কিছু সাজানো গোছান নেই। একটা জিনিষ নিয়ে বলা হচ্ছে তার মধ্যে হঠাৎ করে অন্য কোন বিষয় নিয়ে বলতে শুরু করে দেবেন। একটা স্বাধীন চিন্তা যেভাবে চলতে পারে মনু ঠিক সেইভাবেই সব কিছুকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। এর আগে বললেন আগেকার ঋষিরা দীর্ঘ আয়ু, কীর্তি, যশ আর ব্রহ্মতেজ পেলেন একমাত্র টানা অনেকক্ষণ জপ-

ধ্যান করতেন বলে। সেইজন্য সবারই জপ-ধ্যান করা দরকার। তাই বলে পনের মিনিট বা আধ ঘণ্টা করার কথা বলা হচ্ছে না। যতক্ষণ সময় পাবে ততক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা করে যেতে হবে। আসলে ঈশ্বর চিন্তন মানেই চৈতন্যের সাথে মনের সংযোগ। জগতে যা কিছু চলছে সেই চৈতন্যের শক্তিতেই চলছে। আমাদের মনের মাধ্যমে যেটা সামনে আসছে সেটা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যখন জপ-ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বর চিন্তন করা হচ্ছে তখন সে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের কাছে চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ চৈতন্যের কাছে যত দীর্ঘকাল যাবৎ অবস্থান করা যায় তত তার অন্তঃশক্তি স্ফূর্তিত হতে থাকে। শক্তি বাড়লে স্বাভাবিক ভাবে নাম-যশও বৃদ্ধি হবে, মৃত্যু ভয় দূরীভূত হবে। সব থেকে বড় কথা তার মধ্যে আলাদা ধরনের একটা তেজ এসে যায়।

বেদ অধ্যয়নের বিধি-নিষেধ

এই সব বলার পর বলা হচ্ছে বেদ কখন অধ্যয়ন করবে না। বেদ অধ্যয়ন করার একটা লক্ষ্য নিয়মাবলী ছিল। ব্যাকরণ অধ্যয়ন করারও বিরাট নিয়ম ছিল, যদিও মনু বেদ অধ্যয়ন নিয়েই বেশী বলেছেন। শুদ্ধি অশুদ্ধির অনেক ব্যাপারও এর মধ্যে রয়েছে, যা আমরা এর আগেও কিছু আলোচনা করেছি। পরের দিকেও আসবে, আর এটাই পরে গিয়ে দেশে বড় সমস্যা তৈরী করল। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে দেখা গেল মাসে আটশ উনত্রিশ দিন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা যাবে না। যেমন আছে আসনের সামনে দিয়ে যদি হাতি চলে যায় তাহলে সেদিন আর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা চলবে না। যদি রাজাকে কেউ দেখে নেয়, যদি রথ চলে যায় তাহলেও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা যাবে না। রাজাকে একেবারে অশুদ্ধ দেখা হত, আর তার ব্যবহৃত জিনিসকেও অশুদ্ধ রূপে দেখা হত। কারণ এর আগেই আমরা দেখলাম বলছেন – দশ কশাই সমান এক তেলী, দশ তেলি সমান এক মদ বিক্রেতা, দশ মদ বিক্রেতা সমান এক বেশ্যাজীবী আর দশ বেশ্যাজীবী সমান এক রাজা। সেই রাজাকে যদি কেউ দেখে নেয় তাহলে সে আর ব্যাকরণ পড়বে কি করে! এটা তাদের কাছে এক বিরাট বড় সমস্যা হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় ভট্টি বলে একজন নামকরা কবি ছিলেন। তিনি একটি বই লিখলেন যার নাম ‘রাবণ বধ’ এটাও একটা রামায়ণ। এর আরেকটা নাম ভট্টিকাব্যম্। ব্যাকরণের যত রকম নিয়ম হতে পারে ভট্টি সব এই বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সেইজন্য ভট্টিকাব্যম্ পাঠ করতে গিয়ে বেশীর ভাগ লোকই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। তখন এনারা একটা উপায় বার করলেন। হাতি, রাজা, রথ যদি দেখে নেয় তাহলে সেদিনের মত ব্যাকরণ পড়া বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু কাব্য পড়তে কোন নিষেধ নেই। ভট্টিকাব্যমে ব্যাকরণের সব নিয়ম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, এত নিয়ম দেওয়া আছে যে আচার্যদের এর ব্যাখ্যা করতে হত। কিন্তু আচার্য ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন না, পড়াচ্ছেন কবিতা। এটাই ছিল এক বিরাট সমস্যা।

ঠিক এই ধরনের সমস্যা পারস্য দেশেও হয়েছিল। পারস্য অর্থাৎ ইরানে তখনকার দিনে অত্যন্ত উচ্চমানের সংস্কৃতি ছিল। ইরানের ভাষা ছিল ফার্সি। আরবে যখন ইসলাম ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াল তখন ইরানে চলছিল জরাজীর্ণতার ধর্ম। কিন্তু ইরানীদের কাছে ইসলামদের ধর্মের নিয়ম-কানুন, দর্শন কোন কারণে ভালো লেগে গিয়েছিল। ইরানীরা আস্তে আস্তে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করতে শুরু করল। কিন্তু দেখা গেল আরবিয়ানরা ইরানে এসে আস্তে আস্তে ইরানীদের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকে সমূলে নাশ করতে শুরু করল। আসলে আরবিয়ানরা প্রথমে জংলী ছিল। ইরানীদের যদি কেউ তাদের নিজস্ব পোশাক পরিধান করে তাহলে সাজা পেতে হত, ফার্সি ভাষা যদি কেউ বলে তাহলে সাজা পেত। এইভাবে ইরানের পুরো সংস্কৃতিকে নাশ করে দিল। ইরানের উচ্চমানের সংস্কৃতিকে নিয়ে পার্সিদের খুব গর্ব ছিল। আমি তোমার ধর্ম নিয়েছি তাই বলে আমার সংস্কৃতিকে কেন ছাড়তে হবে! আমাদের ভাষায় কেন কথা বলবো না! ইত্যাদি। ভাষার সমস্যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও হয়েছিল, আমরা বাঙ্গালী আমাদের ভাষা বাংলা, মুসলমান হয়েছি বলে আমাদের বাংলা ভাষাকে কেন ত্যাগ করব! ইরানে তখন ফিরদৌস বলে খুব বড় একজন কবি ছিলেন। তিনি শাহনামা বলে একটা বই লিখলেন। ইরানের যে সংস্কৃতি, ইরানের যে ভাষা, তার ভাষার যে মাধুর্য, লালিত্য সব কিছুকে বজায় রেখে

তিনি এই শাহানামা বইটি রচনা করলেন। তখন তিনি কারাগারে বন্দী। জেলের মধ্যে রচনা করে তিনি কয়েকজনকে দিয়ে মুখস্ত করিয়েছেন যাতে আরবরা এটা না শুনতে পায়। তিনি বলেই দিলেন যত দিন আমার শাহানামা বই আছে ততদিন ইরানের সংস্কৃতির গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারবে না। একা একজন লোক একটা দেশের পুরো সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারে ভাবা যায় না। ঠিক তাই হল, ধীরে ধীরে ইরানীরাও আরবদের মত বর্বর হয়ে উঠল। তারপর কিছু বছর পর শাহানামা ইরানের মধ্যে ছড়াতে শুরু করল। ইরানীদের মধ্যে এই ভাবটা থেকে গিয়েছিল যে, আমাদের একটা উচ্চ সংস্কৃতি ছিল। পরে একা শাহানামা পুরো ইরানী সংস্কৃতিকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল, ইরানের ভাষাকে দাঁড় করিয়ে দিল। আয়াতোল্লা খোমেইনির সময় এই সংস্কৃতি আবার একটা ধাক্কা খেল। ইরানিয়ানরা চিরদিনই নিজেদের আলাদা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে মনে করে এসেছে। এই কারণেই ইরানের সাথে ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর ঝগড়া লেগেই আছে। ওরা অন্যদের মনে করে বর্বর, তোমাদের মধ্যে মহম্মদ এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু আমাদের ভাষা অনেক উন্নত ও আমরা হলাম উচ্চ সংস্কৃতসম্পন্ন জাতি। যদিও শাহানামা ও ভট্টিকাব্যম্ লেখার কারণ আলাদা কিন্তু সমস্যা একটাই, লোকেদের শেখানো যাচ্ছে না। তাই অন্য একটা পথ বার করা হল। তার জন্য সাহায্য নেওয়া হল কাব্যের মাধ্যমে। শাহানামা আর ভট্টিকাব্যম্ দুটোই কাব্যগ্রন্থ।

মনু বলছেন যদি মেঘের খুব গর্জন হয়, বিদ্যুৎ যদি কড়কায়, যদি উল্কাপাত হয় তাহলে সেদিন আর বেদ অধ্যয়ন করবে না। এগুলোকে বলা হয় অকালিক, মানে অমঙ্গলসূচক। এই সময় বেদ পাঠ নিষেধ। কোন কোন সময় বেদ অধ্যয়ন করা যাবে না এর উপর একটা বিরাট লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে এগুলো আমাদের আর কোন ভাবেই কাজে আসবে না। শুধু একটু ধারণা করার জন্য বলা যায় – যেমন কোন গ্রামে যদি কোন মৃতদেহ এখনও সৎকার করা হয়নি, তখন কিন্তু অনধ্যায়, বেদ পাঠ করা হবে না। কোন অধার্মিক বা নীচু জাতির কেউ ক্রন্দন করছে আর সেই ক্রন্দনের শব্দ যদি তোমার কর্ণে প্রবেশ করে তাহলে সেদিন তোমার আর বেদ পাঠ করা যাবে না। তোমার গৃহের সামনে যদি অনেক লোক সমাগম হয়ে যায় তাহলে বেদ অধ্যয়ন করবে না। আরও যেমন বলছেন, বিছানায় শুয়ে বা পা মুড়ে বসে বেদ অধ্যয়ন করবে না। আর মাংস খেয়ে কোন মতেই বেদ অধ্যয়ন করবে না। সূতকের অন্ন, মানে কোন অন্নপ্রাশন বাড়ির অন্ন খাওয়ার পর বা শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেয়ে সেদিন আর বেদ অধ্যয়ন করা যাবে না। আবার বলছেন নদী, সাগর বা কোন জলাশয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, মলমূত্র ত্যাগের সময়, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় বেদ অধ্যয়ন করবে না। আবার অমাবস্যার দিন যদি বেদ অধ্যয়ন কর তাহলে তোমার গুরু মারা যাবেন, আর চতুর্দশীর দিন যদি বেদ অধ্যয়ন কর তাহলে তোমার শিষ্য মারা যাবে। অষ্টমী ও পূর্ণিমা এই দুই তিথিতে বেদ অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মের নাশ হয়। ব্রহ্ম বলতে এখানে বোঝাচ্ছেন বেদ। তার মানে এখানেই চারটে তিথিতে বেদ অধ্যয়ন বন্ধ হয়ে গেল – অমাবস্যা, চতুর্দশী, অষ্টমী আর পূর্ণিমার দিন বেদ অধ্যয়ন করা যাবে না।

আরও বলছেন কারুর সাথে যদি কলহ-বিবাদ হয়ে থাকে, যুদ্ধের সময়, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, খাওয়ার ঠিক পরে, অজীর্ণ অর্থাৎ খাওয়া হজম না হলে, বমি যদি হয়ে থাকে তাহলে বেদ অধ্যয়ন করবে না। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল কোন দিন যদি কারুর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে, কারুর সাথে তর্কাতর্কি হয়েছে তাহলে কিন্তু তখন আর সেটা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় নয়। আসলে কি হচ্ছে, বেদ, উপনিষদ, গীতা এঁরা হলেন সাক্ষাৎ ভগবান। ভক্তরা যখন তাঁদের গুরুর কাছে কিংবা অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করতে যান তখন হাত, পা ধুয়ে, শুদ্ধ বস্ত্রে কত সাবধানে পবিত্র ভাবে যান। ঠিক সেই রকম যাঁরা মন্দিরে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন তখন তাঁদের কি মানসিকতা নিয়ে যেতে হবে ভেবে দেখতে হয়। কিন্তু ভক্তরা প্রণামী বাস্তবে প্রণামী দিচ্ছে পয়সার সাথে বাসের টিকিটটাও বাস্তবে চলে যাচ্ছে সেদিকে কোন হুঁশ নেই। এখানেই বোঝা যায় তাদের মন কত অনিয়ন্ত্রিত! কিছু না করার থেকে এটুকু যে করছে তাতে খারাপ কিছু না হওয়ার থেকে ভালোই হচ্ছে কিন্তু মনটা অনিয়ন্ত্রিতই থেকে যাচ্ছে। যার ফলে কেউই আর আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারেনা। বেদ, উপনিষদের ব্যাপারেও ঠিক তাই বলা হচ্ছে। যখন কারুর সাথে তর্কাতর্কি হয়েছে বা ঝগড়া হয়েছে তখন কিন্তু আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যাবে না। কারণ এতে শাস্ত্রকে অসম্মান করা হয়। ঠিক তেমনি স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে, অনেক

বেশী খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, বমি হয়েছে তাহলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে না। শরীর মন যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকে তাহলে কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে নেই। বেদ অধ্যয়ন থেকে সরে এসে আবার স্নানের ব্যাপারে অনেক কিছু বলছেন।

স্নানের বিধি-নিয়ম

ন স্নানমাচরেড্ডুত্তা নাতুরো ন মহানিশি।

ন বাসোভিঃ সহজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে।।৪/১২৯

ভোজনের পর কোন মতেই স্নান করবে না, ব্যাধিগ্রস্ত থাকলে স্নান করবে না, মহানিশায় স্নান করবে না, মহানিশা বলতে রাত বারোটার পর কোন অবস্থাতেই স্নান করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অনেক বস্ত্র পরিধান করে স্নান করবে না আর অজ্ঞাত জলাশয়ে স্নান করতে যাবে না। এগুলো সাধারণতঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সতর্কীকরণ। যেমন আপনি যে পুকুরের ব্যাপারে কিছু জানেন না সেই পুকুরে স্নান করতে যাবেন না, কারণ পা স্লিপ করে পড়ে গিয়ে নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাছাড়া জলে কি আছে না আছে জানা নেই। এই নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে। শহরের এক কেতাদুরস্ত বাবু গ্রামে এসেছে। গ্রামে পুকুর দেখে শহুরে বাবু গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করছে ‘এই পুকুরে কি সাপ আছে?’ গ্রামের একজন বলছে ‘হুজুর! অনেক কাল আগে এই পুকুরে অনেক সাপ ছিল’। গ্রামের লোকটির কথা শেষ হতেই শহুরে বাবু বলতে শুরু করল ‘তোমাদের এই এক সমস্যা, কিছু একটা জানতে চাইলেই তোমরা সেই মাকাতা আমল থেকে কাহিনী শুরু কর’। বলেই বাবু পুকুরের জলে ঝাঁপ মেরেছে। ঝাঁপ মারতেই দেখে দুটো বড় বড় কুমির বাবুকে খাওয়ার জন্য তেড়ে এসেছে। বাবুটি কোন রকমে জান কবুল করে সাঁতরে পাড়ের কাছে উঠে এসে গ্রামের লোকটিকে তেড়ে গালাগাল দিতে শুরু করেছে ‘তুমি আগে বললে না কেন যে পুকুরে কুমির আছে!’ ‘আরে হুজুর! আমি তো সেইটাই বলতে যাচ্ছিলাম, পুকুরে অনেক কাল আগে সাপ ছিল, কিন্তু পরে কোথা থেকে দুটো কুমির এসে সব সাপগুলো খেয়ে নিয়েছে এখন শুধু দুটো কুমির আছে। তা বলার আগেই তো আপনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন’। মনু কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছেন অজ্ঞাত জলাশয়ে কখন নামতে নেই, কি না কি আছে জানা নেই। মানুষের জীবনকে এনারা কত গুরুত্ব দিতেন আর সব কিছুতে কত সাবধানতা অবলম্বন করে চলতেন। অজ্ঞাত জলাশয়ে কোথায় পাথর আছে, গর্ত আছে, কত রকমের হিংস্র জীব থাকতে পারে, এগুলো না জেনে কখন কোন জলাশয়ে স্নান করতে যাবে না। এরপর আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে বলছেন –

কি ধরণের মানুষ থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে

বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঐষেব বৈরিণঃ।

অধার্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতম্।।৪/১৩৩

এখানেও মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার জন্য কি কি জিনিষ করবে না বলা হচ্ছে। তোমার যে শত্রু, যে তোমার হিত চায় না কক্ষণ কোন অবস্থায় তার সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখবে না। সহায়ঐষেব বৈরিণঃ, তোমার শত্রুর সঙ্গে যার মিত্রতা আছে তার সাথেও কোন সম্পর্ক রাখবে না, সম্পর্ক রাখলে তুমি ঝামেলাতে পড়বেই পড়বে। দূর থেকে ‘ভালো তো’ বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে যাবে। অনেক সময় আমার শত্রুর একজন মিত্র সে আমারও মিত্র, এগুলো খুব জটিলতা সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু মনু একেবারে পরিষ্কার, একটু সুযোগও দিচ্ছেন না – তুমি ঠিক করে নাও এই লোকটি কি তোমার শত্রু বলে মনে হচ্ছে? এই লোকটি কি তোমার অহিত করার সুযোগ খুঁজছে? কোন অবস্থাতেই এর সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না। এই লোকটির যে কজন মিত্র আছে তাদের কাছ থেকেও তোমাকে দূরে সরে আসতে হবে। মিত্রকে বলে দেওয়ার মত স্পর্ধা রাখতে হবে – তোমার সঙ্গে যদি ওর বন্ধুত্ব থাকে তাহলে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

অধার্মিকং, যারা অধার্মিক তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখবে না। ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন যাঁরা করতে চাইছেন তাঁদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত মূল্যবান। কথামতে আছে, নরেন, মাস্টারমশাইরা

কয়েকজন মিলে নিজেদের মধ্যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে তোমাদের মধ্যে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার বিষয় শোনার পর ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে গেছেন, মাস্টারমশাইকে তিরস্কার করে বলছেন – এদের মধ্যে তুমি বয়সে বড় তোমারই উচিত ছিল এই ধরনের আলোচনা উঠতে না দেওয়া। কারণ, যখন আমরা রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ নিয়ে কথা বলছি, মমতা ব্যাণাজী, মনমোহন সিংকে নিয়ে আলোচনা করছি তখন আমরা অধর্মীদের নিয়ে কথা বলছি। অধর্মীদের নিয়ে কথা বলাটাই অধর্ম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দুই অত্যন্ত প্রিয় পার্শ্বদ – নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পরবর্তিকালে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে সারা বিশ্বে ঠাকুরের কথা নিজের বাগ্মি শক্তির দ্বারা প্রচার করে দিলেন আর মাস্টারমশাই কথামৃত রচনা করে ঠাকুরের কথাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন। এঁরা দুজন পরস্পর কথা বলছেন, বিষয় অতি সাধারণ – আজকালকার ছেলেমেয়েদের চরিত্রহরণ। তাতেই ঠাকুর প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যারা চব্বিশ ঘণ্টা এই ধরনের সাধারণ বিষয় নিয়েই আলোচনা করে যাচ্ছে, তাদের চরিত্র কেমন ভাবুন! অধর্মী মানে তো তাই। মনু নিষেধ করে দিচ্ছেন এদের সঙ্গ তো কখনই করবে না, এমনকি এদের বিষয়ে কখন কোন ধরনের আলোচনাও করবে না। যারা কখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে না, ধর্ম পথে চলে না, আজ কিংবা কাল তারা অধর্ম পথে নামবেই, অধর্ম আচরণ করবেই, অধর্মমূলক প্রসঙ্গ করবেই। কোন মতেই এই ধরনের লোকদের সঙ্গ করা চলবে না। চাকরী করতে গিয়ে, কাজ করতে গিয়ে, সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক রকম লোকের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে। সংস্পর্শে আসুক কিন্তু সম্পর্ক রাখবে না, মেলামেশাটা করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল তোমার যে শত্রু তার সঙ্গ কক্ষণ করবে না। আর যে শত্রুর মিত্র, শত্রুকে সাহায্য করছে, তারও সঙ্গ কখনই করবে না। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বলা মুশকিল কার সঙ্গ করব আর আর কার সঙ্গ করবো না। যখন মুসলমানরা ভারতে এল, পরে ইংরেজরা যখন ভারতে এসে গেল তখন এগুলো খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় তখন কোন একটা পরিস্থিতিতে শত্রুর সাথেও হাত মেলাতে হচ্ছে, এমনকি বন্ধুত্বও করতে হচ্ছে। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় শত্রুর সাথে হাত মেলালে ভবিষ্যতে কিছু না কিছু সমস্যা হবেই। অনেক সময় মনে হয় শত্রুর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আবার দেখা যায় যারা শত্রুর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে গেছে তারা অনেক ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসতেও সক্ষম হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শেষ মুহুর্তে যে শত্রুর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল সেই শত্রুই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে। তবে এখানে মনু যেটা বলছেন এটা ব্যক্তিগত স্তরে বলছেন। ব্যক্তিগত স্তরে যদি বোঝা যায় এই লোকটি আমার নিপুণ, আমাকে পছন্দ করছে না, আমার হিত চাইছে না তখন তাকে দূর থেকেই অভিবাদন করে বিদায় জানাতে হয়। শত্রুর যে মিত্র তার সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে নেই। তার সাথে বলছেন অধার্মিকম্। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা মনুস্মৃতি নিয়ে আলোচনা করছি। যাঁরা ধর্মপ্রাণ লোক তাঁদের জন্যই মনুস্মৃতি। অধার্মিক লোক মনুস্মৃতি পালন করতে যাবে না, আর এমনিতেও মনুস্মৃতি যারা ধর্মপ্রাণ নয় তাদের জন্য রচিত হয়নি। মনুস্মৃতির এটা গেল প্রাথমিক শর্ত। তাছাড়া এমনিতে সাধারণ লোক, যারা ধর্মে অতটা আস্থা রাখে না তারাও কিন্তু ধার্মিক প্রবণ লোকদের উপর বেশী ভরসা করে। নিজে ধর্মে বিশ্বাস করে না কিন্তু কোন সমস্যায় পড়লে এরা সব সময় তখন এমন লোকের কাছে যায় যারা ধর্মে বিশ্বাস করে।

ধর্মে বিশ্বাস করা মানে একটা আদর্শে বিশ্বাস করা। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যারা একটা আদর্শে বিশ্বাস করে তারা যদি দশটা ভুল কাজ করে, যাদের কোন আদর্শে বিশ্বাস নেই তারা একশটা ভুল কাজ করে। মানুষ যখন কোন একটা আদর্শকে বেছে নেয় তখন তার জীবন ধারা একটা দিশাতে গতি পেয়ে চলতে থাকে আর যদি কোন আদর্শ না থাকে তখন জীবন পুরো দিশাহীনতায় অন্য রকম হয়ে যায়। এখানে ধর্মই হল সব থেকে উচ্চ আদর্শ। ধর্ম নেই অথচ উচ্চ আদর্শ এই ধরনের চিন্তাধারা পাশ্চাত্যে কিছু কিছু এসেছিল কিন্তু আমাদের দেশে কখন স্থান পায়নি। আদর্শ মানেই ধর্ম। ধর্মের আদর্শ পাল্টাবে, কেউ জৈন মতের হবে, কেউ বৌদ্ধ মতের হতে পারে, কেউ হিন্দু মতের হতে পারে। কিন্তু ধার্মিক নয় অথচ আদর্শ পুরুষ ভারতে এই ধরনের ধারণাকে কোন দিন স্বীকৃতি দেয়নি। স্বামীজী সমগ্র রচনাবলীতে এই কথাটাই অনেকবার

ঘুরে ঘুরে এসেছে। এখন ভারতবাসীদের ধর্ম নিরপেক্ষ বলে মনে করতে শেখানো হচ্ছে, এর মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাব যে পড়ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তার উপর মিডিয়ার উন্নতির ফলে সারা বিশ্বের কোন জিনিষই এখন কারুর কাছে অজানা থাকছে না। বিদেশের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের দেশের বর্তমান যুগে দিনে দিনে মূল্যবোধ শব্দটাই হারিয়ে যাচ্ছে, মূল্যবোধ বলে কিছুই থাকছে না। আগেকার দিনে যাঁরা ধর্মপ্রাণ ছিলেন তাঁরা কোন পরিস্থিতির চাপে পড়ে বা লোভে পড়ে কখনই নিজের ধর্মকে ছাড়তেন না, তার ফলে তাঁরা কখন ভুল কাজও করতেন না। সবাই বিশ্বাস করত ধর্মপ্রাণ লোক কখন মিথ্যা কথা বলবে না, ধর্মপ্রাণ লোক অপরের টাকা-পয়সা চুরি করবে না, ঘুষ নেবে না। আর আজকাল সকালে সংবাদপত্র খুললেই আতঙ্ক। চারিদিকে শুধু কোটি কোটি টাকার স্ক্যাম, ধর্ষণ, ছিনতাই, নেতাদের কাদা ছোঁড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই খবরের কাগজে। বিদেশ তো আরও যাচ্ছেতাই অবস্থা। আমেরিকার একজন মহারাজ বলছিলেন, সকালে কোথাও গেলে সঙ্গে পকেটে কিছু ডলার নিয়ে বেরোতে হয়, কেননা কোন না কোন ছিনতাইবাজ ছুড়ি বন্দুক দেখিয়ে লুট করবে। কটা ডলার যদি পকেট থেকে বার করে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আপনি বেঁচে গেলেন। কিছু না পেলে ছুরি বন্দুক কি চালিয়ে দেবে কোন ঠিক নেই। আমাদের দেশে পকেটে কম টাকা নিয়ে চলে পকেটমার বা চুরি ছিনতাই হয়ে যাবে বলে কিন্তু আমেরিকাতে চুরি ছিনতাই হওয়ার জন্য পকেটে কিছু ডলার নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। এদেরকে তো কখনই খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান বলা যায় না। ধর্মবোধ যদি থাকে তা সে খ্রীষ্টানই হোক বা হিন্দু বা মুসলমান হোক এই ধরনের কাজ কখনই সে করতে পারবে না। এই ধর্মবোধটাই মানুষের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অধর্মবোধ সম্পন্ন মানুষের সাথে কখনই ধর্মপ্রাণ লোকের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। যার জন্য মন খুব সাবধান করে দিচ্ছেন অধার্মিকদের থেকে দশ হাত দূরে থাকবে।

অধার্মিকদের সাথে মন তস্করদের কথাও বলছেন। তস্কর হল, যারাই চুরি-চামারি, ডাকাতি, ছিনতাই করে, বর্তমান যুগে এসেছে চোরাকারবারী বা স্যাগলার। যারা চুরি ডাকাতি করে, স্যাগলিং করে, ছিনতাই করে, ঘুষ নেয় এদের সবাইকে একটা শব্দ দিয়ে পরিচয় করা হয় – তস্কর। এদের সাথে কখনই সঙ্গ করতে নেই, সঙ্গ করতে গিয়ে কবে যে আপনি ফাঁসে যাবেন কোন ঠিক নেই। অধার্মিক বলতে বোঝায় ধর্মের দিক থেকে যারা সরে গেছে আর তস্কর বলতে বোঝায় যারা আইনের দিক থেকে অপরাধী। একজন অধার্মিক লোক পুরোদমে আইন মেনেই চলে, চুরি-চামারি করে না, মার-দাঙ্গা করে না, কিন্তু তবুও তাকে বিশ্বাস করা যায় না। আর তাছাড়া অধার্মিকের সঙ্গ করতে থাকলে একটা সময় আপনার ভেতরের ভাবকে এরা নষ্ট করে দেবে। অন্য দিকে আবার ধর্মে বিশ্বাস করে, ধর্মের কথাও বলে কিন্তু চুরি-চামারি করছে, আইনের দিক থেকে একজন দাগী অপরাধী, এদের সঙ্গও করবে না। আমরা প্রায়ই ধার্মিক আর অধার্মিকের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে ভুল করে বসি। অনেককেই বলতে দেখা যায় – এই দেখো না, লোকটি মন্দিরে যায়, পূজো করে কিন্তু কত মিথ্যা কথা বলে, ঘুষ নেয়। এরা কিন্তু কেউই ধার্মিক নয়। ধার্মিক মানে তার সার্বিক আচার আচরণ সব সময় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

পরসৈ্যব চ যোষিতম্, পরস্ত্রীর সঙ্গ কোন মতেই করবে না। পরনারী সঙ্গ আমাদের পরম্পরাতে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে যার জন্য সব ধর্মে, সব সমাজে পরনারী সঙ্গ নিষেধ করা হয়। পরের শ্লোকেই এই পরস্ত্রী সঙ্গের ফল কি হয় বলছেন –

পরস্ত্রী সঙ্গের পরিণতি

ন হীদৃশমনাযুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।

যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্।৪/১৩৪

এই সংসারে পরস্ত্রী-সেবাতে মানুষের যে আয়ু ক্ষয় হয়, জগতে এর বাইরে এমন অন্য আর কিছু নেই যে এত আয়ু ক্ষয় হবে। যে মানুষকে জানছেন এ পরস্ত্রী-সেবা করে যাচ্ছে আপনি জেনে নিন এই মানুষটির আয়ু খুব দ্রুত গতিতে কমে আসছে। মজার ব্যাপার হল, এর আগে মনু বলে দিলেন মেয়েকে কখন একা

কোথাও ছাড়বে না, যখন অবিবাহিত তখন মেয়ে পিতার অধীনে থাকবে, বিবাহের পর স্বামীর অধীনে এবং বয়স হয়ে গেলে ছেলের অধীনে। এত কিছু বলার পরও বলছেন পরস্ত্রী সঙ্গ কখনই করবে না। তার মানে এই রোগটা সমাজে তখন থেকেই ছিল। মনু দুদিক দিয়ে সুরক্ষা দিচ্ছেন – একদিকে বলছেন মেয়েদের কারুর না কারুর অধীনে রাখো আর অন্য দিকে বলছেন পরস্ত্রী সঙ্গ করবে না, যদি কর তাহলে জীবনের আয়ু দ্রুত কমে আসবে। অনেকে বলতে পারে, আয়ু যদি কমে যায় তাতে এমন কি ক্ষতি, আবার তো জন্ম আছে, তাড়াহুড়ো করার কি আছে।

মনু ভালো ভাবেই জানতেন জীবনের উদ্দেশ্য হল মুক্তি, এও ভালো ভাবেই জানতেন পুনর্জন্ম সত্য। কিন্তু মনুর পুরো দৃষ্টি ও বিষয় হল বর্তমান জীবন। হিন্দুদের কাছে এটা খুব সাধারণ ধারণা যে মুক্তি সত্য, পুনর্জন্ম সত্য আর কর্মফলটাও সত্য। কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এই জীবনকে। কথামতে কোথাও ঠাকুর বলছেন না যে এ জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে। স্বামীজী আবার বলছেন – এর আগের আগের জন্ম অনেক কিছু করেছে, এই জন্মটা আমার জন্য দিয়ে দাও। কিন্তু আমরা বেশীর ভাগই হলাম মহা সুবিধাবাদী, আমরা ভোগটাকে এই জন্মের জন্য রাখি আর মুক্তিটা পরের জন্মের জন্য রেখে দিই। আমাদের উল্টোটা করতে হবে, মুক্তির চেষ্টাটা এই জন্মেই করতে হবে, ভোগের চেষ্টাটা পরের জন্মের জন্য রাখতে হবে। আমাদের যত শাস্ত্র আছে সবচেয়েই এই জীবনের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে আছে, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে চারিদিকে লোক কাতারে কাতারে মরে যাচ্ছে। কোথাও খাবারের কোন কিছু নেই, তার মধ্যে বিশ্বামিত্র নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য চণ্ডালের বাড়ি থেকে মরা কুকুরের মাংস চুরি করে খেতে যাচ্ছেন। চণ্ডালের ঘোরতর আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বামিত্রের সংলাপে ব্যাসদেব এই কথা বলছেন ‘পরের জন্ম আছে কি না আছে কে জানে বাপু! এখন তো আমি এই জন্মটাকেই দেখছি। আর মরা কুকুরের মাংস খেয়ে আমি যে পাপ করছি তপস্যা করে, প্রায়শ্চিত্ত করে আমার শুদ্ধি হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যদি মরেই যাই, মৃত্যুর পর কোথায় গিয়ে পড়ব কিছুই ঠিক নেই। সেইজন্য এই মরা কুকুরের মাংস খেয়ে আমার এই জীবনটাকে আগে রক্ষা করতে দাও’।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই ধরণের খুব গভীর সঙ্কট তৈরী হয়। কেউ এমন একটা পরিস্থিতিতে পরে গেছে যার জন্য তাকে বাধ্য হয়ে একটা ভুল কাজ করতে হচ্ছে। বিশ্বামিত্র বলছেন, মরা কুকুরের মাংস খেলে আমার পাপ হবে জানি, কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেওয়ার সুযোগ পাবো। কিন্তু কিছু না খেলে আমি মারা যাব। গীতায় ভগবান বলছেন *গহনা কর্মণো গতিঃ*, কর্মের গতি অত্যন্ত গহণ। একদিকে বলা হচ্ছে তুমি এই কাজ করো না, আরেক দিকে বলছেন এই কাজ যদি আমি না করি তাহলে আমি মারা যাব। এই ধরণের সঙ্কটে যতক্ষণ উপযুক্ত আচার্যের কাছে গিয়ে না জিজ্ঞেস করা হয় ততক্ষণ সঠিক সমাধান পাওয়া যায় না। ঠাকুরও বলছেন – গ্রাম দেশে কোন কিছুর সমস্যা, বিবাদ মেটাতে নিজের গ্রামে বড় বড় গৌঁফওয়ালা পালোয়ান লোক থাকতে দূর দেশ থেকে পাঙ্কি করে রোগা প্যাটকা এক বামুনকে নিয়ে আসা হয়। শাস্ত্র সাধারণ ভাবে বলে দিচ্ছে তুমি এই এই জিনিষ করবে না। শাস্ত্র যেটা বলে দিচ্ছে সেটাই ধর্ম, এই ধর্মটাকে বুঝতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রের অনেক কথার অপবাদও হয়, অর্থাৎ ব্যতিক্রমও আছে, যেমন এই অধর্ম কাজটা না করলে সে মারা যাবে তখন তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তবে এটা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

মনু প্রথমে মেয়েদের আটকে দিলেন, সরাসরি মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু পুরুষগুলোকে আটকাতে কে? তারা তো যা খুশী করতে পারে। তাই এই শ্লোকে বলে দিলেন তুমি যদি পরস্ত্রী বা পরনারীর সঙ্গ কর তাহলে তোমার আয়ু হ্রাস হয়ে যাবে। আয়ু কমে গেলে মৃত্যুর পর তুমি কোথায় গিয়ে জন্মাবে, কুকুর, শেয়াল, সাপ, ব্যাঙ হয়ে কোথায় জন্মাবে তার কোন ঠিক নেই। তাই তুমি এখনই সাবধান হয়ে যাও। এরপর মানুষের কল্যাণের জন্য কি কি কাজ করা ভালো বলছেন। একটা শ্লোকে বলছেন –

নিজের ও অপরের মঙ্গলার্থে কি কি কাজ করতে নেই

এততত্রয়ং হি পুরুষং নিররদহেদবমানিতম্।

তস্মাদেততত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্।।৪/১৩৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর সাপ এই তিনজনকে যদি অপমান কর তাহলে এরা তোমাকে যখন তখন ভস্ম করে দিতে পারে। এই তিনজনকে কখনই অপমান করতে যাবে না। এর আগের শ্লোকে অবশ্য বড়লোকদের অর্থাৎ আজকালকার দিনে ক্ষমতাবান লোকদের কথা বলা হচ্ছে, এদেরকেও অপমান করবে না। বড়লোক বা ক্ষমতাবান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সাপ – এদের দেখতে যতই দুর্বল দেখাক না কেন, এদের গায়ে কখন হাত দিতে যেও না, অপমান সূচক কোন কথা বলতে যেও না – আজ হোক কাল হোক এরা তোমাকে ছাড়বে না, প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। আর তাতে তোমার কি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

মহাভারতে একটা কাহিনীতে এক ব্রাহ্মণ আর এক রাজার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে জোর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হতেই রাজাকে ব্রাহ্মণ এক অভিশাপ দিয়ে দিল আর রাজাও ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিল। তারপর দেখা গেলে দুজনের ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। তখন ঠিক হল দুজন দুজনের অভিশাপ ফেরত নিয়ে নেবে। প্রথমে ব্রাহ্মণ তার অভিশাপটা ফেরত নিয়ে নিল। তারপর রাজাকে বলল আমি আমার অভিশাপ ফেরত নিয়ে নিলাম এবার আপনিও আমার উপর অভিশাপটা ফেরত নিয়ে নিন। তখন ক্ষত্রিয় রাজা বলছে ‘আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার মনটা খুব নরম, একেবারে মাখমের মত, চট করে আপনারা নরম হয়ে যান। ব্রাহ্মণের মুখ কঠোর আর হৃদয় নরম কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয় আমাদের মুখ নরম আর হৃদয় কঠোর। আপনি আপনার অভিশাপ ফেরত নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আমি আমার অভিশাপ ফেরত নিতে পারছি না’। মনু তাই বলছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এদের কখন অপমান করতে যেও না, যদি এরা রেগে যায় তাহলে তোমাকে শেষ করে দেবে।

এই জীবন একটা মহৎ সুযোগ, অনুশোচনা না করে এই সুযোগকে কাজে লাগাও

নাত্মানমবমন্যেত পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।

আমৃত্যোঃ শ্রিয়মম্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্।।৪/১৩৭

অনেক চেষ্টা করেও যদি সমৃদ্ধি লাভ না হয়, ধনলাভ না হয় তাহলেও কিন্তু কখন ‘আমি কত হতভাগ্য’ এইভাবে অনুশোচনা করে নিজেকে অপমানিত করবে না। এক ধরনের লোক আছে যাদের কোন প্রচেষ্টাই নেই, আর জীবনে কিছুই পায়নি, এদের কথা এখানে একেবারেই বলা হচ্ছে না। এখানে তাদেরই কথা বলা হচ্ছে – যারা চেষ্টা করেছে কিন্তু সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি তারা যেন নিজেকে কখনই অপমান করবে না, আমি কত অভাগা, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল – এই ধরনের অনুশোচনা কক্ষণ করবে না। নিজের নিন্দা কখনই করতে নেই। তাহলে কি করবে? আমৃত্যোঃ মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন This human life is a great chance to reach the highest। এই জীবনটা একটা মহৎ সুযোগ, চেষ্টা করে যাও, লড়ে যাও, কিছুতেই ছাড়বে না, ওটাকে পেয়ে ছাড়বে।

আমাদের জীবনের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে থাকে অনেক কিছুর উপর – যেমন এর আগের আগের জন্মে আমার কেমন চেষ্টা ছিল, পারিপার্শ্বিক মানুষজনদের সহায়তা কেমন পাচ্ছি, দৈব অনুকূল কেমন আছে। কিন্তু একটা চেষ্টাতে যদি লেগে থাকা যায় তখন বাকি প্রতিবন্ধকতাগুলো চাপা পড়ে যায়। প্রথমে দিকে হয়তো সাফল্য আসবে না, দ্বিতীয়বারও হয়তো আসবে না, কিন্তু পরে একটা সময় সাফল্য আসতে বাধ্য। ঠাকুর এটাই কথামতে বলছেন – খানদানি চাষা। বংশ পরম্পরায় চাষ করেই যাচ্ছে, পর পর কয়েকটা বছর বৃষ্টি হলো না, খরা হয়ে গেল। তাই বলে কি খানদানি চাষা চাষ বন্ধ করে দেবে? কখনই না। ওই চাষা চাষ করা ছাড়বে না, ওতেই লেগে থাকবে। মনুও ঠিক এই একই কথা বলছেন, যদি কর্ম বিপাকে কখন দুর্দিন

এসে যায় তাও কিন্তু লেগে থাকতে হবে, হা হতাশ করা একেবারেই চলবে না। নিজেকে কখন অবমাননা না করার কথাই বলা হচ্ছে, নিজেকে কখন ছোট মনে করবে না, তার মানে বলতে চাইছে তোমার সাফল্য হবে।

এখানে একটা হল উপদেশ দেওয়ার জন্য বলা, উপদেশ তো সবাই সবাইকে দিতে পারে, স্বামীজীও বলছেন নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, আত্মবিশ্বাস কখন হারিও না। কিন্তু শুধু মাত্র উপদেশ দেওয়ার জন্য এই শ্লোকটি বলা হয়নি এর পেছনে একটা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আছে। আমি কেন আত্মবিশ্বাস হারাবো না, আমার সামনে যদি দুর্দিন এসে যায় তাহলে আমি কেন আত্মহননের পথ বেছে নেব না, আমি মরে গেলেই যদি শান্তি পাই তাহলে মরে যাওয়াই তো আমার পক্ষে ভালো। আত্মবিশ্বাস না হারানো, আত্মহননের পথে না যাওয়ার পেছনে একটা সিদ্ধান্ত আছে। সেই সিদ্ধান্তটা কি হতে পারে? সিদ্ধান্তটা হল, আমাদের মধ্যে যিনি আত্মা আছেন তিনি হলেন চৈতন্য শক্তি। আমাদের যা কিছু গোলমাল হচ্ছে, দুর্দিন আসছে সব জড় শক্তিতে অর্থাৎ সংসারের জন্য হচ্ছে। আমি যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখি, আমার ভেতরের চৈতন্য শক্তিকে যদি জাগ্রত করি আবার কিন্তু আমার দুর্দিন সুদিনে রূপান্তরিত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে যাব। এটাই স্বামীজীর দর্শন। মনু কিন্তু কোথাও এই লাইনটা নিচ্ছেন না, তিনি আমাদের হিন্দুদের চিরাচরিত যে পরম্পরা ধর্ম সেটাকে নিয়েই এগিয়ে গেছেন।

আসলে চৈতন্য শক্তি আমাদের সবারই মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু একটা সময় এই চৈতন্য শক্তির উপর কোন কারণে অনেক আবরণ এসে চৈতন্য শক্তিকে ঢেকে ফেলে। যার ফলে আমরা কখন নিজেকে অবসাদগ্রস্ত, দুঃখিত মনে করে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিতে চাই। এই জিনিষ যে কোন লোকের হতেই পারে। কিন্তু একবার যদি সে মনে করে আমি এই শরীর নই, মন নই, ইন্দ্রিয় নই আমি হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি হলাম সেই চৈতন্য শক্তি। তখন একটা জিনিষই হবে, ভেতরের চৈতন্য শক্তিটা তখন যে কোন মুহুর্তে জেগে যেতে পারে। চৈতন্য শক্তি একবার জেগে গেলে এই অবসাদ, হতাশার ভাবগুলোকে বেকার ফালতু বলে মনে হবে। এখানে মনু কিন্তু আত্মা নিয়ে কোন কথা বলছেন না, তিনি ধর্ম নিয়ে কথা বলছেন। যদিও এখানে পরিস্কার করে বলছেন না কিন্তু এই শ্লোকের মধ্যে পুনর্জন্মের ভাব আছে। জন্মজন্মান্তর ধরে কর্ম করে করে আমার কিছু ভাগ্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এখন কোন একটা কর্ম ফলপ্রসূ হতে শুরু হয়েছে, যার জন্য চেষ্টা করেও সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সারা জীবনই যে সাফল্য পাবে না তা নয়, আর তার সঙ্গে বিফল হওয়া সত্ত্বেও যখন কাজ করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি, এতে ভাগ্যটাও প্রতি নিয়ত পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। এখন বিফল হওয়ার যে প্রবণতা প্রবল হয়ে আছে এটা কিন্তু এখনকার কর্মের ফল নয়। এই কর্মফলটা সব সময় আসছে পেছনের দিকে যত কর্ম করা হয়ে আছে তার ফল। আর এখন যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তার ফল আগামীদিনে প্রসব করবে। এটাই পাকা সিদ্ধান্ত। সেইজন্য বলছেন, এখন তোমার যে গোলমাল হচ্ছে এট হচ্ছে পেছনের কর্মের জন্য। কিন্তু পেছনে শুধু খারাপ কর্মই আছে কিনা আমাদের জানা নেই, ভালো কর্মও থাকতে পারে। তার উপর এখন যদি ভালো কিছু করা হতে থাকে তার ফলটাও তো আগামী দিনে আসবে। সেইজন্য নিজেকে কখন কোন অবস্থাতেই অসহায়, ছোট মনে করো না। এই শ্লোকের পেছনে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত পাচ্ছি। একটা হল হয় আপনাকে আত্মা বা চৈতন্য শক্তির সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর তা নাহলে দ্বিতীয় পুনর্জন্মবাদের সিদ্ধান্তকে নিতে হবে। দুটো সিদ্ধান্তের কোন একটা সিদ্ধান্তকে যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে আপনার এই যে অসহায় ভাব, অবসাদের ভাব, আমি হীন, আমি অভাগা, আমার মত অভাগা দুনিয়াতে আর কেউ নেই, আমারই কপাল খারাপ, এই ভাবগুলো চলে যাবে। এরপরেই আসছে খুব বিখ্যাত শ্লোক –

সনাতন ধর্মের পালন

সত্যং ক্রিয়াং প্রিয়ং ক্রিয়ান্ন ক্রিয়াং সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রিয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।৪/১৩৮

সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে কিন্তু সত্য কথা অথচ অপ্রিয় কথা কখনই বলবে না। কিন্তু তারপরে আরও মূল্যবান কথা বলছেন প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রিয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ, প্রিয় কথা কিন্তু সত্য নয় কক্ষণ

বলবে না। মিথ্যে কথা যদি মিষ্টিও হয় কখনই বলবে না। এষ ধর্মঃ সনাতনঃ, এটাই সনাতন ধর্ম। আমরা হলাম সনাতন ধর্মী, সনাতন ধর্ম মানে চিরন্তন, আর যে ধর্ম চিরন্তন সেই ধর্মের কথায় কোন ধরনের দ্বন্দ্ব হয় না। প্রিয় কথা অথচ মিথ্যা কথা একমাত্র নিজের স্ত্রীকে রতি কালে বলা যায়। মহাভারতেও আছে আর পরে মনুস্মৃতিতেও বলবে যদি নিজের প্রাণহানির কোন আশঙ্কা থাকে বা অপরের প্রাণহানির সম্ভবনা থাকে, তার সঙ্গে যদি মনে হয় সত্য কথা বললে নিজের সর্বস্ব হানি হয়ে যাবে তখন এই সব ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়, আর একমাত্র রতিকালে স্ত্রীকে প্রিয় মিথ্যা কথা বলা যায়, স্ত্রীকে দেখতে হয়তো ভালো নয় কিন্তু স্বামী বলছে তোমার মত সুন্দরী আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি। কিন্তু অফিসে নিজের বস্কে খুশী করার জন্য সব সময় মিথ্যা কথা বলছে, জানে তার অফিসার মহা দুর্নীতিগ্রস্ত কিন্তু তাও বলছে ‘আপনার মত এত অনেস্ট অফিসার আজ পর্যন্ত দেখিনি’। এই ধরনের মিথ্যা স্তুতি কক্ষণ করতে নেই। আসলে নিজের স্বার্থের জন্যই বস্কে খুশী করার জন্য মিথ্যা স্তুতি করে যাচ্ছে। মনু বলছেন, সত্য আর প্রিয় কথাই বলবে কিন্তু সত্য কথা যদি না হয় আর প্রিয় যদি না হয় তাহলে কক্ষণ সেই কথা বলবে না। এটাই আমাদের সনাতন ধর্ম। শ্রীমা বলছেন খোঁড়াকে কখন বলতে নেই তুমি খোঁড়া কি করে হলে, বলতে হয় ভাই তোমার পা খানি অমন মোড়া হল কি করে।

অনেককে প্রায়ই বলতে দেখা যায় – আমি না মিথ্যা কথা একদম সহ্য করতে পারিনা। তাদের বলতে হয় – মশাই! জগতে এমন একটি লোক দেখান যে সে মিথ্যে কথা সহ্য করতে পারে, অমন লোক থাকলে আমি তাকে গিয়ে প্রণাম করে আসব। মিথ্যে কথা শুনতে তো সবারই বাজে লাগে। আবার এই ধরনের লোকও পাওয়া যাবে যারা বলে – আমি কিন্তু সত্য কথা বলি, সত্য কথা বলতে আমি ভয় পাইনা। আসলে এরা কখনই সত্য কথা বলে না। আরেক ধাপ এগিয়ে এদের জিজ্ঞেস করুন – সত্য কথা বলতে হবে এটা কোথায় লেখা আছে? কেন শাস্ত্রেই লেখা আছে। তাহলে তো শাস্ত্রে এটাও বলছে অপ্রিয় সত্য কথা কখন বলবে না। শাস্ত্র তোমাকে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নিষেধ করে দিচ্ছে। ঠাকুর, শ্রীমাও অপ্রিয় সত্য কথা বলতে বারণ করছেন। এদিকে ঠাকুরের কথা – সত্য কথাই কলিযুগের তপস্যা, এই কথাই তোমার মাথায় ঘুরছে। এগুলোই হল শঠতা, ধর্মের বদহজম জনিত আচরণ। যারা বলে আমি সত্য কথা ছাড়া কোন কথা সহ্য করি না, আমি সদা সত্য কথা বলি, সত্য কথা বলতে আমি ভয় পাইনা, আসলে এরা প্রচণ্ড শঠ প্রকৃতির, নরকের দরজা এদের জন্য খোলা। শাস্ত্র বারণ করছে, ঠাকুর নিষেধ করছেন – অপ্রিয় সত্য কথা কোন মতেই বলবে না। অন্য দিকে আবার প্রিয় কথা অথচ অসত্য ভাষণ, এই ধরনের কথাও বলবে না। কথা বলতে গেলে তোমাকে সত্য আর প্রিয় এক সঙ্গে রাখতে হবে। যদি এই দুটোকে একসাথে না রাখ তাহলে তুমি এষ ধর্মঃ সনাতনঃ পালন করছো না। যদি না পালন কর তাহলে তুমি অধার্মিক হয়ে গেলে। তার আগেই বলে দিয়েছেন অধার্মিকদের সঙ্গ করবে না। এটাই মনুর আদেশ। পরের শ্লোকে মনু বলছেন –

ভদ্রং ভদ্রমিতি ক্রয়ান্দ্রমিত্যেব বা বদেৎ।

শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্যাৎ কেদচিৎ সহ। ৪/১৩৯

যে যা করছে, যে যা বলছে সবাইকে বলবে ভদ্রং ভদ্রং ‘বাঃ বাঃ ভালো ভালো, বেশ বেশ’। আর যদি দেখ কেউ কিছু চেষ্টা করছিল কিন্তু কাজটা খারাপ হয়ে গেল তখনও বলবে ভদ্রং ভদ্রং। একজন একটা ছোট্ট জমিতে চাষ করেছিল কিন্তু চাষটা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন তাকে বলতে হয় ‘বাঃ গাছগুলো তো ভালোই হয়েছিল’। তাকে কখন এমন ধরনের কথা বলবে না যাতে সে নিরুৎসাহ বোধ করে। ‘এর আগে আগে তোমার পাপ কাজ করাছিল তাই গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে’ এই ধরনের কথা কখন বলবে না। শ্লোকের পরের লাইনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

শুষ্কবৈরং, মিছিমিছি, কথায় কথায় ঝগড়া করা হল শুষ্কবৈরং। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করাটা অনেকেরই স্বভাব। ট্রেনে, বাসে, অফিসে, পার্টিতে এই রকম কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা সামান্য কিছু

একটা ছুতো পেলেই ঝগড়া শুরু করে দেবে, এগুলোকে বলে শুষ্কবৈরং। বিবাদধ্বং, অযথা তর্ক করে যাওয়া – ইন্সটবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা হবে তাতে কে জিতবে, কে হারবে, কে রেফারি দেবে, টিভিতে খেলা দেখাবে কি দেখাবে না এই নিয়ে চায়ের টেবিলে, ক্লাবের মাচায়, বাড়ির রকে বসে কিছু লোক তর্ক করেই যাবে। এই ট্রেন অমুক স্টেশনে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না এই নিয়ে ট্রেনের মধ্যেই তুমুল তর্ক বেঁধে যাবে। আপনি এর আগে কোন দিন ট্রেনে চেপেছেন! এগুলো হল বিবাদ। এই বিবাদই শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। তাই বলছেন অকারণে ঝগড়া-বিবাদে নামবে না। একজন মানুষের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয়। আবার আমি আজকে যে জিনিষটা সম্বন্ধে জানছি ইতিমধ্যে তার অনেক কিছু পাল্টে যেতে পারে যার খবর আমার জানা নেই, তাছাড়া একটা পরিস্থিতিতে এক রকম হয়েছিল, পরিস্থিতি পাল্টে গিয়ে অন্য রকম কিছু হয়ে গেছে। এই ধরনের অনেক কিছু বিষয় আছে যা একজন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই একজন যেটা বলছে সেটা আমি মনে করছি হয়তো ভুল বলছে, কিন্তু ঠিকও হতে পারে। এই অবস্থায় অযথা তর্ক বিবাদ করতে নেই। যদি ভুলই হয় তাহলে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। কেনচিৎ সহ, যে যেই হোক না কেন, কারুর সাথে শুষ্কবৈর অর্থাৎ অকারণে শত্রুতা কিংবা বিবাদ করতে নেই।

আগেকার দিনের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বা বড় বৈজ্ঞানিকরা বেশী কথা বলতেন না। বেশী কথা বলা মানে হাভাতের লক্ষণ। ঠাকুরও বলছেন হাভাতে, মানে যারা বেশী কথা বলে। ট্রেনে, বাসে, বাজারে, রাস্তাঘাটে, পাড়ায়, মাঠে ময়দানে যেখানেই যান সব সময় দেখবেন বেশীর ভাগ লোকই সারাক্ষণ কিচিরমিচির করেই চলেছে, এই নিয়ে যে কত রকমের অশান্তি, তর্কাতর্কি, ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েই চলেছে। মনুর কাছে এই জীবনটি অতি মূল্যবান, এই ধরনের অশান্তি ঝগড়াট তৈরী করে তোমার জীবনকে অতীষ্ঠ করে তুলো না আর জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় করো না। যেটাই বলবে ভদ্রং ভদ্রং, কাজটা যদি খারাপও হয় তাও বলবে ভদ্রং ভদ্রং, ভালো ভালো, বেশ বেশ! বলে উৎসাহ দিতে হয়, তুমি তো ভালোই চেষ্টা করেছিল, এই রকম চেষ্টাই বা কজন করে, চেষ্টা করে যাও এর পরের বার এর থেকেও ভালো হবে। তুমি নিজে থেকে যখন বলবে তখন সত্য বলবে আর প্রিয় বাক্য বলবে। অপরের কাজকর্ম দেখে যখন বলবে তখন ভদ্রং ভদ্রং, ভালো ভালো বলবে। আবার পরের শ্লোকেই বলছেন –

নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।

নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেৎ নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ।৪/১৪০

অতি প্রত্যুষে, দুপুরবেলা এবং সন্ধ্যার সময়, যখন রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়, এই সময়গুলোতে লোকজন কম যাতায়াত করে। বলছেন এই সব সময় অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করবে না। আর যারা শূদ্র বা নীচু বর্ণের লোক যদি তোমার পরিচিতও হয় তবুও এদের সাথে ওই সময়গুলোতে কোথাও যাবে না। সেই সময় এদের থেকে যদি কোন বিপদ হয় তাহলে তোমাকে কেউ বাঁচাতে আসবে না। যখনই কোথাও যাবে তাহলে তোমার পরিচিত লোকের সাথে এবং সে যদি উচ্চ বর্ণের হয়ে থাকে তবেই তার সঙ্গে যাবে। তার সাথে বলছেন –

হীনাঙ্গানতিরিজ্ঞাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োহধিকান্।

রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ।৪/১৪১

হীনাঙ্গান্, যাদের কোন অঙ্গ হানি আছে, হাত, পা, চোখ, কান বা হাতের কোন একটা আঙুল এই ধরনের কোন অঙ্গ যাদের নেই এদের বলছেন হীনাঙ্গান্, এদেরকে কখন বিদ্রূপ করে, ঠোঁস মেরে কোন কটু কথা বলতে নেই। এদেরকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করলে এরা কষ্ট পায়, সে যদি কষ্ট নাও পায় তাহলে তার অন্তর্যামী ঠিক কষ্ট পাবে। অন্তর্যামী যদি একবার কষ্ট পেয়ে যায় তাহলে যে বিদ্রূপ করেছে আর সে বাঁচবে না। আমরা প্রায়ই বলি তুমি আমার মর্মে বেদনা দিয়েছ। মর্মে বেদনা দেওয়া মানে অন্তর্যামীকে কষ্ট দিয়েছ। আর কাদের ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করতে নেই? অতিরিজ্ঞাঙ্গান্, যাদের হাতে বা পায়ে পাঁচটির জায়গায় ছটি আঙুল, এদেরকেও

কোন বিদ্রূপ করতে নেই। যে বিদ্যাহীন, যার কোন বিদ্যা নেই তাকে কখন নিন্দা করবে না। মুর্খকে কখন মুর্খ বলতে নেই। এই জায়গাতে এসেই নিজেকে সামলে রাখা সবাই খুব মুশকিল। রেগে গেলে বেশীর ভাগ লোককেই বলতে দেখা যায় – আপনি তো একটা মুর্খ। ঝগড়া হলেই আধুনিক বউরা প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রিদের মুর্খ বলতে কখনই ছাড়বে না। কারণ আগের প্রজন্মে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার অত প্রচলন ছিল না। *বয়োহধিকান্*, যদি খুব বৃদ্ধ হয়, এদেরকেও কখন তাক্ষিল্য করে কোন কথা বলতে নেই।

তার থেকে বড় হল *রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ*, চেহারা যদি কুৎসিৎ হয়, টাকা-পয়সা যদি না থাকে আর উচ্চবর্ণের না হয়ে যদি নিম্নবর্ণের লোক হয় এদেরকে কখনই কোন ভাবে নিন্দা করে কোন কটু কথা বলতে নেই। এখন তো আইন করে দেওয়া হয়েছে কাউকে শূদ্র, হরিজন, ডোম, চামার বলে সম্বোধন করা চলবে না। মনু আইন প্রণয়ন করছেন না, তিনি আমাদের একজন ভদ্রলোক তৈরী করার চেষ্টা করছেন, সমাজ ও পরিবারের লোকেরা জানুক আপনি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। কথাবার্তা কিভাবে বলতে হয় সেই ব্যাপারে কয়েকটি শ্লোকে বলে দেওয়া হল। তারপরে উচ্ছিষ্ট নিয়ে কিছু কথা বলছেন –

ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রো গোব্রাহ্মণানলান্।

ন চাপি পশ্যেদশুচিঃ সুস্থো জ্যোতির্গণান্ দিবি।।৪/১৪২

উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ঐঠো মুখে কখন গরু, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে কোন অঙ্গ দ্বারাই স্পর্শ করবে না। আর সুস্থ অবস্থায় অশুচি থেকে আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির দিকে তাকাবে না। উচ্ছিষ্টের ব্যাপার মোটামুটি সবাই পালন করেন। এর মধ্যে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে যেগুলো একেবারে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, সেগুলো আমার আলোচনা করছি না। এরপর একটি শ্লোকে বলছেন –

গৃহের মঙ্গলের জন্য কি কি করণীয়

মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।

জপতাং জুহুতাত্বেব বিনিপাতো ন বিদ্যতে।।৪/১৪৬

বলছেন যাঁর আচার শুভ, বাড়িতে কোন গোলমালে জিনিষ রাখেন না, সব সময় মঙ্গলদ্রব্যযুক্ত, সদাচারযুক্ত ও সংযতচিত্ত তার সঙ্গে *নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্* রোজ তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তর শুদ্ধি করছেন – অর্থাৎ নিত্য স্নান করা, কাপড় চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখা, মন পরিষ্কার রাখা, তার থেকে মূল্যবান জপতাং জুহুতাত্বেব, প্রতিদিন জপ, ধ্যান, হোম, পূজা, পাঠ করা হয় তাহলে *বিনিপাতো ন বিদ্যতে* এদের বাড়িতে কোন ধরনের উপদ্রব হয় না। বলতে চাইছেন যাদের বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে, নানান ধরনের উপদ্রব চলছে, এগুলোকে এখানে বলছেন *বিনিপাতো*, বিনিপাত মানে দৈবকৃত ও মনুষ্যকৃত উপদ্রব, তারা যদি সব সময় বাড়িত মঙ্গলযুক্ত দ্রব্য রাখেন, অশুভ কোন দ্রব্য বাড়িতে নেই, তার সাথে আচার ব্যবহার ঠিক আছে, মানে লোকের সাথে ঝগড়া বিবাদ করছে না, অশুভ কথা বলে না এবং বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি, স্নানাদি করা আর মনকে পরিষ্কার রাখা এবং নিত্য গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্রের জপ করা, হবন করা, এখন আর কেউ হবন করে না, তার বদলে পূজা পাঠই করা হয়, বলছেন এই কটি জিনিষ যদি নিত্য করা হয় তাহলে কোন উপদ্রব হয় না। আমরাও ছোট থেকে বড়দের কাছে শুনে এসেছি ঠিক ঠিক নিয়মিত জপধ্যান করে গেলে সমস্যা অনেক কম হয়। কিন্তু জপধ্যানের সাথে আরও বাকী জিনিষগুলো জড়িয়ে আছে, যেমন শুদ্ধি, বাইরের শুদ্ধি ভেতরের শুদ্ধি, ঘরদোর নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, আচার ব্যবহার ঠিক রাখা, এগুলো যদি ঠিক ঠিক না করা হয় তাহলে জপ-ধ্যানও ঠিক মত করা যাবে না। পরের শ্লোকে বলছেন –

বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।

তং হ্যস্যাহঃ পরং ধর্মমুপধর্মোহন্য উচ্যতে।।৪/১৪৭

সকাল সন্ধ্যা যখনই সময় হবে তখনই আলস্য ত্যাগ করে বেদ অভ্যাস করবে। এখানে ভাষ্যকাররা বেদ অভ্যাসকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ বলছেন। আপনি যে সময়টাকে ঠিক করে রেখেছেন যে আমি এই সময় ধ্যান জপ করব, সেই সময় সমস্ত রকম আলস্য ত্যাগ করে জপ ধ্যানে বসে যেতে হয়। জপ ধ্যান না করার জন্য আমরা অনেক অজুহাতই দিই, সময়ের অভাব, কাজকর্মের চাপ ইত্যাদি, কিন্তু আসলে জপ ধ্যান না করার মূল কারণ হল আলস্যতা। স্মৃতিকাররা বলছেন আলস্য ত্যাগ করে নিয়মিত ভাবে এই জপ ধ্যান করাটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বাকি সব উপধর্ম। আমরা যা কিছুই করি না কেন, তীর্থ করছি, সাধুসঙ্গ করছি, মন্দিরে যাচ্ছি, দান করছি এগুলো সবই উপধর্ম। কিন্তু সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত আসনে জপ ধ্যান করাটাই মুখ্য ধর্ম, এই ধর্মের সমান আর কোন ধর্ম হয় না। মনুস্মৃতিতে দেখা যায় মনু এই কথাটাকেই অনেক ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। আবার বলছেন –

মানুষ কিভাবে জাতিস্মার হয়

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।

অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্।৪/১৪৮

নিয়মিত বেদাভ্যাস, সর্বদা পবিত্রতা বজায় রাখা এবং নানান ধরনের যে তপস্যার কথা বলা হয়েছে সেই সব তপস্যাতে লেগে থাকা আর তার সাথে সমস্ত প্রাণীর প্রতি অহিংসা ভাব রাখা, এগুলো করলে মানুষ জাতিস্মার হয়, অর্থাৎ তার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। যতক্ষণ না পূর্ব জন্মের স্মৃতি উদয় হয় ততক্ষণ ঠিক ঠিক ধর্ম জীবন শুরু হয় না। পূর্ব জন্মের স্মৃতি এসে গেলেই মানুষ প্রকৃত ভাবে মুক্তির চেষ্টা করে, তার আগে পর্যন্ত কিছু হবে না। এর আগে যে চেষ্টা করছে না তা নয়, চেষ্টা করছে ঠিকই। এর ওর কাছে শুনে, শাস্ত্র পড়ে, মহাপুরুষদের জীবনের ইতিহাসকে দেখে বা শুনে প্রেরণা বশতঃ এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চেষ্টাটা কখন বিফলে যাবে না এটা নিশ্চিত। কিন্তু মানুষ যদি একবার তার আগের আগের জন্মকে দেখে নেয় তখন তার মনে আতঙ্ক ঢুকে যাবে। আরে! আমি আগের আগের জন্মে এই সব গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, সাপ ছিলাম! আমি কতবার মরেছি কতবার জন্মেছি, এই জন্মে এই ছিলাম, ওই জন্মে এই ছিলাম, এর পরের জন্মে কোথায় গিয়ে জন্মাতে হবে কে জানে! তখন সে প্রাণপনে মুক্তির চেষ্টা শুরু করে।

জাতিস্মার হতে গেলে এই চারটি জিনিষ সব সময় পালন করে যেতে হবে প্রথম জপ, দ্বিতীয় শৌচ এবং তৃতীয় তপস্যা আর চতুর্থ সমস্ত প্রাণীর প্রতি অদ্রোহ, কারুর প্রতি যেন হিংসা ভাব না থাকে, সবাইকে নিজের মত দেখা। এই চারটে করলে পূর্ব জন্মের স্মৃতি এসে যায়। এই ভাবে জপ করতে করতে কি হয়?

পৌর্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যাস্যতে পুনঃ।

ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে।৪/১৪৯

যেমন পূর্ব জন্মের স্মৃতি চলে আসে তখন সে বলে নাঃ আর নয়। তখন সে পুরোপুরি ব্রহ্ম অভ্যাসে নেমে পড়ে, নিরন্তর ব্রহ্মের ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন হয়ে যায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তার থাকে না। এই ব্রহ্ম অভ্যাসে তাঁর পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এই পরমানন্দই অনন্ত সুখ আর মোক্ষের দ্বার। ব্রহ্ম চিন্তনের দ্বারাই একমাত্র আনন্দের প্রাপ্তি হয়, পরমতম সুখ অনুভব করে আর মুক্তি লাভ করে। মুক্তিতেই অনন্ত সুখ ও অনন্ত আনন্দ।

পর পর চারটে শ্লোকে মনু চারটে ধাপের বর্ণনা করলেন। প্রথমে আমাদের উপদ্রব গুলো যেন বন্ধ হয়, বিনিপাতো ন বিদ্যতে। বিনিপাত কিভাবে বন্ধ হবে? বাড়িতে সব সময় শুভ জিনিষ রাখবে, সর্বদা সদাচারযুক্ত হবে ও সংযতচিত্ত এবং প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে জপ ধ্যান করে যেতে হবে। জপ-ধ্যানই হল মুখ্য ধর্ম আর বাকি সব উপধর্ম। জপ-ধ্যান, পবিত্রতা, তপস্যা আর সমস্ত জীবের প্রতি অহিংসা করলে মানুষ জাতিস্মার হয়ে যায়। জাতিস্মার হয়ে গেলে তার মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হয়। মুক্তির ইচ্ছার উদয় হলে সে ব্রহ্ম অভ্যাস করতে

শুরু করে। নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তনের দ্বারাই তাঁর পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তিই মুক্তি। এই হল কয়েকটি ধাপ, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখলে দেখা যাবে জপ-ধ্যানই শেষ কথা। আর জপ ধ্যান যদি শুদ্ধ জায়গায় না করা হয় তাহলে জপ ধ্যান ঠিক ভাবে হবে না। আমাদের সবাইকে বাড়িতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতে হয়। তাই বাড়িটাকে শুদ্ধ পবিত্র রাখতে হলে বাড়িতে মঙ্গলযুক্ত দ্রব্য রাখতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নিজের শরীরকে নিয়মিত শৌচাদির দ্বারা শুদ্ধ পবিত্র রাখতে হবে, মন পবিত্র থাকতে হবে তার সঙ্গে পারিপার্শ্বে যারা বসবাস করছে তাদের সবার প্রতি ভালোবাসা, করুণার ভাব রাখতে হবে। কারুর প্রতি রাগ দ্বেষ থাকবে না, হিংসা থাকবে না। এগুলো অনুশীলন করতে করতে পূর্ব জন্মের স্মৃতি এসে যায়। ঠাকুর বলছেন, খাটতে হয়, না খাটলে কিছুই হবে না। এই খাটনির মধ্যে জপ-ধ্যানটাই মুখ্য খাটনি কিন্তু বাকিগুলোও খুব দরকারি। তার সঙ্গে যাদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তাদের প্রতি অদ্রোহ ভাব রাখতে হবে। অদ্রোহ ভাব রাখাটা খুব কঠিন, আমি নিজে কষ্টে পড়ে আছি আর আমার পাশের লোকটির জীবনে কিছুই ছিল না কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করেছে, তার প্রতি দ্রোহ ভাব রাখা খুবই কঠিন। একটা উচ্চ অবস্থায় না পৌঁছাতে পারলে এই অদ্রোহ ভাব আসবে না, তা নাহলে দ্রোহের ভাব এসেই যায়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – আমার ভেতরে অন্য যা কিছু দোষ থাকুক আমার ভেতরে হিংসার ভাব কখন ছিল না। এটাই এখানে মনু বলছেন, তোমার মধ্যে যেন দ্রোহের ভাব না থাকে।

দ্রোহের ভাব কিভাবে কমানো যাবে? ঠাকুরও বলছেন, অমুককে দেখে মনে হল সে আমার থেকে এগিয়ে গেছে, কিন্তু পরে দেখলুম যে ততটা নয়। নিজেকে যখন অন্তর থেকে আমি বড় ভাবতে শুরু করব তখন এই সমস্যাটা কেটে যাবে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর নিজের জীবনের একটা ঘটনা প্রায়ই বলতেন। উনি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন তখন তিনি দেখলেন ওখানকার সবাই কি সুন্দর ইংরাজী বলে, সংস্কৃত জানে, আর ওনার গ্রামের স্কুলে সামান্য পড়াশোনা, না জানেন ইংরাজী, না জানেন সংস্কৃত। কিছু দিন পর থেকে ওনার মনে অবসাদ আসতে শুরু করল, আমি তো এদের কাছে কিছুই নই। তখন হঠাৎ তাঁর মনে হতে লাগল আমি নারকেল গাছের মাথায় যে রকম তড়তড় উঠতে ওস্তাদ ওই রকম তো এরা কেউই পারেনা। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলতেন শুধু এইটাকে সম্মল করে নিজেকে আস্তে আস্তে এই অবসাদের অবস্থা থেকে টেনে তুললাম। আমি যখন নিজেকে জানবো এই কাজের ব্যাপারে আমি একজন শ্রেষ্ঠ পারদর্শী, এই কাজে আমার মত কেউ দক্ষ ও কুশলী নয়, তখন কিন্তু আমার এই দ্রোহের ভাব থাকবে না। তার জন্য আমাকে আগে কি করতে হবে? যে কোন একটা ক্ষেত্রে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে।

স্বামীজী যখন বলছেন আমার মধ্যে কখন দ্রোহের ভাব ছিল না। দ্রোহ অর্থাৎ হিংসা মানুষের মধ্যে কখন হবে? আমি আপনি যদি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তবেই তো আমার অথবা আপনার মধ্যে হিংসার ভাব আসবে! কিন্তু স্বামীজী এত বিশাল হয়ে গেছেন যে তিনি নিজেকে কার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবেন! কোন হিংসার ভাব আসার প্রশ্নই নেই। ঠাকুর কেন বলছেন যে আমার ভয় হল? ঠাকুর তখন সাধনার অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাধনা করে যখন শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে গেলেন তখন তাঁর ধারে কাছে আর কেউ দাঁড়াতে পারছে না। ওই অবস্থায় তখন কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, কে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কে শিবনাথ শাস্ত্রী, সবাইকে ঠাকুরের খড়কুটো মনে হচ্ছে। গীতায় বলছেন যং লঙ্কা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ, ঈশ্বর দর্শনের পর সব কিছু খড়কুটো বলে মনে হয়। কিন্তু এই একই জিনিষ হবে যখন সাধন অবস্থায় কেউ একই জিনিষ করে, যেমন একজন প্রাণপন লাগিয়ে দিয়েছেন একটা ক্ষেত্রে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হয়তো বলছেন আমার ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাই না, জপ-ধ্যান করা ছাড়া আমি আর কিছু করতে চাই না। তখন কি হবে? তখন তাঁর ভেতরে একটা যে শক্তির স্ফূরণ হবে তাতেই মনের এমন অবস্থা হবে যে জগতের কার কি হল, কে বিল গেট হল, কে ওবামা, কে লাদেন, কে শচীন তেণ্ডুলকার কারুর দিকে আর নজর দিতে ইচ্ছেই হবে না। কিন্তু তার আগে একটা ক্ষেত্রে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব পেতে হবে। সেইজন্য ধর্মপ্রাণ লোক হওয়া খুব সোজা, মন্দিরে গেলাম, গঙ্গাস্নান করলাম, চরণামৃত পান করলাম কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া খুব কঠিন। কারণ একটা ক্ষেত্রে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে – ওই জায়গাটাতে আমার ধারে কাছে কেউ নেই। এই

শক্তিটা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ জগতের কিছু মানুষ ও জিনিষের প্রতি আমার আকর্ষণ আবার কিছু জিনিষের প্রতি বিকর্ষণ এই দুটোই থাকবে। এর সাথে দ্রোহের ভাবও থাকবে।

কথামতে ঠাকুর একটা মারাত্মক কথা বলছেন বিশেষ করে সন্ন্যাসী বা সাধকদের ব্যাপারে বলছেন, যদি স্ত্রী বা কোন নারী কু মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে তখন বলতে হয় ‘কেটে দেবো! আমার পরমার্থের হানি করতে এসেছিস’! ‘আমার পরমার্থ হানি করতে এসেছিস!’ এটাই হল মূল কথা। আমি সারা জীবন বহু কষ্ট করে টাকা-পয়সা সঞ্চয় করেছি। সঞ্চয়িত অর্থ পুরোটাই আমি একটা পুটলি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। এখন কোন ডাকাত বা চোর ওই পুটলিটা ছিনতাই করতে আসে তখন আমি কি রকম ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ করতে নিজেকে প্রস্তুত করে নেব! যে কোন মহিলা সব থেকে বেশী নিজেকে শক্তিমান মনে করে যখন তার সন্তান নিজের কাছে থাকে। সাধারণ অবস্থায় কোন নারী নিজের শক্তিকে জাহির করতে যাবে না, যখন স্বামীর সঙ্গে থাকে তখন শক্তি দেখাবে না, বিধবা হয়ে গেলেও শক্তি দেখাবে না কিন্তু যদি তার সন্তানের উপর কোন আপদ বিপদ আসে তখন কিন্তু নারী তার রণচণ্ডীর রূপ ধারণ করে নেবে, কারণ সন্তানই তার সম্পদ। সন্তানের ব্যাপারে সে কারুর সাথে কোন আপোস করবে না। সব রকমের লাঞ্ছনা নারী সহ্য করে নেবে – তার নারীত্বের অবমাননা করে দিন, স্বামীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিন, তার অস্তিত্বকে গুরুত্ব না দিন সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে যাবে কিন্তু সন্তানের উপর কিছু হলে একেবারে ফোঁস করে উঠবে।

ঠিক তেমনি একজন যোগী, যিনি অনেক দিন ধরে সাধনা করে যাচ্ছেন তার সম্পদ হল যোগ উপলব্ধি। এত দিন ধরে সাধনা করে যে যোগশক্তি অর্জন করেছেন, সেটা যতটুকুই হোক না কেন কোন নারীর কাছে সন্তান যেমন প্রাণ, এই যোগশক্তি টুকুও যোগীর কাছে প্রাণ। এখন যোগী যখন দেখবে আমি যদি কারুর প্রতি হিংসার ভাব রাখি, কারুর প্রতি যদি আমার রাগ বিদ্রোহ হয়, কারুর প্রতি যদি আমার আকর্ষণ জন্মায় তাহলে আমার এই সম্পদটুকু চলে যাবে, তখন সে যে করেই হোক এই সম্পদটা হারাতে চাইবে না, তার থেকে বরং কারুর প্রতি দ্রোহ না রাখাই ভাল, বিশেষ কারুর প্রতি রাগ বা বিদ্রোহ কোনটাই রাখার দরকার নেই, আমার এই সম্পদ আমি হারাতে চাই না। তার মানে একটা ক্ষেত্রে সে বিরাট কিছু হতে চাইছে। যতক্ষণ না একটা জায়গায় বিরাট কিছু না হতে পারছে ততক্ষণ এই দ্রোহ ভাবটা থাকবে। সেইজন্যই বলা হয়, ধার্মিক খুব সহজে হয়ে যাওয়া যাবে কিন্তু আধ্যাত্মিক হওয়া খুব কঠিন।

এটাই স্বামীজী বার বার দেখাচ্ছেন। ভারতবর্ষ যদিও ধর্মপ্রাণ দেশ কিন্তু ধর্মের প্রাণ হল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য চাই শক্তি। শক্তি যদি না থাকে তাহলে কোন ক্ষেত্রেই আমরা বিরাট হতে পারবো না। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কোন্ ব্যাপারে নিজেকে বিরাট মনে করেন, মনে করতে পারেন যে এই ব্যাপারে আমার মত বড় আর কেউ নেই? সারা বিশ্বের মধ্যে না হয় বাদ দিন ভারতবর্ষের মধ্যে নিয়ে আসুন, ভারতবর্ষকেও না হয় ছেড়ে দিন কলকাতা শহরের মধ্যে নিয়ে আসুন, আচ্ছা কলকাতাকেও না হয় বাদি দিন আপনার পাড়াতে নিয়ে আসুন, এবার বলুন ‘আমি সকালবেলা এমন সুন্দর ভাবে মশারি ভাঁজ করতে পারি, মশারিকে এই রকম নিখুঁত ভাবে ভাঁজ আমাদের পাড়ায় কেউ করতে পারে না, দোকান থেকে নিয়ে আসার পর যে রকম ভাঁজ থাকে ঠিক সেই রকম ভাঁজ করি। একদিন দুদিন নয়, রোজ করি’। এটাও যদি অর্জন করতে কেউ পারে তাহলে এটাও একটা বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা। এটাও যদি কেউ করতে পারে তাতেই সেই অনেক উপরে চলে যাবে। ভালো করে বিচার করে দেখলে দেখতে পাবো আমাদের বেশীর ভাগ লোকের মধ্যেই এই ক্ষমতাটুকুও নেই। যতক্ষণ না কোন কাজে এই ধরনের নিজের কোন উপলব্ধি না থাকে ততক্ষণ তার মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকতার কোন শক্তিরই বিকাশ হবে না, যার ফলে মায়ার রাজ্যে কোথাও না কোথায় ফেঁসে থাকছে।

এরপর বলছেন, আমাদের শরীরের যত রকমের কাজ করতে হয়, শরীরের সংস্কার বলতে যে কাজগুলোকে বোঝাচ্ছে, মল-মূত্র ত্যাগ, স্নানাদি, সাজগোজ, দাঁত মাজা, দেবতার পূজা এগুলো সব পূর্বাহ্নে

করে নিতে হবে। বারোটোর আগেই সব করে নিতে হয়। বারোটোর পর খাওয়া-দাওয়া করা মানে পিতৃদের অন্ন গ্রহণ করা। তাই খাওয়া, পূজা এগুলো বারোটোর আগেই করে নিতে হয় তা নাহলে অধর্ম হয়ে যাবে।

সমস্ত কর্মই ধর্মভাবে করতে হবে

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যৎ নিবদ্ধং শ্বেষু কর্মসু।

ধর্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ।।৪/১৫৫

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে যে যে সদাচার করতে বলা হয়েছে সেগুলো নিরলস ভাবে পালন করার সাথে সাথে নিজের যা কিছু কর্ম আছে সব ধর্মপূর্বক করবে। এই জিনিষগুলো আমরা বুঝতে পারিনা, মনে করি সদাচার করে নেওয়ার পর সামান্য কিছু অধর্ম করলে কিছু দোষের নয়। কিছু দিন আগে ভারতের একটি রাজ্যের একজন মন্ত্রী তাঁর পদস্থ অফিসারদের বলছেন ‘আপনার চুরি করুন কিন্তু ডাকাতি করবেন না, ঘুষ নিন কিন্তু কাজটুকু করে দিন’। কত বড় অন্যায় কথা! আর কত দুঃখের কথা! যে কাজ করার জন্য আপনাকে মাসে মাইনে দেওয়া হচ্ছে সেই কাজটুকু পর্যন্ত করতে চাইছেন না। শ্রুতি স্মৃতিশাস্ত্রে এই ধরনের কাজকে ভয়ঙ্কর ভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এখানে বলছেন শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে যা যা করতে বলা হয়েছে সেটাই তুমি ধর্মপূর্বক পালন করে যাবে।

সদাচারের প্রশংসা

আচারাল্লভতে হ্যায়রাচারদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।

আচারাদ্বনমক্ষ্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্।।৪/১৫৬

সদাচার দ্বারা মানুষ আয়ু লাভ করে, সদাচার পালন করলে মানুষ গুণবান্ সন্তান লাভ করে, আচার ঠিক থাকলে অক্ষয় ধনপ্রাপ্তি হয়, যখনই কোন কিছুর জন্য টাকা-পয়সার দরকার তখন কোন না কোন ভাবে টাকা পয়সা চলে আসবে, সদাচার পালন করতে থাকলে অনিষ্ট হওয়ার যে সম্ভবনাগুলো ছিল সেগুলোকে কেটে দেয়। এখানে আচার বলতে এতক্ষণ যেগুলো আমাদের করতে বলা হয়েছে সেগুলোকে পালন করা। এই আচারগুলো পালন করলে মানুষ দীর্ঘায়ু হবে, সন্তানরা ঠিক ঠিক হবে, অক্ষয় ধন হবে আর সমস্ত রকম বিঘ্ন, অনিষ্টগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যারা আচার পালন করে না তাদের বলে দুরাচারী।

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।

দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ।।৪/১৫৭

কিন্তু যারা দুরাচারী পুরুষ, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সদাচার গুলোকে পালন করে না তাদের লোকে ভবতি নিন্দিতঃ, এই জগতে সবাই তাদের নিন্দা করে। কোথায় কোন রাজ্যের একজন মন্ত্রী ওই ধরনের কথা বলেছে আর আমরা এখানে বসে তার নিন্দা করছি। দুরাচারী পুরুষদের মনে সব সময় দুঃখ লেগে থাকে। পরিচিতদের মধ্যে যখনই কারুর হাড়িমুখ দেখবেন তখনই বুঝে নেবেন লোকটি দুরাচারী, ভেতরে কিছু গোলমাল আছে। সব সময় নানা রকম ব্যাধিতে জর্জরিত থাকে আর এদের আয়ু কম হয়। যারা অনাচারী, দুরাচার করে তাদের এই জন্মে তো এই ধরনের গোলমাল হবেই এমনকি পরের জন্মেও এই গোলমালগুলো নিয়েই জন্ম নেবে, তার পরের জন্মেও সেটাই টেনে নিয়ে আসবে। শেষে যেই জন্মে সদাচারে নিযুক্ত হবে তখন এই গোলমাল গুলোকে ঠিক করতেই কয়েক জন্ম লেগে যাবে। অনেকে এসে মহারাজদের কাছে দুঃখ করে বলে ‘মহারাজ! এততো জপ ধ্যান করছি কিন্তু দিনে দিনে নানান রকমের সমস্যা তো বেড়েই যাচ্ছে’। বাড়ারই তো কথা। কত কত জন্ম ধরে কত রকমের দুরাচার করে এসেছে, সেগুলো যাবে কোথায়! তাই যতই সমস্যা আসুক সদাচারে সব সময় লেগে থাকতে হয়। ঋষিরা তাই সেই কবে থেকে বলে আসছেন তোমার আচার আগে ঠিক কর। আচার মানে, জপ-ধ্যান, শারীরিক শুদ্ধি ও মনের শুদ্ধি। এই তিনটে হল মুখ্য, আর চতুর্থ হল লোকেদের সঙ্গে যখন ব্যবহার করবে তখন – সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না, প্রিয় অথচ মিথ্যা

কথা বলবে না আর সব সময় ভদ্রং ভদ্রং, সবাইকে ভালো ভালো বলবে আর কারুর প্রতি দ্রোহ ভাব রাখবে না। এগুলো আচারের মধ্যে পড়ে। এই আচারগুলো পালন করলে সমাজে তোমার নিন্দা হবে না, অবসাদ ও হতাশার ভাব আসবে না, রোগব্যাধির প্রকোপ হবে না আর দীর্ঘায়ু হবে। পূর্বাঙ্কেই স্নান, পূজা, খাওয়া-দাওয়া করে নেওয়াও আচারের মধ্যে পড়ছে। আরেকটি শ্লোকে বলছেন –

অন্তরাত্মা যে কাজে প্রসন্ন হন সেটাই সদাচার

যৎ কর্ম কুর্বতোহস্য স্যাৎ পরিতোষহন্তরাত্মনঃ।

তৎ প্রযত্নেন কুবীত বিপরীতন্ত বর্জয়েৎ।।৪/১৬১

যে কাজ করলে তোমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন সেই কাজটি বিশেষ প্রচেষ্টা ও যত্ন নিয়ে করবে। তার বিরুদ্ধ কাজ, যে কাজে মনে গ্লানি আসে সেই কাজ কখনই করতে যাবে না। যাদের দীক্ষা হয়েছে, তারা যদি মনে করে জপ করলে আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন, তাহলে তাদের খুব করে জপ-ধ্যানে লেগে থাকতে হবে। শত বাধ-বিপত্তির এলেও জপ-ধ্যানকে তাদের কখনই বন্ধ করতে নেই। যারা মনে করছে স্বাধ্যায় করলে আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন, তখন অবশ্যই স্বাধ্যায়তেই প্রযত্নশীল হতে হবে। যে কাজ করলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন সেই কাজটা বিশেষ চেষ্টা নিয়ে করতে হয়। অন্য দিকে আবার গুরু বলে দিয়েছেন জপ করবে তখন ভাবতে শুরু করবে কোনটা বেশী করব জপ না স্বাধ্যায়। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে জপ করলে আপনার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন কিনা, আপনি বলবেন হ্যাঁ। কিন্তু স্বাধ্যায় করলে আপনার মন আরও বেশী প্রসন্ন হয়। আবার অন্য জায়গায় বলছেন জপ করলে সব বাধা-বিঘ্ন, সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে সরিয়ে দেবে। তখন বলছেন তাহলে বিশেষ চেষ্টা করে তুমি জপ কর। জপ করাতে আপনার অন্তরাত্মাকে তো কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না, আনন্দই দিচ্ছে। এবার আপনার বিশেষ চেষ্টাটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। স্বাধ্যায় হল passive participation। আর জপ হল active participation। মানুষকে সব সময় দেখতে আমি যে কাজটা করছি আমি এটা passivity করছি না activity করছি। যখন টিভি দেখছি, কম্পিউটারে কাজ করছি এগুলো হল passive participation। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে passive participation করতে হয়, যেটাতে আমাকে লেগে থাকতে হবে, যেমন জপ, ধ্যান ও পাঠ। স্বাধ্যায় সত্যিই ভালো, কিছু না করা থেকে অনেক ভালো। কিন্তু এর থেকে আরেক ধাপ উপরে জপ, জপের উপরে আরেকটা ধাপ হল ধ্যান। এই তিনটেতেই আমাদের অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, কিন্তু এর মধ্যে আবার দেখতে হবে উচ্চ অবস্থার দিকে আমাকে যেতে হলে নীচের একটাতে আটকে থাকলে চলবে না। অনেক কিছু আছে যেগুলো এর আগে অজান্তায় করেছি কিন্তু এখন আর সেই কাজগুলো করতে ভালো লাগে না। যেটা ভালো লাগে না, সেটাকে এবার ফেলে দাও।

তবে আমার জন্য যে কাজটা ঠিক সেই কাজটা আপনার জন্য ঠিক নাও হতে পারে। এই কারণে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে একই জিনিষ সবার জন্য প্রযোজ্য কখনই হতে পারে না। এই নিয়ে খুব নামকরা কাহিনী আছে। দুজন সন্ন্যাসী কোন জায়গা থেকে কাজ সেরে নিজেদের আশ্রমে ফিরছিল। নদীর তীরে এসে দুজনে দেখতে পেলেন একজন খুব রূপসী মেয়ে নদীর তীরে বসে কাঁদছে। সন্ন্যাসীরা মেয়েটিকে একাকী বসে কাঁদতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ‘মা! তোমার কি হয়েছে?’ মেয়েটি তখন বলল ‘আমি আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আমার পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, ভাবছি এই অবস্থায় আমি কিভাবে পায়ে হেঁটে এই নদীকে পার করব!’ তখন একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে বলল ‘তোমার চিন্তার কিছু নেই। তুমি আমার কাঁধে বসো, আমি তোমাকে নদী পার করে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছি’। মেয়েটিও রাজী হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী তাঁর কাঁধে বসিয়ে মেয়েটিকে নদীর ওপারে গিয়ে নামিয়ে দিল। মেয়েটি বলল ‘এবার আমার আর কোন অসুবিধা হবে না, আমি কোন ভাবে আমার স্বামীর কাছে চলে যেতে পারব’। সন্ন্যাসী দুজন আশ্রমে ফিরে যথারীতি সন্ধ্যার প্রার্থনা সেরে খাওয়া-দাওয়া করার পর একজন সন্ন্যাসী অপর সন্ন্যাসীকে বলছেন ‘মহারাজ! আমার ভেতরে খুব দ্বন্দ্ব হচ্ছে, যার জন্য আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি’। ‘তোমার কিসের দ্বন্দ্ব হচ্ছে আমাকে খুলে বলো’। ‘বলতে আমার খুব ইতঃস্তত হচ্ছে, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনি একজন সন্ন্যাসী হয়ে এক

যুবতী স্ত্রীকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, এটা তো সন্ন্যাসীর ধর্ম বিরুদ্ধাচরণ’। তখন এই সন্ন্যাসী খুব হেসে বলছেন ‘আমি তো ওই মেয়েটিকে নদীর পারে নামিয়ে দিয়ে এসেছি কিন্তু তুমি ওকে এখনও কাঁধে নিয়ে বয়ে যাচ্ছ’? এখানে কে ঠিক বলছেন? এই ধরণের সমস্যার সমাধান করা খুব কঠিন। একজন সন্ন্যাসীর অন্তরাত্মা কষ্ট পাচ্ছে একজন সন্ন্যাসী হয়ে একটি মেয়েকে কেন কাঁধে তুলে নেবে! এও কিন্তু নিজের জায়গায় ঠিক আছে। আর যে সন্ন্যাসী কাঁধে বসে নদী পার করিয়ে দিল সেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে ঠিক আছে। লোক ব্যবহারের দৃষ্টিতে যে সন্ন্যাসী মেয়েকে কাঁধে বসিয়েছেন সে কিন্তু ঠিক কাজ করেনি।

মূল্যবোধ জিনিষটা খুব গোলমালে। প্রভু মহারাজ (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ) প্রায়ই একটা কথা বলতেন ‘যখনই কোন কাজ করবে তখন শুধু যে কাজটা ভালো কাজ হবে তাই নয়, কাজটা দেখতেও যেন সুন্দর হয়’। কোন কাজটা ঠিক, কোন কাজ ঠিক নয়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে এগুলো বিরাট বড় সমস্যা। কিন্তু শেষে গিয়ে দাঁড়াবে নিজের অন্তরাত্মাতে গিয়ে। অন্তরাত্মাতে গিয়ে যে সন্ন্যাসী বলছেন ‘আপনি কি করে সন্ন্যাসী হয়ে একটি যুবতী মেয়েকে কাঁধে তুলে নিলেন’। সেই মহারাজ কিন্তু ভুল কিছু বলছেন না, তাঁকে ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। ওঁর মনে সব সময় এই কাজটা খোঁচা দিচ্ছে। এই মহারাজ হয়তো এখনো অতটা অগ্রসর হননি যতটা নারীকে পার করে দিয়েছেন যেই সন্ন্যাসী তাঁর থেকে। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে হয়তো গীতার সেই শ্লোকটা নাড়া দিচ্ছে *যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবতরো জনঃ*, শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যে রকম আচরণ করেন বাকীরা সেই রকমই আচরণ অনুকরণ করবে। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহী এক আনা ত্যাগ করবে। সাধারণ মানুষ সবাই তো আর নারীকে কাঁধে নেওয়ার মূল্যবোধটা ধরতে পারবে না, তাঁরা সন্ন্যাসীর আচরণটাই দেখবে। এগুলো সত্যিই খুব সমস্যা। ব্যক্তি স্তরের সাথে সামাজিক স্তরের যে দ্বন্দ্ব সেটা চিরদিন থাকবে, আর যতই দ্বন্দ্ব থাকুক আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই জীবনটা সম্পূর্ণ রূপে আমার নিজের। একটা সময় মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু কেউই কিছু নয়, তোমার ধর্ম পথই তোমার ধর্ম পথ। আপনার অন্তরাত্মা যদি বলে যা করতে যাচ্ছ এটাই ঠিক, তখন ওই কাজটাই করতে হবে, যখন অন্তরাত্মা বলছেন এই কাজটা করো না, তখন কোন ভাবেই সেই কাজ করতে নেই। কিন্তু এই কথা কাদের বলা হচ্ছে? যাঁরা ধর্মপথে চলে শুদ্ধি লাভ করে নিজের জীবনকে উন্নীত করতে চাইছে তাদের বলা হচ্ছে, পাড়ার চ্যাংড়া, লোফার ছেলেরদের বলা হচ্ছে না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সৎ সঙ্গ করে, ধর্মার্থ বুঝে নিয়ে ধর্ম পথে চলতে চলতে মন একেবারে শুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। ওই শুদ্ধ মনই অন্তরাত্মা কি চাইছেন বুঝতে পারে, তার আগে নয়। তখন সে বলতে পারে আমার অন্তরাত্মা চাইছে এটা আমি করি, তাই আমি করছি। কারণ আমি জানি কোনটা সৎ কোনটা অসৎ, আমি জানি কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য। সমাজের দৃষ্টিতে যেটা পাপকর্ম, আমি জেনে বুঝে সেই পাপকর্মই করছি, কারণ এই কর্মে আমার অন্তরাত্মার সায় আছে।

কিন্তু সবাই এই কাজ করতে পারবে না, কারণ তাদের মন এখনও শুদ্ধ নয়। যাদের মন শুদ্ধ নয় তারাও কোন পাপ কাজ নিজের স্বার্থে করার পর চালাকি করে বলবে আমার অন্তরাত্মা এটা চাইছে। এটা একেবারে নিশ্চিত যে, যাঁর অন্তরাত্মা একেবারে শুদ্ধ, তিনি সমাজের দৃষ্টিতে যেটা পাপকর্ম, সেই পাপকর্মও যদি করেন এবং তিনি ভেতর থেকেও একেবারে পরিস্কার, তখন দেখা যাবে ওই কর্ম তাঁকে কোন রকম বিপাকে ফেলবে না। কারণ ওনার উদ্দেশ্যটা মহৎ। উদ্দেশ্য আর কার্য দুটো আলাদা জিনিষ, এই দুটোকে আমরা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলি। একটা হল কার্য আর তার পেছনে যে প্রেরণা সেটাই উদ্দেশ্য। যে কোন কার্যের পেছনে থাকে একটা প্রেরণা। আমার উদ্দেশ্য হল প্রচুর টাকা উপার্জন করা। প্রচুর টাকা হোক এই প্রেরণা আমাকে নানান রকম কার্যের মধ্যে ঠেলবে, ব্যবসা বাণিজ্য করা, অত্যাধিক পরিশ্রম করা, স্যাগলিং করা – এগুলো সবই কার্য। এই কার্যের প্রেরণা হল প্রচুর টাকা। কিন্তু যে মনে করছে এইভাবে টাকার পেছনে লাগাম ছাড়া দৌড়ানটা একেবারেই ঠিক নয়। এরপর সে যদি সৎ ভাবে টাকা উপার্জন করে তাতেও সে কিছু কুফল পাবে, কিন্তু অসৎ ভাবে যদি উপার্জন করে তখন মারাত্মক কুফল পাবে, এই কুফল পাওয়া থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। যতই সে বলুক আমার অন্তরাত্মা এতে সায় দিচ্ছে, আমি নিজে ঠিক আছি কোন ভাবেই সে বাঁচবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রেরিত যে কর্মগুলো সম্পাদন করা হয় ওই কর্ম কিন্তু তাকে ছাড়বে না। যখন নিষ্কাম ভাবে

কারুর মঙ্গলের জন্য, কিংবা অজান্তায় কোন খারাপ কর্ম করে দিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন যখন দেখলেন কৌরবরা বেঁচে থাকলে ধর্ম স্থাপন করা যাবে না, তখন তিনি ছল বল কৌশলে যুদ্ধ করে কৌরবদের শেষ করে দিলেন, এই নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কোন অনুশোচনা নেই। গান্ধারী যখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিচ্ছেন তখনও তিনি নির্বিকার। অন্তরাত্মাকে প্রসন্ন করতে গিয়ে কোন পাপকর্ম করার পর যদি কারুর অভিশাপও বর্ষিত হয় সেটাও সে গায়ে মাখবে না। দুটো স্তরে এই মূল্যবোধের তাৎপর্য বিবেচিত হয়, একটা সাধারণ অবস্থায় আর একটা উচ্চ অবস্থায়। অন্তরাত্মার কথা যেটা বলা হচ্ছে এটা উচ্চ অবস্থার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, এটা সাধারণ অবস্থার জন্য নয়। সাধারণ লোকদের জন্য পরিষ্কার – এটা করবে, এটা করবে না।

এর থেকেও একটা বাজে অবস্থা আছে। আমার নিজেরই একটা সমস্যা এসে গেছে। মহাভারতে আপৎধর্মের আলোচনায় বিশ্বামিত্রের কাহিনীতে দেখান হচ্ছে, দুর্ভিক্ষে বিশ্বামিত্রের এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে তাঁকে চণ্ডালের বাড়ি থেকে মরা কুকুরের মাংস চুরি করে খেতে হচ্ছে। সেখানে তাঁর অন্তরাত্মা বলছেন তুমি এটাই দেবতাদের নিবেদন করে খেয়ে নাও কোন অসুবিধা নেই। এই কর্মের যে একটা পাপ হবে সেটা তাঁর অবশ্যই লাগবে। কিন্তু পাপটা ওই ভাবে লাগবে না, যেটা স্বার্থবশতঃ বা লোভে পরে পাপ করলে লাগবে। এখন কোন সন্ন্যাসীর ইচ্ছে হল একটু গাঁজা খেয়ে দেখলে হয় কেমন লাগে। গাঁজা খাওয়া, মদ খাওয়া এগুলো ঠিক নয়, বিশেষ করে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে তো একেবারেই ঠিক নয়। সন্ন্যাসীর মনে ইচ্ছা জেগেছে সে চাইলে মনের জোরে সেই ইচ্ছাটাকে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মন যদি একেবারে নাছোরবান্দা হয়ে যায়, আমাকে একবার খেতেই হবে। তখন সে কি করবে? তখন সে যদি দেখে তার অন্তরাত্মা বলছেন ঠিক আছে একবার খেয়ে দেখে নাও, দেখে নিয়ে ওইখানেই ইতি করে বেরিয়ে এস। খেলে পাপ লাগবে ঠিকই, কিন্তু না খেলে আরও তার বিপদ হত, মাথাটাই হয়তো খারাপ হয়ে যেত, মাথার মধ্যে রাতদিন বাঁ বাঁ করত। সেটাই বলছেন – অতটুকু করে নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এস। কিন্তু মূল কথা হল, যে জিনিষটা করলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হন সেই কাজটাই করবে। কারণ একজন গৃহস্থ লোক কোন কারণে চুরি করে নিল বা ঘুষ নিয়ে নিল, তখনকার মত তার একটা কাজ হয়তো মিটে গেল, কিন্তু তারপর তার অন্তরাত্মা তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলবে। সেইজন্য একবার হয়ে গেছে, বলে দাও আর করবো না, তখন ব্যাপারটা ওইখানেই মিটে যাবে। আরেকটি শ্লোকে বলছেন –

মানুষ নিজের দুঃখকে নিজেই কত ভাবে ডেকে আনে

অধার্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।

হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে।।৪/১৭০

এই জগতে সাংসারিক লোকেরা কি কি ভাবে নিজেদের দুঃখকে ডেকে নিয়ে আসে – অধার্মিকো নরো। অধার্মিক কারা? যার সম্পদ হল অনৃতম্, মিথ্যা কথা বলাই যার ভরসা, সব সময় মিথ্যা কথাই বলছে। উকিলরা সব সময় মিথ্যা কথা বলছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে উৎকোচ নেওয়া এদের সম্পদই অনৃতম্, এরাই অধার্মিক। হিংসাতরশ্চ, হিংসা বলতে বোঝায় পর কাউকে শারীরিক ও মানসিক পীড়া বা কষ্ট দেওয়া। অপরের ভালো কিছু দেখে মনে হিংসা হচ্ছে, কাউকে খোঁট মেরে কথা বলে আঘাত দেওয়া এগুলো সবই হিংসা বৃত্তি। এর মধ্যে দুটোকে হিংসা বৃত্তির মধ্যে গণ্য করা হয়, কারুর আড়ালে তার নিন্দা করা আবার সামনে থেকেও অপরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করা সবটাই হিংসা বৃত্তির মধ্যে পড়ছে। নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে, এদের নিত্য অশান্তি লেগেই থাকে, ইহলোকে এরা কখনো সুখ লাভ করতে পারে না। স্মৃতিতে ঘুরে ঘুরে বলছেন কাদের অশান্তি হয়, এর আগেও বলছিলেন, যারা জপ-ধ্যান করে না, যাদের ভেতর বাইরে শুদ্ধি নেই তারা কখন শান্তিতে থাকতে পারেনা। আর যারা মিথ্যা কথা, ঘুষ নেয়, অপরকে কষ্ট দেয় এদের জীবনে শান্তি কখনই আসবে না। আমরা ভাবি প্রচুর টাকা রোজগার করলে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করা যাবে, প্রচুর জামা-কাপড় পড়া যাবে। কিন্তু আমাদের সবারই পেট তো একটাই, খেলে তো একটা পেটই ভরবে দু পেট তো কেউ খেতে পারেনা। আর গায়ের উপর একটাই শাড়ি চাপাতে পারবে, সখ করেও কেউ গায়ে দুটো শাড়ি চাপাতে যাবে

না। তাও মানুষ টাকার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে, যেটুকু আয় করছে তাও আবার ভবিষ্যতের জন্য শুধু জমিয়েই যাচ্ছে, টাকা জমিয়ে যাচ্ছে, জামা-কাপড় জমিয়ে যাচ্ছে, গয়না-গাঁটি জমিয়েই যাচ্ছে। সৎ ভাবে উপার্জন করে জমাচ্ছে তাও বোঝা যায়, একটা ভালো কাজের জন্য জমাচ্ছে তাও ভালো, যারা অসৎ ভাবে আয় করে জমিয়ে যাচ্ছে তাদের যে কি দুরবস্থা বোঝা যায় না। মন্ত্রী, নেতা, আমলাদের নামে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কত রকমের খবর বেরোচ্ছে। এই দেখাচ্ছে এদের কেউ কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক, কোন কোন নেতাদের এতই ক্ষমতা যে তারা যা বলবে সেটাই সেই রাজ্যের প্রশাসনের শেষ কথা। আবার কিছু দিন পরে খবরের কাগজে বেরোচ্ছে অমুক নেতার বাড়িতে সিবিআই হানা দিয়ে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করেছে, তাদের কেউ এখন জেলে, কারুর আর কোন ক্ষমতাই নেই। এটাকেই এরা বলে সুখ। এইভাবে দুর্নীতির দ্বারা উপার্জিত টাকা থাকে না আর সে টাকা দিয়ে কোন দিন মনের শান্তিও আসে না।

ধর্ম ও অধর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।

শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুমূলানি কৃন্ততি। ৪/১৭২

ফল দানের ব্যাপারে অধর্ম ও ধর্ম গুরু প্রতিপালন করার মত। গুরু পালন করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সেই গুরু দুধ দিতে শুরু করে না। অধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, অধর্ম করলে তৎকাল ফল দেবে না, ধীরে ধীরে অধর্ম ফল দেয়। আর যখন ফল দিতে শুরু করবে তখন অধর্মের কর্তাকে জড় শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়। অধর্ম করা শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গেই যে ফল দেবে তা নয়, ধীরে ধীরে শেকড়টাকে কাটতে থাকে। আপনি আজকে চুরি করে কালকেই তার ফল পাবেন তা কখনই হবে না। কিন্তু অধর্মের ফল কর্তাকে কখনই ছাড়বে না।

বিদেশে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপের লোকেরা খুব ডিসিপ্লিন। মজার ব্যাপার হল বিদেশীরা ভারতকে আবার খুব গালাগাল দেয়, ভারতের লোকেরা ডিসিপ্লিন নয়, নিয়ম মানে না, চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে ইত্যাদি। মিথ্যা কথা বলে না আর চুরি করে না মাত্র দুই শ্রেণীর লোক যারা একেবারে পশুস্তরে আছে তারা কখন মিথ্যা কথা বলে না। যার জন্য দেখা যায় যে কোন দেশের আদিবাসী উপজাতিদের মিথ্যা কথা বলতে দেখা যায় না। মিথ্যা কথা বলে না মানে, তারা বলতে পারে না, তাদের মস্তিষ্ক মিথ্যা কথা বলার মত উন্নত হয়নি। আর যিনি পরমহংস তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। এই দুই শ্রেণীর বাইরে সবাই কিছু না কিছু মিথ্যা কথা বলবে, চুরি করবে। আমরা সবাই গোলমাল করি, আর আমাদের সবারই গোলমাল করার ক্ষমতা আছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা মিথ্যা কথা বলে না তার কারণ এরা এখনো বর্বর জাতি, সবে জংলী থেকে উপরে উঠছে। যে কটি প্রাচীন সভ্যতা আছে সেখানকার লোকেরা মিথ্যা কথা বলবেই, আইন ভাঙবেই। ভারতের লোকেরা তাই করে, চীনের লোকেরা তাই করে, গ্রীস দেশের লোকেরা তাই করে, ইরানীয়ানরা তাই করবে। কারণ এই সব প্রাচীন সভ্যতার উপর দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রচুর ঝড়-ঝাপ্টা গেছে। এখন যে নতুন নতুন সভ্যতা তৈরী হচ্ছে এরা তো সবে জন্মেছে, ঝড়-ঝাপ্টা তো দেখেইনি। একটা বিন লাদেন টুইন টাওয়ার উড়িয়ে দিতেই আমেরিকা সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভারতের বৃকে সাত আট হাজার বছর ধরে এর থেকেও কত ভয়ঙ্কর ঝড়-ঝাপ্টা গেছে, প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর কিছু না কিছু ঝড় লেগেই থাকছে। প্রাচীন সভ্যতা হল বুড়ো মানুষের মত, বুড়ো হলে তার শক্তি কমে যায়। শক্তি যখন কমে যায় তখন অনেক কিছু তাকে বুদ্ধি দিয়ে সামলাতে হয়। তারা জানে আগে নিজেকে বাঁচতে হবে। আমেরিকাতে যারা একটা বোমা মেরেছে তারাই ভারতে প্রতি বছর বোমা মেরে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও ভারত ঘাবড়ে যায়নি। ভারত অনেক কিছু দেখেছে, ভারত জানে এরা অধর্ম করছে। কিন্তু অধর্ম করে কেউ পার পেয়ে যাবে না, হ্যাঁ এখন কিছু হচ্ছে না ঠিকই, অধর্মের ফল পেতে সময় একটু লাগবে কেউই বাঁচবে না। আর যারা ধর্মকে আশ্রয় করে আছে, শত ঝড়-ঝাপ্টাতেও ধৈর্য হারাচ্ছে না, তারা জানে আমার উপর যা ঝড় আসছে আসতে দাও, এই ঝড় একদিন পেরিয়ে যাবে কারণ যারা মিথ্যা কথা বলছে, চালাকি করছে করতে দাও, এই জিনিষ বেশি দিন চলবে না। আর যাই হোক

ধর্মের দিক দিয়ে তাদের তো কেউ মারতে পারবে না। যখন ভারতের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করেছে তখন অধর্মকে আশ্রয় করেই অত্যাচার করেছে, ইংরেজরাও অধর্ম দিয়েই ভারতকে লুণ্ঠ করেছে। ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে, মহম্মদ গজনী, মহম্মদ ঘোরী থেকে শুরু করে ইংরেজরা যখন থেকে ভারতে এসেছে শুরু থেকে সবাই ভারতকে অধর্ম দিয়ে লুণ্ঠ, জখম, অত্যাচার করে গেছে। আজ ইংরেজদের বসতভূমি ইংল্যান্ড কোথায় এসে পৌঁছেছে। তাদের নাকি সূর্য অস্ত যেত না, আর আজ কখন সূর্য ওঠে আর অস্ত যায় বোঝাই যায় না। ভারত যেমন ছিল তেমনই আছে। অন্য দিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ত্রাসী সমস্যায় জর্জরিত। এটাই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, অধর্ম সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয় না। কি রকম ফল দেয়? গরুর মত। আপনি একটা বাছুর কিনে নিয়ে গেলেন। আজকে বাছুর কিনলেন আর কাল থেকেই গরু দুধ দিতে শুরু করবে তাতো হবে না। তার পরের শ্লোকে বলছেন –

যদি নাতুনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তমু।

ন ত্বেব তু ক্রুরতোহধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ।।৪/১৭৩

শুধু তাই নয়, অধর্মের ফল যদি তুমি নিজে না পাও তাহলে তোমার সন্তান তার ফল পাবেই। আর কোন কারণে সন্তান যদি তোমার অধর্মের ফল না পায় তোমার পৌত্র পাবেই পাবে। তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে অধর্মের ফল প্রসব করবেই। কোন অবস্থাতেই অধর্ম কর্ম নিষ্ফল যাবে না। কোথায় ফল দেবে? ওই পরিবারেই দেবে – তুমি যদি না পাও তোমার ছেলে পাবে, ছেলে যদি কোন ভাবে না পায় তাহলে তোমার নাতি পাবেই পাবে, আর ওখানেই খেলা শেষ। এটা বলছেন না যে তোমার বংশে কোন এক সময়ে গিয়ে লাগবে, তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে এর খেলা শেষ হয়ে যাবে। অধর্মের ফলের কথা বলার পর বলছেন –

পরিত্যাজেদর্শকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।

ধর্মধ্বংস্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ।।৪/১৭৬

ধর্ম বিরোধী অর্থ ও কামের চেষ্টা কখন করবে না, চেষ্টা করা দূরে থাক কামনাও করবে না। এখানে বলতে চাইছেন, সংসারী নিশ্চয়ই অর্থ সঞ্চয় করবে কিন্তু অন্যায় কাজ করে, অধর্ম করে অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি সংসারী ভোগ নিশ্চয়ই করবে কিন্তু অধর্মের দ্বারা আর অন্যায় ভাবে কোন ধরনের ভোগ করবে না। আবার কিছু কিছু ধর্ম কার্য আছে যেটা করলে পরে দুঃখ দেবে, এই ধরনের ধর্ম কার্যও করবে না। আর শেষে বলছেন, যে ধর্ম কার্য লোক নিন্দিত সেই ধর্ম কার্যও করবে না।

এই শ্লোকে তিন ধরনের কাজ করতে নিষেধ করা হল – প্রথম হল অর্থ ও কামের জন্য যেটা ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ সেটা কখনই করবে না। দ্বিতীয় যে কার্যটা ধর্ম সম্মত অথচ ভবিষ্যতে দুঃখ দেবে সেই কার্যও করবে না। আর তৃতীয় যে ধর্ম কার্য লোক নিন্দিত সেই কার্যটাও করবে না। ব্যাখ্যাকাররা এখানে ব্যাখ্যা করছেন – অর্থের ব্যাপারে বলছেন – চুরি করা, ঘুষ নেওয়া, ডাকাতি করা এগুলো অধর্ম মূলক কর্ম, এইভাবে অর্থ সঞ্চয় কখনই করবে না। কামের ব্যাপারে বলছেন – গৃহস্থ যদি কোন যজ্ঞ করার সঙ্কল্প করে তাহলে যজ্ঞ যেদিন হবে তার আগের দিন সেই গৃহস্থ যেন তার স্ত্রীর সঙ্গ না করে। যদিও ধর্ম পথেই সঙ্গ করা হচ্ছে কিন্তু যেহেতু শুভ কর্মের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাই আগের দিন থেকে তাকে পবিত্র ভাবে থাকতে হবে। আর অন্যান্য কামের ব্যাপারে, যেমন পরজী সঙ্গ করা ইত্যাদি এগুলোর তো কোন প্রশ্নই নেই।

দ্বিতীয় যেটা বলা হয়েছে যে ধর্মকার্য ভবিষ্যতে দুঃখ দেবে সেই ব্যাপারে ব্যাখ্যাকাররা উপমা দিচ্ছেন – একজন গৃহস্থের স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র আছে অর্থাৎ তার উপর অনেকে নির্ভর করে আছে। মাঝখান থেকে সেই গৃহস্থ সর্বস্ব দান করে দিল। সর্বস্ব দানতো মহাদান আর শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, ধর্মকার্যই করছে কিন্তু সে তার পরিবারকে ভবিষ্যতে এক কঠিন সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিল। সব সম্পত্তি যদি কেউ দান করে দেয় তাহলে আগামীকাল খাবে কি! এই ধরনের ধর্মকার্য করতে নিষেধ করা হচ্ছে। তুমি ধর্মকার্যই করছ এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাকে দুঃখ দেবে। এই ধর্মকার্য তোমাকে সুখ দেবে না।

তৃতীয় হল লোকনিন্দিত ধর্মকার্য – যেমন তন্ত্রে পঞ্চমকার সাধনের কথা বলা আছে, স্ত্রীকে নিয়ে সাধনার কথা বলা আছে। এগুলো সবই ধর্মকার্য কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ধরনের সাধনা করতে নেই কারণ এগুলো লোকনিন্দিত। তার সাথে ব্যাখ্যাকাররা উপমাতে যদিও বলছেন বৈদিক যুগে গোবধ চলত, কিন্তু বৈদিক যুগে গোবধ ছিল এনারা এটা কোথায় পেলেন জানা নেই কারণ উপনিষদাদিতে কোথাও এই ধরনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাই হোক এনারা বলছেন বৈদিক যুগে গোবধ ছিল কিন্তু কলি যুগে গোবধ চলবে না। তার সাথে এনারা আরেকটা উপমা দিচ্ছেন নিয়োগ বিধি। আগেকার দিনে কোন স্ত্রীর যদি সন্তানাদি না হত তখন নিজের আত্মীয় পরিবারের কোন পুরুষের দ্বারা সন্তানোৎপত্তির ব্যবস্থা করা হত। এই ধরনের নিয়োগ বিধি এখন নিষেধ, লোকনিন্দিত। কিন্তু এই নিয়োগ বিধিই বর্তমান যুগে অন্য ভাবে ঘুরে এসে গেছে, যেমন টেস্ট টিউব বিবি, স্পার্ম ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। বলছেন যে, নিয়োগ বিধিটা তখন ধর্মকার্য ছিল, যেখানে পুরুষকে ভাড়াতে নিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু কলি যুগে এই ধরনের ধর্মকার্য চলে না। কিছু আগে আমরা এক সন্ন্যাসীর কথা বললাম, যে এক অসুস্থ মহিলাকে নিজের কাঁধে করে নদী পার করে দিল, এটা ধর্মকার্য কিন্তু লোকনিন্দিত, এই ধরনের লোকনিন্দিত কার্য করতে নেই। আবার অনেকে বলতে পারেন আমার অন্তরাত্মা বলছে এটা করতে। এই কারণে মূল্যবোধের ব্যাপারটা খুব জটিল। সহজেই কোন কিছুর সমাধান করে দিয়ে সহজিকরণ করা যায় না। এক জায়গায় বলছেন তোমার অন্তরাত্মা যদি বলে তাহলে তুমি করতে পারো, আবার অন্য জায়গায় বলছেন এই জিনিষগুলো করবে না। সেইজন্য শেষে গিয়ে দেখা যায় মূল্যবোধের পরিভাষা ব্যক্তি বিশেষে পাল্টে যায়, সার্বজনীন মূল্যবোধ বলে কিছু থাকে না। পরের শ্লোকে বলছেন –

শরীরের অঙ্গ দিয়ে যে কাজগুলো করতে নেই

ন পাণি-পাদ-চপলো ন নেত্র-চপলোহনজুঃ।

ন স্যাদ্ধাক্চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহ-কর্মধীঃ।।৪/১৭৭

এই শ্লোকে শরীরের কয়েকটি অঙ্গের দ্বারা কিছু জিনিষ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। হস্তচপল, যে দ্রব্য গ্রহণীয় নয় সেই দ্রব্যকে গ্রহণ করে নেওয়া। কোন অনুষ্ঠানে গেছে, খুব সুন্দর একটা ফুলদানি দেখেছে, সবার আড়ালে টুক করে ফুলদানিটা সরিয়ে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল, ইংরাজীতে একে বলে kleptomania। সাধারণতঃ বিরাট বড়লোকদের মধ্যে এই রোগটা দেখা যায়, এই রোগে চুরির অভ্যেস থাকে, যেখানে যা পাবে সেটাকেই পকেটে বা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবে, ওর কিন্তু সেই হুঁশও নেই যে আমি চুরি করছি। আবার কারুর বাড়িতে গিয়ে কোন ভালো জিনিষ দেখলেই বলবে, এটা কি সুন্দর! আমাকে দেবেন! তখন চেয়েই নেবে, এদের বলে হস্তচপল। এরপর হল পাদচপল, পা সব সময় চলছে, অকারণে ঘুরে বেড়াবে। তৃতীয় নেত্রচপল, চোখটা সব সময় নাচছে, বিশেষ করে কোন সুন্দরী নারীর দিকে বার বার চোখ চলে যাওয়া। এগুলো কখন করতে নেই। চতুর্থ বাক্চপল, অহেতুক ও অকারণে সবার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। তার সাথে বলছেন পরদ্রোহ, কারুর ভালো কিছু দেখলেই হিংসা করা। মনু অপরের প্রতি দ্রোহ অর্থাৎ হিংসাবাবকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন।

যে পথ অবলম্বন করলে কষ্ট কম হয়

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহঃ।

তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে।।৪/১৭৮

কোন কাজ করতে গেলে, কোন আচরণ করতে গেলে আমাদের অনেক সময় সংশয় উৎপন্ন হয়। কারণ অনেক সময় মনে হবে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। তখন আমরা কি করব? বলছেন, যে পথে তোমার পিতা গমন করেছেন, যে পথ তোমার পিতামহ অনুসরণ করে গেছেন সেই পথকে যদি তুমি অবলম্বন কর তাহলে তোমার কষ্টটা কম হবে, তোমার জীবনে দুঃখ কম আসবে। এর আগেও বলেছেন মহাজনরা যে পথে গমন করেছেন সেই পথকে অনুসরণ করাই নিরাপদ, মহাভারতে যেমন বলা হয়েছে মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। আসলে যে পথটা জানা পথ সেই পথে গেলে কষ্ট হয় না। আরেকটি শ্লোকে যেমন বলছেন –

কাদের সাথে বিবাদ করতে নেই

মাতাপিতৃভ্যাং যামীভ্রাত্ৰা পুত্রং ভার্যয়া।

দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ।।৪/১৮০

কাদের সঙ্গে বিবাদ করতে নেই বলছেন। মা, বাবা, যামী, যামী মানে নিজের বোন বা পুত্রবধু, কুলস্ত্রী, ভাই, সন্তান, নিজের স্ত্রী, নিজের কন্যা আর দাসবর্গ, মানে বাড়ির লোকের সঙ্গে সে যেই হোক এদের সাথে বিবাদ করতে নেই।

ছায়া স্তো দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।

তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্ঞরঃ সদা।।৪/১৮৫

বাড়িতে যে নিজের ভৃত্যবর্গ আছে এরা তোমার নিজের ছায়া। এখনকার দিনে অনেক কিছু পালেট গেছে। কিন্তু আগেকার দিনে বংশ পরম্পরায় ভৃত্য একই বাড়িতে থাকত। তখনকার দিনে চাকর-বাকররা তাদের মালিককে আর তার পরিবারকে যেমন জানত তেমনি মালিকও তার ভৃত্যকে আর তার পরিবারকে জানত। এক অপরের মূলের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তার থেকে আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আগেকার দিনে বাড়ির ভৃত্যদের নিজেদের পরিবারের সদস্য রূপেই গণ্য করা হত। এক সময় একটি ছোট্ট রাজপরিবারে একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল। একবার রাজবাড়ির একটি ছোট্ট আট নয় বছরের বাচ্চা ভৃত্যটিকে ‘তুই’ বলে সম্বোধন করেছিল। ছেলেটির বাবা তখন সারাক্ষণ তাকে বলেই যাচ্ছেন ‘তুমি ওকে তুই করে ডাকলে’? এতবার করে তার বাবা কথাটি বলতে শুরু করলেন যে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি জীবনে আর এই ভুল করবে না। মনু বলছেন, দাস হল তোমার ছায়া, দাস ছাড়া তোমার কোন কিছুই চলবে না। পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ যার উপর নির্ভর করে আছে তারা সেই পরিবারের ছায়া।

আর বলছেন, তোমার যে দুহিতা সে তো তোমার কৃপার পাত্র। একেই মেয়ে সন্তান, অসহায়, কদিন পর বিয়ে হয়ে গেলে নিজের বাপের বাড়ি, যেখানে বড় হয়েছে, খেলা করেছে, আবদার করেছে, দুষ্টুমি করেছে সেই বাড়ি ছেড়ে অন্য পরিবারে চলে যাবে। সত্যিই কত কষ্টের! সেইজন্য বলছেন, এরা যদি কোন কারণে কটু কথা বলে তোমাকে কোন কষ্ট বা আঘাত দিয়ে দেয় সেই কষ্ট বা আঘাতটা সহ্য করে নিতে হয়। দুটোর কারণ আলাদা – দাস হল তোমার ছায়া আর মেয়ে অসহায়। আগেকার দিনে বেশির ভাগ পরিবারে তাই দেখা যেত মেয়ের গায়ে বাবা মায়েরা কখন হাত তুলতেন না। যদিও অন্য দিক দিয়ে দাসরাও অসহায়। একবার একজন এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা বলছিলেন। ট্যাক্সিতে ওঠার পর তিনি ড্রাইভারের সাথে পরিচয় করতে গিয়ে দেখেছেন লোকটি এত ভদ্র যে কল্পনাই করা যায় না। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন ‘আপনি কতদিন যাবৎ ট্যাক্সি চালাচ্ছেন’? ‘গতকাল থেকে’। ড্রাইভারটি বলতেই উনি চমকে উঠেছেন ‘এত বয়সে ট্যাক্সি চালাতে কেন এলেন’? ড্রাইভারটি তখন তার ইতিহাস বলতে শুরু করল। ট্যাক্সি চালকটি এর আগে এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে কুড়ি বছর ধরে ড্রাইভারি করছিল। মালিকের মেয়েকে নিজের চোখের সামনে সে বড় হতে দেখেছে। এখন মেয়েটি আঠার উনিশ বছর হয়ে গেছে। একদিন মেয়েটি তাকে খুব অপমানসূচক কিছু কথা বলতে খুব অপমানিত বোধ করেছে। মালিককে গিয়ে বলতেই মালিক বলল ‘মেয়ে এখন বড় হয়েছে, কিছু বললে তো সহ্য করতেই হবে’। তখনই চোখের জল ফেলে চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি চালাচ্ছি। সত্যিই ভাবলে অবাক লাগে, যে লোকটি এত দিন ধরে কাজ করেছে তাকে তোমার মেয়ে অপমানসূচক কথা বলল তার জন্য মেয়েকে একটা ধমক দিতে পারলো না! এটাই মনু বলছেন, তোমার দাস হল তোমার ছায়া। এখন তার যে নতুন ড্রাইভার হবে তার কি রকম ব্যবহার হবে, চোর হবে না বদমাইস হবে কে বলবে! গৃহস্থরা আসলে নিজেদের যত চালাক ভাবে তার থেকে তারা অত্যন্ত মুখ্য হয়, যেখানে নজর দেওয়ার কথা সেখানে নজর দেবে না, যেখানে প্রয়োজন নেই সেইখানে নজর দেবে। এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন দাস তোমার ছায়া।

মনুস্মৃতিতে উপনিষদের প্রভাব

মনুস্মৃতির উপর উপনিষদের প্রভাব খুব বেশী নজরে আসে। আমাদের হিন্দু ধর্মের পরম্পরাতে দুটি ধারা খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় – একটি হল জ্ঞানমার্গ, উপনিষদ আমাদের এই জ্ঞানমার্গ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ধারাটিকে ভক্তি বা ভাগবত ধর্ম বলা হয়। জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই জিনিষটাকে জ্ঞানমার্গ আদৌ জানেও না। কিন্তু ভাগবত ধর্মে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া আর কারুর ইচ্ছাতে কিছু হতে পারে তারা মানবেই না, তাদের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু চলছে। আধ্যাত্মিকতায় তো দুটো জিনিষ কখনই হতে পারে না, হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু আছে তা নাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু হয় না। জ্ঞানমার্গীরা মনে করেন আমাদের ভেতরে যে শুদ্ধ আত্মা আছেন যিনি চৈতন্য স্বরূপ, সেই চৈতন্যের আলোতে আলোকিত হয়ে বুদ্ধি সব কাজকর্ম করছে। সেইজন্য আমরা যা কিছু করছি সেই চৈতন্য স্বরূপের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। জীবের ভেতরে সেই শুদ্ধ আত্মা, যিনি অন্তর্যামী রূপে সবার ভিতরে বিরাজ করছেন, তিনি যদি না থাকেন তাহলে জীব কিছুই করতে পারবে না। যা কিছু জগতে হচ্ছে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের জন্যই হচ্ছে। সেই শুদ্ধ আত্মা বা অন্তর্যামী এবং ভগবানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুটো একই। তার মানে সেই ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে, আমার নিজের যেটা হয় সেটাকে আমি মনে করছি আমার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। এটাকেই যখন সমষ্টি রূপে নেব তখন বলব ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে।

মনু জানেনই না ভগবান বলে কেউ আছে কিনা আর ভগবানের ইচ্ছা বলে কিছু হয় কিনা। মনুস্মৃতিতে কোথাও ‘ভগবানের ইচ্ছা’ এই শব্দ ধারে কাছে আসবে না। মনুর কাছে আমি আছি তুমি আছ আর আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের বোঝা আছে। মনু আবার পুনর্জন্মের প্রসঙ্গও বেশী আনছেন না, পুনর্জন্ম থাকতেও পারে। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে একজন জিজ্ঞেস করছে – মশাই! পুনর্জন্ম কি আছে? ঠাকুর এই প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে বলছেন, কে জানে বাপু, থাকলেও থাকতে পারে তবে অনেকে যখন বলেছেন তখন আছে। মনুও ঠিক এই ভাবে পুনর্জন্মকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। যদিও মনু পুনর্জন্মের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে বলছেন পুনর্জন্ম আছে, সরাসরি পুনর্জন্মকে কোথাও সামনে নিয়ে আসছেন না। তিনি মানছেন, তুমি জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত যা আছ আর এখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টা পরে রয়েছে এবং মৃত্যুর পরে কিছু হয়তো আছে, যদি থাকে তার একটা সুব্যবস্থা করে নেওয়া। এটা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে মনু আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করছেন মূলতঃ আমাদের এই জীবনের উপর।

মনুস্মৃতির সার কথা এই অধ্যায়ের ১৪৮ ও ১৪৯ নং শ্লোকে বলে দেওয়া হয়েছে। ১৪৮ নং শ্লোকে বলছেন বেদাভ্যাসেন, বেদাভ্যাস মানে মনুর কাছে গায়ত্রী জপ বা এখনকার দিনে যার যার ইষ্টমন্ত্রের জপ। সর্বদা জপ করতে হবে, জপের ব্যাপারে কোন ছাড়াছাড়ি নেই। দ্বিতীয় বাহ্যভ্যন্তর শৌচাদি অর্থাৎ সংস্কারাদি কার্য। তৃতীয় তপস্যা, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপন করা। এই তিনটে হল তোমার নিজের ব্যাপার, তোমাকে জপ-ধ্যান করতে হবে, বাহ্যভ্যন্তর শৌচ করতে হবে আর তপস্যা করতে হবে। এরপর তুমি যখন লোকসমাজে পরিবারে অপরের সাথে মেলামেশা করছ তখন যেন কারুর প্রতি দ্রোহ ভাব, নেতিমূলক মনোভাব না থাকে। এগুলো করলে তোমার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি স্মরণ করতে পারবে। অথচ মনু পুনর্জন্ম আছে কিনা কোথাও আলোচনা করছেন না। কিন্তু শ্রাদ্ধের আলোচনা যখন করছেন তখন তার মানে পরের জন্ম আছে। কিন্তু পরের জন্মে তুমি এই এই করবে এইসবের উপর আলোকপাত করছেন না। এরপর মনু বলছেন যেমনি তোমার পূর্ব জন্মের স্মৃতি আসবে তখন থেকে ব্রহ্মাভ্যাসের দিকে তোমার মন যাবে। আসলে পূর্বজন্মের স্মৃতি যখনই কারুর ফিরে আসে তখনই তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটা তীব্র ভাবে জেগে যায়, বাংলায় বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আমি ওই ওই জীবনে এত মার খেয়েছি! মাগো! আবার আমাকে এই কুকুর বেড়াল হয়ে জন্ম নিতে হতে পারে! আর না! আর না! এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি!

কিন্তু এই জীবনেই আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে কত মার খেয়েছি। কিন্তু এত মার খেয়েও তো আমাদের হুঁশ আসে না। ঠাকুর বলছেন, উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোয় কিন্তু তবুও

উট কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়তে চায় না। মানুষও তাই, মার খাচ্ছে তবুও সে ছাড়তে পারছে না, বলছে – ভালোবাসাটাই তো জীবনের উদ্দেশ্য। ভালোবাসা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তার সাথে রক্তারক্তিও আছে। এই রক্তারক্তিটা যে জীবনে আছে এটাকে বোঝার জন্য দরকার – বেদাভ্যাস, শৌচ আর তপস্যা। আর তার সাথে অদ্রোহ। এগুলো অভ্যাস করলে মন পরিষ্কার হয়ে একেবারে পবিত্র হয়ে যায়। মন পবিত্র হলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়, জিনিষটা যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি দেখায়। যেমন রসগোল্লা মিষ্টি হয়, বাচ্চারা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে তাদের কাছে রসগোল্লা অমৃত। কিন্তু একজন ডায়েবেটিকস্ রুগীর কাছে রসগোল্লা বিষতুল্য। আমি আমার ভাবকে যখন রসগোল্লার উপর আরোপ করে দিচ্ছি তখন রসগোল্লা অমৃতের মত অথবা বিষের মত হয়ে যায়। কিন্তু মিষ্টি তো মিষ্টিই। এটাকে বলে objective reality। মানে জিনিষটা আছে, ব্যস্ আর কিছু না। গ্রীষ্মের রোদে বালসা পোড়া হয়ে বাড়ি এসে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে প্রাণটা জুড়িয়ে যাবে, আর কনকনে ঠাণ্ডায় শীতকালে ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালতে পারছি না। জল সেই জল, কিন্তু জলের প্রতি আমার প্রতিক্রিয়াটা পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে।

এই জগৎটা একটা আমড়া, আমড়াতে আঁটি আর চামড়াই সার। ঠাকুর বলছেন খেলে আবার অল্পশূল। এই জগৎটা তাই, কিছু নেই এই জগতে। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যেও বলছেন এই সংসারে সুখের গন্ধের লেশটুকও নেই। অথচ আমরা সুখের সন্ধানে দৌড়েই চলেছি। শেষে যখন মার খাচ্ছি তখন বলছি কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে। এই ভাবটা বার বার মনের মধ্যে আনতে বলছেন। এই যে বোধ এই জগতে কিছু নেই, সুখের আনন্দ যেটা আসছে সেটা আমাদের ভেতরের প্রতিক্রিয়া মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। আমড়া বলতেই মুখ থেকে জল গড়াচ্ছে। আমড়া তো মুখের ভেতরে নেই তাহলে জল কোথা থেকে আসছে! আমার ধারে কাছে আচার নেই কিন্তু আচারের নাম শুনতেই মুখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করে। আমাদের মন আচারকে নিয়ে আসছে। ঠিক তেমনি যখন জপ-ধ্যান অর্থাৎ বেদাভ্যাস করা হচ্ছে, বাইরে ভেতরে শৌচ করছে, তপস্যা করছে, সবার প্রতি অদ্রোহ আর তার সাথে ভদ্রং ভদ্রং সব কিছুতে ভালো ভালো বলে প্রশংসা করা হচ্ছে, মানে কোন কিছুতে আকর্ষণ নেই বিকর্ষণ নেই তখন প্রত্যেকটি জিনিষ যেমনটি আছে তেমনটি দেখতে পারে। তখন বুঝতে পারে জগতে কিছুই তো নেই, কার পেছনে ছুটবো আর কিসের জন্যই বা ছুটে মরতে যাব। অন্য দিকে কার থেকেই বা পালাতে চাইছি আর কেনই বা পালাতে যাব। তখন তার ব্রহ্মাভ্যাসের দিকে মন যায়। ব্রহ্মাভ্যাসের দিকে যখন মন যায় তখন একটা সময় সেই জ্ঞানটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই জ্ঞান যখন উদ্ভাসিত হয় তখনই হয় পরমানন্দ প্রাপ্তি। এটাই মনুর মূল বক্তব্য, তার মানে মনুর কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছার কোন স্থান নেই। মনুর কাছে একটাই, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পরমানন্দ প্রাপ্তি যেটা কোন অবস্থাতেই পাল্টাবে না। এই উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত করার জন্য তোমাকে বেদাভ্যাস করতে হবে, আমাদের ভাষায় টানা জপ-ধ্যান করা, বাহ্যভাস্তুর শৌচ রাখতে হবে, মানে দেহশুদ্ধি, মনের শুদ্ধি, বাক্ শুদ্ধি, ব্যবহারে শুদ্ধি, আচারে শুদ্ধি, সব রকমের শুদ্ধির অনুশীলন কর, তপস্যা করতে হবে, মানে শরীর মনের একটু কৃচ্ছ সাধন করা, সবার প্রতি অদ্রোহ ভাব আনতে হবে আর তার সাথে ভদ্রং ভদ্রং, সবাইকে ভালো ভালো বলে যেতে হবে। এগুলো করতে করতে পূর্বজন্মের স্মরণ আসবে। যতক্ষণ পূর্বজন্মের স্মরণ না আসে ততক্ষণ কিন্তু ব্রহ্ম চিন্তন হয় না। মনু ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা একবারও বলছেন না, তাঁর কাছে একমাত্র গুরুত্ব হল নিজের চেষ্টা। যা কিছু হবে নিজের চেষ্টাতেই হবে। যে যতই বলুক ভগবানই শেষে নিয়ে যাবেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে ভগবান কোথাও নিয়ে যাননি। কাহিনীতেই এগুলো পাওয়া যাবে, কাহিনীগুলোও আবার বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাহিনী ব্যতিরেকে কিছু মহৎ জীবন আছে, যে জীবনকে কাহিনীর মাধ্যমে দেখান হয় হঠাৎ পরিবর্তন। কিন্তু তার মধ্যে যে কতটা সত্যি আছে, কতটা মশলা সংযুক্ত হয়েছে, কতটা কল্পিত আছে, এগুলো বোঝা সত্যিই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মনুর কাছে এই ধরনের কল্পনার কোন স্থানই নেই। মনুর কাছে পরিষ্কার – তুমি এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়েছ। কিন্তু এখন তুমি যে অবস্থায় আছ তাতে তুমি প্রচুর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছ। তোমাকে এই অবস্থা থেকে বেরোতে হবে। কিভাবে বেরোতে হবে? প্রচুর জপ-ধ্যান করতে হবে, শারীরিক ও মানসিক শৌচ পালন করতে হবে আর তপস্যা করতে হবে ও সবার প্রতি অদ্রোহ ভাব নিয়ে আসতে হবে। আগেকার দিনে

ব্রাহ্মণদের এটাই আদর্শ ছিল। এগুলোই ছিল ব্রাহ্মণ ধর্ম, এটাই ব্রহ্মধর্ম, এটাই জীবনের পথ, সেই কারণে ব্রাহ্মণদের এতো সম্মান করা হত। কিন্তু বাকি লোকেরা কি করবে? বেশীর ভাগ মানুষের মন কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে রয়েছে, নাম-যশের জন্য ছুটছে। আর যদি কোন কারণে স্থূল স্তরে এগুলো থেকে মন বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাও তাদের ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে না। একটা বয়সের পর যখন সব ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে যায়, কর্মক্ষমতা কমে আসে তখন স্বাভাবিক ভাবেই কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ থেকে মন সরে আসে। স্থূল স্তরে অনেকের এগুলো চলেও যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো তাদের ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে না। এই তিনটির পর সব থেকে বড় বিঘ্ন হল আলস্য। এই আলস্যটাই সবাইকে শেষ করে দেয়। কামিনী-কাঞ্চন, নাম ও যশ এই তিনটে সমস্যা আর আলস্য পায়ে ল্যাং মেরে মানুষকে ফেলে দেয়। আলস্য কি করে? কাজ-কর্ম থেকে একটু ফাঁকা পেলে খবরের কাগজ পড়ছে, নাটক-নভেল পড়ছে, টিভি দেখছে। আবার অনেকে আছেন জপ-ধ্যান না করে অনেক রকম শাস্ত্র পড়ে যাচ্ছেন, তিনি আবার বলছেন আমি তো স্বাধ্যায় করছি। স্বাধ্যায় কিছুই হচ্ছে না, মন এখানে অন ভাবে চালাকি করছে। মন যে কত রকমের বাঁদরামো করতে পারে কল্পনাই করা যায় না। এই ধরনের যত রকমের বিঘ্ন আছে ব্রাহ্মণরাও এই বিঘ্নের মধ্যে পড়ে যেতেন। ব্রাহ্মণরা নিজেরাও বুঝতে পারতেন না, সেইজন্য তাঁরাও ফেঁসে যেতেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর সংখ্যা এত কম হওয়ার মূল কারণ এটাই। আলস্য যদি আপনাকে ধরে নেয় তাহলে আপনি আর এই তিনটে করতে পারবেন না – বেদাভ্যাস, শৌচ আর তপস্যা। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। আলস্যকে যদি জয় করে নেওয়া যায় তারপর আবার ল্যাং মারতে আসবে ব্যাধি। অকারণে কোথা থেকে আজকে কোমর ব্যাথা, কাল হাতে ব্যাথা, পরশু পেটের গণ্ডগোল হতে শুরু করবে। যেই জপধ্যান করা ছেড়ে দেওয়া হবে তক্ষুণি সব ঠিক হয়ে যাবে। যোগশাস্ত্রেও পতঞ্জলী এই বিঘ্ন গুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর আবার জপ করতে বসলে শুভ, অশুভ কত রকমের চিন্তা আসতে শুরু করবে। সেইজন্য আধ্যাত্মিকতার প্রস্তুতি যত কম বয়সে নিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। যাদের বয়স হয়ে গেছে তার আজ থেকেই শুরু করুক, আজ থেকেই এক মাস যাবৎ পাঁচ মিনিট করেই জপ করতে বসুক, তারপর দশ মিনিট।

এই কারণে মনু কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার উপর কখনই ছাড়ছেন না। তিনি ইচ্ছা করলে জপ করিয়ে নেবেন, তিনি ইচ্ছে করলে সব বিঘ্ন দূর করে দেবেন – এই সব কথাতে মনু একেবারেই যাবেন না। মনুর কাছে এগুলো হল ফাঁকিবাজির ধর্ম। এই জিনিষটা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখা উচিত – হিন্দু ধর্মের ঠিক ঠিক পথ হল আত্মপ্রচেষ্টা বা পুরুষকার। শরণাগতির ভাব অনেক উচ্চ অবস্থার জন্য। প্রাথমিক স্তরের জন্য কখনই শরণাগতির ভাব হতে পারে না। প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ মানুষকে শরণাগতির কথা বলাও ঠিক নয়। প্রাথমিক অবস্থায় একমাত্র উপদেশ হল পুরুষকারকে অবলম্বন কর, খুব পরিশ্রম কর, দৈবের উপর কখনই নির্ভর করে থাকবে না। কথামতে ঠাকুর কতবার বলছেন – খাটো, সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই নেশা হয় না, তার জন্য তোমাকে সিদ্ধি আনতে হবে, সিদ্ধি বাটতে হবে, তারপর সিদ্ধি তৈরী করতে হবে, তৈরী করার পর এবারে পান করতে হবে তোমাকে নিজেকে। অন্য কেউ এসে খাইয়ে দেবে না। কিন্তু একটা অবস্থার পর মানুষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে দেখে সে একেবারে অসহায়। তখন তার জন্য শরণাগতির পথ। এরপর মনু দানের ব্যাপারে বলছেন। দানের ব্যাপারে বলতে গিয়ে মনু তিন প্রকার দান গ্রহিতার কথা বলছেন যাদের দান করলে দান কর্তার সব কিছু বিফলে যায় –

দানের প্রসঙ্গে মনুস্মৃতি

প্রথম হল যার বেদের জ্ঞান নেই, মুখ্য ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় বৈড়ালব্রতিক, যে ব্রাহ্মণ ধর্মের ধ্বজাই রেখেছে কিন্তু কোন রকম আচার-আচরণ করে না আর তৃতীয় হল বক্রব্রতিক, বকের মত ধ্যান করে যাচ্ছে আসলে নজর মাছের দিকে। বলছেন –

ত্রিষ্প্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যররজিতং ধনম্।

দাতুর্ভবত্যানর্থায় পরদ্রাদাতুরেব চ।৪/১৯৩

যথা প্লবনৌপলেন নিমজ্জত্যদকে তরন।
 তথা নিমজ্জতোহধস্তাদগ্জৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ।।৪/১৯৫
 ধর্মধ্বজী সদালুঙ্কৃষ্টাদিকৌ লোকদম্বকঃ।
 বৈড়ালব্রতিকো জ্যেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিসম্বকঃ।।৪/১৯৫

যারা এই তিন ধরণের ব্রাহ্মণকে তাদের ন্যায়ানুসারে উপার্জিত অর্থ বা ধন দান করে, এই তিন ধরণের ব্রাহ্মণ এদের সবারই পরলোক মহা অনর্থের কারণ হয় আর দাতা সহ এই চারজনই পাথরে বোঝাই নৌকার মত জলে ডুবে মরে। ১৯৫ শ্লোকে মনু বিশ্লেষণ করছে বৈড়ালব্রতিক কারা – যারা লোভী, মহা কপট, কপটতা করে সংসারের সবাইকে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে লোকদের বোকা বানাচ্ছে, হয়তো কাউকে বলছে আমি একটা বড় যজ্ঞ করতে যাচ্ছি আমাকে সাহায্য করুন, ইদানিং তো অনেকে ভুয়ো এনজিও খুলে সমাজসেবার নাম করে লোকেদের থেকে প্রচুর টাকা তুলছে। লোকেদের দেখাচ্ছে আমরা যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, মানুষের সেবা করতে যাচ্ছি। কিন্তু আদৌ এগুলো উদ্দেশ্য নয়। সমাজ সেবার নামে কোটি কোটি টাকা ডোনেশান থেকে তুলছে। সেখান থেকে লোক দেখানোর জন্য সামান্য কিছু খরচ করে বাকি টাকা সরিয়ে রাখে। এরা হল বৈড়ালব্রতিক, বাংলায় যাদের বলে বেড়ালতপস্বী। বেলুড় মঠের জন্য স্বামীজী নিয়ম করে গেছেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে দান নেওয়া হয়েছে দানের অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় হবে, শাকের কড়ি শাকে যাবে মাছের কড়ি মাছে যাবে, আর এই নিয়ম যেন পুরোপুরি পালন করা হয়। তা নাহলেই গোলমাল হবে।

হরিদ্বারের কঙ্কালে রামকৃষ্ণ মিশনের বড় হাসপাতাল আছে, উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিয়েই এই হাসপাতাল করা হয়েছিল। একবার এক সাধু চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিল। গুশ্রম্বা করার পর ভালো হয়ে গেছেন, কিন্তু কিছু খেতে চাইছিলেন না। কেন খেতে চাইছেন না খোঁজ নিতে গিয়ে মহারাজরা দেখেন সাধুটি কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সাধুটি বলছেন ‘আপনারা সাধুরা যে সেবা-গুশ্রম্বা করছেন দেখে আমার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, আর আমি কত মহাপাপী’। পরে বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে জানা গেল সাধুটি হরিদ্বারের কোন এক আশ্রমের মহন্ত ছিল। সাধুটি এমন কপট ছিল যে, আশ্রমের সাধুদের ঘিয়ের পুরি আর সবজী সাথে লাড্ডু খাওয়ার জন্য কোন ভক্ত মহন্তকে টাকা দিলে সাধুটি কায়দা করে ডালডার পুরি বানিয়ে টাকাটা বাঁচিয়ে নিজের জন্য রেখে দিত। সাধুটি কঙ্কাল আশ্রমের মহারাজদের কাছে নিজে বলছেন ‘আমি এই ধরণের কাজ করতাম। এখন ওরা মেরে আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর এখানে এসে আপনাদের এই নিঃস্বার্থ সেবার কাজ দেখে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না’। এটাই বৈড়ালব্রতিক, জগতকে দেখাচ্ছে এক রকম নিজে করছে অন্য রকম। এই ধরণের লোককে যদি কেউ টাকা দেয়, যে টাকা নিচ্ছে সেতো গেলই আর যে টাকা দিল সেও গেল। এরা খুব হিংসুকও হয়। লক্ষ্য রাখে, আমার পাশের আশ্রমে কত ভক্ত যাচ্ছে, কত বড়লোক ভক্ত যাচ্ছে। আর অপরের গুণ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

বক্রতী যারা তাদের দৃষ্টি সব সময় নীচুর দিকে। কোথা থেকে কায়দা করে কিছু হাতানো যায়। বক যেমন সব সময় নীচে মাছের দিকে মনটা ফেলে রাখে। নিজের জন্য কিছু আদায় করার সময় এরা খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। কিছু আছে তান্ত্রিকের মত সেজে হাড়গোড় নিয়ে বাড়িতে এসে এমন ভয় দেখাবে, আমাকে এই এই জিনিস দিতে হবে তা নাহলে তোমার ছেলে মরে যাবে। ধর্মভীরু মানুষ ভয়েতেই কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়। নিষ্ঠুর ছাড়াও এরা স্বভাবতই কপট, মিথ্যাচারী হবে। বক যেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখায় যেন কি গভীর ধ্যান করে যাচ্ছে, কোন ধ্যান-ফ্যান নেই মাছ এলেই ঘপাৎ করে ধরবে বলে ধ্যানের ভান করে আছে। এর পরে বলছেন, মানুষ যদি কতকগুলি গুণের অনুশীলন করে তাহলে তার কখন পতন হয় না –

যম-নিয়মের অনুশীলন

যমান্ সেবতে সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
 যমান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন।।৪/২০৪

আধ্যাত্মিক সাধনায় যম ও নিয়ম সবাইকে পালন করতে হবে। অষ্টাঙ্গ যোগে যম ও নিয়ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ। যম হল সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। অস্তেয় হল চুরি না করা আর অপরিগ্রহ মানে কারুর কাছ থেকে কিছু না নেওয়া। আর নিয়ম হল শৌচ, সন্তোষ, তপ, দান ও ঈশ্বরপ্রতিধান। শৌচ মানে স্নানাদি করা, দান করা আর ঈশ্বরপ্রতিধান মানে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা অর্থাৎ ঈশ্বরে শরণাগত হওয়া, সন্তোষ মানে সব কিছুতেই সন্তুষ্টির মনোভাব। এর সাথে আছে স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। এখানে বলছেন যিনি যমে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, মানে সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহের অনুশীলন না করে নিয়ম করেন তিনি কিন্তু পতিত হয়ে যাবেন। একজন চুরি করছে, ঘুষ নিচ্ছে, মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু অন্য দিকে সে স্বাধ্যায় করছে, দান করছে, খুব করে শৌচ করছে কিন্তু এগুলো করলে সে পতিত হয়ে যাবে। যম হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। একজন যদি শুধু যম অনুশীলন করে যাচ্ছে কিন্তু নিয়ম কিছুই করছে না, অর্থাৎ স্বাধ্যায় যদি নাও করে, দান যদি নাও করে, সন্তোষ যদি নাও থাকে তাহলেও কিন্তু সে অনেক মহৎ হয়ে যাবে। এই শ্লোকে মনু সাবধান করে দিচ্ছেন, তুমি যম ও নিয়ম দুটোই করবে কিন্তু এর মধ্যে যম হল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এরপর অন্ন খাওয়া নিয়ে বিরাট একটা তালিকা দিয়েছেন, কার কার অন্ন খাওয়া যাবে আর কার কার কোন অন্ন খাওয়া যাবে না। যেমন বলছেন –

অন্নের শুদ্ধি-অশুদ্ধি

মত্তদ্রুদাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।

কেশকীটাবপনম্নঞ্চ পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ।।৪/২০৭

যারা উন্মত্ত, মদাসক্ত, ক্রোধী আর ব্যাধিযুক্ত এদের অন্ন কখনই খাবে না। খাবারে যদি চুল বা পোকা পড়ে থাকে তখন সেই খাবার দুষ্ট খাদ্য রূপে পরিগণিত হয়ে যায়, ওই খাবার কখনই খেতে নেই। খাবারে যদি কেউ ইচ্ছাকৃত পা লাগায় তাহলেও সেই অন্ন খাওয়া যাবে না। অনিচ্ছাকৃত ভাবে লেগে যাওয়ার কথা বলছেন না। এরপর বলছেন যারা গোহত্যা করেছে, ভ্রূণহত্যা করেছে, ব্রাহ্মণহত্যাকারী, এদের অন্ন খাওয়া তো দূরের কথা এরা যদি অন্ন অবলোকনও করে থাকে সেই অন্ন খাবে না। রজস্বলা নারী যদি অন্ন স্পর্শ করে থাকে, কাক প্রভৃতি আমিষাশী পাখির ঠোকরানো ফল বা কোন খাবার এবং কুকুর যদি কোন খাবার স্পর্শ করে থাকে তাহলে এইসব খাবার খাবে না।

গবা চান্নমুপস্রাতং ঘৃষ্টান্নঞ্চ বিশেষতঃ।

গণান্নং গণিকান্নঞ্চ বিদুষা চ জুগুপ্সিতম্।।৪/২০৯

আবার বলছেন গরু যদি কোন খাবারের আশ্রাণ নিয়ে থাকে সেই খাবার খাবে না। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, যদি নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয় এই খাবারটা অমুকের জন্য, ওই খাবারটা আর খাবে না। অনেকে মিলে বস্তুর বাড়িতে গেছেন। সেখানে এক কাপ চা নিয়ে একজনকে দেওয়া হল। উনি বললেন আমি তো চা খাই না। এরপর সেই চায়ের কাপটা আপনাকে দেওয়া হল। মনু নিষেধ করছেন ওই কাপের চা তুমি খাবে না। আপনিও ওই চা কাউকে দেবেন না, বরঞ্চ কাপের চা'টা ফেলে দিন কিন্তু অন্য কাউকে দেবেন না। যখন কারুর জন্য নিমিত্ত করে অন্ন দেওয়া হল তখন সেই অন্নটা উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল। শুধু খাদ্যের ব্যাপারেই নয়, যে কোন দ্রব্য তা বস্তুই হোক আর অন্য কিছুই হোক যখন কারুর জন্য বাজার থেকে কিনে আনা হল তখন সেই দ্রব্যটা আর কাউকে দেওয়া উচিত হবে না। আপনি আপনার ছেলের জন্য কিছু একটা কিনেছেন, ছেলের এখন সেটা পছন্দ হল না। আপনি ভাবছেন এটাকে এখন কাকে দেওয়া যায়, ফেলে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আচ্ছা কোন মহারাজকে দিলে হয়। এই কাজ কখনই করতে নেই। এঁটো খাবার যেমন খেতে নেই, কাউকে দিতেও নেই, ঠিক তেমনি কোন জিনিষ যদি অপরের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়ে থাকে তখন সেটাও উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। অপরের নাম করে কোন খাবার বা দ্রব্য কখনই গ্রহণ করতে নেই, এতে গ্রহিতার ব্যক্তিত্বের, বিশেষ করে যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চ অবস্থায় যেতে চাইছেন তাঁদের ক্ষতি করে।

এরপর বলছেন বিদ্বান যদি কোন খাবারকে নিন্দিত সূচিত করে থাকেন তখন সেই খাবার খেতে নেই। ঠাকুর গল্প বলছেন, গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হয়ে আপনাদের আমড়ার চাটনি দেব? গ্রামের লোকরা বলছে, বাবুরা কি খেয়েছেন। বাবুরা যে কালে খেয়েছে তাহলে আমরাও খেতে পারি। বড়লোক বা বিদ্বানরা যদি খারাপ বলে থাকে তাহলে আর ওই খাবার খেতে নেই। যারা চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করে তাদের অন্ন কক্ষণ গ্রহণ করতে নেই। যারা গান-বাজনা করে উপার্জন করে তাদের অন্ন খেতে নিষেধ করা হচ্ছে। কৃপণের অন্ন, সুদখোরদের অন্ন খাবে না।

যদি সংস্কারপূর্বক অন্ন পরিবেশন না করা হয় তাহলে সেই অন্ন গ্রহণ করতে নেই। মাংস যদি দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ না করা হয়ে থাকে তবে সেই মাংস খেতে নেই। এগুলো সব শুনে রাখতে হয়। আসলে আমরা প্রথমেই আলোচনাতে বলেছিলাম মনুস্মৃতির সব কথা এখনকার দিনে পালন করতে যাওয়া উচিত নয়, তাহলে অনেক ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে, যাঁরাই আধ্যাত্মিক জীবন পালন করেন তাঁদের জীবনচর্চা আপনা থেকেই পাল্টে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে করতে মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য এসে যায়। সত্ত্বগুণী সাধু মাংস নিজে থেকেই আর খেতে পারবে না। মনু এই কথাগুলো তাঁদের জন্যই বলছেন যাঁদের মধ্যে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়ে গেছে আর যাঁদের এই চেতনা জাগ্রত করার ইচ্ছা জেগেছে। ধর্ম পথে বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে যোগও আছে আবার ভোগও আছে। বেশ কিছু দিন জপ-ধ্যান করলে রাজসিক খাওয়ার ইচ্ছাটা কমে যায়। পরিবারের কোন সদস্যের মন থেকে হয়তো মাংস খাওয়ার ইচ্ছাটা চলে গেল কিন্তু অন্য সদস্যদের খাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, তখন আবার অনেক সমস্যা হয়ে যায়। বাকিরা খাচ্ছে বলে এমন একটা পরিস্থিতি হবে যে আপনাকেও খেতে হচ্ছে, তখন আবার আপনার শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে।

আবার বলছেন, শত্রু, পতিত এদের অন্ন কখনই খেতে নেই। এইভাবে বিরাট একটা তালিকা দিয়ে যাচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মনুস্মৃতিকে যদি পুরোটা পালন করা হয় তাহলে লোকে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে তখনকার দিনে ব্রাহ্মণরা পুরোপুরি এগুলো পালন করতেন। যেমন একটা বলছেন, রাজার অন্ন যদি কেউ খায় তাহলে তার তেজ হরণ হয়ে যাবে। শূদ্রের অন্ন যদি কেউ খায় তাহলে ব্রহ্মবর্চস্ অর্থাৎ বেদবিদ্যার সামর্থ্য বা বেদবিদ্যা লাভের যে তেজ সেটা চলে যাবে। স্বর্ণকারের অন্ন যদি কেউ খায় তাহলে তার আয়ু হ্রাস হবে। চর্মকারের অন্ন খেলে যশ চলে যাবে। সবার অন্নের ক্ষেত্রে শুধু শুধু না না করে গেছেন, এখন তাহলে কার অন্ন খাবে নির্ধারণ করা খুব মুশকিল হয়ে যেত। ওই কারণে ব্রাহ্মণরা বিরক্ত হয়ে স্বপাক অন্ন খেতেন, নিজের রান্না নিজেই করে নিতেন। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং সেন্টারে এক সময় একজন খুব বিরাট পণ্ডিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তিনি তো বেলুড়ে থাকাকালীন কারুর অন্ন খেতেন না। শুধু ঠাকুরের ভোগের অন্ন থেকে তাঁকে একটু বেশী পরিমাণ অন্ন আরেকটু পায়স দেওয়া হত। এর বাইরে তিনি নিজে দুটো আতপ চাল সেদ্ধ করতেন, একটু ডাল আর একটা আলু সেদ্ধ করে খেতেন। ব্রাহ্মণরা কারুকে বিশ্বাস করতেন না। আর আমরা হয়তো বিশ্বাস করবো না, কিন্তু সত্যিকারের তেজ হরণ করে। কিছু দিন আগেও মঠের যাঁরা উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের মহারাজরা ছিলেন তাঁরা ট্রেনে যাতায়াতের সময় কিছুতেই ট্রেনের জিনিষ খেতেন না। ট্রেনে যারা খাবার পরিবেশন করে তাদের মধ্যে কি ধরনের লোক আছে কে জানতে যাচ্ছে। তার থেকে বরং দুই এক রাত না খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া মঙ্গল। আমরা তো সবাই না জেনেই খাচ্ছি, কিন্তু এতে তেজ হরণ হবেই। সেইজন্য গীতায় বলছেন যখনই কোন কিছুতে সন্দেহ বা সংশয় হবে তখন ওঁ তৎসৎ বলে দেবে। কিন্তু সব থেকে ভালো হল না খাওয়া। এরপর দান নিয়ে বলছেন।

বিভিন্ন দানের ফল

যারা জল দান করে তারা তৃপ্তি পায়। মাড়োয়ারীদের অনেক সেবা সংস্থা আছে যারা বিভিন্ন জায়গাতে লোকদের শুধু জল খাইয়ে যায়। যারা অন্ন দান করে তারা অক্ষয় সুখ পায়। আগেকার দিনে রাজারা অন্ন দান করত। যারা তিল দান করে তারা অভিলষিত সন্তান লাভ করে। আমাদের ঐতিহ্যে তিল দানের একটা বিরাট

মহাত্ম্য ছিল। ভাগবতাদিতে তিল দানের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। তিল থেকে যে তেল তৈরী হত সেই তেলে আগেকার দিনে বাতি জ্বালান হত। অনেক জায়গায় আবার বলা হয় তিল দান করলে পরের জন্মে চোখ ভালো পায়। মন্দিরাদিতে আগে তিলের প্রদীপ জ্বালান হত। এই রকম বিরাট লম্বা একটা তালিকা দিয়ে বলে যাচ্ছেন ভূমি দান করলে কি হয়, সুবর্ণ দান করলে কি পায় ইত্যাদি।

দানের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন, দানকর্তা যে ভাব নিয়ে দান করছে, পরের জন্মে সে সেই সুখটাই পায়। যেমন কেউ প্রচুর অন্ন দান করছেন, পরের জন্মে তাঁর অন্নের অভাব হবে না। তৃষ্ণার্ত মানুষ জল পান করে তৃপ্তি পায়, যে জল দান করছে তার সব সময় তৃপ্তি থাকে। আমি এই জীবনে যে জিনিষটা চাইছি, সেই জিনিষ অপরকে দান করলে, এটা নিশ্চিত যে ওই জিনিষটা আমার কাছে আসবে। ঠাকুরও বলছেন – কি জানো! আগের জন্মে দান টান করলে পরের জন্মে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে জিনিষটা দান করা হয়, সেই জিনিষটা তার প্রাপ্ত হয়। যেমন বলছেন, যারা গরীবদের বস্ত্র দান করে, পরের জন্মে তাদের কখনই বস্ত্রের অভাব হবে না। এখানে দুটো ব্যাপার আসছে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যেটা আমি দান করছি পরের জন্মে সত্যিই সেই জিনিষের আমার কখন অভাব হবে না। আর দ্বিতীয় সাধারণ দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, দান-ধ্যান করলে আমাদের ভেতরকার স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতাটা কমতে শুরু করে। স্বার্থপরতা কমলে স্বাভাবিক ভাবে মনটা আধ্যাত্মিকতার দিকে এগোতে শুরু করবে। তবে দান করা সবার জন্যই খুব মঙ্গলজনক। পঞ্চ মহাযজ্ঞেও আমরা বলেছিলাম নিয়মিত দান অবশ্যই করতে হবে।

যোহর্চিতং প্রতিগৃহীতি দদাত্যর্চিতমেব চ।

তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকস্ত বিপর্যয়ে।।৪/২৩৫

এই শ্লোকটিও খুব নামকরা, স্বামীজীও অনেক বক্তৃতায় এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী তাঁর ভাষণে এমন অনেক কথা বলেছেন যেগুলো সব শাস্ত্রেরই কথা। এখানে বলছেন যিনি দান করছেন এবং দান করে নিজেকে মনে করছেন দান করে আমি ধন্য হলাম, আর যিনি দান গ্রহণ করছেন তিনিও মনে করছেন আমি দান গ্রহণ করে কৃতার্থ হলাম, তখন দুজনেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এখন কেউ যদি কোন সাধুর জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসে আর সেই সাধু যদি সেটা গ্রহণ না করেন তখন সে খুব কুণ্ঠা বোধ করে। এটা সত্যিই আমি যদি কারুর দান গ্রহণ করি তাহলে তো দাতা ধন্য হবেই। আবার আমরা যাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি তাঁকেই কিছু দিতে ইচ্ছা করে, সেই দিক থেকে দেখলে আমিও ধন্য হব যদি আমাকে কিছু দেওয়া হয়। দান দেওয়ার সময় আর দান নেওয়ার সময় এই ভাব যদি উভয়ের থাকে তখন তাদের দুজনেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এর বিপরীত হলে দুজনেই নরকে যায়। কোন সাধু মহাপুরুষকে কিছু দেওয়ার সময় যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবেসে দান করতে হয় তেমনি কোন গরীব কাঙালীকেও কিছু দান করার সময় প্রণাম করে দিতে হয়। এটা গেল দানের ব্যাপারে তপস্যার ব্যাপারে বলছেন –

তপস্যা প্রসঙ্গে

ন বিস্ময়েত তপসা বদেদিষ্টা চ নানৃতম্।

নার্তোহপ্যপদেদ্বিপ্রায় দত্তা পরিকীর্তয়েৎ।।৪/২৩৬

নিজের তপস্যার ব্যাপারে কখন বিস্ময় করবে না। তপস্যার বিস্ময় হল – আগেকার দিনে সাধু মহারাজরা অনেক দিন আশ্রমে কাজ কর্ম করার পর ভাবেন, অনেক কাজকর্ম করা হয়ে গেছে, আর বেশী কাজ না করে হৃষিকেশে গিয়ে বা উত্তরকাশীতে গিয়ে কিছু দিন থেকে তপস্যা করব। ওখানে কিছু দিন তপস্যা করে যখন সাধুরা ফিরতেন তখন হয়ত এক বছরের লম্বা দাড়ি বা দু বছরের লম্বা দাড়ি নিয়ে ফিরতেন। এটা হল বিস্ময় আমি কতদিন হিমালয়ে তপস্যা করে এসেছি। স্বামী প্রমোদানন্দজী মহারাজ মজা করে বলতেন – হিমালয়ে যাঁরা কিছু দিন থেকে তপস্যা করেছে তাঁরা তপস্যায় গ্রাজুয়েট হয়ে গেছে, যাঁরা অমরকন্টক, ওঙ্কারেশ্বরে গিয়ে তপস্যা করেছেন তাঁরা তপস্যায় মাস্টার ডিগ্রী পেয়ে গেছেন আর যাঁরা নর্মদা পরিক্রমা

করেছেন তাঁরা তপস্যায় পিএইচডি করে নিয়েছেন। মহারাজ এই তিনটির মধ্যে একটা জায়গাতেও যাননি। মনু বলছেন, যাঁরা নিজেদের তপস্যায় বিস্ময় প্রকাশ করে, আমি এক বছর পায়ে হেঁটে নর্মদা পরিক্রমা করেছি! এই বিস্ময় প্রকাশ করলে তপস্যার সব ফল নাশ হয়ে যায়। আর বলছেন যজ্ঞ করার সময় যেন অসত্য কথা বা অতিরঞ্জিত করে কোন কথা না বলে। আর পণ্ডিত যেন দুর্বাচ্য ও কঠোর বাক্য যেন কখন না প্রয়োগ করে। ইদানিং কালের পণ্ডিতদের মধ্যে যে কি প্রচণ্ড রেশারেশি, একজন আরেকজনকে ছোট করার জন্য কত রকমের অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করছে, আর সব সময় এক অপরের প্রতি লড়াইয়ের মনোভাব। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে কেউ একটা পেপার তৈরী করেছে, কোন কারণে অন্য কোন পণ্ডিত যদি তার একটা কি দুটো প্যারাগ্রাফ নিয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে কপিরাইট নিয়ে কোর্টে মামলা করে দেবে। নিয়েছে তো কি হয়েছে! তার জন্য তো তোমার গর্বিত হওয়ার কথা। তোমার যদি সেই পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা থাকে তাহলে আরও কত কিছু তোমার মাথা থেকে বেরোতে পারবে। পাণ্ডিত্যের সাথে যদি বিনয়ের ভাব না থাকে তাহলে সেই পাণ্ডিত্যের উপর সব সময় সন্দেহ আসবে। পাণ্ডিত্য আর বিনয় দুটো এক সঙ্গে চলে।

এই শ্লোকের শেষাংশে বলছেন, দান দিয়ে কক্ষণ কাউকে বলতে নেই। যেমন, একজন ভক্ত কোন এক আশ্রমে একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কম্পিউটার দিয়েছিলেন। মহারাজরা সেটিকে সারিয়ে টারিয়ে অফিসের কাজে ব্যবহার করছেন। এখন ভক্তটি নিজের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যাকে নিয়েই অফিসে মহারাজদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখনই সবাইকে দেখিয়ে বলতেন — জানতো এই কম্পিউটারটা আমি দান করেছিলাম। মনু নিষেধ করছেন, দান করবে কিন্তু কেউ যেন তোমার দানের কথা জানতে না পারে। পরের শ্লোকে বলছেন —

যজ্ঞোহনুতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।

আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্তনাৎ।।৪/২৩৭

এই শ্লোকটিও খুব মূল্যবান শ্লোক। যজ্ঞের সময় যদি মিথ্যা কথা বলে তাহলে ওই যজ্ঞটা নিষ্ফল হয়ে যায়। তপস্যায় বিস্ময় প্রকাশ করলে তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যায়। ‘আমি ছয় মাস পায়ে হেঁটে নর্মদা পরিক্রমা করেছি’ যেই বলে দিল, ওইখানেই তার এই তপস্যার ফল সব নষ্ট হয়ে গেল। যদি ব্রাহ্মণকে দুর্বাচ্য প্রয়োগ কর, তুমি যদি পণ্ডিতও হও, তোমার আয়ু কিন্তু ক্ষীণ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ হলেন জ্ঞানী পুরুষ। কটু কথা কাউকেই বলতে নেই, মজাতেও যদি কাউকে কটু কথা বলে তাতেও আয়ু ক্ষয় হয়ে যাবে। মনুস্মৃতিতে একটা খুব লক্ষণীয় ব্যাপার হল মনু কিন্তু আয়ুর উপর খুব নজর দিয়ে রেখেছেন। কারণ আমরা এই জীবন যেটা পেয়েছি এটাকেই সামনে পাচ্ছি, এর পরে কি হবে আমরা কেউ জানিনা, পরজন্ম আছে কি নেই তাও জানা নেই, যদি জেনেও থাকি তাহলে পরের জন্মে আমি কি হব সেটাও জানি না। জানছি একমাত্র এই জীবনটাকে। আর বলছেন দান করে দানের কথা বলে দিলে দানের ফলটা নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্ম সঞ্চয় করে যাও, একমাত্র ধর্মই তোমার সাথে যাবে

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।

একোহনুভুক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্।।৪/২৪০

মানুষ একাই জন্ম নেয়, মানুষ একাই মরে। আর সুকৃতি যেটা হয় সেটা নিজেই ভোগ করে আর তার যা দুষ্কৃতি হয় সেটাও সে নিজেই ভোগ করে। কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবে না। সন্তানের যখন শরীর খারাপ করে তখন বাবা-মার কত দুশ্চিন্তা হয়, তার জন্য সব কিছু করবে, ডাক্তার নিয়ে আসবে, ওষুধ নিয়ে আসবে কিন্তু সন্তানের শরীরে ব্যাধির যে যন্ত্রণার কষ্ট সেটা সন্তানকেই সহ্য করতে হয়, এই কষ্ট বাবা-মা কখনই নিজেদের শরীরে টেনে নিতে পারবে না। সেইজন্য পরের শ্লোকে বলছেন —

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলৌষ্টসমং ক্ষিতৌ।

বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মস্তম্নুগচ্ছতি।।৪/২৪১

মরে গেলে তোমার বন্ধু-বান্ধবরা তোমার মৃত শরীরকে কাঠের টুকরো বা মাটির ঢেলার মত ফেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, কেউ তোমার সাথে থাকবে না। একমাত্র ধর্মই তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে অনুগমন করবে। এই জীবনে তুমি নিজে যে ধর্ম করেছ ওটাই তোমার সাথে যাবে, অন্য আর কিছুই সাথে যাবে না।

তস্মাদ্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চি মুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্মেণ হি সহায়েন তমন্তরতি দুষ্টরম্।।৪/২৪২

সেইজন্য একটু একটু করে জীবনে ধর্ম সঞ্চয় করে যেতে হয়। কারণ বেশী ধর্ম করতে পারবে না, সেই ক্ষমতা তোমার নেই। তাই তোমার যতটা সামর্থ্য সেই অনুসারে একটু একটু করে ধর্ম সঞ্চয় করে যাও। এই ধর্ম দিয়েই তুমি ঘোরতর তমকে, অর্থাৎ অধর্মকে পার করতে পারবে। এই ধর্মই তোমাকে তির্যকাদি যোনিতে জন্ম নেওয়া, নরকাদিতে গতি হওয়া থেকে আটকাবে, মৃত্যু-ভয় দূর করবে। তমস্ বলতে যা কিছু বোঝায় এই ধর্মই তোমাকে তমসের সব কিছু থেকে পার করিয়ে দেবে।

ধর্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিশম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্তন্তং খ-শরীরিণম্।।৪/২৪৩

ধর্মপ্রাণ পুরুষ তপস্যার দ্বারা সমস্ত কিল্বিশকে নাশ করে, কিল্বিশ মানে পাপ। এই কিল্বিশ যখন নাশ হয়ে যায় তখন এই শরীরকে ধর্মই স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। এখানে ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের সাথে খুব মিল পাওয়া যায়। মনু কিন্তু পুনর্জন্ম নিয়ে বেশী কিছু বলছেন না, মনু বলছেন তুমি এই জন্মটা পেয়েছ, এই জন্মে আয়ুকে যতটা পারো লম্বা কর, শুভ কর্ম করে যাও, এই শুভ কর্মই তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। মনু আমাদের এই দিকেই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরপর বলছেন, তুমি তোমার বংশ কি ভাবে বৃদ্ধি করবে, নিজের বংশকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ করে তুলবে, তার জন্য জাতিগত, বিদ্যাগত ও চরিত্রগত উৎকৃষ্ট গুণসমন্বিত উত্তম বংশের কন্যা বা পুত্রের সাথে বিবাহাদির সম্বন্ধ স্থাপন করবে। এরপর শেষের দিকে এসে বলছেন –

আত্মার অপহরণ করা নিন্দনীয়

যোহন্যথা সন্তুমাআনমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ।।৪/২৫৫

যে নিজে গোলমেলে, নিজের আচরণের ঠিক নেই কিন্তু সজ্জন পুরুষের যেমনটি গুণ আছে তেমনটি না বলে তার বিপরীত বলে, সংসারে এদের মত পাপী ও চোর আর কেউ হয় না। কারণ সে আত্মার অপহরণ করেছে। যেমন, একজন লোক আছেন যিনি পণ্ডিত ও অতি সজ্জন লোক। আমার আবার যে কোন কারণেই হোক তাঁর প্রতি বিদ্বেষ আছে। আমি এখন সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি, লোকটি কোন পণ্ডিতই নয়, একটা মুর্থ। কিংবা আমি সবাইকে বলছি লোকটি অফিসে ঘুষ নেয়। এতে আমি কি করছি? আমি তাঁর আত্মার অপহরণ করে নিচ্ছি, কারণ তাঁর বাস্তবিক স্বরূপটাকে আমি কেড়ে নিচ্ছি। সেইজন্য কারুর নিন্দা করতে নেই। নিন্দা করলে কি হয়, সে হয়তো দেখাচ্ছে এক রকম আসলে কিন্তু তিনি সেই রকম নন। এখানে কিন্তু বলছেন, নিজে অন্য রকম করছে কিন্তু অপরের নামে নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। আমি নিজে ঘুষ নিই কিন্তু আরেকজনকে বলছি ‘ওকে আমি ভালো করে জানি ওতো অফিসে ঘুষ নেয়’, আসলে সে কখন ঘুষ নেয় না, তখন কিন্তু আমার পাপ লাগবে। বলা হয়, পরের দোষ দেখবে না, নিজের দোষটাই দেখবে। কিন্তু এখানে একটা শর্ত লাগাচ্ছেন – তুমি নিজে অন্য রকম, অথচ অন্য একজনকে গালাগাল দিচ্ছ। এর মত পাপী আর কেউ হয় না। এটাকেই পরের শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন –

বাচ্যার্থা নিয়তাঃ সর্বৈ বাঙমূলা বাগ্বিনিঃসূতাঃ।

তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ।।৪/২৫৭

বলছেন বাণী দিয়েই সব কিছু প্রকাশ করা হয় আবার এই বাণী দিয়েই সব কিছুকে গুপ্ত রাখা হয়, তার মানে বাণীই প্রধান। এখন যে লোকটি যেমন গুণের তাঁকে যখন সেই গুণের বিপরীত বলে নিন্দা করছি, তখন সে বাণীকে চুরি করে নিচ্ছে। বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই যে আমরা শাস্ত্র আলোচনা করছি, এটা আমরা সবাই বাণীর মাধ্যমেই করছি। আমি যখন একটা জিনিসকে সবার কাছে প্রকাশিত করছি তখন বাণীর মাধ্যমেই করতে হচ্ছে, যখন লুকাচ্ছি তখন বাণীর মাধ্যমেই লুকোচ্ছি। এই কারণে বাগদেবীর সম্মান অনেক বেশী। একজন ভালো লোকের নামে আপনি নিন্দা করছেন মানে, আপনি এই বাগদেবীকেই অপহরণ করে নিচ্ছেন। এই ধরনের কাজ মহা পাপ, এই পাপ থেকে কেউ বাঁচবে না। মনু পরের শ্লোকে আবার পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন –

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বান্গ্যং যথাবিধি।

পুত্রে সর্বং সমাসজ্য বসেনমাধ্যস্থমাশ্রিতঃ।।৪/২৫৭

জন্ম থেকেই আমরা কয়েকজনের প্রতি ঋণী – মহর্ষি, পিতৃ, দেবতা ইত্যাদি। বলছেন, বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিদের, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃদের আর যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদের সব ঋণ আগে শোধ কর। এই সব করে ঋণমুক্ত হয়ে নিজের বাড়িতেই শান্তিতে বসবাস কর। আসলে মনু সন্ন্যাস জীবনকে বেশী গুরুত্ব দেননি বা হয়তো সন্ন্যাসের ব্যাপারটা তাঁর পছন্দের ছিল না। সেইজন্য মনু বলছেন এই ভাবে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে শান্তিতে বাড়িতেই বাস কর। বাণপ্রস্থের ব্যাপারে বলছেন, যদি সত্যিই তুমি একাকী থাকতে চাও, তোমার যদি বয়স হয়ে গিয়ে থাকে, সংসারের সব কর্তব্য কর্ম করা হয়ে গেছে তখন তাহলে কাছেই একান্তে যাতে তোমার বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে, ওই রকম কোন জায়গায় গিয়ে সাধন ভজন কর, ব্রহ্মরূপ চিন্তন কর। শেষ বয়সে যদি কেউ এইভাবে সাধন ভজন ও ব্রহ্মরূপ চিন্তন নিয়েই থাকতে পারে তাহলে সেটাই পরমকল্যাণ, তখনই মানুষ মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। মনুও চাইতেন, একটা বয়সের পর মানুষ যেন সংসারে না জড়ায়। আগেকার দিনের মানুষগুলো ভালো ছিল, বয়স হলে সবাই সংসারের দায়িত্ব ছেলেদের উপর ছেড়ে দিয়ে বাণপ্রস্থী হয়ে যেতেন। ছেলেরাও বাবার জন্য সামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিত। ইদানিং কালে কেউ দায়িত্বই ছাড়তে চায় না। যদি ছেলের উপর ভরসা না থাকে তাহলে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রেখে দিল, ছেলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল, বাবা ছেলেকে তার জন্য সেখান থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দিল। আর এখনতো রীতিমত চারিদিকে লেখালেখি হচ্ছে, বিচারকরাও বলছেন, উকিলরা বলছে, খবরের কাগজ বলছে, তোমার টাকা তুমি নিজের কাছে রাখ, ছেলেদের নামে কখনই লিখে রাখতে যাবে না। ছেলেকে বাবা বলবে, আমার জন্য সাদামাটা একটা খাবারের ব্যবস্থা করে দাও, মাসে মাসে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দেব আর আমি মরে গেলে তুমি সব টাকা পেয়ে যাবে।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

এরপর আমরা পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন কিছু কিছু শুদ্ধি অশুদ্ধির ব্যাপারে বলা হয়েছে, পঞ্চম অধ্যায়েও শুদ্ধি অশুদ্ধির ব্যাপারটাই চলছে। অন্যান্য স্মৃতিকারদের অনেকটা আইন প্রণয়নকারী বলে বোঝায় কিন্তু মনুস্মৃতি হল ঠিক ঠিক শাস্ত্র বলতে যা বোঝায়। মনুর উদ্দেশ্য হল কিভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের যদি চারটি দোষ থাকে

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ।

আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।।৫/৪

এখানে বংশপরম্পারায় যারা ব্রাহ্মণ বা যারা সাধারণ মানুষ তাদের কথা বলা হচ্ছে না। যারা সদাচার উচ্চ ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ তাঁদেরকেও মৃত্যু কিভাবে ঘিরে ফেলে বলছেন। সদাচার ও ধর্মপ্রাণ মানুষের নিয়মকানুন সব আলাদা ভাবে চলে। মৃত্যু ঘিরে ফেলে মানে, তাঁদেরও কিভাবে পতন হতে পারে, আয়ু কমিয়ে দেয়, যশ কিভাবে চলে যায়। চারটে দোষ যদি কোন ব্রাহ্মণ করে তখন মৃত্যু তাকে বেঁধে ফেলে। প্রথম হল, ব্রাহ্মণ যদি বেদাভ্যাস না করে, অর্থাৎ জপ-ধ্যান যদি না করে তাহলে মৃত্যু তাকে বেঁধে নেবে। দ্বিতীয় সদাচার ব্রত যদি ত্যাগ করে দেয়, যেমন কোন আচারী ব্রাহ্মণ কোন একটা অবস্থায় এসে তার আচারকে ত্যাগ করে দিল। তৃতীয় আলস্য, আমাদের মধ্যে সব রকম গুণ আছে কিন্তু সব গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের আলস্য এসে গ্রাস করে নেয়। সব শেষে চতুর্থ অশ্রমের যদি দোষ থাকে তাহলে কিন্তু অনেক কিছু গোলমাল হয়ে যাবে, সেইজন্য অশ্রমের দোষগুলোকে প্রথমে নিবারণ করতে হবে। তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও হিন্দু সমাজ খুব সতর্ক ছিল যাতে অশ্রমের কোন দোষ না হয়। কিন্তু হঠাৎ করে ইদানিং চারিদিকে আসুরিক বৃত্তি ছেয়ে গিয়ে একটা দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। মনু এখানে বলে দিচ্ছেন অশ্রম দোষ যদি হয় এই দোষ কিন্তু তাকে সর্বনাশ করে ছাড়বে। ঠাকুরের জীবনীতে দেখা যায় তদানিন্তন গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁর মত উদার মনোভাব আর কারুর মধ্যেই পাওয়া যায় না, অথচ যখন তাঁর শিষ্যদের তিনি খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা, কথাবলা সব কিছু থেকে যেভাবে সামলে রাখছেন তখন অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একমাত্র নরেন ছাড়া কাউকে স্বাধীনতা দেননি। নরেন যা খুশী খেতে পারে, ওতে ওর কিছু হানি হবে না। এমনকি ঠাকুরের সমসাময়িক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের লেখাতেও আচারের ব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠার কি প্রাঞ্জল বর্ণনা পাই। একদিকে ঠাকুর ছিলেন খুব আচারী ব্রাহ্মণ আবার অন্য দিকে কখনো মন্দিরে আসছেন কখনো আবার মন্দিরে আসছেন না।

লশুনং গৃঞ্জনধৈব পলাগুং কবকানি চ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভাবানি চা।।৫/৫

কি কি খেতে নেই বলতে গিয়ে বলছেন, রসুন, গাজর, পেঁয়াজ, ব্যাঙের ছাতা অর্থাৎ মাশরুম এগুলো খেতে নেই। আর মলমুত্রাদিপরিশুদ্ধ অপবিত্র স্থানে যে শাকসজ্জী জন্মায় সেগুলো খাবে না। কিন্তু সারা কলকাতা ধাপার সজ্জীতে ছেয়ে আছে, ধাপাতে কলকাতার যত আবর্জনা ফেলা হয়। তারপর বলছেন গাছের ছাল কেটে দিলে যে আঠা বেরোয় ওগুলো খাবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যে নিষেধাদি আছে তার মধ্যে কিছু আছে গুচি অশুচির ব্যাপার আবার কিছু আছে শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। সব কিছুকে মিলিয়ে মনু একসাথে বলে দিচ্ছেন।

ঈশ্বরে অনিবেদিত অন্ন বৃথা

বৃথাকৃসরসংযাবং পায়সাপূপমেব চ।

অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ।।৫/৭

খাদ্যের মধ্যে ‘বৃথা’ শব্দটাকে আমাদের পরম্পরাতে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৃথা মানে, যে অন্ন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়নি। কিছু কিছু খাদ্য আছে যেগুলো ঈশ্বরকে নিবেদন না করে কখনই খাওয়া উচিত নয়। এগুলোর মধ্যে হল কৃসর, কৃসর হল তিল মিশ্রিত অন্ন। আজকাল আর খাওয়া হয় না। সংযাব, মানে হালুয়া, মোহনভোগ জাতীয় মিষ্টি খাদ্য। তার সাথে পায়সান্ন, মালপোয়া জাতীয় পিঠে। এই জিনিষগুলো বিশেষ অন্ন এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা হয় বলে প্রভুকে অর্পণ না করে খেতে নেই। রোজ ভাত-ডাল খাওয়া নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে না, কিন্তু এই বিশেষ জিনিষগুলো যদি ঈশ্বরকে অর্পণ না করা হয় তখন এগুলো বৃথা হয়ে যায়। এই বৃথা খাদ্য খেতে নেই। আগেকার দিনে বিশেষ দিনগুলিতে এই জিনিষগুলো বিশেষ ভাবে রান্না করে কুলদেবতাকে অর্পণ করার পর সবাই মিলে গ্রহণ করত।

অনুপাকৃতমাংসানি, এখানে আবার নতুন করে বলছেন যজ্ঞে যদি বলি না হয়ে থাকে তাহলে সেই মাংস খেতে নেই। নৈবেদ্যের জন্য যে অন্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেই অন্ন খেতে নেই। আর পিতৃদের উদ্দেশ্যে

হবিষ্যাদিতে যে অন্ন দেওয়া হয় সেই অন্ন কখন খাবে না। এরপর বলছেন কোন গরুর দুধ খাবে কোন গরুর দুধ খাবে না, এ এক লম্বা তালিকা। তারমধ্যে যেমন বলছেন জংলী পশু যেমন হরিণ, নীলগাই এদের দুধ খাবে না। মোষের দুধ খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মাংস খাওয়ার ব্যাপারে স্মৃতির বিধান

এরপর মাংস খাওয়া নিয়ে বলছেন, কিসের কিসের মাংস খাবে না, কিসের কিসের মাংস খাবে। এরমধ্যে আছে পাখীর মাংস খাওয়া যেতে পারে কিন্তু যে পাখী কাঁচা মাংস খায় যেমন কাক, শকুন, চিল এই ধরনের পাখীর মাংস খাবে না। গ্রামবাসী পশু বা পাখীর মাংস খাবে না। গ্রামবাসী মানে, মুরগী, পায়রা, হাঁসের মাংস খাওয়া যাবে না। এক ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষেধ করছেন। যেমন গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি। কয়েকটি পাখীর নাম করে বলছেন –

কলবিষ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কটম্।

সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যুহং শুকসারিকে।।৫।১২

তখনকার দিনের অনেক পাখীর নাম এখানে পাওয়া যাচ্ছে। কলবিষ্ক মানে চড়ুই, প্লব, হাঁস, চক্রবাক, গ্রাম্য মোরগ, সারস, রজ্জুবাল, দাত্যুহ মানে ডাহুক পাখী, শুক সারিকা অর্থাৎ টিয়া, শালিক পাখী, এই সব পাখীর মাংস খেতে নিষেধ করা হচ্ছে। এছাড়া বলছেন, বক, যে সব পাখী ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খায়, যে সব পাখীর পা জোড়া, যে সব পাখী খাদ্যবস্তু নখ দিয়ে ছাড়িয়ে খায় যেমন ময়ূর, মোরগ প্রভৃতি, যে সব পাখী জলে ডুব দিয়ে মাছ ধরে খায় যেমন পানকৌড়ী প্রভৃতি এদের মাংস ভক্ষণ করবে না, যে সব মাংস শুষ্ক অনেক দিন রেখে দেওয়া হয়েছে সেই মাংসও বর্জন করবে। তারপর বলছেন গ্রাম্য শূয়োরের মাংস খাবে না। কিন্তু পাঞ্জাবের দিকে সবাই গ্রাম্য শূয়োরের মাংস খায়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, পাঞ্জাবীরা যদি শূয়োরের মাংস না খায় তাহলে তাদের লোকে মনে করবে তারা মুসলমান। আসলে শূয়োরের মাংস খাওয়ার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রথম থেকেই চলে আসছে। যদিও এখানে গ্রাম্য শূকরের মাংস খেতে নিষেধ করছেন, কিন্তু একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, বন্য শূকরের মাংস খাওয়া যেতে পারে। পাঞ্জাবে প্রচুর মুসলমান ছিল বলে ওদের থেকে আলাদা করার জন্য পাঞ্জাবে শূকরের মাংস খেত।

যে সব পশুর বা পাখীর পঞ্চ নখ হয় এদের মধ্যে কিছু প্রাণীর মাংস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো যে আবার দেবতাদের অর্পণ করা যাবে সেই ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। সেইজন্য এটা বোঝা যাচ্ছে যে মনুস্মৃতি একজন স্মৃতিকারের লেখা নয়। প্রথমে দিকে বলছেন মাংস যদি দেবতাদের অর্পণ করা না হয় তাহলে সেই মাংস খাবে না। আবার এমন কিছু পশুর মাংস খাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন যার মাংস দেবতাদের অর্পণ করা যাবে না।

অনেকের ধারণা যে আমাদের পূর্বজরা গাছের ফলমূল খেয়ে থাকতো, তাঁরা কোন দিনই নাকি মাংসাশী ছিল না। কিন্তু কবে থেকে পূর্বজরা মাংস খেতে শুরু করলেন বলা খুব মুশকিল। আমরা মনুস্মৃতিতে যা আছে সেটাকেই মানব। এখানে মজার ব্যাপার হল আমাদের চোয়ালের পাশে যে দাঁত আছে, এই দাঁতগুলো হল মাংস খাওয়ার জন্য। অন্য দিকে আমাদের সবারই পেটে এ্যাপেনডিক্স আছে। এ্যাপেনডিক্সের কাজ হল ঘাস হজম করা। এখন মানুষ ঘাস খায় না, গরু, ছাগলরাই ঘাস খায়। ঘাস হজম করার জন্য একটা আলাদা অর্গান দরকার পড়ে। আমরা এখন ঘাস খাই না, তাই এ্যাপেনডিক্স আমাদের একটা অদরকারী অর্গান হয়ে থেকে গেছে। আমাদের শরীরের একটা অর্গান হয়ে গেছে অকেজো, অন্য দিকে মাংসাশী প্রাণীর দাঁতগুলো থেকে গেছে। মানুষ এখন হয়ে গেছে সর্বভুক, ফলও খাচ্ছে, দানা শস্যও খাচ্ছে আবার মাছ মাংসও খাচ্ছে।

আবার বলছেন, দ্বিজ যদি ছত্রাক নামের কন্দ, গ্রাম্য শূকর, রসুন, পেঁয়াজ, গ্রাম্য মোরগ আর লাল মূলো যদি খায় তাহলে সে শীঘ্র পতিত হয়ে যায়। কিন্তু মাংস কখন খাবেন বলতে গিয়ে বলছেন –

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।

যাথাবিধি নিযুক্তস্ত প্রাণানামেব চাত্যয়ে।।৫/২৭

প্রোক্ষিতং মানে, যজ্ঞের হবনাদিতে যদি মাংস অর্পণ করা দরকার হয় তখন সেই মাংস মন্ত্র দ্বারা হবন করার পর সেই মাংস খাওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা যদি মাংস খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে একবার তাদের মাংস খাওয়ানো যেতে পারে, দুবার কখনই নয়। শাস্ত্র বিহিত শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত মাংস ভক্ষণ করা যেতে পারে। মজার ব্যাপার হল, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে বা রোগের কারণে যদি প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়, ডাক্তার খেতে বলছে তখন মাংস ভক্ষণ অবশ্যই করা যেতে পারে।

ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহস্তর্ধনার্থিনঃ।

যাদৃশং ভবতি প্রত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ।।৫/৩৪

যারা অর্থের প্রয়োজনে পশুপাখী বধ করে বেড়ায় তাতে তাদের নিশ্চয়ই পাপ হচ্ছে, কিন্তু তার থেকেও বেশী পাপ হয় যারা দৈব কর্ম সম্পন্ন না করে মাংস ভক্ষণ করে। শ্রাদ্ধাদিতে যে মাংস ভক্ষণ করে, তাছাড়া এমনিতে আজকে ছুটির দিন বলে চল মাংস খাই এতে বেশী পাপ হয়। যারা টাকার জন্য প্রাণী বধ করে তাদের পাপ তুলনায় কম হয়। আবার বলছেন –

কুর্যাদ্ ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।

ন ত্বেব তু বৃথা হস্তং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন।।৫/৩৭

খুব যদি মাংস খেতে ইচ্ছে করে তাহলে আটা বা ময়দাকে ঘি চিনি দিয়ে মেখে পিণ্ড তৈরী করে একটা পশুর আকৃতি দিয়ে সেটাকেই খাবে। ওতেই মনটা শান্ত হয়ে যাবে। ইদানিং হাতি, ঘোড়া, ছাগলের আকৃতি দিয়ে চিনির যে মঠ তৈরী করা হয়, বলছেন এটা খেয়ে মনকে শান্ত করে দেবে। কিন্তু কখনই অকারণে পশু বধ করতে যাবে না। বৃথা পশুকে বধ করলে কি হয় বলছেন –

যাবন্তি পশুরোমানি তাবৎকৃত্বো হ মারণম্।

বৃথা পশুয়ঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি।।৫/৩৮

যারা অকারণে আর বৃথা পশু বধ করে, ওই পশুর শরীরে যত লোম আছে তত জন্ম তারা ওই পশুর হাতে মারা যায়। একটা ছাগলকে যদি নিজের মাংস খাবার জন্য মারা হয় তাহলে ওই ছাগলের শরীরে যত লোম আছে তত জন্ম ধরে ওই ছাগল তাকে মারতে থাকবে। এগুলো হল মানুষকে একটু ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দেওয়া। কারণ মানুষের মধ্যে এত পাশবিক বৃত্তি যে যখন তখন অকারণে পশু হত্যা করে মাংস খেয়ে নিত, আর আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরাও গরু-টরু খেয়ে নিত। ব্রাহ্মণ যদি গরু খায় তাহলে সাধারণ লোক হাতি খাবে, এই প্রবৃত্তি গুলোকে আটকান চেষ্টা করছেন।

যে ব্যক্তি কাউকেই হিংসা করে না, পশু হোক, পাখী হোক, কীটপতঙ্গ হোক, মানুষ হোক সবার প্রতি যার অহিংস ভাব থাকে, তখন সেই ব্যক্তি যা কিছু চিন্তন করে, যা কিছু কার্য করে, যে কোন জিনিষের যখন ধ্যান করে, সেই জিনিষটা খুব সহজেই তার লব্ধ হয়ে যায়। ধরুন আপনি হয়তো কোন পশু, পাখী, কীটপতঙ্গ মারেন না, মাছ-মাংসও খান না, কোন ব্যক্তির প্রতিও আপনার হয়তো কোন হিংসার ভাব নেই, এখন আপনি যদি চান আমি ঈশ্বরে মন দেব, তখন খুব সহজেই ঈশ্বরে আপনার মন বসে যাবে। বলছেন, মানুষ পবিত্র ফল-মূল ভক্ষণ করে ততটা ফল পায় না, যতটা ফল সে মাংস ত্যাগ করে পাচ্ছে। অথচ স্মৃতিকাররা শ্রাদ্ধাদিতে মাংস দিতে বলছেন। এই সব কথা বলে বলছেন –

মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্যাহম্।

এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।৫/৫৫

এখানে মনু মাংস শব্দের ব্যাখ্যা করছেন। সংস্কৃতের পণ্ডিতরা সংস্কৃত শব্দ নিয়ে অনেক রকমের খেলা করতেন। বলছেন মাং মানে আমি স ভক্ষয়িতা, আমি যার মাংস খাচ্ছি পরে সে আমাকে খাবে। পণ্ডিতরা মাংস শব্দের এই ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। যখন কারুর এই ভাব হয়ে যায় তখন কিন্তু সে মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাবে। পরের শ্লোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন –

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।৫/৫৬

এত কিছু কথা বলার পরে বলছেন, দেখো! মাংস ভক্ষণে কোনও দোষ নেই, মদ খেলেও কোন দোষ নেই আর নারীসঙ্গ করলেও কোন দোষ নেই। কারণ মানুষের এইটাই প্রবৃত্তি। মানুষ মাংস খাবে, মদ্যপান করবে, নারীসঙ্গ করবে, এগুলো তাদের প্রবৃত্তিতেই রয়েছে। তব্বে পঞ্চ মকারেও এই জিনিষগুলোকেই নিয়ে আসা হয়েছে, শুধু দুটো জিনিষকে এখানে উল্লেখ করা হয়নি – মৎস্য আর মুদ্রা। কিন্তু মৎস্য মাংসের মধ্যেই এসে যায়। মুদ্রা মানে চালভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি, যেগুলো মদ্যপানের সময় ভক্ষণ করা হয়। পঞ্চ মকারের মাংস, মদ ও মৈথুন বললে বাকি দুটো এমনিতেই এসে যায়। তব্বে যেগুলোকে পূজার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাকেই স্মৃতিতে অন্য ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। মাংস খাবার জন্যই মানুষ তৈরী হয়েছে, মদ পান করার জন্যই সে তৈরী হয়েছে আর মৈথুন করার জন্যই মানুষ তৈরী হয়েছে। তবে কি, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা, যদি কেউ এগুলোকে ত্যাগ করতে পারে তাহলে সে কিন্তু মহৎ। তার মানে আপনি যদি এগুলো করেন দোষ নেই, কিন্তু আপনি যদি না করেন তাহলে আপনি হয়ে গেলেন মহৎ। এইটাই মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। করলে দোষ নেই, না করলে মহৎ। আপনি যদি আপদে-বিপদেও সত্যি কথা বলেন সেটা ভালোই, কিন্তু আপনি যদি মিথ্যা কথা বলে বেরিয়ে যান তাহলে আপনি আরও মহৎ হয়ে গেলেন। স্মৃতিতে দুই ধরনের ধর্মের কথা বলছেন। প্রথম ধর্মের মতে বলছেন, আপনি যদি করতে চান করুন তাতে দোষ কিছু নেই, দ্বিতীয় বলছেন, যদি এটা না করেন তাহলে আপনি মহৎ। এটাই হিন্দুদের প্রকৃত দর্শন।

স্বামীজী যখন আমেরিকাতে ছিলেন তখন রমাবাঈরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে বিশেষ করে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রচুর কটুক্তি করছিলেন। স্বামীজী এর প্রত্যুত্তরে কিছু কিছু জবাব দিয়েছিলেন, বাকি ওনার বন্ধুরা জবাব দিয়েছিলেন। সেখানে ঠিক এই কথাই বলছেন, তোমাদের আদর্শ আর আমাদের আদর্শ আলাদা। আমাদের আদর্শ হল আধ্যাত্মিক জীবন। মেয়েদের বলা হচ্ছে, তোমার বিয়ে হওয়া মানে আমরা তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম। কিন্তু কোন কারণে তুমি বিধবা হয়ে গেছ, এবার আমাদের যেটা জাতীয় আদর্শ সেটাতে তুমি পুরোপুরি নেমে যাও। আমাদের জাতীয় আদর্শ হল সন্ন্যাসীর আদর্শ। সন্ন্যাসীর আদর্শটাই তুমি এখন পালন কর। কিংবা যারা বিবাহ করেনি তাদের জন্যও সন্ন্যাসীর আদর্শ, কোন ভোগের পথে যেও না। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা যেখানে স্কুল কলেজ আছে, সেখানে হয়তো একটু তেল-মশলা যুক্ত খাবার খাচ্ছেন কিংবা কোথাও মাছ-মাংসের ব্যবস্থা আছে বলে খাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা ভোগের জন্য কখনই খান না, শরীর রক্ষার নিমিত্তে খাচ্ছেন। এটাই সন্ন্যাসীর জীবন। ভারতে বিধবাদের জীবনও তাই, তোমার নজর থাকবে নিবৃত্তির দিকে। প্রবৃত্তি তোমাকে মাংস খেতে উত্তেজিত করবে, মদ খেতে প্ররোচনা দেবে, ভোগে নামতে লোভ দেখাবে, রঙচঙ শাড়ি পোশাকের দিকে টানবে। সন্ন্যাসীর আদর্শই আমাদের জাতীয় আদর্শ। আমাদের জাতীয় আদর্শ হল পুরোপুরি ধর্মপ্রাণ হওয়া। যাদের ভোগের ইচ্ছা আছে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হল। সুযোগ পেয়ে যতটা ভোগ হওয়ার হয়ে গেল, আর না হল তো ভুলে যাও, এবার তুমি জাতীয় আদর্শে নিজেকে সঁপে দাও। সমস্যা হল তাদের নিয়ে যারা এখনও ভোগ করতে চাইছে, ভোগের বাসনাতে গিজ্ গিজ্ করছে, তাদের জোর করে নিবৃত্তির দিকে টেনে নিয়ে এলে হিতে বিপরীত হবে। সেইজন্য কিছু বিধি-নিষেধের নিয়ম তৈরী করে তাদের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তোমাকে একবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, আবার কিসের সুযোগ! এবার এই পথে চলার চেষ্টা কর। এর মধ্যেও অনেক জটিল ব্যাপার এসে যায়। আসলে আমাদের দেশটা খুব গরীবে দেশ।

একজন ভদ্রলোক রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের খুব কাছে থেকে সঙ্গ করে নিজের স্মৃতিচারণে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখছেন, রাণী লক্ষ্মীবাই ছেলেদের মত পোশাক পড়তেন আর তলোয়ার বন্দুক চালাতে ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন-যাপন পুরো আমাদের দেশের বিধবাদের মত। বিধবাদের তখন নিয়ম ছিল, বিধবা হয়ে গেলে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে তার চুল গুলো ফেলে দিত। কিন্তু কি দুঃখের কথা, লক্ষ্মীবাইয়ের স্বামী যখন মারা গেলেন তখন তাঁর বয়স খুবই অল্প, আমার আর চুল লাগবে না বলে এক কথায় কাশী গিয়ে নিজের চুল ফেলে দিতে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। ওই অল্প বয়স থেকে তিনি ছেলেদের সঙ্গে কুস্তি লড়তেন, তলোয়ারবাজি করতেন, ঘোড়া চালাতেন। তাঁর স্বামী প্রথম থেকেই একটা অপদার্থ ছিল। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সন্তান হয়নি বলে সে আরেকটা বিয়ে করল। তারপরেই সে মারা গেল। লক্ষ্মীবাই তখন বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেছিল আমি কাশী গিয়ে আমার চুল ফেলে দেব। বৃটিশরা একটা বদমাইশ জাত, তারা যেতেই দিল না তাঁকে। তাতে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, আমি একজন তপস্বিনীর মত জীবন-যাপন করতে চাইছি কিন্তু বৃটিশরা আমাকে তা করতে দিল না। লক্ষ্মীবাইকে তাঁর সাম্রাজ্য সামলাতে হত। ইতিমধ্যে বৃটিশদের ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। সব একাই সামলে গেছেন। সব সময় ছেলেদের মত প্যান্ট-শার্ট পড়ে থাকতেন। তখনকার দিনের মত গৌড়া সমাজে এটা ভাবাই যায় না একজন বিধবা ছেলেদের পোশাক পড়ে, নিজের দন্তক পুত্রকে পিঠে বেঁধে আর তলোয়ার নিয়ে সব কিছু সামাল নেবেন। ঝাঁসিতে সবাই তাঁকে মা দুর্গার অবতার বলে মানতেন। কিন্তু তিনি সারাটা জীবন বিধবার আচরণ পুরোটাই কঠোর ভাবে পালন করে এসেছেন। এগুলো আর কিছুই নয়, প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, আমাদের জাতীয় আদর্শ কি, বাকিটা সেই ভাবেই চালাতে হবে। কিন্তু আমাদের না আছে কোন জীবনের উদ্দেশ্য, না আছে কোন জাতীয় আদর্শ। তখন কি হবে? প্রবৃত্তিরেণা ভূতানাং, জীবের প্রবৃত্তি কি? বন্ধিমবাবু যেমন ঠাকুরকে বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য হল আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। এর বাইরে জীবের আর কোন প্রবৃত্তি আছে নাকি! কিন্তু ধর্মগ্রন্থ সেখান থেকে তুলে আমাদের উপরের দিকে নিয়ে আসে, যাতে আমাদের ওই দুরবস্থার মধ্যে না থাকতে হয়। স্মৃতিকাররা তাই করছেন, স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি রয়েছে সেখান থেকে টেনে উপরের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন।

এরপরে শৌচ, শুদ্ধি, অশুদ্ধির নানা রকমের অবস্থা, কোন অবস্থায় অশুদ্ধ হয়, বিশেষ করে নারীদের কখন অশুদ্ধি হয়, নারীসঙ্গ করার পর কি কি অশুদ্ধ হয়, তারপর বংশের কে কোথায় মারা গেলে কত দিনের অশুদ্ধি হবে, যেমন রাজা মারা গেলে কি হবে, আপনার বন্ধু বিদেশে মারা গেছে তখন কি হবে, বাড়ির লোক বিদেশে মারা গেছে তাতে কি কি করতে হবে এই নিয়ে অনেক কিছু বলার পর মূল সাধারণ বিধিটা একটা কথায় বলছেন – যাদের যজ্ঞ উপবীত সংস্কার হয়ে গেছে আর যাদের সপিণ্ড দানের প্রথা রয়েছে সেই রকম ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনের দিন আর শূদ্রের এক মাস পর্যন্ত অশুদ্ধি থাকে। এদের শ্রাদ্ধকর্মও সেই অনুসারে হয়। তবে এই নিয়মগুলো বিভিন্ন স্মৃতিতে পাণ্টে যায়।

কোন কোন জিনিষ শুদ্ধি করে

ব্রাহ্মণের কোন কিছু থেকে অশৌচ হলে যজ্ঞাদির জল স্পর্শ করে নিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয়ে যায়, ক্ষত্রিয়ের কোন অশৌচ হলে সে যে কোন বাহন রথ, হাতি, ঘোড়া বা কোন অস্ত্র স্পর্শ করলে শুদ্ধ হয়ে যায়। বৈশ্য একটা চাবুক স্পর্শ করে নিলে তাতেই শুদ্ধ হয়ে যায় আর শূদ্র যদি কোন লাঠি স্পর্শ করে নেয় তাতেই সে শুদ্ধ হয়ে যাবে। সকলকেই অবশ্য স্নানাদি করে স্পর্শ করতে বলা হচ্ছে। যে যে বর্ণের যেখানে যেখানে তাদের শক্তি রয়েছে সেগুলোকে স্পর্শ করার কথাই বলা হয়েছে। এরপর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে বলছেন –

জ্ঞানং তপোহগ্নিরাহারো মৃণ্মনো বার্যুপাঞ্জনম্।

বায়ুঃ কর্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্তৃণি দেহিনাম্।।৫/১০৫

একজন মানুষকে কি কি জিনিষ শুদ্ধি দেয় বলছেন। প্রথম হল জ্ঞান, যাঁর আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি শুদ্ধ হয়ে গেলেন। আত্মজ্ঞান মানুষকে যে শুদ্ধ করছে এর প্রমাণ আমরা গীতাতেই পদে পদে পাই।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – যথৈধাংসি সমদ্বোহঁগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন। জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। যেমন স্তম্ভিকৃত কাঠকে অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ ভস্ম করে দেয়, ঠিক তেমনি জ্ঞানাগ্নি সব কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কর্ম মানেই পাপ, আত্মজ্ঞান সমস্ত কর্মের বীজকেই ভস্ম করে দেয়। আত্মজ্ঞানের মত শুদ্ধিকর আর কিছুই হয় না, এই ভাবটাই আমাদের শাস্ত্রে অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে। অন্য যে শুদ্ধিকারক আছে তা মনের মলিনতা, শরীরের মলিনতাকে পরিষ্কার করবে। কিন্তু আত্মজ্ঞান মলিনতার যে শেকড় সেটাকেই নিঃশেষে পরিষ্কার করে দেয়। দ্বিতীয় তপস্যা করলে, নানা রকমের ব্রতোপবাস, তীর্থাদিতে যাওয়া এগুলো করলে মানুষ শুদ্ধ হয়, মানে ধর্ম-অধর্মকেই উড়িয়ে দেয়। তৃতীয় অগ্নি সবাইকে শুদ্ধ করে, কোন জিনিষে সন্দেহ হলে সেটা অগ্নিতে একবার ঠেকিয়ে নিলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে। চতুর্থ আহার, আমি এখন ঠিক করেছি এক মাস যাবৎ মাছ-মাংস খাবো না, দুধ, ফলমূল প্রভৃতি পবিত্র খাদ্যবস্তু গ্রহণ করব, এই আহার আমাকে শুদ্ধ করবে। খাওয়া-দাওয়ার উপর শরীর মনের শুদ্ধতা অনেকাংশেই নির্ভর করে। আমি যদি বলি আমি এই দশ দিন একাহারী হব, তখন এই আহার আমাকে শুদ্ধ করে দেবে। বিভিন্ন তিথি পার্বণে, যেমন একাদশী, পূর্ণিমা, অমবস্যা উপবাস করলে শরীর মন দুটোকেই শুদ্ধ করে। পঞ্চম মাটি, আগেকার দিনে সাবানের প্রচলন ছিল না, মাটিই সাবান হিসাবে ব্যবহার করা হত, তাই বলছেন মাটি শুদ্ধ করে। ষষ্ঠ মন, জপ-ধ্যান করে কেউ যদি নিজের মনকে পরিষ্কার করে নিতে পারে তখন তার সব কিছুই শুদ্ধ হয়ে যাবে, তার কাছে অশৌচ কোন ব্যাপারই থাকবে না। সপ্তম জল, জল মানুষকে শুদ্ধ করে। অষ্টম অনুলেপন, শরীরে কিছু কিছু দ্রব্য যেমন হলুদ, নিমপাতা ইত্যাদি অনুলেপন করলে শরীর শুদ্ধ হয়। গোময় দিয়ে বাড়ির উঠোন লেপন করলে সব শুদ্ধ হয়ে যায়। নবম বায়ু, বাতাস সব কিছুকে শুদ্ধ করে। গঙ্গাজল একবার খেয়ে নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দিলে ভেতরের সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যাবে, কোন কিছুতে সন্দেহ হলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেই সেটা শুদ্ধ হয়ে যাবে। এখানে লক্ষণীয় হল আমাদের যে পঞ্চ তত্ত্ব আছে অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও মাটি এই পাঁচটাই পবিত্র করে। এই পাঁচটা মহাতত্ত্বের সাথে আরও কয়েকটি জিনিষকেও পবিত্রকারী রূপে যুক্ত করা হয়েছে। দশম সৎকর্ম, যজ্ঞাদি কর্ম করলে শুদ্ধ হয়। যদি দেখি আমার কিছু দোষ হয়ে গেছে তখন আমি যদি যজ্ঞাদি করি, এখনকার দিনে খুব করে জপ করলে, দান ইত্যাদি কোন শুভকর্ম করলে সেই দোষটা ঠিক হয়ে যাবে। একাদশ সূর্য, সূর্যের আলোও মানুষকে শুদ্ধ করে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করে সূর্যের আলো আমার শরীরে লাগিয়ে নিলে রাত্রিতে যা পাপ হয়েছে সেটা শুদ্ধ হয়ে গেল। সূর্যের আলোতে অশুদ্ধ জিনিষ রেখে দিলেও শুদ্ধ হয়ে যায়। সব থেকে সুন্দর বলছেন, সময়ের সাথে সব কিছুই শুদ্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে বড়রা অনেক সময় কোন কারণে খুব রেগে গেছেন, বাড়ির লোকরা তার কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াতে থাকে। আমরাও এক সময় স্কুলে, কলেজে কারুর উপর খুব রেগে গেছি। এখন যখন ওই ঘটনার দিকে তাকাই তখন বেশীর ভাগ ঘটনারই কোন তাৎপর্য খুঁজে পাইনা, সবই যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। তার মানে সময়ের সাথে সাথে মনের ওই অশুদ্ধ ভাবটা শুদ্ধ হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু ঘটনা সময়ের সাথে মুছে যায় না কিন্তু দোষগুলো সময়ের সাথে চাপা পড়ে যায়। এইসব কথা বলে বলছেন –

সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।

যোহর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদারিশুচিঃ শুচিঃ।।৫/১০৬

বলছেন জল, অগ্নি, মাটি প্রভৃতি শুদ্ধিকর জিনিষের মধ্যে অর্থশুদ্ধিকে উৎকৃষ্ট শৌচ বলে মনু নির্দেশ করছেন। তার মানে মনু বলতে চাইছেন, অন্যায় ভাবে যদি অর্থোপার্জন না করে থাকে, ঘুষ না নিয়ে বা মিথ্যা কথা না বলে, ন্যায় ভাবে যদি টাকা রোজগার করতে পারে, আর খুব দান-ধ্যান করে তখন সেটাই হবে সব থেকে বড় শুদ্ধি। আসলে ঘুষ নিয়ে, মিথ্যা কথা বলে অর্থ না নেওয়া মানে সেই ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক পরের দ্রব্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। সেই ব্যক্তিই যথার্থ শুদ্ধ পবিত্র। আপনি কাজ করেছেন, যা আপনার প্রাপ্য সেটুকু নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা যে এত শুদ্ধ পবিত্র হতেন তার প্রধান কারণ এটাই, দানে যা পেলেন তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন, তার বেশী পাওয়ার জন্য কখনই কারুর কাছে যাঞ্জা করতেন না।

পরের দিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে লোভ জন্মাল। তীর্থাদিতে পাণ্ডারা যেভাবে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে দক্ষিণা আদায় করে, এগুলো সব অশুদ্ধ অর্থ। অন্য দিকে যারা ঘুষ নিচ্ছে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে অসদোপায়ে জাল বিল তৈরী করে অর্থ রোজগার করছে, এগুলো সব অশুদ্ধ অর্থ, অশুচি জিনিষকে যেমন স্পর্শ করতে নেই, এদের এই সব অর্থও সেই রকম অশুচি, স্পর্শও করতে নেই। তাই বলছেন টাকা যদি শুদ্ধ হয় তখন এর মত শুদ্ধ আর কিছু হয় না। অন্য দিকে যারা রোজ গঙ্গান্নান করছে, মাটি বা সাবান দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার রাখছে তাদের থেকেও পরিষ্কার হলেন যাঁর অর্থটা শুদ্ধ।

গুরু নানকের খুব নামকরা একটা কাহিনী আছে। গুরু নানকের নাম তখন সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। একবার এক খুব ধনী লোক গুরু নানককে তার বাড়িতে আহ্বানের জন্য আপ্যায়ন করেছেন। গুরু নানক সেই ধনীর বাড়িতে গেলেন না। কিন্তু আরেকজন অতি সাধারণ লোকের আমন্ত্রণে তার বাড়িতে গুরু নানক চলে গেলেন। এই নিয়ে বড়লোকের বাড়ির লোকেরা খুব রাগারাগি করতে শুরু করে দিয়েছে। গুরু নানকের আবার যোগের অনেক সিদ্ধাই ছিল। গুরু নানক তখন বললেন ‘ঠিক আছে! ওদের বাড়িতে আমার জন্য যত খাবার তৈরী করা হয়েছে সব এখানে নিয়ে এস’। যত রকমের খাবার তৈরী হয়েছিল, হালুয়া, পুরি সব নিয়ে আসা হয়েছে। গুরু নানক খাবার গুলিকে হাতের মধ্যে নিয়ে টিপতে থাকলেন। টিপতেই সবাই দেখছে ওই খাবার থেকে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। আর এই অতি সাধারণ লোকের দেওয়া শুকনো রুটি টিপতেই দেখছে ঝর ঝর করে দুধ পড়ছে। তখন লজ্জায় বড়লোক বাড়ির লোকেরা আর কিছু বলল না। অসদোপায়ে উপার্জিত অর্থের অল্প সব সময় অশুদ্ধ। তবে কি আমরা নিজেদের অর্থশুদ্ধির ব্যাপারে সচেতন হতে পারি না, তার কারণ কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ এমন যে এর থেকে বেরোন খুব মুশকিল। বেশির ভাগ সরকারি অফিসে কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, দেরীতে কাজে যাচ্ছে, আগে চলে আসছে, যেটুকু সময় অফিসে কাজ করার সেটুকুও ঠিক মত করছে না। আবার ওই কাজের মধ্যেই আবার ঘুষ নিচ্ছে। সেইজন এদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও সেই রকম হচ্ছে। কিন্তু মনু বলছেন, যার টাকা শুদ্ধ সে বিরাট শুদ্ধ, কারণ তার বাকি সব কিছুই শুদ্ধ।

ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ।

প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ।।৫/১০৭

এই অংশের প্রত্যেকটি শ্লোকরই খুব মূল্য আছে। আরও কি কি ভাবে মানুষ শুদ্ধ হয় বলছেন। বিদ্বান ব্যক্তি ক্ষমার দ্বারা শুদ্ধ হন। আমাদের কেউ অপমানিত করেছে, আমি যদি তাকে ক্ষমা করে দিই, তখন আত্মজ্ঞানের জন্য এর থেকে বেশী শুদ্ধি আর কিছুতে হবে না। এটা বলা হচ্ছে যাঁরা বিদ্বান পুরুষ তাঁদের জন্য, মুখুরা ক্ষমা করতে পারবেই না। এখানে প্রায়ই আমরা ভুল করি। স্কুলের শিক্ষক বিদ্বদজন, কোন ছাত্র যদি অন্যায় করে তখন কি শিক্ষক সেই ছাত্রকে ক্ষমা করবে কি করবে না? কারুকে শোধরানোর জন্য, ভালো করার জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয় সেটা এর মধ্যে পড়ছে না। ছাত্র অন্যায় করেছে, ওকে যদি শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে সে ভালো মন্দের আচরণটাই শিখবে না। ছাত্রকে শাস্তি দিয়ে তাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা, কান মূলে দেওয়ার মধ্যে বিষ ঢালা হচ্ছে না। এখানে এই নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না। শিক্ষক যখন ছাত্রকে শাস্তি দেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা রাগের বশে শাস্তি দেন না। ছাত্রকে যে রাগটা দেখাচ্ছেন এটা তাকে শোধরানোর জন্য, এখানে ব্যক্তিগত কিছু নেই, ইংরাজীতে বলা হয় nothing personal about it। যেমন বিচারকরা যখন রায় দেন তখন সেখানেও তাঁদের ব্যক্তিগত কিছু থাকে না, আইন যেভাবে বিচার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সেই অনুসারে তিনি তাঁর রায় দেন, আইনে এই বলা আছে এই কাজে এই সাজা। যেখানে ব্যক্তিগত ব্যাপার আসবে সেখানেই ক্ষমার কথা বলা হচ্ছে। সেটাই এখানে বলছেন বিদ্বানরা সব সময় ক্ষমা দিয়ে শুদ্ধ হন। বিশেষ করে বাড়িতে যারা চাকর-বাকর আছে তাদের প্রতি সব সময় ক্ষমার ভাব রাখতে হয়। বেশীর ভাগ মানুষ রেগে গেলে ধৈর্য হারিয়ে দু-চারটি কড়া কথা শুনিয়া দিলে নিজেকে খুব তৃপ্ত মনে করে। আপনি বিদ্বান কিনা বোঝা যাবে আপনি ক্ষমা করতে পারছেন কিনা। মহাভারতে ক্ষমাকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে কথায় কথায় বলা হচ্ছে ক্ষমার মত কিছু নেই।

যারা অকার্য করে অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য করে তারা দান দ্বারা শুদ্ধ হয়। তাহলে দান কারা করে? যারা অনেক পাপ কার্য করেছে। কিন্তু দান করলে আবার পুণ্যও হয়। যারা লুকিয়ে গোপনে কোন খারাপ কাজ করে, ইংরাজীতে বলা হয় secret sin, আমরা অনেকে প্রায়ই লুকিয়ে অনেক পাপকর্ম করি যে পাপের কথা কেউ কোন দিন জানতে পারে না। যেমন এমন গোপনে আড়ালে ঘুষ নিচ্ছে যেটা কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। তাছাড়া গোপনে নারীসঙ্গ করা, যেগুলো অনেকেই জানতে পারে না। বলছেন এই ধরনের গোপন পাপ কর্ম গায়ত্রী জপ করলে কেটে যায়। আর শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞরা, বেদজ্ঞতা যাঁরা তাঁরা এমনিতেই শুদ্ধ। কিন্তু তপস্যার দ্বারা তাঁরা আরও শুদ্ধ পবিত্রতা অর্জন করে একেবারে খাঁটি সোনা হয়ে যান। বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) নামে ঠাকুর যেমন বলছেন, ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। তপস্যার আবার অনেক রকম বিধান আছে। এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক।

মৃত্তৌয়েঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।

রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ।।৫/১০৮

মলিন বা অপবিত্র বস্তু, যেমন উচ্ছিষ্ট পাত্র এগুলো মাটি ও জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়, এখন মাটির বদলে সাবান ব্যবহার করার চল হয়েছে, তাতেই শুদ্ধ হয়। নদী তার বেগে শুদ্ধ হয়, নদীতে যদি স্রোত থাকে তাহলে সেই নদীর জলে থুতুই ফেলুন আর যাই ফেলুন সব নদীর প্রবাহেই শুদ্ধ হয়ে যায়। মেয়েদের শুদ্ধির ব্যাপারে কিছু কথা বলছেন, মনে মনে যে পাপ মেয়েরা করেছে, সেই পাপও একটা সময় তাদের কেটে যায়। কোন ব্রাহ্মণ যদি সন্ন্যাস নিয়ে নেয় সেই ব্রাহ্মণের সর্বশুদ্ধি হয়ে যায়। সন্ন্যাসেই ব্রাহ্মণের শেষ শুদ্ধি।

অভির্গাত্ৰাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি।।৫/১০৯

ঘাম বা অন্য কিছু মালিন্যতা থেকে শরীর অশুদ্ধ হলে স্নান করলে সেই শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়। মনের দ্বারা কোন নিষিদ্ধ বিচার, যে বিচার মনকে দূষিত করে সেই ধরনের কোন বিচারের দ্বারা যখন মন অশুদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি যদি সত্য কথা বলে দেয় ‘হ্যাঁ আমি মনে মনে এই রকম খারাপ চিন্তা করছিলাম’, তাহলে সেই দূষিত মন শুদ্ধ হয়ে যায়। জীবাত্মা অর্থাৎ আমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ উপনিষদাদি শুনলে আর তার সঙ্গে তপস্যা করলে তিনি শুদ্ধ হন এবং বুদ্ধি জ্ঞান বা শিক্ষার দ্বারা শুদ্ধ হয়। এই যে আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি এতে আমাদের সবারই বুদ্ধি শুদ্ধ হচ্ছে, এই অর্থেই মনু বলছেন।

এই ভাবে বিরাট লম্বা শুদ্ধির ব্যাপারে বলে যাচ্ছেন, সুতির কাপড় কিসে শুদ্ধ হবে, উলের কাপড় কিভাবে শুদ্ধ করতে হবে সব বলে যাচ্ছেন। এগুলো অত বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার এখন আর দরকার পড়ে না, কিন্তু শুদ্ধির ব্যাপারে কয়েকটি খুব মূল্যবান শ্লোককে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন ভারতের এত দূরবস্তুর কারণ হল এখানে বড্ড বেশী নিয়ম-কানুন। যে সমাজে নিয়ম-কানুন যখন বেশী হয় সেই সমাজের তখন অধোগতি হয়। যেখানেই প্রচুর আইন আছে সেখানে আইনের ফাঁক বার করা, আইনকে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাটা লোকেদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। যেখানে আইন কম থাকে সেখানকার সমাজে বেশী গোলমাল হয় না। সেইজন্য সমাজ ও মানুষকে যদি ঠিক রাখতে হয় তাহলে আইন কম রাখতে হয়। কিন্তু দুষ্ট লোকের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন এরা বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আইনের অনেক ফাঁক বার করে। তখন আবার সেই ফাঁকটাকে বন্ধ করতে আরেকটা নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়।

ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।

অদৃষ্টমভির্নির্গিতং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে।।৫/১২৭

দেবতারা ব্রাহ্মণদের জন্য তিন রকমের বস্তুকে শুদ্ধ বলে স্থির করে দিয়েছেন। প্রথম হল অদৃশ্য, চোখের সামনে কোন বস্তুকে যদি অশুদ্ধ হতে না দেখা হয়ে থাকে, যেমন এই চেয়ারে আগে থেকে কেউ খুতু ফেলে গেছে সেটা আমি দেখিনি। কিন্তু আমি যখন এসে চেয়ারে বসছি তখন শুদ্ধ মনে করেই বসছি, এতে আমার কোন পাপ লাগবে না। দ্বিতীয় নজরে যদি পড়ে যায় তখন আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যদি সন্দেহও একটু থাকে তখন একটু জল ছিটিয়ে দিলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে। স্নানের পর ঠাকুর যখন বস্ত্রাদি পড়তেন তখন তাতে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতেন। কারণ কে না কে কাপড় ভাঁজ করেছে জানা নেই। এই জিনিষগুলো সবারই করা উচিত - যেমন স্নান করে পূজা করতে বসার আগে জামা কাপড়ে, আসনে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে এবং একটু গঙ্গাজল মুখে দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে হয়। এখানে শুধু জল ছিটিয়ে নিতে বলছেন। তৃতীয় নির্ণীক, কোন ব্রাহ্মণ বা কোন গুরুজন যদি বলে দিয়ে থাকেন এটা শুদ্ধ, তাহলে সেটা শুদ্ধ বলেই মানতে হবে। কেউ গর্হিত কোন কাজ বা দোষ করেছে, এরপর কোন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছে, সন্ন্যাসী তাকে বলে দিলেন, তুমি শুদ্ধ পবিত্র। সন্ন্যাসীর মুখের কথাতেই সে শুদ্ধ হয়ে গেল। কিংবা মা যদি সন্তানকে বলে দেয় এটা শুদ্ধ, তুমি খেতে পার। তখন সেটা শুদ্ধই হবে। মা যদি দেখেও থাকে এটা দোষযুক্ত এবং দিয়েও দেয়, যদি মা বলে দেয় এটা শুদ্ধ তখন সেটা শুদ্ধই। তোমার সন্দেহ থাকুক আর নাই থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি নলিনী দিদির প্রচণ্ড ছুঁচিবাঁই ছিল। নলিনী দিদি একবার রাহুয় কিছু মাড়িয়ে এসেছে। মা বলছেন একটু গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে নিতে। নলিনী দিদি কিছুতেই মানছেন না। তখন মা বললেন ঠিক আছে আমাকে ছুঁয়ে দে। গুরুজনরা বলে দিলে তাতেই শুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে অনেক কিছু বলছেন -

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।

প্রসবে চ শুচিবৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।।৫/১৩০

স্ত্রীজাতির মুখ সব সময়ই শুচি থাকে, এখানে হয়তো রতিকালের সম্পর্ক নিয়ে বলছেন। যদি কোন পাখির চঞ্চু দ্বারা ঠোকরান ফল মাটিতে পড়ে যায় তখন ওই ফলটা উচ্ছিষ্ট হবে না। গোদহনকালে বাছুর গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে থাকলে সেই দুধ উচ্ছিষ্ট হবে না। শিকারের সময় যখন কুকুর গিয়ে কোন আহত পশু বা পাখিকে মুখে করে নিয়ে আসে তখন সেটা উচ্ছিষ্ট হয় না। এই ভাবে কোনটা উচ্ছিষ্ট, কোনটা অশুদ্ধ অনেক কিছু বলার পর একটা শ্লোকে এসে বলছেন -

এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।

ত্রিগুণং স্যাদ্ধনস্থানাং যতীনাশ্চ চতুর্গুণম্।।৫/১৩৭

এই যে এতগুলো শুদ্ধির কথা বলা হল এগুলো গৃহস্থদের জন্য। ব্রহ্মচারীরা এর দুই গুণ শুদ্ধি পালন করবে, বাণপ্রস্থি তিন গুণ আর সন্ন্যাসীরা চার গুণ বেশী পালন করবে। এখন কোন গৃহস্থকে যদি কোন কিছু শুদ্ধির জন্য দু বার হাত ধুতে হয়ে, সেই একই জিনিষের শুদ্ধির জন্য একজন সন্ন্যাসীকে আট বার হাত ধুতে হবে। এই ভাবে চললে তো সন্ন্যাসীকে সারা দিন হাত ধুয়েই যেতে হবে। আসলে শুদ্ধিকে ধরে রাখতে হলে আগে একটা শ্লোকে যেমন বলেছেন, সর্বদা বেদাভ্যাস, মানে নিয়মিত জপ-ধ্যান করে যেতে হবে। আর শৌচের দ্বারা শরীর ও মনকে সব সময় শুদ্ধ পবিত্র রাখা। এই দুটোর সাথে সবার প্রতি অদ্রোহ ভাব। এগুলো করলে মানুষ পূর্বজন্মের স্মৃতি জানতে পারে। সেইজন্য এনাদের কাছে শরীর আর মনের শুচি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শৌচ ও আচমনের ব্যাপারেও অনেক নিয়ম বলছেন। এর মধ্যে কখন কোনটা এঁটো হবে, কোনটা এঁটো হবে না বলছেন, যেমন একটা শ্লোকে বলছেন -

স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।

ভৌমিকৈস্তে সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ।।৫/১৪২

আগেকার দিনে লোটা থেকে ঢেলে লোককে জল খাওয়াতো। লোটা থেকে আপনার হাতে আমি জল ঢালছি, আপনি সেই জল খাওয়ার সময় জল ছিটকে আমার পায়ে পড়ছে, তাহলে আমার পায়ে এঁঠো জল পড়ছে। কিন্তু এখানে বলছেন, ওই জলটা এঁঠোর মধ্যে পড়বে না, বিশুদ্ধ জমির উপর অবস্থিত জলের মতই ওই জলটা শুদ্ধ। এই ধরনের বিরাট লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন। আবার বলছেন –

সুপ্তা ক্ষুত্ৰা চ ভুক্তা চ নিষ্ঠীব্যোক্তান্তানি চ।

পীত্বাপোহধ্যৈষ্যমাণশ্চ আচামেৎ প্রযতোহপি সন্।।৫/১৪৫

আপনি যদি আগে থেকেই সব দিক থেকে শুদ্ধ থাকেন তাও ঘুম থেকে উঠে আপনাকে আচমন করতে হবে। আর কখন কখন আচমন করতে হবে? হাঁচি দেওয়ার পর, খাওয়া-দাওয়ার পর, খুতু ফেলে আর অসত্য ভাষণের পর, যদি মিথ্যে কথা বলে থাকে তাহলে আচমন করতে হবে। এমনকি জল পান করার পরেও আচমন করতে হবে। আচারী ব্রাহ্মণরা সব সময়ই এই আচমনই করতে থাকতেন। আর যখন বেদাধ্যয়ন করতে যাবে তখন আগে থেকে শুদ্ধ থাকলেও আচমন করে নিয়ে বেদপাঠ শুরু করবে।

এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম মনু একটা বিষয় থেকে দুম্ করে আরেকটা বিষয়ে চলে যাবেন। এখানেও শুচির কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্ত্রীধর্মের আলোচনাতে চলে এসেছেন। প্রথমেই বলছেন –

নারী স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মনু

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।

ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেহুপি।।৫/১৪৭

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।

পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।৫/১৪৮

কোন নারীই, তা সে বালিকাই হোক, যৌবনেই হোক কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় হোক, যে কোন কাজ অভিবাবকের ইচ্ছা ছাড়া করবে না। নারীর অভিবাবক কারা? শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বৃদ্ধা কালে পুত্র। এই শ্লোকের ব্যাপারে আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। মনু একদিকে বলছেন সব দিক থেকে মেয়েদের সুরক্ষা দিতে হবে, সমস্ত ভাবে তার সুখ-স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও কিন্তু অন্য দিকে তিনি মেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন।

কিছু দিন আগে ইতালির একজন বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর বায়োগ্রাফি বেরিয়েছিল। পরে তিনি আমেরিকাতে চলে গিয়েছিলেন। উনি অনেকবার বিয়ে করেছিলেন, একটা সময় তাঁর জীবনটা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের বায়োগ্রাফিতে লিখছেন – অনেক কিছু দেখা শোনার পর এখন আমার মনে হয় স্ত্রী যে অবস্থাতেই থাকুক স্বামীদের উচিত তাদের খুব কড়া অনুশাসনে রাখা, নাহলে স্ত্রীরা উৎসর্গে চলে যাবে। অথচ তিনি নিজেই খুব উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে গেছেন। তিনি নিজেই তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক কিছুর বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর বর্ণনার মধ্যে এমন এমন ঘটনা বলছেন যেগুলো ভদ্র সমাজে কাউকে বলাও যায় না। কিন্তু পরের দিকে যখন তাঁর জীবনে ঘোরতর সঙ্কট নেমে এল তখন তাঁর কোথা থেকে উপলব্ধি হল যে মেয়েদের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে না রাখলে মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হতে বেশী সময় নেবে না। তিনি নিজে আমেরিকান সমাজের কয়েকটি ঘটনার কথা বলে দেখাচ্ছেন আমেরিকাতে দিনে দিনে কিভাবে এগুলোর জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যার জন্য তিনিও লিখছেন আমার কিন্তু দৃঢ় মত মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়াটা ঠিক নয়। তুমি বিয়েথা করোনি, তুমি নিজের মত যা ইচ্ছে তাই করছ সেটা একটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু বিয়ের পর তোমাকে স্বামীর কড়া শাসনে থাকতে হবে। মনু কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে দৃঢ় – তুমি এখন নাবালিকা তোমাকে বাবার অধীনে থাকতে হবে। তোমার বিয়ে হয়ে গেল, এবার স্বামীর অধীনে। বার্ষিক্যে চলে এসেছ, এবার ছেলের অধীনে। কোন অবস্থায় মেয়েকে স্বাধীন ভাবে ছাড়া যাবে না।

মনুর এই নিয়মের উপর কে কি মত দিচ্ছেন সেটা কোন গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল তখনকার সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনুর কি চিন্তা ভাবনা ছিল আর সমাজ তখন কিভাবে চলত। বর্তমান দিনেও যদি কেউ গ্রামের দিকে যান সেখানেও দেখা যাবে এখনও তারা এটাই পালন করে আসছে। গত লোকসভার নির্বাচনে এনডি টিভি একটা বিশেষ বাস ছাড়া হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নির্বাচন সমীক্ষা চালাবার জন্য। সেই বাসে একজন মহিলা সাংবাদিক ছিলেন। কয়েক মাস যাবৎ সারা ভারত ঘুরে ঘুরে নির্বাচন সমীক্ষার রিপোর্টিং করেছিল। তারপর তিনি একটা বই লিখেছিলেন। সেখানে একটা জায়গায় সেই মহিলা সাংবাদিক লিখছেন যে, রাজস্থানের কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামে মেয়েদের ইন্টারভিউ নিতে গেছেন। গ্রামের মেয়েরা তাঁকে বলল, আমরা তোমাকে ইন্টারভিউ দেব তাতে তোমারই সুবিধা হবে আর তুমিও আমাদের কিছু সুবিধা করে দাও। কি সুবিধা করবে? আমরা কাস্তে দিয়ে গম কাটছি, তুমি আমাদের হয়ে একটু ক্ষেতের গম গাছ কেটে দাও। তারপরে সেই মেয়েটি যিনি কিনা সব দিকে খুব ওস্তাদ স্মার্ট ইত্যাদি, কিন্তু কাস্তে নিয়ে যতই চালাচ্ছে গম আর কাটতে পারছে না। একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। এর অবস্থা দেখে গ্রামের মেয়েরা খুব হাসছে। মেয়েটিতো ঘেমে নিয়ে একেবারে অস্থির হয়ে গেছে। তারপরে ভদ্রমহিলা খুব সুন্দর লিখছেন – গ্রামের মেয়েরা সারাটা দিন ক্ষেতে কাজ করে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরল। বাড়িতে ফিরে পুরোদমে সবারই জন্য রান্না করতে লেগে গেল। ভদ্রমহিলা লিখছেন, সারাদিন মাঠে কাজ করল। বিকেলে গিয়ে রান্না করে শাশুড়িকে খাওয়াচ্ছে, বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, স্বামীকে খাওয়াচ্ছে। আর শোয়ার সময় স্বামীর পা টিপছে। এরপর নিজের কথা বলছেন – ‘আমি এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে কাজ করি। আর আমার স্বামী যখন সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি ফেরে, আমাদের বাড়ির চাকরানী সে যা হোক করে একটা উদ্ভট রান্না তৈরী করে রেখে দেয়, বেচারীকে চোখ-কান বুজে চুপচাপ ওইটাই খেতে হয়। তখন আমার স্বামীর প্রতি একটু করুণা জেগে উঠল’। এখানে ভাবতে হয় আমি কাকে প্রাধান্য দিচ্ছি, ব্যক্তিকে না সমাজকে? ব্যক্তিকে যদি প্রাধান্য দিই, আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যা করা হচ্ছে, তাতে কি আর করা যাবে, ওদের মতই এগিয়ে যাব। তারপর যখন নানান রকমের সামাজিক ব্যাধি চাড়া দিয়ে উঠবে তখন তুমি সামলাও। বাচ্চাকে তো শুধু বাবা-মা বড় করে না, বাচ্চাকে পুরো সমাজ মিলে বড় করছে, পুরো একটা গ্রাম মিলে বড় করে। সবাই মিলেই বড় করছে। গ্রাম দেশে এখনও দেখা যায় কোন বাচ্চা অন্যায় করলে যে কোন লোক এসে তাকে ধমকে দিচ্ছে। এখন এখানে কাউকেই কিছু বলার নেই, কাউকে বলতে গেলে বলে দেবে – আপনি কে হে আমাকে বলার!

মনুর কাছে সমাজ, পরিবারের সামাজিক মূল্য। কিছু দিন ধরে ব্যাঙ্গালোর থেকে নর্থ-ইস্ট লোকেরা দলে দলে পালাচ্ছে। কেন পালাচ্ছে? কোথায় গোলমাল? গোলমালটা লাগল বার্মাতে কিছু মুসলমানরা বদমাইশি করছিল বলে সেখানকার সরকার এদের মেরে তাড়াচ্ছে। তার জন্য মুসলমানরা ভারতে বদমাইশি করতে শুরু করল। কি বলে বদমাইশি শুরু করল? আমাদের মুসলমান ভাইদের বার্মাতে মেরে তাড়াচ্ছে। এর ধাক্কা লাগল আসামে, আসামের ধাক্কাটা গিয়ে লাগল ব্যাঙ্গালোরে। এখনতো অনেক জায়গাতেই শুরু হয়ে গেছে। মুসলমানদের এমনই নিজেদের মধ্যে প্রীতি! স্বামীজী একটা জায়গায় খুব দুঃখ করে বলছেন – কবে সেই দিন আসবে যে দিন একজন হিন্দুর দুঃখ-কষ্ট দেখে আরেকজন হিন্দুর বুক ফেটে যাবে। কবে সেই দিন আসবে যেদিন একজন হিন্দু এসে বলবে – দেখো তুমি আমার ভাই, তুমি যে দেশেরই হও না কেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আমি তোমার পাশে আছি। আজকে আমাদের লজ্জাও করে না। কর্ণাটকে বিজেপির সরকার, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা এত ক্ষমতাসালী হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানের ভয়ে হাজার হাজার লোক নিজের কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। বলছেন, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের সময় যেভাবে লোক নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল ঠিক সেইভাবে লোক এখন পালাচ্ছে। কারুর লজ্জাও করছে না, হিন্দুদের কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাহস দিচ্ছে না যে, দেখি কে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে! হিন্দু সমাজ এক বিচিত্র জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, এরা না গ্রহণ করছে মনুর চিন্তা ভাবনা, না আছে এদের আমেরিকার মত ক্ষমতা। আমেরিকা যতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ হয়ে থাকুক কিন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্য কি না করছে। বিন লাদেনকে মারার জন্য সমাজের একটা অংশ তাতেই লেগে থাকল। আমরা এটা বুঝি না যে, সমাজ যদি অধঃপতনে যায়

তোমারও পতন হবে। একজন মারা গেলে সমাজ মরে যায় না, কিন্তু সমাজ দুবলে সবাই দুববে। মনুর এটাই প্রচেষ্টা, সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। সেইজন্য বলছেন মেয়েদের কোন ভাবে স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। কারণ নারীই পারে ঘর, পরিবার, সমাজকে সামলে রাখতে। আরেকটি শ্লোকে মনু বলছেন –

নারীর ধর্ম ও তার কয়েকটি গুণ

সদা গ্রহণ্য ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া।

সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া।।৫/১৫০

যদি স্বামী রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাও স্ত্রী হাসিমুখে থাকবে কারণ ঘর সামলানো তার কাজ। নারীকে গৃহকার্যে দক্ষ হতে হবে, বাড়ির ব্যবহার্য সমস্ত সামগ্রী, বাসন-পত্র থেকে শুরু করে জামা-কাপড় সব পরিষ্কার করে গোছগাছ করে রাখবে। আর অর্থ ব্যয়ে তাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, অযথা বেশী অর্থ ব্যয় যাতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকবে। এগুলো হল মেয়েদের গুণ। এখন আমাদের সমাজে বড়লোকদের বাড়ির বউ মেয়েদের মধ্যে একটা নতুন রোগ এসেছে compulsive buyer। এটাকে একটা মানসিক ব্যাধি বলে সবাই মেনে নিয়েছেন। এরা একটাই কাজ করে শুধু শপিং, শপিং ছাড়া আর কিছু কাজ করতে পারেনা। ভ্যানিটি ব্যাগে টাকা ভরে নিয়ে যাবে আর শপিং মল থেকে শপিং করে গাড়ি ভর্তি করে জিনিষপত্র নিয়ে আসবে। বেশীর ভাগ জিনিষই কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু তাও কেনা চাই। এটা এক ধরনের রোগ।

মেয়েদের এই গুণগুলোকে আধার করে একটা কাহিনী আছে। একজন বড়লোকের ইচ্ছে হল এই ধরনের কোন গুণবতী মেয়েকে বিয়ে করবে। লোকটি এবার এক সের ধান নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলছে ‘আমার এই এক সের ধান আছে, এই এক সের ধান দিয়ে কেউ আমার পুরো একটা খাবার বানিয়ে দিতে পারবে কি’? মানে, যতটা ভাত সে খাবে তার থেকে কিছু বেশী ধান আছে, কিন্তু এই ধান দিয়েই তার জন্য পুরো খাবারটা বানিয়ে দিতে হবে। লোকটি বলছে ‘যে আমাকে বানিয়ে দিতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করব। সবাই তার কথা শুনে হাসছে, এভাবে শুধু এক সের ধান দিয়ে পুরো খাবার বানিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সবাই জানে লোকটি খুব বড়লোক। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে গেছে। সেখানে এক সুন্দরী যুবতী বলল আমি বানিয়ে দিতে পারব। মেয়েটি ধানটা নিল। খুব কায়দা করে এত সুন্দর ভাবে ধানটাকে ভাঙল যে ধানের তুষ গুলো গোটা গোটা রয়ে গেল আর চালটা বেরিয়ে এল। মেয়েটি জানতো রূপো পরিষ্কার করতে এই ধরনের তুষকে ব্যবহার করা হয়। মেয়েটি বাড়ির কাজের মেয়েটিকে বলে দিল যারা রূপোর কাজ করে তারা এই ধরনের সুন্দর তুষ পেলে খুব খুশী হবে, ওদের এই তুষগুলো দেবে, তাতে তারা যে পয়সা দেবে তাই দিয়ে তুমি কিছু জ্বালানি কাঠ, একটা হাড়ি আর তেল-মশলা কিনে নিয়ে আসবে। সত্যিই তাই হল, তুষের পয়সা দিয়ে সব হয়ে গেল। এরপর যখন কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রান্না করেই জল দিয়ে কাঠের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। ওই জ্বলন্ত কাঠগুলো এখন হয়ে গেল কাঠ-কয়লা। ওই কাঠ-কয়লা গুলোকে আবার যাদের এই ধরনের কাঠ-কয়লা দরকার তাদের কাছে বিক্রীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটা বিক্রী করে সেই পয়সা দিয়ে আবার পান-মিষ্টি কিনে নিয়ে এসেছে। এরপর আরও অনেক রকম ভাবে কায়দা করে অন্যান্য কিছু খাবার সামগ্রী নিয়ে এসেছে। অনেক লম্বা কাহিনী, যাই হোক এর মূল ভাবটা হল যারা খুব মিতব্যয়ী ও বুদ্ধিমান তারা কোন কিছু নষ্ট হতে দেবে না, টাকা নষ্ট করবে না, সময় নষ্ট করবে না, ইমোশান নষ্ট করবে না। আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি, আমরা সবাই অযথা টাকা নষ্ট করি, সময়ের অপচয় করি আর সব থেকে বাজে হল আমাদের ভেতরে যে ইমোশান আছে সেটাকে বড্ড বেশী নষ্ট করি। আমরা অকারণে রেগে যাচ্ছি, আবার অকারণে হা হা হি হি করে হাসি মজা করছি, এইভাবে অযথা ইমোশানকে নষ্ট করতে নেই। আবার একটা শ্লোকে বলছেন –

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।।৫/১৫৪

স্ত্রীদের বলছেন – স্বামী যদি কোন কারণে সদাচারহীন হয়, পরস্ত্রীতে যদি অনুরক্ত হয় আর বিদ্যাদির যদি কোন গুণ না থাকে তা সত্ত্বেও পতিব্রতা স্ত্রী কিন্তু তাকে দেবতার মতই দেখবে। ঠাকুর বলছেন – যদ্যপি আমার গুরু গুঁড়ি বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। ঠিক তেমনি স্ত্রী নিজের স্বামীকে দেবতার মত দেখবে। এই শ্লোকটি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা অনেক কিছু রহস্য এর মধ্যে পেয়ে যাব। আজকালকার মেয়ে হলে কি করবে? বিয়ের পরের দিন যদি জানতে পারে তার পতি দেবতাটির চরিত্র বলে কিছু নেই, লেখাপড়া কিছু জানে না, সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্সের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। কিন্তু মনু এখানে বলছেন তুমি এরকমটি করো না। কেন মনু নিষেধ করছেন? স্বামীজী এক জায়গায় তাঁর বক্তৃতায় বলছেন, স্বামী যতই দুর্বৃত্ত হোক, যতই চরিত্রহীন হোক, যত বড় মাতাল হোক স্ত্রী যদি তার পতিব্রতা ধর্ম ও সেবা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তার ভেতরে এমন তেজ ও ক্ষমতার আবির্ভাব হবে যে যার প্রভাবে তার স্বামী দেবতাটিকে একদিন না একদিন সঠিক পথে আসতেই হবে। এই নিয়ে আবার সমস্যা হল ইদানিং কালে সবাই বলবে, ভালো তো! স্বামীই এটা স্ত্রীদের প্রতি করুক না। এই নিয়ে পরে বিরাট আলোচনা করা হয়েছে। মনু সেখানে দেখাচ্ছেন স্বামী আর স্ত্রীর এক অপরের প্রতি কি ভূমিকা। আর এই ভূমিকার কোন জায়গাতে জোর দিতে হবে। মনু সেখানে নারীকে বলছেন মাটি আর পুরুষকে বলছেন বীজ। মাটি যদি খারাপ হয়ে যায় সেই মাটিতে আর কোন ফসল হবে না। সেইজন্য আগে মাটিকে ঠিক রাখতে হয়। সেটাই এখানে বলা হচ্ছে, স্ত্রী যদি ঠিক থাকে তাহলে সে স্বামীকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে চলে যেতে পারে। আর সমাজ চলে স্বামীর জোরেই। আজকের দিনে নারী প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, আর্মির চীফ হতে পারে, সিইও হতে পারে কিন্তু জেনেটিক্যালি আয় করার ক্ষমতা পুরুষের হাতে। সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা পুরুষের দ্বারাই সম্ভব। এই পুরুষই যদি গোলমালে হয়, তাকে সারাবেটা কে? অন্য দিকে স্ত্রীর থেকে নিকট বন্ধু তার আর কেউ নেই। যে কোন পুরুষের জন্য সবচেয়ে পুরনো ও কাছের একমাত্র বন্ধু হল তার স্ত্রী, কারণ দুজনের জীবনটাই একে অপরের সাথে জুড়ে রয়েছে। মা-বাবা যতই কাছের হোক কিন্তু একদিন তো তারা মারা যাবে, মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, ছেলে বিয়ে করে কোথায় চলে যাবে কোন নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনকে সব সময় কাছে পাচ্ছে, দুজনেই হল প্রকৃত বন্ধু। সেখানে যদি বন্ধুত্বের ভাব না থাকে তাহলে বুঝে নিন স্বামীর জীবনটা নরকে চলে গেল। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে উল্টোটা কেন হয় না? কারণ কিছু কিছু গুণ, যেমন ধৈর্য, ক্ষমা, ভালোবাসা, মমতা, স্নেহপরায়ণতা, বাৎসল্যতা এই গুণগুলো ছেলেদের থাকে না, মেয়েদের মধ্যেই থাকে। সেইজন্য যে পথে গেলে সব কিছু সহজ হবে সেই পথটাকে এনারা বেছে নিয়েছেন, মেয়েদের এভাবে রাখ। কিন্তু আমরা মানছি না, চারিদিকে তার ফলও হাতে হাতে পাচ্ছি।

এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিষ মাথায় রাখতে হবে, এখন যেমন উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, উদ্ধত মেয়েরা যারা আছে তাদেরকে এখানে ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না। আমি একটা নারী শরীর পেয়েছি, বাড়ির প্রথা অনুযায়ী একটা বয়সে মা-বাবা আমাকে বিয়ে দিয়েছে। এখন আমার লক্ষ্য হল এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে আমি কিভাবে আমার জীবনকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করতে পারি। এই যে ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক উন্নতি, এই ভাবটাই হল প্রধান। আমার যদি আধ্যাত্মিক সত্যে আস্থা না থাকে তাহলে এসব কথার কোন দরকার নেই, তখন ভারতীয় সংবিধানকে মেনে চললেই সব ঠিক থাকবে। যদি আমি মনে করি এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে আমি আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে চাই, তখন এগুলো কাজে লাগবে – সারা জীবন স্বামীর সেবা করে যাবে, স্বামী মারা গেলে কোন পুরুষের নাম পর্যন্ত মুখে আনবে না। বলছেন একমাত্র পতিব্রতা ধর্মকে আশ্রয় করেই তুমি আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পার।

আবার বলছেন তুমি যদি বিধবা হয়ে যাও তাহলে সারা জীবন তুমি ক্ষমাগুণশালিনী হয়ে থাকবে, কখন কারুর প্রতি রাগ বিদ্বেষ দেখাবে না এবং নিয়মাচারিণী হয়ে মধু-মাংস-মৈথুনবিবর্জন রূপ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এখানে ব্যাখ্যাকাররা বলছেন *নিয়তব্রহ্মচারিণী*, ব্রহ্মচারিণীরা যে ব্রত পালন করে, বিধবারাও সেই ব্রত পালন করবে। তার মানে, কোন প্রকার ভোগে তারা যাবে না, মাছ-মাংস খাবে না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ বিধবারাই মাছ-মাংস খায় না। যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয় কেন

আপনারা খান না? বলবে, খেতে নেই। তা নয়, যখন মাছ-মাংস, মদ খাওয়া হচ্ছে তখন শরীরে তাপ বৃদ্ধি হয়, শরীরে তাপ বৃদ্ধি হলে কাম বেগ বাড়ে। আসলে একজন বিধবার জীবন মানে সন্ন্যাসীর জীবন। সন্ন্যাসী যে ভাবে জীবন-যাপন করে একজন বিধবার জীবনও সেইভাবেই চালিত হয়। সন্ন্যাসীও এক প্রকার বিধবা, জগতে যত রকমের ভোগ থাকতে পারে দুজনেই তার সমস্ত কিছু থেকে দূরে। ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া মন আর কোন দিকে যাবে না। সন্ন্যাসী যেমন কোন ধরনের নারী চিন্তন করবে না, ঠিক তেমনি বিধবারা পুরুষ চিন্তন করবে না। সন্ন্যাসীর জীবন যেমন একেবারে সাদাসিধে, বিধবার জীবনও তাই। এই জায়গাটা আমরা ধরতে পারিনা। এখন কোন বিধবা যদি বলে, আমি একা থাকতে পারবো না, আমি আবার বিয়ে করব। না থাকতে পারলে করো, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না। কিন্তু পতিব্রতা ধর্ম পালন করে তোমার যে ঈশ্বর লাভ করার সুযোগ এসেছিল, সেই সুযোগটা তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এটা সবারই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি একবার ঠিক করে নিলেন আমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করব, এখন তিনি সন্ন্যাসীই হয়ে যান, গৃহীই থাকুন, বিধবা হয়ে যাক বা বিয়ে না করেই থাকুক, এখানে তাঁর আদর্শ একটাই থাকবে, প্রথম সে যদি পুরুষ হয় তাহলে কোন নারীর চিন্তা করবে না, আর যদি নারী হয় তাহলে কখন কোন পুরুষের চিন্তা করবে না, অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ধর্ম পালন তাকে করতে হবে। দ্বিতীয়, ভোগের যত রকমের সামগ্রী আছে তার থেকে দূরে থাকবে।

সন্তান দ্বারা নয়, তপস্যার দ্বারাই মানুষ স্বর্গ লাভ করে

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।

দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্।।৫/১৫৯

বেদে বলা আছে যে, সন্তান না হলে নাকি স্বর্গে যাওয়া যায় না। যাদের সন্তানাদি নেই তারা পুত্র নামক নরকে গিয়ে পড়ে। পুত্র পুত্র নামক নরক থেকে উদ্ধার করে বলে তার নাম পুত্র। কিন্তু মনু এখানে বিপরীত কথা এনে এই ধারণাটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, বালখিল্যাদি যে ঋষিরা ছিলেন তাঁরা শৈশব থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছেন। ব্রহ্মচর্য পালন করে সন্তানোৎপত্তি না করেও তাঁরা স্বর্গে গিয়েছিলেন। সেইজন্য সন্তান না হলে আমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না এটা মনে করা ঠিক নয়। মানুষ স্বর্গে যায় তপস্যার দ্বারা। বিয়ে করা, সন্তানের জন্ম দেওয়া, এগুলোও যজ্ঞ। এই যজ্ঞের মাধ্যমেও মানুষ স্বর্গে যায়। কিন্তু যে বলে দিল আমি বিয়ে করবো না, সন্তান উৎপত্তিতে যাবো না, তখন তার যজ্ঞের ধরণটা অন্য রকম হবে।

মৃত্যে ভর্তৃরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।

স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।৫/১৬০

অপত্যলোভাদ্ য তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে।

সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে।।৫/১৬১

যদি কোন নারী কম বয়সে বিধবা হয়ে যায়। এরপর সে যদি পুরোপুরি পতিব্রতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে ব্রহ্মচারীর মত থাকে আর তার সন্তান যদি নাও থাকে সেও কিন্তু স্বর্গে যাবে। এখানে মনু পরিষ্কার দৃষ্টান্ত এনে বলছেন, বালখিল্য ঋষিরা যেমন শৈশব কাল থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, সন্তান উৎপত্তি না করেও স্বর্গ লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি একজন বিধবা যদি ব্রহ্মচর্য পালন করে আর তার সন্তানও যদি না থাকে সেও স্বর্গে যাবে। যদি কোন স্ত্রী শুধু মাত্র সন্তানের লোভে স্বামীর উল্লঙ্ঘন করে এবং তাতে যদি তার সন্তান হয়েও যায়, তখন সে স্বর্গ থেকেও নষ্ট হয় আর এই লোকে নিন্দিত হয়। স্বামী অথর্ব হতে পারে, নপুংসক থাকতে পারে বা স্ত্রী বিশেষ কোন পুরুষের থেকে সন্তান চাইছে ইত্যাদি। তার মানে এই ধরনের ঘটনা তখনকার দিনেও ছিল, যেখানে স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গ করছে শুধু সন্তান পাবার জন্য। নিয়োগপ্রথা ব্যতিরেকে কোন কারণে পর পুরুষ থেকে সন্তান উৎপত্তি হওয়াটা শাস্ত্র সম্মত নয় এবং লোকে এই কার্য কখনই প্রশসিত হয় না।

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যেব সা ভবেল্লোকে পরপূর্বেতি চোচ্যতে।।৫/১৬৩

কোন স্ত্রী তার নীচবর্ণের বা ধন-মান-কুল-শীলাদিতে নিকৃষ্ট স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে যদি উচ্চবর্ণের পুরুষের কাছে চলে যায়, সেটাকেও ভালো দৃষ্টিতে দেখা হয় না। মনুষ্য সমাজে সে নিন্দিত হয় আর সকলে তাকে ‘পরপূর্বা’ বলে সম্বোধন করে। ‘পরপূর্ব’ মানে সবাই বলবে আগে এর অন্য পতি ছিল। তখনকার দিনে মেয়েদের দ্বিতীয় পতিগ্রহণ করাকে ভালো চোখে দেখা হতো না। তার মানে সেই সময় পুনর্বিবাহ প্রথা মেয়েদের মধ্যেও ছিল। আমরা যদি ভাগবতের দিকে তাকাই সেখানেও দেখতে পাই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলছেন, ‘তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে ছেড়ে শিশুপালের কাছে চলে যেতে পার’। আমরা অনেকেই মনে করি তখনকার দিনে মেয়েদের দ্বিতীয় বিবাহ ছিল না, বিধবারা বিয়ে করতে পারতো না, কিন্তু তা নয়, এগুলো রীতিমত ছিল। যদি কোন কারণে স্বামীকে পছন্দ না করে তখন সে তাকে ছেড়ে আরেকজনকে পতিত্ব রূপে গ্রহণ করতে পারত। কারণ এই শ্লোকেই নীচবর্ণকে ছেড়ে উচ্চবর্ণে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন, তার মানে এগুলো তখন হত। যদিও উচ্চবর্ণের পুরুষকে পতি রূপে দ্বিতীয় বিবাহ করছে কিন্তু এটাকে নিন্দা করছেন। এই ধরনের কিছু স্ত্রী ধর্মের উপর বললেন। স্ত্রী ধর্মে মূল কথা হল তোমার নিত্য জীবন-যাপনের ব্যাপারে সদা সর্বদা সাবধান ও সজাগ থাকতে হবে।

ষষ্ঠোহধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহস্থশ্রম সম্পাদন করার পর কখন, কিভাবে বাণপ্রস্থশ্রমের ধর্ম পালন করবে। কখন একজন গৃহস্থ বাণপ্রস্থী হবে? বলছেন –

বাণপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম

গৃহস্থস্ত যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।

অপত্যসৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।।৬/২

যখন একজন গৃহস্থ দেখবে তার শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে, চুল পেকে সাদা হয়ে যাচ্ছে আর বিশেষ করে যখন নিজের পোত্রের মুখ দেখে নিয়েছে, তখন কিন্তু সেই গৃহস্থের বাণপ্রস্থী ধর্ম অবলম্বন করা উচিত। বাণপ্রস্থ আশ্রমে যাওয়ার সময় হয়েছে কিনা বোঝার জন্য তিনটে লক্ষণের কথা বলা হল – শরীরের চামড়া ঝুলে যাচ্ছে, চুল পেকে যাচ্ছে আর নাতির মুখ দেখে নিয়েছে। আপনার এবার বার্ধক্য এসে গেছে, এবার আপনি বাণপ্রস্থী হয়ে যান। বাণপ্রস্থী মানে আগেকার দিনের মত বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকা এখনকার দিনে সম্ভব নয়। গৃহে থেকেও বাণপ্রস্থী হয়ে থাকা যায়, আলাদা ভাবে থাকুন, সংসারের কোন কিছুতে জড়াবেন না, নিজের মত থেকে ঈশ্বরের দিকে মন দিয়ে রাখলেন। বলছেন –

সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বধৈব পরিচ্ছদম্।

পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সত্বে বা।।৬/৩

বাণপ্রস্থী কি করবে? গ্রাম্য আহার পরিত্যাগ করবে। গ্রাম্য আহার মানে, ভালো ভালো খাবার-দাবার, ভাত, যব, আটা এই খাওয়াগুলো কমিয়ে দিতে হয়। আসলে বাণপ্রস্থীরা তখন ভিক্ষা করেই থাকতেন, খুব সাধারণ ফল-মূল খেয়ে থাকতেন। বাণপ্রস্থীকে অতি সাধারণ খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। পরিচ্ছদম্, মানে গাড়ি, ঘোড়া, বস্ত্র, বিছানা এগুলোর ব্যবহার করে ছেড়ে দিয়ে অতি সাধারণ ভাবে জীবন-যাপন করবেন।

এর মধ্যে খুব সুন্দর কথা বলছেন, পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য, যদি তাঁর স্ত্রী এই রকম বাণপ্রস্থীর জীবন-যাপন করতে না চায় তাহলে সেই স্ত্রীকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করে বলে দেবে ‘পুত্র! তুমি তোমার মায়ের ভার গ্রহণ কর’। স্ত্রীর অনুমতি নিয়েই বনে যেতে হবে, স্ত্রী হয়তো বনে জঙ্গলে গিয়ে কঠোর জীবন-যাপন করতে

চাইছে না, তখন স্বামীকে স্ত্রীর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই বাণপ্রস্তু হয়ে বনে যাবেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী যেন কোন কষ্ট না পায়। যদি সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তো খুবই ভালো।

বাণপ্রস্তু হয়ে বনে গিয়ে শুধু শাক, মূল, ফল এগুলো খেয়েই জীবন রক্ষা করতে হবে। বিরাট কোন খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবে না। আসলে একটু চিন্তা করলে আমরা এই বাণপ্রস্তু জীবনের তাৎপর্য বুঝতে পারব। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেই ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের সহযোগিতা করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। এরপরও যদি আমরা গুরুপাকের খাবার-দাবার খেতে থাকি তখন পাকস্থলি সেগুলো হজম করতে পারবে না, হজম বিঘ্নিত হলে শরীরের অন্যান্য অর্গানগুলো বিদ্রোহ করতে শুরু করে দেবে। একটা বয়সের পর ইন্দ্রিয়গুলোকে তাই খুব সচেতন ভাবে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হয়, ইন্দ্রিয়গুলোকে ছেড়ে দিলেই তার পরিণাম খুব পীড়াদায়ক হবে। তারপর বাড়িতে অন্য যারা অল্প বয়সী সদস্যরা রয়েছে তাদের এখন ভোগের জীবন, তাদেরকে ভোগ করতে দিতে হবে। বয়স্ক লোকের ভোগের জন্য আর সেবা করতেই যদি তাদের অর্থ আর সময় চলে যায় তাহলে তাদের জীবনে ভোগের অপূর্ণতা থেকে যাবে, যার পরিণাম মারাত্মক কিছু হতে পারে। এই সব কিছু বিচার করে একটা বয়স হয়ে গেলে নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে এনে অতি সাধারণ ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয়। সম্মানিত জীবন অথচ অতি সহজ সরল জীবন যাপন, কোন ভোগের দিকে যাবে না এটাই বাণপ্রস্তু জীবনের আদর্শ। একটু ভাত ঝোল খেয়ে নিলেই হল। বাঙালীরা মাছ ছাড়া থাকতে পারে না, তারা ওই ঝোলের মধ্যে একটা ছোট্ট মাছ দিয়ে দিল। সেটারও কোন দরকার পড়ে না। কিন্তু আজকাল সবাই অনেক রকম হিসাব-নিকাশ করে, আমার ভিটামিনের ঘাটতি হবে, প্রোটিনের ডেফিসিয়েন্সি হবে। এগুলোর কিছুই দরকার পড়ে না, যখন সময় হবে তখন ঠিক আমাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে, আমার কিছুই করার থাকবে না, কিছু করতেও হবে না। যতই ওষুধ খাই, পথ্য খাই কোন কিছুই কাজে লাগবে না। সেইজন্য বলছেন, সাধারণ খাওয়া-দাওয়া, সাধারণ জীবন আর ঠাকুরের নাম এই নিয়েই থাক, যখন সময় হবে চলে যাবে।

আবার বলছেন, এই যে সাধারণ খাদ্য নিয়ে জীবন-ধারণ করা হচ্ছে, এই দিয়েই আপনি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞের জন্য আর বিশেষ আয়োজন করে বড় করে কিছু করার প্রয়োজন হবে না, যা পেয়েছেন ওই দিয়েই পঞ্চ মহাযজ্ঞ হয়ে যাবে। এর সাথে বলছেন –

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্ দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।

দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ। ৬/৮

বয়স্ক লোকদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কি বলছেন? স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ, আপনি এখন বাণপ্রস্তু হয়ে গেছেন, এখন যত বেশী সময় পাওয়া যাবে ততটা সময়ই স্বাধ্যায়ে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে হবে। শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন কিছু অধ্যয়ন করবেন না। স্যাদ্ দান্তো, নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে বশে নিয়ে আসতে হবে। এই বয়সে আমি এয়ার কন্ডিশন ছাড়া থাকতে পারবো না, আমার ভালো দামী চটি, জুতা লাগবে। এই ধরনের বিলাসী মনোভাব একেবারে ছাড়তে হবে। যাঁরা বাণপ্রস্তু তাঁরা এই শরীরকে নিয়ে বেশী ভাবনা-চিন্তা করবেন না। একটু কঠোরতা অবলম্বন করে শারীরিক কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়াতে হবে। মৈত্রঃ সমাহিতঃ, সবার সাথে মৈত্রী ভাব, সকলের প্রতি প্রিয় ও হিতভাষী হতে হবে। আপনি তো এখন সব কিছু থেকে সরে এসেছেন, এখন কিসের আর ঝগড়া-ঝাটি। এর সাথে মনকে নিয়ন্ত্রণে এনে পরমাত্মা ও ইষ্টের চিন্তায় সমাহিত করতে হবে। আমাদের মঠের এক সন্ন্যাসী ভাই, বয়স খুবই অল্প, ম্যালিগ্‌নেন্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলে দিলেন বত্রিশটা কেমো নিতে হবে। চৌদ্দটা দেওয়ার পর ডাক্তার তাঁকে বলে দিলেন, ‘মহারাজ! আর কেমো দিয়ে কিছু করা যাবে না, মৃত্যুর জন্য আপনি তৈরী হয়ে নিন’। এখন তিনি সব সময়ই ‘মা’ ‘মা’ করে যাচ্ছেন। এমনতেই তিনি খুব ভালো সাধু, আর এখন ভেতর থেকে আরও নরম হয়ে গেছেন। কিন্তু ওনার একটা আশা ছিল সব সাধুদের কাছ থেকে যেন ভালোবাসা পাই। এখন উনি দেখছেন সব সাধু তাঁর জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন, খেয়াল রাখছেন কিসে তিনি আনন্দে খুশীতে বাকি জীবনটুকু

কাটিয়ে দিতে পারেন। মহারাজ এখন নিজের মৃত্যুকে সামনে দেখছেন আর সব সময় ‘মা’ ‘মা’ ডাকছেন আর সবার প্রতি মৈত্রী ভাব। এখন কি তিনি কারুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করতে যাবেন! তা আমাদেরও তো সেই একই অবস্থা। দুদিন আগে নয়তো দুদিন পরে আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। তাহলে কিসের জন্য এত লড়াই, মারামারি, ঝগড়া বিবাদ! কাকে তোমার ক্ষমতা দেখাচ্ছ! কি করে বেড়াচ্ছ! এটাই এখানে বলছেন যখন বাণপ্রস্থী হয়ে গেলেন তখন সবার প্রতি করুণার ভাব, মৈত্রীর ভাব নিয়ে আসতে হয়।

দাতা নিত্যমনাদাতা, দানশীল হয়ে যান, যে যা চাইছে দিয়ে দিন। আর সর্বভূতানুকম্পকঃ, সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা। গরু, কুকুর, বেড়াল, পিপড়ে যেই আসছে সবারই জন্য কিছু না কিছু রাখা আছে। এগুলো হল বাণপ্রস্থীদের ধর্ম। এটা আবার সন্ন্যাসীদের ধর্ম নয়। এখনকার দিনে অবশ্য বাণপ্রস্থী আশ্রম উঠে গেছে, তাও যে শ্লোকগুলো আমাদের কাজের এবং আজকের যুগের পক্ষে উপযোগী সেগুলো নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে।

নক্তঞ্চগ্নঃ সমশ্রীয়াৎ দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।

চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্ব্যাপ্যষ্টমকালিকাঃ।।৬/১৯

বাণপ্রস্থীদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন। যতটা ভিক্ষা করে নিয়ে আসবে সেখান থেকে সে কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারে বা নিজেও জোগাড় করে রাখতে পারে। সারাদিন কিছু খাবে না, শুধু বিকেল বেলায় খাবে। আর তা না করে একদিন পুরো উপোস করে পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় খাবে। আরও যদি পারে তাহলে তিন রাত উপোস করে চতুর্থ দিনে সন্ধ্যাবেলায় খাবে। তাহলে বাণপ্রস্থীর খাওয়া কি রকম? দিনে একবার, তাও সন্ধ্যার দিকে। যদি পারে তাহলে একদিন ছেড়ে ছেড়ে খাবে, যদি আরও পারে তাহলে দুদিন ছেড়ে ছেড়ে খাবে। পারলে তিন দিন দিবারাত উপোস করে অর্থাৎ ছয় বেলা উপোস করে চতুর্থ দিনে দিবা ভাগে ভোজন করবে। এইভাবেই বাণপ্রস্থীকে বাকী জীবন চালাতে হবে। এবার নিজের তপস্যাকে কিভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে বলছেন –

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্ত স্যাদ্ বর্ষাস্বভাবকাশিকঃ।

আর্দ্রবাসান্ত হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ন্তপঃ।।৬/২৩

গ্রীষ্মকালে বাণপ্রস্থী পঞ্চতপা করবে। শ্রীশ্রীমা যেমন পঞ্চতপা করেছিলেন। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ফাঁকা মাঠে গাত্রাবরণ ছাড়াই বৃষ্টিধারার নীচে দণ্ডমান থাকবে। শীতকালে গাত্রে সিন্ত বসন ধারণ করবে। আমাদের কারুরই এগুলো করার দরকার নেই। দেখাচ্ছেন কত কঠোর ভাবে এনারা সবাই সাধনা করতেন। শরীরকে কোন রকম প্রশয় দেওয়া চলবে না। এইভাবে তাঁরা শরীরকে একেবারে জয় করে নিতেন। বাণপ্রস্থী যিনি হয়ে গেলেন তাঁর কাছে আর শরীরের কোন মূল্যই নেই। আমরা শরীরকে বড্ড বেশী গুরুত্ব দিই বলে শরীরের ব্যাধির ব্যাপারে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠি। তবে এতটা কঠোর আমাদের এখন না করলেও চলবে, কিন্তু একটা সময় আমাদের সবাইকে শরীর থেকে মনকে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা শুরু করা উচিত। দিল্লীতে এক কলেজ হোস্টেলের একটি ছাত্র শীত কালে যখন দিল্লীতে দু-তিন ডিগ্রী ঠাণ্ডার সময় ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শুধু একটা হাফ শার্ট পড়ে ঘুরে বেড়াত। এখন তার বয়স হয়েছে, এই বয়সেও এখনও সেই ওই ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক একদিন বলছিলেন ‘আমারও এক সময় ঠাণ্ডা লাগত। কিন্তু একদিন ইণ্ডিয়া গেটের কাছে ভোরবেলা দেখলাম কিছু শ্রমিক খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করছে। তখন আমার মনে হল এরা যদি পারে আমি কেন পারবো না’। সেই যে ছেলেটি ঠাণ্ডাকে ভ্রক্ষেপ করতে শুরু করল এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে এমন করতে হবে তা নয়। কিন্তু এখানে মনু যেটা বলতে চাইছেন তা হল শরীরের উপর মন দেওয়াটা কমাতে হবে। কিন্তু মূল হল আত্মসিদ্ধির জন্য উপনিষদের যে মহাবাক্য আছে তার চিন্তন সব সময় করে যাওয়া। শরীরের দিকে মন না দিয়ে, শরীরের বেশী চিন্তন না করে একমাত্র আত্মচিন্তন করাটাই মূল কথা।

অপরাজিতাং বাস্থ্যত্রজেদ্ দিশমজিষ্ণগঃ।

আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যানিলাশনঃ।।৬/৩১

এই রকম কঠোর তপস্যা করতে করতে যদি এমন কোন রোগ হয়ে যায়, যার কোন চিকিৎসা করা যাবে না, তখন এই বাণপ্রস্তু শুধু জল আর বায়ু আহার করতে করতে যোগনিষ্ঠ হয়ে শরীর পতন না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে সরলগতিতে চলতে থাকবে। চলতে চলতে যেখানে শরীরের পতন হয়ে যাওয়ার হয়ে যাবে। আর সে অল্প গ্রহণ করবে না।

বাণপ্রস্তু চতুর্থ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। যদিও এখানে মনুস্মৃতিতে বলা হচ্ছে, কিন্তু এগুলো যে ঠিক এইভাবেই হত তা নয়। যদি পঁচিশ বছর করে হিসাব করা হয় তাহলে পঁচিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গৃহস্থ জীবন, তারপর বাণপ্রস্তু আর পঁচাত্তোর বয়সের পর সন্ন্যাস, এটাই মোটামুটি নিয়ম ছিল। কিন্তু একেবারে বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না। অনেকে গৃহস্থের পরেই সন্ন্যাস আশ্রমে চলে যেতেন। এরপর মানুষের ঋণ সম্বন্ধে বলছেন –

মানুষের কত রকমের ঋণ

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষৈ নিবেশয়েৎ।

অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ।।৬/৩৫

প্রত্যেক মানুষের তিনটে ঋণ আছে – ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ। এই তিনটে ঋণ থেকে মুক্ত না হয়ে কেউ যেন সন্ন্যাস না নেয়। আসলে মনু সন্ন্যাসের খুব একটা পক্ষপাতি ছিলেন না, যদিও তিনি উপনিষদের মহাবাক্যাদির উপর ধ্যান করতে বলছেন। একদিকে মনু ঠিকই করেছেন, কারণ স্মৃতি হল মূলতঃ আচরণ বিধি। বিধি-নিষেধ গৃহস্থদের জন্য, বিধি ও আচরণ সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। সন্ন্যাসী সব সময় বিধি-নিষেধের পারে। সেইজন্য মনুস্মৃতিতে যা কিছু আছে তার বেশীর ভাগই সন্ন্যাসীদের জন্য নয়।

বেদ অধ্যয়ন করা অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সন্তান উৎপত্তির দ্বারা পিতৃঋণ আর যজ্ঞের দ্বারা বা বর্তমান কালে পূজো অর্চনার দ্বারা দেবঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে তিনটে ঋণকে শোধ না করা পর্যন্ত সন্ন্যাস নেওয়া যায় না। কিন্তু অন্য দিকে আমাদের উপনিষদে আছে যদ্বহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ, মনে যখনই ত্যাগের ভাব এসে যাবে তখনই বেরিয়ে পড়। কিন্তু মনু বলছেন এই তিনটে ঋণ যতক্ষণ শোধ না হয় ততক্ষণ সন্ন্যাস নেওয়া যাবে না – বেদ অধ্যয়ন যেন করা থাকে, যজ্ঞাদি যেন পুরো দমে করা থাকে আর সন্তান উৎপত্তি যেন করে থাকে। যদি এই তিনটে ঋণ থেকে মুক্ত না হয়ে কেউ যদি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার নরকে গতি হয়। এরপর মনু সন্ন্যাস ধর্মের প্রসঙ্গে বলছেন –

সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম

যো দত্ত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।

তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।।৬/৩৯

সন্ন্যাসীর সব থেকে বড় ধর্ম হল সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান। সন্ন্যাসীকে যেন কেউ ভয় না পায়। সেইজন্য সন্ন্যাসীও কাউকে ভয় পায় না। সন্ন্যাসীর ধর্মই হল একত্ব বোধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ভেতরে একত্ব বোধ থাকলে কাউকে সে ক্ষতি করতে যাবে না, কারুর কোন ক্ষতি সে করবে না সেইজন্য সবাইকে সন্ন্যাসী অভয় প্রদান করে। বাণপ্রস্তু অবস্থায় যখন থাকে তখনও তার বহুত্ব বোধ থাকে, গৃহস্থদের তো থাকেই। যে সন্ন্যাসী একত্ব বোধকে সাধনা রূপে নিচ্ছেন না সেই সন্ন্যাসীর কিছু গোলমাল আছে বুঝতে হবে। ঈশাবাস্যোপনিষদে যার জন্য বলা হচ্ছে তত্র কো মোহঃ কঃ শোক। একত্ব বোধ থাকলে তার

শোক আর মোহ চলে যায়। এর প্রতি ভালোবাসা, এর থেকে দূরে থাকা, শোক আর মোহ এই জিনিষগুলো থাকবে না। কারণ একত্ব বোধ থাকলে কাউকে আলাদা ভাবে দেখার ভাবটাই চলে যাবে। সবাই তো আমারই অঙ্গ কাকে ভালোবাসব, কাকে ঘৃণা করব! এই ভাবটাই পরের শ্লোকে ফুটে উঠছে –

যস্মাদগ্ধপি ভূতানাং দ্বিজায়োৎপদ্যতে ভয়ম্।

তস্য দেহাদিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন।।৬/৪০

এই একত্ব বোধ থেকে যখন ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কোনও প্রাণীরই অনুমাত্রও ভয় জন্মায় না তখন সেই সন্ন্যাসী এই দেহ থেকেই বিমুক্ত হয়ে জীবনমুক্ত হয়ে যান। আমি যদি নিজেকে আমার শরীরের মধ্যে বেঁধে রাখি তাহলে আমি আলাদা তুমি আলাদা অবশ্যই হবে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে, উপনিষদের শ্লোক, সন্ন্যাসীদের জন্য এটি একটি খুব মূল্যবান মন্ত্র। সন্ন্যাসী কেন সবাইকে অভয় দিচ্ছেন? কারণ তাঁর আর শরীরের বোধ নেই। রুডিয়র্ড কিপ্লিং তাঁর অসাধারণ কীর্তি ‘দি জঙ্গল বুকের’ মুংলী সিরিজের জন্য খুব বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও রুডিয়র্ড কিপ্লিংকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী। কারণ উনি চাইতেন ইংরেজ যেন ভারত ছেড়ে কোন দিন না যায়, ভারতে ইংরেজরা শাসন করলেই ভারত ঠিক থাকবে। কিন্তু লেখক হিসাবে তিনি দুর্দর্শ লেখক ছিলেন। তাঁর এই বইগুলো ১৯০৮ সালের দিকে লেখা হয়েছিল। এই বইয়ের শেষে একটা কাহিনী আছে। ইংরেজদের সময়কার ভারতের এক রাজ্যের এক মন্ত্রীকে নিয়ে এই কাহিনী। খুব নামকরা মন্ত্রী, তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তাঁর নামের পেছনে একটা বিরাট পদবী লাগান ছিল। একটা বয়সে এসে তিনি হঠাৎ বললেন আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। কিপ্লিং এটা নিয়েই কাহিনী শুরু করছেন, ভারতে এই নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ভারতে সবারই জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে আমি একদিন সন্ন্যাসী হব। সন্ন্যাস ভারতের উচ্চতম আদর্শ। এখন অবশ্য আর উচ্চতম আদর্শ নেই। তারপর ওই মন্ত্রীর জীবনের বর্ণনা দিয়ে কিপ্লিং খুব সুন্দর একটা ক্লাসিক সাহিত্য দাঁড় করিয়েছেন।

সন্ন্যাসী হয়ে তিনি এখন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সন্ন্যাস জীবনে আসার আগেই তিনি এত বিখ্যাত হয় গিয়েছিলেন যে, এক শহরে ঘুরতে ঘুরতে দেখছেন শহরের একটা রাস্তা ওঁর নামেই করা আছে। আরেক শহরে গিয়ে দেখছেন তাঁর মুর্তি বসান আছে। তিনিও নিজের মুর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই দেখে যাচ্ছেন। এখন তো তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই তাঁকে কেউ চিনতেও পারছে না। পুলিশ এসে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলছে ‘এই যে ফকির বাবা! এখানে দাঁড়াতে না, হট এখান থেকে’। পরিত্রাজক হয়ে কিছু দিন ঘোরাঘুরি করার পর হিমাচলের দিকে পাহাড়ি অঞ্চলে একটা গুহা দেখে বসে গেলেন। গ্রামের আদিবাসীরা এসে তাঁকে কিছু খাবার-দাবার দিয়ে যেত। তিনি কখন খেতেন, কখন খেতেন না। সব সময় ঈশ্বর চিন্তনে নিয়েই আছেন। কিপ্লিং খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, এক দিন, দু দিন এইভাবে থাকতে থাকতে একটা সময়ের পর দেখা গেল ওই অঞ্চলের পশুপাখীরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করেছে। জংলী কুকুর গুলো আসছে, হরিণরাও আসছে, সাপ, বিছেরা আসছে। গ্রামের লোকের যা খাবার নিয়ে আসে তার থেকে কিছু ওদের জন্য রেখে দেন, রোজ খানও না। এরপর একটা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি আসনে ধ্যানে বসে আছেন। সেই সময় একটা হরিণ এসে তাঁকে ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। উনি আদর করে হরিণকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সরিয়ে দেওয়ার পর আবার হরিণটা গিয়ে ধাক্কা মারছে। তখন তিনি খুব মিষ্টি করে বলছেন ‘তোমাকে আমি এত ভালোবাসা দিলাম আর তুমি এই প্রতিদান দিচ্ছ’। তারপর দেখেন হরিণটা আসনটাকে মুখ দিয়ে টানছে। কিছুক্ষণ পরে দেখেন আরও কয়েকটি হরিণ এসে তাঁকে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করেছে। তখন কিছু একটা ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ হয়েছে। আসলে কিছুক্ষণের মধ্যে ভূমিকম্প আসছে, পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে বাঁচার আর কোন পথ থাকে না। এই গুহারই নীচে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামের লোকেরাই প্রতিদিন সন্ন্যাসীর জন্য খাবার নিয়ে আসে। এখন এই গ্রামের লোকদের সাবধান করতে হবে, তা নাহলে পুরো গ্রাম ধুলিসাং হয়ে সবাই মারা যাবে। উনি তখন ওই রাত্রে

অন্ধকারে পাহাড় থেকে নেমে গ্রামের লোকদের সরাবার জন্য দৌড় লাগিয়েছেন। তখন তার বয়স পঁচাশি ছিয়াশি হবে, ওই বয়সে তিনি দৌড়ে গ্রামে গিয়ে সবাইকে বলছেন ‘তোমরা সবাই পালাও পালাও, ভূমিকম্প আসছে। এক্ষুণি উপর থেকে ধস নামবে’। পশুদের মধ্যে কোন কোন পশু ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের কিছু কিছু লক্ষণ ধরতে পারে। হরিণগুলোও টের পেয়ে ধাক্কা মেরে মেরে তাঁকে আসন থেকে উঠিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দিল। গ্রামের সবাই মারা পড়ত। কারণ পরে দেখা গেল পুরো গ্রামটা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ভোর হতেই সূর্যের আলোতে সবাই দেখছে রাস্তার মধ্যে সন্ধ্যাসী পড়ে আছেন। এই বয়সে অতটা দৌড়ে এসেছেন, শরীর এই ধকল সহিতে পারল না। সবাই দেখছেন সন্ধ্যাসীর নিখর দেহটা রাস্তার উপর পড়ে আছে।

এই যে অভয় দান নিয়ে আমরা কথা বলছি, একত্ব বোধে ঠিক এই রকমটাই হয়। এমন কি পশুগুলো তাদের বাচ্চাদের এনে তাঁর কাছে ছেড়ে দিয়ে যেত যাতে ওরা ওনার কাছে নিরাপদে থাকতে পারে। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং ছিলেন খুব উচ্চমার্গের সাহিত্যিক, কাহিনীটা পড়লে বোঝা খুব মুশকিল এটা কি সত্যিকারের কাহিনী, না কি উনি কল্পনা দিয়ে সাজিয়েছেন। অবশ্যই কাহিনী, কিন্তু বর্ণনা এমন প্রাঞ্জল যে মনে হবে সত্যিকারের। মন যখন একত্রে চলে যায় তখন এ আমার ক্ষতি করবে, এ আমাকে মারতে আসবে, একে মারি এই ধরনের কোন চিন্তা ভাবনাই আর থাকে না। গান্ধীজীর এই ভাবটা ছিল। সাবরমতি আশ্রমে যখন তিনি থাকতেন সেখানে সাপ বিছে কোন প্রাণীকেই মারা হত না। সব প্রাণী, বিষধর সাপ থেকে শুরু করে ব্যাঙ, ইঁদুর সবাই নির্ভয়ে আশ্রমের মধ্যেই ঘুরে বেড়াত। অথচ কোন সাপ কোন দিন কাউকে ছোবল দেয়নি। আমাদের দর্শনের তত্ত্বেই আছে আমার মনে যদি হিংসা ভাব না থাকে তাহলে সাপও আমাকে ছোবল দিতে আসবে না। আবার অন্য রকমও হতে দেখা গেছে। দিল্লীতে এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থাকতেন। তাঁর বাড়িতেই সাপের একটা বাসা ছিল, যেখানে অনেক বিষাক্ত সাপ থাকত। উনি আবার এদের দুধ খাওয়াতেন। কিন্তু একদিন দেখা গেল সাপের ছোবলেই তিনি মরে পড়ে আছেন। আসলে আমরা যে মনে করি সাপ কামড়ায়, কিন্তু সাপ কখন কাউকে কামড়ায় না। ভয় পেলে বা অন্ধকারে কোন ভাবে লেজে পা পড়ে গেলে প্রতিক্রিয়া বশতঃ কামড়ে দেয়। রেগে গেলে আর ভয় পেলেই সাপ কামড়ায়। সেইজন্য গ্রামের দিকে সাধারণতঃ সাপ কেউ মারে না, একটু হাততালি দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

এটাই এখানে বলছেন, সন্ধ্যাসী যখন একত্ব বোধে চলে যান তখন তিনি তো বিদেহ হয়ে গেলেন, শরীর বোধটাই তাঁর চলে গেল। একত্ব বোধ মানেই তো এটাই, সবার শরীরের সঙ্গে আমি এক। তখন কারুর প্রতি যে বিশেষ ভালোবাসা, কারুর প্রতি বিদ্বেষ কোনটাই থাকবে না, অন্য জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর কোন হিংসা ভাব থাকে না। পাতঞ্জলী যোগসূত্রেও ঠিক এই একত্ব বোধের কথা বলা হয়েছে, *বিতর্কবোধেন প্রতিপক্ষভাবনম্*। আপনার যে সমস্যাটা আছে তার উল্টোটা করুন, সমস্যাটা সেরে যাবে। যদি দেখা যায় কোন লোক আপনাকে পছন্দ করছে না, আপনার প্রতি দ্বেষ ভাব নিয়ে চলছে, হয়তো সে আপনাকে শেষ করে দিতে চাইছে, এবার আপনি অন্তর থেকে সবাইকে ঠিক ঠিক ভালোবাসতে শুরু করুন। আপনি দেখবেন এরও মন কিছু দিন বাদে পাল্টাতে শুরু করবে, আপনার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা হল impersonal value, personal value নয়। Personal value কি রকম? একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসছে, ছেলেটি মেয়েকে বলছে ‘আমি তোমাকে এতো ভালোবাসি তুমি আমাদের দিকে ফিরেও তাকাও না’! সেটা এখানে হবে না। এখানে impersonal value নিয়ে বলা হচ্ছে। আমি যদি কারুর প্রতি হিংসা দ্বেষ না রাখি আমার প্রতিও কেউ হিংসা দ্বেষ রাখবে না। নির্ভয় হওয়াটাও এই রকমের। প্রায়ই অনেকের মুখে শোনা যায় ‘আমি কাউকে ভয় পাইনা’। যখনই কেউ বলে ‘আমি কাউকে ভয় পাইনা’, ওর কথা শুনলেই তো মানুষের ভয় হবে। আমি যদি এই জগতে কাউকে ভয় না পেতে চাই, তখন আমাকে দেখতে হবে আমাকেও যেন কেউ ভয় না পায়। ভেতর থেকে সবাইকে, সমস্ত প্রাণী, জীব, জন্তু, পোকা-মাকড় সবার প্রতি ভালোবাসা মানে আমি আমার শরীর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিজের স্কুল শরীর আর মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে এই নির্ভয় ভাব আসে না। সন্ধ্যাসী কি রকম হবেন বলছেন –

আগারাদভিনিক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিরজেৎ।।৬/৪১

গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসী কমণ্ডলু, দণ্ড ও মৌনতা ধারণ করবেন। আগেকার দিনে এই নিয়মগুলো ছিল। এই তিনটে জিনিষ হল সন্ন্যাসীর চিহ্ন। গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মানে এই নয় যে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোন বাড়িতে গিয়ে থাকবে, না তা চলবে না। সন্ন্যাসীর কোন গৃহ থাকবে না। আর ভালো খাওয়া-দাওয়া ও ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ থাকবে না। আমাদের স্বামীজী ও তাঁর অনেক গুরুভাই এবং অন্যান্য মহারাজদের খাওয়া-দাওয়ার রুচির ব্যাপারে খুব সচেতনতা ছিল। অন্য দিকে আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ ছিলেন, যখন যা পাচ্ছেন, যে যা দিচ্ছে, ভালো মন্দ সবই নির্বিকার চিন্তে আহাৰ করে নিতেন। মনুস্মৃতিতে একটু অন্য ভাব নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীর ভাব একটু আলাদা। ঠাকুর স্বামীজীদের খাবার দাবারে ভালো-মন্দের বোধটা খুব প্রখর ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে একেবারে নির্বিকার।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধার্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্ ন জহতি ন হীয়তে।।৬/৪২

সন্ন্যাসী কারুর সঙ্গ করবে না, একা চলবে। একা চলে শুধু মোক্ষ পথে থাকবে। ফলে সন্ন্যাসী কাউকে যে ত্যাগ করছেন তাও নয়, আবার কাউকে যে গ্রহণ করছেন তাও নয়। সন্ন্যাসী সর্বদা জীবনের মোক্ষ পথে একাই চলেছেন। এগুলোই সন্ন্যাসীর ধর্ম। সন্ন্যাসীর কিছু কিছু লক্ষণের ব্যাপারে বলছেন —

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষাকোহসঙ্কসুকো মুনি ভাবসমাহিতঃ।।৬/৪৩

আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা সকাল বিকেল দুবেলাই যজ্ঞ করতেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর যজ্ঞ করা যাবে না, সেইজন্য তাঁদের বলা হয় অনগ্নি। গীতায় এর শব্দটা হল নিরগ্নি। অনিকেতঃ, সন্ন্যাসীর কোন ঘরবাড়ি নেই। অনিকেতর মূল ভাবটা হল একটা জায়গায় সন্ন্যাসী স্থায়ী ভাবে থাকবে না। কিন্তু একটা বয়সে এসে সন্ন্যাসীকেও একটা স্থানে স্থিত হতে হয়। বুড়ো বয়সে সন্ন্যাসীরাও কোথাও গিয়ে স্থির হয়ে যেতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে সন্ন্যাসীর মনোভাব হল, একটা জায়গায় আমি স্থির থাকবো না। স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ, সন্ন্যাসী গ্রামে বা লোকালয়ে প্রবেশ করবেন শুধু মাত্র শিক্ষা করার জন্য। বাকি সময় গ্রাম বা লোকালয়ের বাইরে থাকবে। রোগ ব্যাধি যদি হয়ে যায় তখন সন্ন্যাসী সেগুলোকে উপেক্ষা করবে, হয়েছে আবার সেরে যাবে। আর ব্রহ্মবুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না। সন্ন্যাসীর খুব কঠিন নিয়ম। আগেকার দিনেতো সব ক্রিয়া কর্ম শেষ করে সন্ন্যাস নিতেন, কারুর চোখের জল ফেলে তাঁকে সন্ন্যাসীর জীবনে প্রবেশ করতে হচ্ছে না। কিন্তু এখন বাচ্চা বয়সেই ঘরবাড়ি ছেড়ে আসছে, তাঁর জন্য তাঁর মা কাঁদছে, বাবা কাঁদছে, ভাই-বোনেরা কাঁদছে। এখন তো যখনই কেউ সন্ন্যাসী হয় তাঁর কাছের যত লোক আছে সবাই চোখের জল ফেলছে।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষ্যেত নির্দেশং ভূতকো যথা।।৬/৪৫

হিন্দুদের পুরো দর্শন এই শ্লোকের উপর দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসী মৃত্যুকেও অভিনন্দন করবে না, আমি মরলেই ভালো, আমি মরতে চাই এই ভাবটা সন্ন্যাসীর কখনই থাকবে না। যদি কোন সন্ন্যাসী বলেন আমি মরতে চাই, তাহলে সেই সন্ন্যাসীর ভেতরে কিছু একটা গলদ আছে। আবার জীবনকেও সে বন্দনা করবে না। সন্ন্যাসী যদি বলে আমি অনেক দিন বেঁচে থাকতে চাই, আমি সুখে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে সেই সন্ন্যাসীরও ভেতরে কিছু গলদ আছে বুঝতে হবে। সন্ন্যাসী সব সময় নিষ্পৃহ। কিসে নিষ্পৃহ? জীবনের প্রতিও নিষ্পৃহ, মৃত্যুর প্রতিও নিষ্পৃহ, দুটোতেই নিষ্পৃহ। এটাই সন্ন্যাসীর ধর্ম। গীতা উপনিষদে বার বার এই কথাটাই বলা

হচ্ছে – না তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকবে, না তাঁর মরে যাবার ইচ্ছা হবে। সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতিও কোন মোহ থাকে না, আর মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি থাকে না।

শ্লোকের পরের পঙক্তিটিও খুব উল্লেখনীয়। এগুলো আমাদের সব সময় চিন্তন করতে হয়। কালমেব প্রতীক্ষিত, শুধু সময়ের অপেক্ষায় থাকবে। কি সময়ের অপেক্ষায়? যখন যেটা হচ্ছে। কেউ ভালো জিনিষ নিয়ে এল, খুব ভালো। কেউ মন্দ জিনিষ নিয়ে এল, খুব ভালো। এই অসুখ হয়ে গেল, খুব ভালো। অসুখ সেরে গেল, খুব ভালো। যা কিছু হচ্ছে সময়ের জন্য হয়ে যাচ্ছে, কালের প্রবাহে হয়ে চলেছে। আর কিভাবে প্রতীক্ষিত? নির্দেশং ভূতকো যথা। নির্দেশং এখানে দুটো অর্থ হতে পারে, একটা হল আদেশ আর ব্যাখ্যাকাররা আরেকটা অর্থ করছেন বেতন, ভূত্বারা যে বেতন পান। বাড়ির ভূত্ব সব সময় কর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা থাকে না। যেমনটি নির্দেশ আসবে ভূত্ব তেমনটি করে দেবে। সন্ন্যাসী কালের ঠিক সেই রকমই অপেক্ষায় থাকবে। এখন সময় খুব ভালো চলছে, খুব ভালো। সময় এখন খারাপ চলছে, তাও খুব ভালো। ফলে সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতি কোন মোহ নেই, মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি নেই। এটা সন্ন্যাসীদের জন্য বলা হচ্ছে। এটাই যদি গৃহস্থ পালন করতে যায় তাহলে বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। এটি হল একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ। জীবন যেমনটি আসছে তেমনটি গ্রহণ করাটা গৃহস্থদের জন্য নয়। এই আদর্শকে গৃহস্থরা গ্রহণ করার জন্য ভারতে কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভারতে এখন যে তীব্র ভোগবাদ এসেছে, তার মূল কারণ হল সন্ন্যাসীদের যে আদর্শ, সন্ন্যাসীদের যে ধর্ম সেটা এখন গৃহস্থদের কাছে চলে গেছে। ভারতবর্ষের পক্ষে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের। জীবনের প্রতি আসক্তি গৃহস্থের অবশ্যই থাকবে। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার প্রয়াস গৃহস্থদের অবশ্যই করতে হবে। আমাদের চেষ্টা করে পেতে হবে, এই পুরুষকার গৃহস্থের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। গৃহস্থের ধর্মই হল আমৃত্যু সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে কিভাবে আয় বাড়ান যায়, কিভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমৃদ্ধি করা যায়। চুরি-চামারি করবে না, ভুল পথ নেবে না কিন্তু চেষ্টা তাকে চালিয়ে যেতে হবে। সন্ন্যাসী কিন্তু কোন চেষ্টা করবে না। ঠাকুর বলছেন ফোঁস করবি কিন্তু বিষ ঢালবি না। কিন্তু সন্ন্যাসীর ফোঁস করারও অধিকার নেই। তিনটে ধাপ আছে – প্রথম কামড়াবে, বিষও ঢালবে। দ্বিতীয় ফোঁস করবে। তৃতীয় ফোঁসও করবে না। যারা অতি গর্হিত মানুষ তারা বিষ ঢেলে দেয়। ঠাকুর কিন্তু গৃহস্থকে বলছেন, ফোঁস করবি কিন্তু বিষ ঢালবি না। সন্ন্যাসী ফোঁসও করবে না।

সন্ন্যাস ধর্মের ব্যাপারে মনুর মূল কথা হল জগতে যত রকমের দায়িত্ব আছে তার সব দায়-দায়িত্ব সম্পাদন করার পরই তুমি সন্ন্যাস নেবে। সন্ন্যাস নেওয়ার পর সন্ন্যাসীর জীবন যে কত সাধারণ হবে বলতে গিয়ে একটা শ্লোকে বলছেন –

ইতুভাদাবগন্তুতুজস্নেত নাবমন্যেত কঞ্চন।

ন চেমং দেওমাশ্রিত্য বৈরং কুবীত কেনচিৎ।।৬/৪৭

সন্ন্যাসীকে বলছেন, যদি কেউ এমন কথা বলে দেয় যেটা মর্যাদার বাইরে, অর্থাৎ যে কথা বলা উচিত নয়, যেমন কোন শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা বা তর্জন গর্জন করে অপ্রিয় বচন প্রয়োগ করছে, তাও তুমি সহ্য করবে। সন্ন্যাসী নিজে থেকেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক কাউকে অপমান করবে না। শেষ কথা হল এই শরীরকে নিমিত্ত করে কারুর সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা শত্রুতা করবে না।

আসলে অপরের সাথে আমাদের শত্রুতা অনেক কিছুকে নিমিত্ত করেই তৈরী হওয়ার সম্ভবনা থাকে। প্রথম নিমিত্ত হল আমাদের এই দেহ। বিদ্যুৎ নেই, ঘরে পাখা, এসি কিছুই চলছে না, আমাদের খুব গরম লাগছে, সবাই এবার চললাম বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে হামলা করতে। এই হামলাটা শরীরের জন্যই করা হচ্ছে। তরকারীতে নুন বেশী হয়েছে, ব্যস এই নিয়ে যে রান্না করেছে, তা সে নিজের বউই হোক, মা হোক, কাজের মেয়ে হোক, তার সাথে ফাটাফাটি গুরু করে দিল। এখানেও সেই শরীরই নিমিত্ত। মনকে নিমিত্ত করেও শত্রুতা, লড়াই হয়। এক অপরকে সম্মান না দেওয়ায় কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হামেশাই লড়াই,

তিক্ততা হয়ে থাকে। ইমোশানের বাইরেও মন নিয়ে লড়াই হয়। বুদ্ধির স্তরে যাঁরা একটু উচ্চমানের তাঁদের মধ্যে আদর্শ মতবাদ নিয়ে মনের সংঘাত তো প্রায়শই হয়ে থাকে। বিজ্ঞান আর ধর্মের ব্যাপারে বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের লড়াই যেটা সেটা মনকে নিমিত্ত করেই হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা কিন্তু শরীরের ব্যাপারে বেশী নজর দেন না ও চিন্তাও করেন না, কিন্তু নিজের মতবাদের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ইগোটা বিরাট ভূমিকা নেয়, এই ইগোকে কেন্দ্র করেই এঁদের মধ্যে ঝগড়া অশান্তি লেগে থাকে। যখন আমরা বলি Freedom of Speech দেওয়া হচ্ছে না, তখন এই নিয়ে অশান্তি লেগে যায়। কিংবা কোন মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঝগড়া বিতর্ক লেগে থাকে। এছাড়া নিজস্ব সম্পদ, বিষয়, অর্থকে নিমিত্ত করে প্রচুর অশান্তি ঝগড়া তৈরী হয়। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এগুলোও লড়াই, ঝগড়ার নিমিত্ত হয়। মানুষ সব থেকে বেশী ফোঁস করে ওঠে যখন নিজের স্ত্রীর প্রতি যদি কেউ অশালীন আচরণ করে তখন স্বামী ফোঁস করে উঠবে, স্বামীকে যদি কেউ নিন্দা করে তখন স্ত্রী ফোঁস করে উঠবে, নিজের সন্তানকে যে ক্ষতি করবে মা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দেহ, মন, অহঙ্কার, সম্পত্তি, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এই যে এতগুলো ঝগড়া, লড়াইয়ের নিমিত্তের কথা বলা হল, এগুলো সবই একটা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। ওই কেন্দ্রতে সামান্য কিছু গোলমাল হলেই আমরা মেজাজ হারিয়ে ফেলি। দেহ, মন, সংস্কার নিয়ে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বাইরে আরেকটা ব্যক্তিত্ব আছে, যাকে বলা হয় সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব (extended personality)। মানুষের ব্যক্তিত্ব কখন নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, নিজস্ব ব্যক্তি সত্তাকে সে আরেকজনের সাথে সব সময় জুড়ে রেখেছে। এই জিনিষটাকেই গীতায় ভগবান খুব সুন্দর বলছেন – *অসক্তিরনভিসঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*। আমি যখন ভাবছি আমি অমুক তখন আমি আমার দেহের সাথে, মনের সাথে আর মনের সঙ্গে আমার অহঙ্কারাদি সবই এসে গেল, এটা হয়ে গেল আমার নিজের ব্যক্তিত্ব, গীতায় এটাকে বলছেন *অসক্তি*। আর *অভিসঙ্গঃ* হল আমার সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে এসে যাচ্ছে আমার সম্পত্তি, বাড়ি, গাড়ি, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বাবা, মা, ভাই-বোন। এই সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব থেকে আরেকটা সম্প্রসারিত লাইনে যাবে আমার স্কুল-কলেজের বন্ধু, এখান থেকে আরও কয়েকটা সম্প্রসারিত লাইন যাবে আমি বাঙালী, আমি হিন্দু, আমি ভারতীয়, আমি সিপিএম, আমি তৃণমূল – এই ভাবে আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রসারিত হতে থাকে। ব্যক্তিত্ব যত দূর সম্প্রসারিত হবে ততই ব্যক্তিত্বটা বিরাট হতে থাকে, তার মানে তার হৃদয়টাও প্রসারিত হচ্ছে। এখন আমার যে সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব, যেখানে যেখানে আমার নিজস্বতা জড়িয়ে আছে সেখানকার অস্তিত্ব যদি কোন সময় বিপন্ন মনে হয়, মানুষ তখন ফোঁস করে ওঠে। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা মনে করে তারা এক। তাই আফ্রিকার কোন প্রত্যন্ত গ্রামে যদি কোন মুসলমানের উপর কোন আঘাত আসে তার ধাক্কা ভারতেও এসে লাগবে। কারণ তারা মনে করছে আমি আর আফ্রিকার ওই নিগ্রো মুসলমান এক। ঠিক তেমনি সন্তানের উপর যদি কিছু আঘাত আসে মা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠবে। সাপের ল্যাঙ্গে পা পড়লে সাপ ফোঁস করে ওঠে। ল্যাঙ্গে পা পড়লে সাপ মনে করে আমার অস্তিত্বের উপর এখন মারাত্মক বিপদ এসেছে। মানুষ কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সাপ, কুকুর, বেড়াল, গরু এরা নিজেদের অস্তিত্ব শরীর পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে। সেই তুলনায় মানুষ প্রচুর জিনিষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানুষের প্রথম আসে শরীর ও মন আর তার ঠিক পরেই আসে একেবারে যে তার কাছের। সেখানে যদি তার মনে হয় কিছু বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন ফোঁস করবে। যে কোন পুরুষই সহ্য করবে না, যদি কেউ তার স্ত্রীর গায়ে হাত দেয়। আবার কোন স্ত্রী চাইবে না আমার স্বামীর গায়ে কেউ হাত দিক। সেখান থেকে তার সন্তান, তার পৌত্র এগুলোতে চলে যায়। এগুলো হল সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্ব। গীতায় এটাকেই খুব সংক্ষেপ করে বলছেন – *অসক্তি* আর *অভিসঙ্গঃ*। *অসক্তি* শুধু নিজেকে নিয়ে আর *অভিসঙ্গ* হল নিজের বাইরে যা কিছুর সঙ্গে একত্ব করে রাখছে।

সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য হল এই দুটো থেকেই বেরিয়ে আসা। সন্ন্যাসী *অভিসঙ্গঃ* প্রথমেই কেটে বাদ দিয়ে রেখেছে, কারণ সেতো ঘরবাড়ি, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, জাতি, কুল, ধর্ম সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাই সন্ন্যাসীর *অভিসঙ্গ* বলে কিছু নেই। এখন সন্ন্যাসীর শরীর ছাড়া আর কিছু নেই। তাই এই শ্লোকে বলছেন সন্ন্যাসী এই দেহকে নিমিত্ত করে যেন কারুর সাথে শত্রুতা বা ঝগড়া বিবাদে না জড়ায়। কোথায় ভিক্ষা করতে

গেল সেখানে তারা হয়তো ভিক্ষা দিল না, সন্ন্যাসী এখন রেগে গেল ‘আমাকে ভিক্ষা দিল না’! এই রাগ তো সন্ন্যাসী দেহকে কেন্দ্র করেই করছে। বাকি জিনিষকে নিমিত্ত করে তো তার রাগ হবে না, কারণ বন্ধু-বান্ধব, মা-বাবা সবাইকে তো সে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দেহকে কেন্দ্র করে যা কিছুই হোক না কেন সেইদিকে তাকাতে নেই, এটাই সন্ন্যাসীর ধর্ম। কেউ যদি কখন সন্ন্যাসীর উপর ক্রোধ করে পাল্টা ক্রোধ সে কখনই করবে না। কেউ কটু কথা বললে সন্ন্যাসী তাকে মিষ্টি কথাই বলবে।

স্বামীজীরা যে সন্ন্যাসের আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, এটা ঠিক সেই সন্ন্যাস নয়। এখানে তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে যাঁরা কেউ ব্রহ্মচর্য ও গৃহস্থ আশ্রম শেষ করে বাণপ্রস্থী হয়ে গেছেন, তারপর একটা বয়স হয়ে যাওয়ার পর সন্ন্যাস হয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সামাজিক সচেতনতার প্রতি একটা দায়িত্ব আছে। তাই এখানকার সন্ন্যাসীদেরকেও একটু আধটু রাগ-টাগ দেখাতে হয়, কিন্তু এই রাগ কারুর বিনাশের জন্য বা ক্ষতি করার জন্য নয়। এখানে বলছেন যাঁরা শুধু আত্মজ্ঞানের জন্য বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের জন্য অন্য কোন কিছুই অপেক্ষা থাকে না। যেমন ধরুন, মুসলমানরা যখন দেশে খুব অত্যাচার করছিল তখন মধুসূদন সরস্বতী মুসলমানদের টেকা দেওয়ার জন্য নাগা সম্প্রদায় দাঁড় করালেন। এরা সারা দিন ডন-বৈঠক করে বডি বিল্ডিং করত আর যখনই কোথাও মুসলমানদের আক্রমণ হবে খবর পেত তখন সবাই একজোট হয়ে ত্রিশূল নিয়ে সেখানে লড়াই করার জন্য পৌঁছে যেত। সেই বামেলাটা এখন মিটে গেছে কিন্তু নাগা সম্প্রদায়টা থেকে গেছে। এরা একটু রুঢ় হয়, এদের উদ্দেশ্যটাই আলাদা ছিল, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা। সেই কারণে এদের রাগ তো থাকতেই হবে। তাই মনু সন্ন্যাসীর যে আদর্শের কথা এই শ্লোকে বলছেন, সেটা অন্য স্তর থেকে বলছেন। পরের শ্লোকে বলছেন সন্ন্যাসী কি রকম হবেন –

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।

আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরোদিহ।।৬/৪৯

সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিক বিষয়ক চিন্তাই করবে, এর বাইরে অন্য কোন চিন্তা করবে না। বর্তমান যুগে অনেক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও মনে করেন যে আমরা অধ্যাত্ম চিন্তাতেই লীন হয়ে থাকব। কিন্তু সব সন্ন্যাসীর পক্ষে আধ্যাত্মিক চিন্তাতে লীন হয়ে থাকাটা হয়ে ওঠে না। তার কারণ এখানকার দিনের অনেক সন্ন্যাসীকে সমাজের জন্য এমন কিছু কাজ করতে হয় যার জন্য সন্ন্যাসীকে অনেক কিছুতে জড়িয়ে পড়তে হয়। জড়িয়ে পড়ার জন্য আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই হয়ে যায়। তবে আমাদের স্বামীজী মঠ মিশনের সন্ন্যাসীদের জন্য আদর্শ দিয়ে গেছেন সেখানেও এটাই প্রধান – যখন কাজ করবে তখন কর্মযোগ করবে। কর্মযোগের উদ্দেশ্যই হল কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টা। যখন কাজ থাকবে না তখন প্রাণপণে একমাত্র ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাই এখানে মনুর সন্ন্যাসীর আদর্শের সাথে তফাৎ কিছু নেই। যে কোন সন্ন্যাসী যদি অধ্যাত্ম চিন্তন থেকে সরে গিয়ে অন্য দিকে যাচ্ছে, তার মানে তার মধ্যে অনেক গোলমাল আছে এবং আরও সে গোলমালের মধ্যে গিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এতে সন্দেহের কিছু নেই। যেমন একদিকে সন্ন্যাসী কিন্তু সব সময় শুধু পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চাতে, কম্পিউটার নিয়ে, গণিত নিয়ে, সাহিত্য নিয়েই সারাক্ষণ ডুবে আছেন, এই সন্ন্যাসী কিন্তু বিনাশের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু এই চর্চাগুলোই যদি ঈশ্বরকে সামনে রেখে করা হয়, আমি যা করছি ঠাকুরের কাজই করছি। তখন এটাই কর্মযোগ হয়ে যাবে। যখন কাজ করছেন তখন ঈশ্বর চিন্তনও করছেন, এতে আর কোন সমস্যা হবে না।

অধ্যাত্মরতি এটা হল সন্ন্যাসীর প্রথম কাজ। দ্বিতীয় আসীনো, ধ্যানে বসবে। আমরা মনে করি আমি চলতে ফিরতে ধ্যান করব, শুয়ে শুয়ে ধ্যান করব, চেয়ারে বসে ধ্যান করব – এগুলো ভালোই। কিন্তু ভালোর ভালো হল সোজা নিজের আসনে গিয়ে পদ্মাসন বা সুখাসন করে বসে ধ্যান করা। ধ্যান সন্ন্যাসীকে অবশ্যই করতে হবে। তৃতীয় নিরপেক্ষো, সন্ন্যাসী কোন কিছুই অপেক্ষায় থাকবে না। এখানে শুধু মঠ মিশনের সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে না, যাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদের কথাও বলা হচ্ছে। তাঁরাও কোন

কিছুর অপেক্ষা করবে না। সন্ন্যাসীরও না না করেও কিছু জিনিষ তো লাগবে। একটা কমণ্ডলু লাগবে, কম্বল লাগবে, ধুতি লাগবে। এবার কোন বাবাজীর কম্বলটা হয়ত গেছে ছিড়ে। এখন কোন রাজা হয়ত একটা ভাণ্ডারা দিয়ে বাবাজীকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। সেই বেচারী এখন ভাবছেন যদি ওখানে একটা ভালো কম্বল জুটে যায় তাহলে শীতটা ভালো ভাবে কাটিয়ে দিতে পারবো। প্রথমে তিনি অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা মানে কোন কিছুর প্রত্যাশা করা। কম্বল না পাওয়ার জন্য আবার এই দেহকে কেন্দ্র করে দুঃখ হবে। স্বামীজী তাই এগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে গেছেন। তিনি বললেন আজকের দিনে সন্ন্যাসীদের কেউ দেখাশোনা করে না, সন্ন্যাসীকে কেউ না দেখলে সে কোথায় যাবে! দুদিনে ছিটকে যাবে। মঠ মিশনে কত ভক্তই তো ঘুরঘুর করে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও বলবে না যে, আমি অন্তত একজন সন্ন্যাসীর সব কিছুর দায়িত্ব নেব, খাওয়া-পড়া যা কিছু। কিংবা এতটা না করেও যদি বলে এই সন্ন্যাসীর এতটুকু, তাঁর জামা-কাপড় আর পাদুকার দায়িত্বটা নেব। কিন্তু কেউ একবারও ভেবে দেখেন না যে সন্ন্যাসীরা যাবে কোথায়। কথামতেও ঠাকুর একই কথা বলছেন। একজন ভক্ত তীর্থ করতে গিয়ে পালিয়ে এসে ঠাকুরকে বলছেন, সেখানে সাধুরা কেবল চাই চাই, দাও দাও করছে। ঠাকুর শুনে ওই ভক্তের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। বলছেন – জগতের সব সুখ কি শুধু তোমরাই ভোগ করবে। প্রথম প্রথম যারা কথামত পড়বে তারা মনে করবে যে ঠাকুর হয়তো বলবেন – ঠিকই করেছে পালিয়ে এসে, সাধুরা কেন চাই চাই করবে, তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ, সাধু হয়েছে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করে লোকের কাছে চেয়ে বেড়াচ্ছ, এসব কি করছ! কিন্তু ঠাকুর উল্টোটা বলছেন – জগতের সব সুখ কি শুধু তোমরাই ভোগ করবে? বালী পৌরসভা যখন বেলুড় মঠের পুরকরের উপর ছাড় বন্ধ করে দিয়েছিল তখন তারা মঠের সন্ন্যাসীদের নামে নানা রকমের কথা তুলেছিলেন। সাধুরা বেলুড় মঠে খাটে শোয়, সকালে চা খায় ইত্যাদি। স্বামীজীর কানে যেতেই বলছেন ‘যাক্ শালারা! নিন্দার ছলে আমাদের নাম তো নিচ্ছে, এতেই এদের মঙ্গল হবে’।

সন্ন্যাসী তো ভগবানের নামে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু এখন যাবেটা কোথায়। কি করবে তখন, সাধুরা তাই বাধ্য হয়ে প্রণাম প্রণামীর দিকে তাকায়। সমাজে চলার জন্য সবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী কপর্দক শূন্য হয়ে কোথায় যাবে! কোন উপায় নেই। তা যাই হোক মনু বলছেন, সন্ন্যাসী কোন কিছুর অপেক্ষা রাখবে না, আমার একটা নতুন কম্বল আসুক, একটা কমণ্ডলু আসুক, একটা নতুন ধুতি আসুক। অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই, তাই ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

সন্ন্যাসী সব সময় নিরামিষাশী হবে। এখানে নিরামিষ মানে মাছ-মাংসের কথা বলা হচ্ছে না, যে কোন ধরনের সুখ হোক, সেটা ভোগ করবে না। এর মধ্যে অবশ্য মাংসটাও অন্তর্ভুক্ত। *আত্মনৈব সহায়েন*, কোন কিছুতে কারুর উপর কখন নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে নিজের উপর। নিজের সামর্থ্যের উপর ভরসা করে যেটুকু করার করবে, অন্য কারুর উপর ভরসা করতে যাবে না। *সুখার্থী*, এখানে জাগতিক সুখের কথা বলা হচ্ছে না, সুখার্থী বলতে বোঝাচ্ছেন যাঁরা মোক্ষ সুখ পেতে চাইছেন। *বিচরেদিহ*, সংসারে জগতে কিভাবে বিচরণ করবে? এই কয় ভাবে সন্ন্যাসী জগতে বিচরণ করবে – অধ্যাত্ম বিষয়ক ছাড়া অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না, পরব্রহ্মের ধ্যান করবে, কোন কিছুর অপেক্ষা রাখবে না, সব কিছুতে স্পৃহাশূন্য হবে অর্থাৎ কোন ধরনের ভোগ্য বস্তু থাকবে না, কারুর উপর ভরসা করবে না আর সব সময় মোক্ষ সুখ আকাঙ্ক্ষা করবে।

তারপরে আবার সন্ন্যাসীদের অনেক নিয়মের কথা বলছেন। যেমন, অন্যান্য যাঁরা বাণপ্রস্তুী আছেন কিংবা সাধু আছেন তাঁদের কাছে ভিক্ষা করতে যাবে না। যে বাড়িতে অনেক পাখি বসে থাকে সেই বাড়িতে ভিক্ষা করতে যাবে না। কুকুর যে বাড়িতে আছে তাদের বাড়িতে যাবে না। এরও সত্যিই বাস্তবিক সমস্যা হয়। ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদের বেশভূষা অনেক সময় বিচিত্র হয় বলে বাড়ির পোষা কুকুরগুলো বাবাজীদের দেখলেই গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আসে। এই ধরনের অনেক ঘটনার অভিজ্ঞতা সাধুদের মুখে শোনা যায়। সেইজন্য সন্ন্যাসীদের কোন ভক্ত বাড়ি যাওয়ার আগে ভালো করে খোঁজ নিয়ে তারপর যাওয়া উচিত। নিয়মের কথা বলতে গিয়ে একটা শ্লোকে বলছেন –

এককালং চরৈঐক্ষং ন প্রসজ্জত বিস্তরে।

ভৈক্ষ্যে প্রসক্তো হি যতি বিসয়ৈল্পপি সজ্জতি।।৬/৫৫

সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রাণ ধারণের জন্য দিনে একবার মাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন করাই প্রশস্ত। কারণ বেশী বার ভোজন করলে সময় নষ্ট আর হজমেও অনেক শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া বেশী করলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়। সেইজন্য বলছেন সন্ন্যাসী একবার মাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন করবে। বৈষ্ণব বাবাজীদের দেখা যায় সকাল থেকে পূজো পাঠ কীর্তন সব করে-টরে সেই বেলা দুটো আড়াইটার সময় গিয়ে ভোজনে বসেন। জেনে বুঝেই খান, ওই আড়াইটার সময় খাওয়া হয়ে গেল আবার সেই পরের দিন আড়াইটার আগে আর কিছু খাবেন না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো স্বভাববশতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয় সব সময় খেলা করতেই চাইবে। কিন্তু যখন আহার বিহারকে সংযমিত করা হয় তখন সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। একটা খুব সুন্দর শ্লোকে বলছেন –

অভিপূজিতলাভাংস্ত জুগুপ্সেতৈব সর্বশঃ।

অভিপূজিতলাভৈশ্চ যতির্মুক্তোহপি বধ্যতে।।৬/৫৮

যদি বিশেষ পূজা-অর্চনা করে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় তখন সন্ন্যাসী যেন কখনই এই ধরনের পূজা বা অর্ঘ্য দেওয়াকে পছন্দ বা গ্রহণ না করে। গৃহস্থ সব সময়ই চাইবে – সন্ন্যাসী ভগবানের দূত হয়ে আমার গৃহে এসেছেন আমি তাঁর বিশেষ পূজা করব। কিছু কিছু গৃহস্থ স্বভাবে ভক্তির ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হন। বাড়িতে সাধু সন্ন্যাসী গেলেই মালা পড়াবে, চন্দন লাগাবে, পায়ে ফুল দিয়ে অর্ঘ্য দেবে, গৃহস্থের গৃহে এই ধরনের দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। মনু বলছেন, এই ভাবে যদি সন্ন্যাসীকে আদর আপ্যায়ন করা হয় তখন এটা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিন্দাজনকই শুধু নয় খুব ক্ষতিকারকও। সন্ন্যাসী যেন এগুলোকে একেবারেই পছন্দ না করেন। কারণ বলছেন, ভালোবাসা এমন এক জিনিষ, শ্রদ্ধা সম্মানটা এমন এক পদার্থ যে, যিনি মুক্ত যোগী সেও কিন্তু বন্ধনে পড়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নিজের সব কিছু দিয়ে সন্ন্যাসীকে সম্মান দিচ্ছে তার প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই সন্ন্যাসীর একটা মমত্ব বোধ এসে যাবে। মমত্ব বোধ এসে গেলেই সন্ন্যাসী বাধা পড়ে যাবে। গৃহস্থ তো সন্ন্যাসীকে এই ভাবে শ্রদ্ধা সম্মান করতেই চাইবে। সন্ন্যাসীদের প্রতি সংসারীদের দুর্বলতা থাকেই।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে এই নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। একজন যুবক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, দেখতে খুব সুন্দর। এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেছেন। সেখানে একটি মেয়ে তাঁকে দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে সন্ন্যাসীর পেছন পেছন সে হাঁটতে শুরু করে দিল। একেই যুবক সন্ন্যাসী তার উপর শরীরে আলাদা একটা দীপ্তি। যে কোন মানুষ যখনই ভগবানের চিন্তন করছেন, তাঁর মধ্যে আলাদা একটা তেজ এসে যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীর এই তেজটা আসে সন্ন্যাসের জন্য। সন্ন্যাস থেকে যেমনি সে গৃহস্থাশ্রমে চলে এল তক্ষুণি তার সব কিছু চলে গেল। সে যাই হোক, সন্ন্যাসী মাত্রেই দেখতে সুন্দর হয়, কথাবার্তাও খুব সুন্দর ভাবে বলতে পারেন। সেইজন্য সবাই তাঁকে ভালোবাসতে চাইবে। মেয়েরাও নতুন নতুন ফন্দি পেতে তাঁকে ফাঁসাতে চাইবে। এটা ঠাকুরেরই ভাষা, তিনিও ঠিক একই কথা বলছেন মেয়েরা নতুন নতুন ফন্দি পাতবে। সেখানে তো সবাই দেখতে পাচ্ছে যে সাধুর পতন হয়ে গেল। কিন্তু এখানে যেটা বলছেন সেটা আরও মারাত্মক ব্যাপার।

যে গৃহে বেশী মান, সম্মান, ভালো ভালো অর্ঘ্য দিয়ে সন্ন্যাসীকে সৎকার করা হচ্ছে তখন সেই পরিবারের সদস্যদের প্রতি সন্ন্যাসীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা মমত্ব বোধ জাগবে। একবার হরিদ্বারের দিকে এক সন্ন্যাসী অন্য এক আশ্রমের সাধু মহারাজকে বলছিলেন – ভাই! ভগবানের নাম নেওয়ার জন্যই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু ফেঁসে গেছি। এখন তো আমার সবই আছে, ভক্ত আছে, ভক্তানি আছে, প্রণাম প্রণামী আছে, গলায় মালা আছে, কপালে চন্দন আছে, ভগবান ছাড়া সবই আছে, তোমরাই বাপু ধন্য ভগবানের নামটা এখনও তোমাদের মনে আছে। খুব দুঃখ করে বলছেন। যিনি বলছেন তিনি ওখানকার একটা সম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বর, টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, হাতি-ঘোড়া সবই আছে। এখন ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারছেন না, উপায় নেই। যে সাধুর যত বেশী ঐশ্বর্য সেখানেই বেশী ভক্ত ঘুরঘুর করে। ভক্তরা কোন মর্চে বা

আশ্রমে গেলে সেখানকার সেক্রেটারি বা মহন্তের কাছেই ঘুরঘুর করে, কেউ কি সেখানে গিয়ে খোঁজ নেয় যে, এখানে ভালো বিদ্বদ্ উপলব্ধিবান সাধু কেউ আছেন কিনা! তার মানে ভক্তরা সেই ঐশ্বর্যের পেছনেই ঘুরছে। হরিদ্বারের দিকে যারা ঘুরতে যান তারা জানেনও না এখানে রামকৃষ্ণ মিশন বলে একটা আশ্রম আছে। অথচ ওখানকার সাধুরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের প্রচণ্ড সম্মান করেন, কারণ তাঁরা জানেন নিজেরা এই জালে ফেঁসে গেছেন। এটাই এখানে বলছেন – অভিপূজিতলাভৈশ্চ। যখনই ভক্তরা কোন সাধুকে পূজা অর্চনা করা শুরু করে দেয় তখনই বুঝে নিতে হবে ওই সাধুর সাধু জীবন ঘোর বিপদের দিকে এগোতে শুরু করল, পতন হতে সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ভক্তরাও কি একবারও ভাববে না যে, আমি একজন সাধুর জীবন সর্বনাশ করে দিচ্ছি! একজন সাধারণ লোক গৃহস্থবান তো স্বাভাবিক ভাবেই হয়, বিয়েথা লোকে স্বাভাবিক ভাবেই করে, সন্তান উৎপত্তি তো স্বাভাবিক ভাবেই করে। কিন্তু একজন সন্ন্যাসীকে তৈরী হতে কত বছরের তপস্যা লাগছে। একবারও কেউ এই জিনিষটা ভাবে না। মনু এই কারণে এই ধরনের জিনিষ করতে নিষেধ করে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ দুজনকেই সাবধান করছেন। তিনি সাধুকে যেমন সাবধান করে দিচ্ছেন, অন্য দিকে ভক্তদেরকেও প্রকারান্তরে সাধুদের এই ধরনের পূজা অর্চনা করতে নিষেধ করছেন। তাও ভক্তদের কোন হুঁশ নেই, একজন সন্ন্যাসীকে ফেলে দিতে পারলে যেন এদের কত আনন্দ। তারপর আবার সামনে চোখের জল ফেলবে আর আড়ালে বলবে ‘বেশ হয়েছে! সাধু হয়ে কি তেজ দেখাচ্ছিল!’ এরপরে বলছেন সন্ন্যাসী মুক্তির জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি নেবে –

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বৈষক্ষয়েণ চ।

অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।।৬/৬০

অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা কিভাবে জাগ্রত হবে বলা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজের বশে আনতে হবে। রাগদ্বৈষক্ষয়েণ চ, কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি বা বিদ্বেষের ভাব আসতে না দেওয়া। আর অহিংসয়া চ, সকল জীবের প্রতি অহিংসার ভাবকে পোষণ করা। মনু অহিংসা, অদ্রোহ, ক্ষমা এই ভাবগুলোকে বার বার নিয়ে আসছেন। হিন্দু ধর্মের এগুলোই শেকড় – কোন প্রাণীকে হিংসা না করা, কারুর প্রতি দ্রোহ না রাখা। যদি দেখা যায় কেউ আপনার প্রতি দ্রোহ করছে, সেখান থেকে সরে আসুন। আমাদের সব সমস্যার উৎস হল, আমরা চাই সমগ্র জগৎ যেন আমার মতে চলে। সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই দেখা যায়, যারা বলবে জগৎ জগতের মতই চলুক। কিন্তু ভগবান মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে, মানুষ নদীকেও নদীর মত চলতে দেয় না। নদীর উপর বাঁধ দিয়ে নিজের মত চালাচ্ছে। আমাদের সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্বের যে জায়গাতে জগৎটা আছে, আমরা চাই সেটা যেন আমাদের মত চলুক। যখনই মনের মত চলে না তখনই আমাদের মধ্যে যত অশান্তির বিষ তৈরী হয় আর মেজাজ হারিয়ে ফেলি। রাগ এলে হিংসার ভাব, দ্রোহের ভাব জেগে ওঠে। আমি যখন দেখি আমার সন্তান আমার মত চলছে না, তখন অশান্তি লেগে যাচ্ছে। আমি যখন দেখছি আমার আশে পাশের মানুষরা আমার মত চলছে না, তখন জ্বালা ধরে যাচ্ছে। আরে তারা তো ঠিকই আছে। যে কোন মানুষ সে তো নিজের জায়গাটাতে ঠিক আছে। যখন শিশু ছিল তখন তাকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল। এখন সেই শিশু বড় হয়ে গেছে, এখন সে কি করছে আর কি করছে না সব কিছু দেখতে যাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমি চাইছি সে যেন আমার মত চলে। যখন আমার মত চলে না তখনই গোলমাল হতে শুরু করে। মনু বলছেন, ওখান থেকে তুমি সরে এস।

যে কোন মানুষের মধ্যে যখন সবার প্রতি অহিংসার ভাব আসে সে তখন অমৃতত্বায় কল্পতে, অর্থাৎ তখন সে অমৃত লাভের জন্য যোগ্যতা লাভ করে। আমরা এই যোগ্যতাই অর্জন করতে পারিনি। এর আগে যেমন বলেছিলেন, বেদাভ্যাস যদি করা হয়, যদি বহিঃ ও অন্তর শুদ্ধ হয় আর তার সঙ্গে সবার প্রতি যদি অদ্রোহ ভাব আসে তখন তার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি আসে। পূর্ব জন্মের স্মৃতি জানতে পারলে মানুষের মনে মুক্তির ইচ্ছা জেগে ওঠে। কিন্তু আমরা এত মন্দিরে যাচ্ছি, এত শাস্ত্র কথা শুনে যাচ্ছি, এত পূজা করছি, কই আমাদের তো কারুরই মুক্তির ইচ্ছা জাগছে না। শ্রীশ্রীমা যখন বলে গেছেন হবে, তখন অবশ্যই হবে। কিন্তু যত

ঈশ্বরীয় কথা তো আমাদের মুখ দিয়েই বেরোচ্ছে, অন্য দিকে ঠাকুর বলছেন – এমনি সময়ে টিয়া পাখি মুখ দিয়ে রাম রাম বুলি আওড়ায় আর বেড়ালে ধরলে টাঁ টাঁ করে। হরিবোল হরিবোল তো সবাই করছে, জপ-ধ্যান তো সবাই করছে কিন্তু একটু কিছু হলেই সব বিশ্বাস-টিশ্বাস উবে যাচ্ছে কেন? কারণ কারুর ভেতরে একটুও কিছু ঢোকেইনি। একটা পাথর সমুদ্রে ফেলে দিন। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করুন তুমি জল দেখেছ? পাথরও বলবে ‘জল দেখেছি মানে! আমি সমুদ্রে বাস করি, জলের মধ্যেই আছি’। কিন্তু এক ফোঁটা জলও তার ভেতরে ঢোকেনি। একটা স্পঞ্জকে ফেলতেও হবে না, সমুদ্রের জলে একটু স্পর্শ করলেই জলকে শুষে নেবে। আমরা সবাই পাথরের মত। বেলুড় মঠে আসছি, যাচ্ছি, প্রসাদ খাচ্ছি, চরণামৃত খাচ্ছি। বেলুড় মঠ হল আধ্যাত্মিক সমুদ্র, কিন্তু ভেতরে এক ফোঁটা আধ্যাত্মিকতা ঢুকছে না। মনু আমাদের ভেতরে এই আধ্যাত্মিকতার ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টার উপরই জোর দিচ্ছেন, তুমি শাস্ত্র নিয়মিত অধ্যয়ন কর, বাইরে ভেতরে শুচিতা অর্জন কর আর সবার প্রতি অদ্রোহ ভাব নিয়ে এস। তোমার ভেতরে আধ্যাত্মিকতা এসেছে কিনা কোথায় ধরা পড়বে? অপরের প্রতি তোমার কোন হিংসার ভাব আছে কিনা। তার জন্য তোমার প্রস্তুতি হল রাগ-দেষকে ক্ষয় করা। দেষ মানেই আমার দুঃখ জ্বালা হচ্ছে, আমি এই জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। তখন আমার ক্ষমতা থাকলে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার উপর হিংসা করা! ক্ষমতা না থাকলে চোখের জলই বেরোতে থাকবে। মনু বলছেন রাগ-দেষ থেকে বেরিয়ে এস, এগুলো মধ্যে কক্ষণ জড়িয়ে যেও না।

আমরা প্রায়ই একটা শব্দ শুনে থাকি, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক পথে যাঁরা আছেন তাঁদেরকেই এটা করতে বলা হয়, সেটা হল বিচার। আধ্যাত্মিক পথে বিবেক-বিচার করাটা খুব দরকার। বিবেক বিচারের সাথে নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার, কোনটা নিত্য আর কোনটা অনিত্য বস্তু এটাকেও বিচার করতে হয়। এই বিচার নিয়ে মনু কয়েকটি শ্লোকে আলোচনা করেছেন। সন্ন্যাসী সব সময় বিচার করবে শাস্ত্র নিন্দিত কর্ম করে মানুষ কিভাবে তির্যক যোনি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সাপ, বিছে এইসব প্রাণী হয়ে জন্মায় আর নরকে গিয়ে পড়ে। এগুলো সব সময় বিচার করতে হবে। তাহলে সে আর শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম কখন করতে যাবে না। ভালোবাসার ব্যাপারে বলছেন, প্রিয় যারা তাদের বিয়োগ হয়, অপ্রিয় যারা তাদের সংযোগ হয় আর বার্ষক্যে জরা-ব্যাধির কষ্ট আছে। সন্ন্যাসী এগুলোকে সব সময় বিচার করবে। গীতায় ভগবান বলছেন *ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখাদোষানুদর্শনম্।।* জন্ম হলে কষ্ট, মৃত্যুর সময় কষ্ট, বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট, শরীরে ব্যাধি হলে কষ্ট। এগুলোকে বিচার করতে বলছেন, বিচার করে এগুলোর মধ্যে বার বার দোষ দর্শন করলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য এসে যাবে, মমত্ব বোধ চলে গিয়ে এগুলো থেকে সরে আসার ইচ্ছা প্রবল হবে। তার সঙ্গে বলছেন –

দেহাদুৎক্রমণং চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।

যোনিকোটিসহস্রেষু স্ত্রীশাস্যন্তরাত্ননঃ।।৬/৬৩

আমি যদি এই শরীরই হই তাহলে বাড়ির লোকদের জন্য কেন চোখের জল ফেলছি? কোথাও একটা নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। কারণ আমি এই শরীর নই, এই শরীরের ভেতরে কোন একটা সূক্ষ্ম জিনিষ আছে, যে কিনা এই শরীরের বাইরেও নিজেকে সম্প্রসারিত করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যেমন ইলেক্ট্রিক বাল্বে আলো জ্বলছে, বাল্বটা হল যেন আমার শরীর কিন্তু আমার বাস্তবিক সত্তা হল আলো, যদিও আলোর একটা ছোট্ট কণা ভেতরে কিন্তু সে অনেক দূর পর্যন্ত বিকিরণ করতে পারছে। যদিও এটা উপমার জন্য বলা হল। নিজেকে বিস্তার করে সম্প্রসারিত করতে পারছে বলে অনেকের সাথে সে জড়িয়ে রয়েছে। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বাড়ি, গাড়ি সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে একত্ব করে নিয়েছে। আবার দিন দিন এই শরীর ক্ষয় হয়ে হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য সে ওখান থেকে ভয়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে যাবে কোথায়? আবার অন্য কোথাও একটা শরীর নেবে। এই সূক্ষ্ম শরীরটাই স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে আরেকটা স্থূল শরীরে প্রবেশ করছে। দেহ থেকে জীবাত্মার এই যে উৎক্রমণ, অর্থাৎ প্রাণবিয়োগটা অতীব যন্ত্রণাদায়ক যা সহ্য করা অসম্ভব, অতি কষ্ট পেয়ে পেয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া, তারপর আবার কোথায় সাপ, ব্যাঙ হয়ে, কিংবা মানুষ হয়েই অত্যন্ত নোংরা বস্তিতে

বা শত্রুর ঘরে নাতি হয়ে জন্ম নিতে হবে, এগুলোকে বার বার বিচার করা। পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্। জন্মাচ্ছি মরছি, মরে আবার কোন নারীর গর্ভে ঢুকছি।

আমাদের যদি বিচার করে দেখতে বলা হয় মৃত্যুর পর তোমাকে কার নাতি হয়ে কার বাড়িতে জন্ম নিতে হবে, তখনই তো আমাদের আতঙ্ক লেগে যাবে। এটাই মনু বলছেন, সর্বদা বিচার করে যাও। এগুলো সর্বদা একটা পর একটা বিচার করে যাও, প্রিয়জনের বিয়োগ হবে, যারা অপ্রিয় তাদের সংযোগ হবে, যাদের পছন্দ করি না হয়তো তাদের ঘরে গিয়েই আমার জন্ম হতে পারে। এটা সত্যিকারের হয়, স্টিভেনসন তাঁর বইয়ে পূর্ব জন্মের অনেক দৃষ্টান্ত নিয়ে এসেছেন। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, আপনার প্রতি কারুর হয়তো শত্রুতা আছে। আপনার প্রতি তার এতই রাগ যে, সব সময় আপনাকে নিয়েই ভাবছে। তারপর মরার পর সে আপনারই বাড়িতে এসে জন্ম নিল। আর জন্মে নিয়েই কত রকম ভাবে জ্বালাতন শুরু করে দিল, জ্বালিয়ে বাড়ির সবাইকে শেষ করে দেবে। কানপুরের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় একজন হিন্দু মারা গেছে। তারপর সে জন্ম নিয়েছে এক মুসলমানের বাড়িতে। দেখা গেল তার সব আচার হিন্দুদের মত, মুসলমানদের একেবারে সহ্য করতে পারেনা। এই সমস্যাগুলো সব সময় বিচার করতে হয়। সেইজন্য পুনর্জন্ম নিয়ে যতক্ষণ না বিচার করা হয় ততক্ষণ বৈরাগ্য আসবে না।

অন্য দিকে বলছেন, ব্রহ্ম প্রাপ্তি হলে মানুষ যে আত্মজ্ঞান পায় এবং এর ফলে মুক্তি পেয়ে যে তার সুখপ্রাপ্তি হয়, এটাকে নিয়ে সব সময় চিন্তন করে যেতে হবে। প্রথমে নেগেটিভ দিকগুলো নিয়ে বিচার করতে বললেন, এবার পজিটিভ গুলিকে বিচার করতে বলা হচ্ছে। ঠাকুর ঈশ্বর দর্শনের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর দর্শনে যে সুখ লাভ হয় তার তুলনা করে একটা খুব দামী কথা বলছেন। মানুষ কেন ঈশ্বরের দিকে এগোবে? ঠাকুর এক দিকে যেমন সংসারের অনেক নেগেটিভ দিকগুলো নিয়ে বিচার করতে বলছেন, যেমন বিচার করবে নারী শরীরে কি আছে কিংবা সন্দেশ রসগোল্লাতেই বা কি আছে। অন্য দিকে ব্রহ্মানন্দের বা ঈশ্বর প্রাপ্তির কি লাভ বলতে গিয়ে বলছেন ঈশ্বরের রূপ ও ঐশ্বর্যের একবার যদি দর্শন হয়ে যায় তখন রস্তা তিলোত্তমার রূপকেও চিতার ভস্ম বলে মনে হয়। ঈশ্বরের সৌন্দর্যের কাছে জগতের কোন সৌন্দর্যই দাঁড়ায় না। কিন্তু সুখ, সুখটাই তো সবার উপরে। ঈশ্বর দর্শনের সুখের সাথে জগতের সুখের তুলনা করে বলছেন – এই জগতে সব থেকে প্রিয় সুখ হল রমণ, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের যে সুখ বা ঈশ্বর দর্শনের যে আনন্দ তাতে প্রতিটি রোমকূপে ওই রমণ সুখ অনুভূত হয়। আনন্দের পরিমাপ করে ঠাকুর আরও বলছেন – বিষয়ানন্দ থেকে ভজনানন্দের সুখ অনেক বেশী, আর ভজনানন্দ থেকে ব্রহ্মানন্দে সুখ আরও বেশী অনুভূত হয়। মনু এখানেও বলছেন একদিকে সংসারে যেমন নেগেটিভ দিকগুলো আছে সেগুলো বিচার করবে আবার অন্য দিকে ঈশ্বর লাভ হলে কত আনন্দ হয় সেটারও বিচার করবে।

সূক্ষ্মতাং চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।

দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুক্তিমৈশ্বর্যধমেসু চ।।৬/৬৫

যোগের সাধনার সময় পরমাত্মা যে কত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সেটা সব সময় চিন্তন করবে। আর কি ধরণের কর্ম করলে উত্তম, মধ্যম আর নিম্ন যোনি প্রাপ্ত হতে হয় সেটাও সব সময় ভাববে। তার মানে সন্ন্যাসী যখন ধ্যানে বসবে তখন নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার যেটা করবে, ইষ্টানিষ্টের বিচার যেটা করবে সেটাতে সব সময় এই ভাবটাকে ধরে রাখবে – যদি আমি যোগ সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম ভাবটাকে ধরার চেষ্টা করি তাহলে আমার এই এই লাভ, আর যদি না করি তাহলে আমাকে ওই সব গর্ভে গিয়ে জন্ম নিতে হবে। এক দিকে আতঙ্ক অন্য দিকে মহা সুখ, এর মধ্যে একটাকেই আমাকে বেছে নিতে হবে।

আমরা মনে করি সাধু সন্ন্যাসী মানে একেবারে পাকা জ্ঞানী। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। এই জিনিষ গুলোকে ক্রমাগত বিচার করে করে নিজেকে পাকা করে নিতে হয়। যারা বোকা মুখের মত ভাবতে থাকে, ঈশ্বর সব করে দেবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে হবে, তাদের দ্বারা আর কিছু না হোক একটা জিনিষ হবে, তারা

এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতেই থাকবে। ঈশ্বরের একটাই মাত্র ইচ্ছা, তাঁর এই সৃষ্টিটা চলতে থাকুক। বাচ্চা মেয়ে মায়ের মত শাড়ি পড়ে তার আঁচলে একটা চাবির গোছা বেঁধে ঘোরাচ্ছে। সবাই দেখে বলছে, দেখেছে এখনই চাবি ঘোরাচ্ছে! বড় হয়ে বরকে এইভাবে নাচাবে। ভগবানও তাই করে যাচ্ছেন, সবাইকে তিনি নাচিয়ে যাচ্ছেন। এখন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি তাহলে জন্ম জন্ম ধরে তিনি আমাদের নাচাতেই থাকবেন। যখন দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করবে তখন ভগবান মুখে একটু মধু ঢেলে দেবেন, যাতে আবার সংসারের সুখের জন্য লালায়িত হয়ে আবার ক্রন্দনের রাজ্যে ফিরে যাই। জেলে যখন কয়েদিদের পিটুনি দেয়, মারতে মারতে যদি কয়েদি বেহুঁশ হয়ে যায় তখন এটা সেটা করে হুঁশটা ফিরিয়ে আনে, হুঁশ ফিরলেই আবার বেদম মার। ভগবানের তো এটাতেই মজা। আমি যদি বড় বেশী কাঁদতে শুরু করি দিই তাহলে তো আমি জাল ছিড়ে বেরিয়ে যাব। তখন তাড়াতাড়ি করে ভগবান একটু সুখ দিয়ে দেন। মানে আমি দুঃখ যন্ত্রনার চোটে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলাম, ভগবান তখন একটু সুখ শান্তি দিয়ে হুঁশ ফিরিয়ে আনলেন, তারপর আবার পিটুনি। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর ছাড়লে এই দুর্গতিই কপালে জুটবে। তাই বাঁচতে হলে সব কিছু ঈশ্বরের উপর না ছেড়ে একটু নিজের হাতে নিতে হয়। ব্যাখার যন্ত্রণায় আমরা বেহুঁশ হয়ে গেলেই তিনি একটু সুখ দিয়ে আবার পেটাতে শুরু করেন। তিনি তো সংসার সৃষ্টি করেছেন সংসারকে চালানোর জন্য। সংসারকে চালাতেই তাঁর মজা। যাকে ভালোবাসা দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সেখান থেকে আঘাত এলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলবে ‘তাকে কত ভালোবেসেছিলাম, সে তো একবারও আমার কথা মনে করে না’। চোখের জল যদি বেশী হয়ে যায় তখন আবার ঈশ্বরের আশঙ্কা হয়, এর আবার বৈরাগ্য না এসে যায়! তখন আরেকজনকে তার জীবনে নিয়ে আসেন। তখন আবার পুরনো খেলনাটা ভুলে নতুন খেলনা নিয়ে খেলতে শুরু করে। সেইজন্য সন্ন্যাসীকে বলছেন, সংসারের এই জিনিষগুলোকে সব সময় বিচার করতে হয়। ভালো-খারাপ যাই আসুক সবটাকেই বিচার করতে হয়, বিচার ছাড়া হবে না। আজ পর্যন্ত ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না যে, ঈশ্বর এসে কাউকে উদ্ধার করেছেন। একটি কোন দৃষ্টান্ত নেই যে নিজের চেষ্টা ছাড়া উদ্ধার হয়েছে। যুক্তিতেই দাঁড়ায় না। সচ্চিদানন্দ ছাড়া তো কিছু নেই, তিনি নিজের ইচ্ছা শক্তি আর ক্রিয়া শক্তিতে এই জগৎকে দাঁড় করিয়েছেন। ঠাকুরও বলছেন – বুড়ি চায় না কেউ তাকে ছুঁয়ে দিক, খেলা তো তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী বলছে আমার সব কিছু দেখা হয়ে গেছে। এবার সে বুড়ি ছোঁওয়ার চেষ্টা করতে নেমে পড়েছে, কিন্তু বুড়ি তো তাকে ছুঁতে দেবেন না। তাই তোমাকে চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে। কিসের চেষ্টা? সব কিছু বিচার করে করে সরে এস, এই চেষ্টা। প্রিয় বিয়োগ আর অপ্রিয় সংযোগ, বার্ষক্য, ব্যাধি, মৃত্যু, মৃত্যুর পর নিম্ন যোনিতে জন্ম, আবার অন্য দিকে ব্রহ্মানন্দের সুখ এগুলো ভাবতে ভাবতে একটা সময় বিবেক জাগ্রত হয়ে যায়, তখন বলবে আর না অনেক হয়েছে। তুলসীদাসের খুব নামকার ভজন আছে যার বক্তব্য এটাই – হে শ্রীরাম! অনেক নাচান নাচিয়েছ, আর নয় প্রভু। কিন্তু আমরা বলি – হে প্রভু! কষ্ট যখন দিয়েছ, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাটাও দাও। প্রভু আমাদের অবশ্যই দেবেন, যিনি কষ্ট দিয়েছেন কষ্ট সহ্য করা ক্ষমতা অবশ্যই তিনি দেবেন। দুই গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খাইয়ে আবার পিটুনি দেবেন। কিন্তু কেউ বলে না যে, হে প্রভু! এই নাও তোমার বেদনা, এই নাও তোমার সুখ।

ভগবানকে কখন সুখ-দুঃখের কথা বলতে নেই, বলতে হয় এই নাও তোমার সুখ, এই নাও তোমার দুঃখ, আমার কোনটাই লাগবে না। যদি বলি – হে প্রভু! এত দিন দুঃখ দিলে এবার একটু সুখ দাও। অবশ্যই প্রভু সুখ দেবেন, কারণ তিনি জানেন একটু সুখ না দিলে খুব গোলমাল লেগে যাবে, ব্যাটা হয়তো সন্ন্যাসীই হয়ে যাবে। বিবেকের কথা আমরা খুব বলি। কিন্তু এই বিবেক জিনিষটাকে জাগ্রত করা খুব কঠিন। যতক্ষণ এগুলো বিচার করা না হয় ততক্ষণ বিবেকের অস্তিত্বটাই ধরা যায় না। ঠাকুর বলছেন বাচ্চা যখন কাঁদে তখন তাকে চুষনি দেওয়া হয়, বাচ্চা ওই চুষনি নিয়েই মাকে ভুলে থাকে। কিন্তু একটা সময় চুষনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মার জন্য চিৎকার করতে থাকে। মা তখন ভাতের হাড়ি নামিয়েই দৌড়ে এসে বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়। এটাই বলা হচ্ছে বিচার করে করে এই চুষনিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য এগিয়ে পড়।

আমাদের মনের একদিকে রয়েছে আত্মার শক্তি, যার জন্য মন সব সময় আলোকিত হয়ে উঠছে, অন্য দিকে মন আবার জড়িয়ে আছে ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে। ইন্দ্রিয়গুলো আবার চলে নিজের বিষয়ের সঙ্গে, কারণ ইন্দ্রিয় আর তার বস্তু এক। ইন্দ্রিয় মনকে নাচাচ্ছে, মন নিজের আত্মার আলোকে ভুলে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু আমাকে বাঁচতে হবে। সেইজন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে কিভাবে মনকে ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে ঘুরিয়ে আত্মার দিকে ঘোরান যায়। আমাকে আগে ঠিক করতে হবে আমি কি চাইছি, আমি কি ইন্দ্রিয় সুখ চাইছি? হ্যাঁ আমি ইন্দ্রিয় সুখই চাই, কারণ এটাকে আমি একেবারে প্রত্যক্ষ দেখছি। ভগবানও এটাই চাইছেন আমরা যেন ইন্দ্রিয়ে সুখের পেছনে দৌড়াই, এই সংসারটা তো দৌড় প্রতিযোগিতার এক মহা খেলা, এতেই সবাই আনন্দে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের কারবারী হয়ে যাই তখন ভগবানও খুব আনন্দ পান। একজন ডাক্তার যার খুব পসার নেই, তার চেম্বারে একটা রুগী এলে ডাক্তারের যে রকম আনন্দ হয়, ভগবানেরও ঠিক সেই রকম আনন্দ হয় যখন দেখেন কেউ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য দৌড়াচ্ছে। এক শহরে দুজন ডাক্তার, দেখা যাচ্ছে একজন ডাক্তারের চেম্বারে খুব ভিড় হয়েছে আর অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে। বাইরের শহর থেকে একজন নতুন রোগী এই শহরে এই ডাক্তারের এখানে ভিড় আর মোমবাতি জ্বলছে দেখে অন্য ডাক্তারের কাছে চলে গেল। সেখানে এসে দেখে চেম্বারটা অন্ধকার, ডাক্তার একা বসে আছে। ডাক্তার রোগের বিবরণ শুনে ওষুধ লিখে প্রেসক্রিপশান করে রোগীকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। রোগী তখন বলছে ‘ডাক্তারবাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করব’? ‘বলুন, কি জানতে চান’। ‘আচ্ছা ডাক্তারবাবু! ওই ডাক্তারের চেম্বারে দেখলাম প্রচুর লোকজন আর অনেক মোমবাতি জ্বলছে, কিন্তু আপনার চেম্বারে কোন রুগী নেই, আর কোন মোমবাতিও জ্বলছে না, এর রহস্যটা কি’? তখন এই ডাক্তার বলছে ‘আসলে ব্যাপারটা হল, আমাদের মধ্যে একটা প্রথা আছে চিকিৎসা করতে গিয়ে কোন রোগী যদি মারা যায় তখন আমরা তার নামে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখি। ওনার অতগুলো রোগী মারা গিয়েছে বলে অত মোমবাতি জ্বলছে’। এই লোকটি খুব অবাক হয়ে বলছে ‘আপনি এত ভালো ডাক্তার! আপনার তাই একটাও মোমবাতি জ্বলছে না’? সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলছে ‘না, এবার জ্বালাব’। ভগবানও ওই রকম খুঁজে বেড়াচ্ছেন মোমবাতি জ্বালানোর জন্য। যারাই সুখের অন্বেষণ করছে তখন ভগবানের এক গাল হাসি, এবার একটা খন্দের পাওয়া গেল। ভগবানও এসো এসো বলে খুব করে সুখের ডালি সাজিয়ে তাকে বরণ করতে এগিয়ে যাবেন। এরপর আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে মনু বলছেন –

দুষ্টিতোহপি চরেদ্ ধর্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্।।৬/৬৬

আমি আপনি যে আশ্রমেই থাকি না কেন, ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গৃহস্থশ্রম, বাণপ্রস্থশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পুরুষ ও নারী যাই হয়ে থাকি না কেন সবটাতেই দোষ আছে। কোন আশ্রম, কোন ধর্ম, কোন বর্ণের সব কিছুই ঠিক কখন হবে না, সবটাতেই কিছু না কিছু দোষ পাওয়া যাবে। সেইজন্য কি করতে বলছেন? দুষ্টিতোহপি চরেদ্ ধর্মং, যার জন্য যে ধর্ম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তাকে সেই ধর্মটাই পালন করতে বলা হচ্ছে। যেমন স্ত্রীদের জন্য একটা ধর্ম করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক স্ত্রীকে বলা হচ্ছে তোমরা ওই ধর্মটাই পালন কর। সেই রকম ব্রাহ্মণদের জন্য একটা ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের জন্য একটা ধর্ম করে দেওয়া হয়েছে, বলছেন তুমি যে বর্ণেরই হও না কেন তোমার বর্ণের জন্য যেটি নির্দিষ্ট ধর্ম সেই ধর্মটাই পালন কর। গীতায় ভগবান অর্জুনকে ঠিক এই কথাই বলছেন – সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। যদি ওই ধর্মে দোষ পাও তাও তুমি ওই ধর্মটাই পালন করে যাও।

যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ, তুমি যে আশ্রমে আছ সেই আশ্রমেই বসবাস কর, ওই আশ্রম থেকেই তোমার সব কিছু হবে। সবাইকে যে সন্ন্যাস হতে হবে, সবাইকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, সবাইকে পুরুষ হতে হবে তার কোন মানে নেই। যেখানে তুমি সে অবস্থায় আছ সেখান থেকেই তোমার সব হবে। কিন্তু ওই আশ্রম ও বর্ণের ধর্মটা তোমাকে পালন করতে হবে। মনুস্মৃতিতে যে ধর্মের কথা বলে দেওয়া হয়েছে, যেমন তুমি পুরুষের শরীর

পেয়েছ তুমি পুরুষের ধর্ম পালন কর। তুমি স্বামী যদি হও তাহলে স্বামীর আচরণ পালন কর। যেমন মনুস্মৃতিতে বলছেন যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ, তাই তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে তোমার বাড়ির মেয়েরা যেন কোন কষ্ট না পায়। ঠিক তেমনি নারীর জন্য একটা আলাদা ধর্ম করে দেওয়া হয়েছে। এখন বলছেন, যাদের কম বয়স তাদের জন্য একটা ধর্ম আছে, যাদের বেশী বয়স তাদের জন্য আরেকটা ধর্ম আছে। তুমি যে অবস্থায়, যে আশ্রমে, যে বর্ণে আছ সেখানে যদি দোষও দেখ তবুও ওখানকার ধর্মটাই পালন কর। কারণ প্রত্যেক আশ্রমে, প্রত্যেক বর্ণে, প্রত্যেক ধর্মেই দোষ আছে। গীতায় যে ভগবান বলছেন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মোভয়াবহঃ, এই কারণেই বলছে।

আর কি করবে? সমঃ সর্বেষু ভূতেষু, তুমি যেখানেই থাক সেখান থেকে সবার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখার চেষ্টা কর, সবাইকে ভালোবাস। সম্প্রসারিত ব্যক্তিত্বে স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি যে অভিসঙ্গের কথা বলা হয়েছিল, ওই ভালোবাসাটা বন্ধ কর। আত্মীয়, পরিবার, পরিজন থেকে গুরু করে সারা বিশ্বের সব মানুষ ও সমস্ত কীট-পতঙ্গ, পশুপাখী সবার প্রতি সমান দৃষ্টি নিয়ে আসার চেষ্টা কর। মা-বাবা নিজের সন্তানকে তো ভালোবাসবেই। কিন্তু ঠাকুর আবার বলছেন, শুধু নিজের সন্তানকে ভালোবাসার নাম মায়া। আর সবার সন্তানকে ভালোবাসার নাম দয়া। মায়া বন্ধন সৃষ্টি করে আর দয়া মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মানে এটাই। যে বলছে যা আছে সব আমার নিজের জন্য, অন্য কারুর জন্য নয়, তার মৃত্যু শিয়ারে। আমরা যে এত স্মৃতি আদি অধ্যয়ন করছি কারণ আমরা মন্দ বুদ্ধি সম্পন্ন। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারতের যে এত দুর্গতি তার একটি কারণ হল আমাদের দেশে প্রচুর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কারণ সব মানুষগুলো হল মন্দ বুদ্ধি সম্পন্ন, একটা প্রশ্ন করলে কোন উত্তর আসে না। যারা মন্দ বুদ্ধির তাদের সব কিছুর জন্য নিয়ম করে দিতে হবে। একটা পা ফেলতে গেলেই আমরা আইনের বেড়াজালে আটকে যাচ্ছি। এখানে কি বলছেন? তুমি যেখানেই জন্ম গ্রহণ কর না কেন, যে আশ্রমেই জন্ম নাও না কেন সেখানেই স্থিত থাক। প্রত্যেক ধর্মেই দোষ থাকবে। ধর্ম বলতে এখানে বোঝাচ্ছেন, গৃহস্থপ্রমাদির ধর্ম। কিন্তু মূল দৃষ্টিটা থাকবে সমঃ সর্বেষু ভূতেষু। এই কথাটা আমাদের শাস্ত্রে বার বার ঘুরে ঘুরে আসবে – সবার প্রতি সম দৃষ্টি রাখ। ঈশোপনিষদে যেটা বলছেন তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতি, একত্ব বোধ হয়ে গেলে তখন আর ভেদ দৃষ্টি থাকে না। একত্ব বোধ হওয়া আর সম দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া একই জিনিষ।

ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্, লিঙ্গ মানে চিহ্ন। যেমন গেরুয়া পোশাক সন্ন্যাসীর লিঙ্গ, বৈষ্ণবদের এক রকম চিহ্ন, কালী সাধকদের আরেক রকম চিহ্ন। এই লিঙ্গ কখন ধর্মের কারণ হয় না। ধর্ম যে কোন লোক যে কোন অবস্থাতেই করতে পারে। শেষ ধর্ম হল একত্বম্ আর সমঃ সর্বেষু ভূতেষু, সমস্ত প্রাণীর প্রতি সম দৃষ্টি রাখা। ষষ্ঠোহধ্যায়ের এই ৬৬ নং শ্লোকটি মনুস্মৃতির খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, তুমি যে অবস্থায় আছ সেখানকার জন্য যে ধর্মটা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে সেই ধর্মটাই পালন করে যাও। কিন্তু একটা জিনিষ সব সময় মাথায় রাখবে, যা কিছুই করো না কেন, যদি সব কিছু ভুল হয়ে যায় বা কোথাও যদি সংশয় আসে তখন এটাই মনে রাখবে সমঃ সর্বেষু ভূতেষু, সব জীবে সম দৃষ্টি রাখ। সর্বজীবে সম দৃষ্টি রাখাটাই মূল, আর তা না করে শুধু গেরুয়া পোশাক চাপিয়ে, কপালে তিলক লেপন করে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা বুলিয়ে কিছুই হবে না।

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যমুপ্রসাদকম্।

ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি। ৬/৬৭

কিছু ফল আছে বা নির্মলী দুষিত জলে ফেলে দিলে জলটা পরিষ্কার ও শুদ্ধ হয়। কিন্তু দুষিত জলের সামনে বসে শুধু নির্মলী নির্মলী করে গেলে জলটা পরিষ্কার হয়ে যাবে না। তেমনি ধর্ম ধর্ম করে গেলে কিছুই হবে না, ধর্ম তোমাকে আচরণ করতে হবে। আর শেষ ধর্ম হল সমঃ সর্বেষু ভূতেষু। সম দৃষ্টি এসে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই কারুর প্রতি আর হিংসার ভাব থাকবে না, রাগ-দ্বेष আসবে না, কারুর প্রতি দ্রোহ ভাব

আসবে না। যাঁরা ধর্ম সাধন করেন তাঁদের জন্য সমৃদ্ধি হল খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাদের সমৃদ্ধি নেই তাদের দ্বারা ধর্ম আচরণ হবে না।

দহ্যন্তে ধায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।

তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ।।৬/৭১

সোনা, রূপার ময়লা আগুনে দিলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর শব্দই হল তপ্তকাঞ্চন। সোনাকে আগুনে দিলে তার সব মালিন্য পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়ের যত রকমের দোষ আছে প্রাণায়ামের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সব দোষ দক্ষ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের দোষ মানে, চোখে সুন্দর জিনিষ দেখতে চাওয়া, কানে ভালো গান শুনতে চাওয়া। গানকে ভালোবাসতে নিষেধ করা হচ্ছে না, সঙ্গীতকে আমি পছন্দ করি সেটা অন্য জিনিষ। কিন্তু অমুকের গান শুনলেই আমার মনটা না কেমন উদাস হয়ে যায় বা সব কিছু ছেড়ে রোজ গান শুনতে যাওয়া, এগুলো ইন্দ্রিয়ের দোষ। সুন্দর জিনিষ দেখতে নিষেধ করা হচ্ছে না, কিন্তু যাকে ভালোবাসছে তাকে বলছে ‘তোমাকে না কি মিষ্টিই দেখতে’, এগুলো হল ইন্দ্রিয়ের দোষ। ঠাকুর বলছেন, গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে এসে এক মহিলা বলছে ‘যাই নাতির চাঁদমুখটা একবার দেখে আসি’। ঠাকুর শুনে বলছেন চাঁদ মুখ না পোড়ার মুখ। মহিলা নিজের চোখ দিয়ে দেখতে চাইছে নাতির রূপ, আবার প্রেমিক প্রেমিকাকে দেখতে চায়। এই ধরনের যত ইন্দ্রিয়ের দোষ আছে প্রাণায়াম করলে এগুলো পুড়ে যায়।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্ দোষণ্ ধারণাভিচ্ কিল্বিষম্।

প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।।৬/৭২

প্রাণায়াম করলে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন রকমের ব্যাধি ও দোষ চলে যায়। মনের পাপ ঈশ্বর চিন্তন করলে, পরমাত্মায় মন দিলে চলে যায়। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে বলপূর্বক সরিয়ে আনা হলে বিষয় সংসর্গ থেকে যে পাপ হয় সেটা কেটে যায়। জোর করে বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে হয়, দরকার হলে নিজেকেই সরে আসতে হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন, বিকারের রোগীর ঘরে জলের জালা রাখা যায় না। মাঝে মাঝে যখন ভোগের বিষয় থেকে বেরিয়ে আসা হচ্ছে তখন বিষয়সংসর্গ জনিত পাপটা কেটে যায়। বিষয়সংসর্গ অত্যন্ত খারাপ জিনিষ। যখনই কারুর প্রতি যদি দুর্বলতা থাকে তখন তার মনটা সেই ব্যক্তির কাছে টেনে টেনে নিয়ে যায়, আর যখনই কাছে যাবে তখনই গোলমাল হবে। সেইজন্য বলছেন বিষয় থেকে টেনে নিতে হয়। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে নেওয়াকে যোগে বলা হয় প্রত্যাহার। প্রত্যাহারে ঈশ্বর ব্যতিরেকে যা কিছু আছে কাম, ক্রোধ, লোভাদিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তিনটে জিনিষ এই শ্লোকে বলছেন – প্রাণায়াম, ধারণা আর প্রত্যাহার। প্রাণায়ামে দেহের দোষ কেটে যায়, ধারণাতে মনের পাপ চলে যায় আর প্রত্যাহারে কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলোর প্রতি যে প্রীতি আছে সেটা পুড়ে যায়।

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্যেয়ামকৃতাভিঃ।

ধ্যানযোগেন সংপশ্যেদগতিমস্যন্তরাত্মনঃ।।৬/৭৩

জীবের যে কি কারণে উর্দ্ধগতি আর নিম্নগতি হয় এটা যারা যোগী নয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞানহীনদের কাছে অত্যন্ত দুর্জ্যেয়। কিন্তু যাঁরা যোগী, আত্মজ্ঞানী তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পান। গীতাতেও ঠিক একই কথা বলছেন – উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।। ভেতরের জীবাত্মাই যে সব কিছু করছেন যারা বিমূঢ় তারা এটা দেখতে পায় না। কোন সন্ন্যাসী যখন ব্রহ্ম অভ্যাস করেন তখন ধীরে ধীরে তিনি দেখতে পান কিভাবে জীবের গতি কখন উপরের দিকে কখন নীচের দিকে হয়। কিন্তু সাধারণ লোকদের এই কারণেই জীবাত্মা, পুনর্জন্ম এগুলোতে বিশ্বাস হয় না, তারা তো এগুলো দেখতে পারছে না। যে জিনিষটা আমি দেখিনি সেই জিনিষটাকে আমি কি করে বিশ্বাস করব! আচার্য শঙ্কর তাই বলছেন, এগুলো শাস্ত্রে আছে আর শাস্ত্রের কথা মানতে হয়। মনু এক ধাপ এগিয়ে বলছেন যাঁরা যোগী তাঁরা এগুলো দেখতে

পান, যাঁরা যোগী নয় তাঁরা এগুলো দেখতে পায় না। যোগীরা যে জিনিষগুলো দেখেছেন, অনুভব করেছেন সেটাই শাস্ত্র।

জীব যে এই বিভিন্ন রকমের গতি প্রাপ্ত করে, কখন দেবলোকে যাচ্ছে, কখন অসুরলোকে যাচ্ছে, এই জিনিষগুলোকে ধ্যানের দ্বারা বুঝতে হয়। বুঝে নেওয়ার পর যখন পরমাত্মার ধ্যান করে তখন এটা অভ্যাসে পরিণত হয়। অবিদ্যার জন্যই মানুষের এই দুর্গতি, এই জ্ঞান হয়ে গেলে তখন তার মন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দিকে যায়। পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা যেটা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি, যেটা এই অর্থেও দেখা যেতে পারে, আমি হয়তো দেখলাম একজন মারা গেল তারপর সে এবারে দেবলোকে চলে গেছে, এবারে সে অমুক লোকে গেছে, এই জিনিষগুলো যখন দেখে তখন তার বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে যায়। তাহলে তো আমারও এই রকম কিছু হতে পারে। তখন মানুষ সাবধান হয়ে যায়। সেইজন্য আগেই বলে দিলেন বেদান্ত্যাস, শুচি, তপস্যা আর অদ্রোহ করলে মানুষ পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা জানতে পারে। এখানেও বলছেন প্রাণায়াম, ধারণা ও প্রত্যাহার এগুলো করে বার বার মনটাকে ধ্যানে নিয়ে গেলে তখন আস্তে আস্তে এই জিনিষগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। তা না করলে অসঙ্গ আর অভিসঙ্গির মধ্যে ফেঁসে থাকতে হবে। এমনিতে শাস্ত্র পড়লে, কথামৃতাди গ্রন্থ পড়লে মনে হবে আধ্যাত্মিক জীবন খুব কঠিন। কিন্তু এই পথে নামলে ভালো বোঝা যায় কত কঠিন এই আধ্যাত্মিক জীবন। এটাই এনারা বলছেন সব দিক দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাও। শাস্ত্রের কথা তাই বার বার শুনতে হয়, অধ্যয়ন করতে হয় তারপর সব সময় চিন্তন করে যেতে হয়। আর সাধনাতে লেগে থাকতে হয়। ফিটকিরি ফিটকিরি বললে কি জল পরিষ্কার হবে! জলে ফিটকিরি দিলে তবেই তো জল পরিষ্কার হবে।

এখানে সন্ন্যাসীদের ধর্ম নিয়েই আলোচনা চলছে। ধ্যান করলে কি হয় বলতে গিয়ে বলছেন, ধ্যান করলে জগতের সব কিছুর প্রতি তার মমত্ব বোধটা চলে যায়। মমত্ব হল যেটা অভিসঙ্গির কথা বলা হল। দুটো জিনিষ আছে, একটা অহংতা আর অন্যটা মমতা। অহংতা থেকে আসে আমি বোধ আর মমতা হল আমার, আমি আর আমার। ধ্যান করলে এই আমি ও আমার বোধটা চলে যায়।

ধ্যানিকং সর্বমেবৈতৎ যদেতদভিশব্দিতম্।

ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশুতে।।৬/৮২

সন্ন্যাসীর ধ্যানের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, একমাত্র পরমাত্মার ধ্যান করলেই এই মমত্ব বোধ যায়। যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানশূন্য ধ্যান হয় সেই ধ্যানের কোন ফলই হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এই শ্লোকটি খুবই মূল্যবান। সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না আর মৃত্যুর প্রতিও কোন মমত্ব থাকে না। তাঁকে যদি বলা হয় তুমি মরে যাবে, তাহলে সে বলবে বেঁচে থাকতে হলে বেঁচে থাকব, মরে যাওয়ার হলে মরে যাব, বাঁচা আর মরা কোনটাতেই আমার ভ্রক্ষেপ নেই। সন্ন্যাসীর এটাই শেষ মমত্ব, তাঁর যে দেহের প্রতি বা জীবন-মৃত্যুর প্রতি কোন অহংতা মমতা থাকার সেটা চলে যায়। জীবন আর মৃত্যুর প্রতি এই মমত্ব যায় একমাত্র পরমাত্মার ধ্যানে। আমরা যখন ধ্যান করি তখন আমাদের মন একবার এদিকে যাচ্ছে, আরেকবার ওদিকে যাচ্ছে। বলছেন এই ভাবে ধ্যান করলে কিছুই হয় না। সেইজন্য পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা ইস্টের ধ্যান আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরের শ্লোকে বলছেন –

অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ।

আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতং চ যৎ।।৬/৮৩

এই শ্লোকটি সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহস্থদের জন্য নয়। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাসীকে ধ্যান করতে বলা হল। এই শ্লোকে বলছেন বেদে যজ্ঞের জন্য ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র আছে সেই বেদমন্ত্র গুলোও জপ করতে হয়। জীবের স্বরূপ প্রতিপাদক বেদমন্ত্রও জপ করতে হয়। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্তের যে মন্ত্র আছে সেগুলোও জপ করতে হয়। এখানে তিন রকমের জপ করতে বলা হচ্ছে – অধিযজ্ঞম্, অধিদৈবিকম্ আর আধ্যাত্মিকম্।

যে মন্ত্রাদির দ্বারা বেদের বিভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়, সেই বেদমন্ত্র গুলোর জপ করাকে বলা হচ্ছে অধিযজ্ঞম্। জীবের স্বরূপ প্রতিপাদক বেদের যে মন্ত্রগুলো আছে তার জপ করাকে বলছেন অধিদৈবিকম্। আর উপনিষদের ব্রহ্ম প্রতিপাদক মন্ত্রের জপকে বলছেন আধ্যাত্মিকম্। সন্ন্যাসীদের এই তিন ধরনের জপই করতে হয়। জপ না করলেও অন্ততঃ চিন্তনটা করে যেতে হয়। এখানে যেমন ব্রহ্ম প্রতিপাদক মন্ত্রের উপমা দিতে গিয়ে বলছেন সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এটাই সন্ন্যাসীকে জপ করতে হয়। এই জপেই তাঁর ব্রহ্ম উপাসনা হয়ে যাচ্ছে। তবে গৃহস্থদের শুধু ইষ্টমন্ত্র জপ করাতেই জোর দেওয়া হয়েছে। ইষ্টমন্ত্র জপে এই তিনটির সাধনাতে সবটাই হয়ে যায়। যেমন ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় বা ওঁ নমঃ শিবায়, এইসব মন্ত্রে সবটাই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের তিনটেকেই পৃথক ভাবে জপ করা বিধেয়। কারণ সন্ন্যাসীকে তিন ধরনের জপ করে তিন ধরনের স্তরকে অতিক্রম করে আসতে হয়। পরের শ্লোকে বলছেন –

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমেব বিজানতাম্।

ইদমথিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম্।।৬/৮৪

যারা বেদ জানে না, অর্থাৎ যারা বেদবেত্তা নয় তাদের জন্য বেদই একমাত্র শরণ। আর যাঁরা বেদজ্ঞ অর্থাৎ যাঁদের বেদের জ্ঞান আছে তাঁদের জন্যও বেদই একমাত্র শরণ। বলতে চাইছেন ধর্মের ব্যাপারে, স্বর্গাদির ব্যাপারে জানতে হলে বেদ ছাড়া আর কিছু নেই। বার বার সেইজন্য বেদাভ্যাস করতে বলা হচ্ছে। আমাদের ভাষায় বলা যায়, যারা ঈশ্বর মানে না তাদের জন্যও ঈশ্বরই একমাত্র শরণ, আর যারা ঈশ্বর মানে তাদের জন্যও ঈশ্বরই একমাত্র শরণ।

৮৬ নং শ্লোকে সন্ন্যাসী কত রকমের হতে পারে বলছেন। ঠাকুরও বিভিন্ন প্রকার সন্ন্যাসীর কথা বলছেন, যেমন বহুদক, কুটীচক, হংস, পরমহংস সন্ন্যাসী ইত্যাদি। এখানেও নানান রকমের সন্ন্যাসী কথা বর্ণনা করা হল বলছেন। এত কিছু বলার পর বলছেন, এই যে এত আশ্রমের কথা বলা হল, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, এর মধ্যে কিন্তু –

শ্রেষ্ঠ আশ্রম ও ধর্মের দশটি লক্ষণ

সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।

গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রিনেতান্ বিভর্তি হি।।৬/৮৯

এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে বেদ ও স্মৃতির বিধান অনুযায়ী গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কারণ গৃহস্থাশ্রমের উপরেই বাকি তিনটে আশ্রম নির্ভর করে আছে। তারপরে বলছেন, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলতে এখানে সবাইকেই বলা হচ্ছে, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন তাকে দশটি ধর্ম অবশ্যই পালন করতে হবে –

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।৬/৯২

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। কেউ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কিনা বোঝা যাবে এই দশটি ধর্ম দিয়ে। যে যেখানেই থাকুক না কেন এই দশটি ধর্ম তাকে পালন করতেই হবে। ধৃতি মানে ধরে রাখা, ঠাকুর বলছেন – একজন কুয়ো খুঁড়ছিল, একটু খোড়ার পর বালি বেরোতেই সেখান ছেড়ে আরেক জায়গায় খুঁড়তে শুরু করল। একটু খুঁড়ে পাথর বেরোচ্ছে দেখে সেখান ছেড়ে আরেক জায়গায় কুয়ো খুঁড়তে গেল। তার মানে সে ধরে রাখতে পারছে না। একটা জিনিষে লেগে থেকে করে যাওয়াকে বলে ধৃতি। ক্ষমা, কেউ আমাকে অপমানিত করে দিল বা কটু কথা বলে দিল প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে সহ্য করে গেলাম। বাইরের ইন্দ্রিয় গুলিকে নিগ্রহ করা হল দম। এর আগে একটা শ্লোকে বলা হয়েছিল হস্তচপল, পাদচপল, নেত্রচপল আর বাকচপল – সব সময় হাত নেড়ে যাচ্ছে, সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখ সব

সময় এদিক ওদিক ঘুরছে আর অকারণে বক্ বক্ করে যাচ্ছে। এগুলোর অভাবই দম, বাইরের সব ইন্দ্রিয় গুলোকে সংযমে রাখতে হবে। অস্ত্রেয় মানে চুরি না করা। শৌচ, সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে একেবারে ফিটফাট থাকা। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ মানে জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিকে নিগ্রহ করা। ধী মানে বুদ্ধি, বুদ্ধি একেবারে পরিষ্কার। বুদ্ধি না থাকলে কোন ধর্মই সাধন করা যায় না। মুর্খদের দ্বারা কোন ধর্ম সাধন হয় না। বেদাভ্যাস অর্থাৎ অধ্যয়ন করতে করতে বুদ্ধিটা জাগ্রত হয়। যেমন যেমন অধ্যয়ন করতে থাকবে তেমন তেমন বুদ্ধিটা জাগবে। বিদ্যা, বিদ্যার্জন করা। ধী আর বিদ্যা এই দুটো এক সঙ্গে যুক্ত। যেমন যেমন ধী বাড়ে তেমন তেমন বিদ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার যেমন যেমন বিদ্যা বাড়ে তেমন তেমন বুদ্ধিটাও পরিষ্কার হয়। সত্যম্, সত্য কথা বলা। আর অক্রোধ, কারুর উপর ক্রোধ না করা। তুমি ব্রহ্মচারী হও কি তুমি গৃহস্থ হও বা বাণপ্রস্থী হও কিংবা সন্ন্যাসী হও, এই দশটি ধর্ম সবাইকেই পালন করতে হবে। ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

দশলক্ষণকং ধর্মমনুষ্ঠিতন্ সমাহিতঃ।

বেদান্তং বিধিবচ্ছূতা সন্ন্যাসেদনুগো দ্বিজঃ।।৬/৯৪

যদি কোন গৃহস্থ চায় আমি ধর্মের পথ অবলম্বন করে পরম গতি প্রাপ্ত করব তাহলে সেই গৃহস্থকে ধর্মের এই দশটি লক্ষণ সর্বদা পালন করে খুব শ্রদ্ধাবনত চিন্তে গভীর আগ্রহ সহকারে গুরুমুখে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করতে হবে। এগুলো করার পর তিনটে ঋণ দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ থেকে মুক্ত হতে হবে। তিনটে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। এগুলোই হল সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বশর্ত – প্রথম দশটি ধর্মের লক্ষণকে পালন করতে হবে, দ্বিতীয় বিধিবৎ গুরুর মুখে উপনিষদের মহা বাক্যাদি শ্রবণ করতে হবে এবং তৃতীয় যত রকমের দায় দেনা আছে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

সংন্যস্য সর্বকর্মাণি কর্মদোষানপানুদন্।

নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্যে সুখং বসেৎ।।৬/৯৫

এটা ঠিক যে মনু সন্ন্যাসের খুব একটা পক্ষপাতি ছিলেন না। মনুর কাছে গৃহস্থ ধর্ম একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। এখানে মনু বলছেন, কোন গৃহস্থ যদি একটা বয়সের পর ঠিক করে নেয় যে সে সব কর্ম ত্যাগ করে দেবে, কর্মজনিত যে দোষ হয় তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোন ধরনের কর্মে সে লিপ্ত হবে না, প্রাণায়াম করে সব দোষগুলোকে নষ্ট করে দেবে, ইন্দ্রিয়ের পুষ্টির জন্য কোন কর্ম না করে শুধু ইন্দ্রিয় সংযম করবে, বেদাভ্যাস অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ, ধ্যান এগুলো নিয়মিত করবে আর পুত্রৈশ্বর্যে সুখং বসেৎ, পুত্রের ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করবে। তুমি সব কর্ম ছেড়ে দিয়েছ, বাড়ির সব দায়িত্ব এখন তোমার সন্তানের উপর, এখন সন্তান যেমনটি করতে বলবে তুমি তেমনটিই করবে। সন্তান এখন বাড়িক মালিক। এটাই কুটীচক সন্ন্যাসের লক্ষণ। এই ধরনের গৃহস্থও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস মানেই কর্মসন্ন্যাস, সন্ন্যাসী কোন ধরনের দায়-দায়িত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, সেইজন্য সে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধাও কারুর থেকে নেয় না। এই ধরনের সন্ন্যাসীর কি হয় –

এবং সংন্যস্য কর্মাণি স্বকার্যপরমোহস্পৃহঃ।

সন্ন্যাসেনাপহিত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।।৬/৯৬

এইভাবে যিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, কোন ধরনের কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন না, কোন দায়-দায়িত্ব থাকছেন না, কোন সুযোগ সুবিধাও নিচ্ছেন না তখন স্বকার্যপরমোহস্পৃহঃ, এখন নিজের যে আসল কাজ সেটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। সন্ন্যাসীর নিজস্ব প্রধান কি কাজ? ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করাটাই তাঁর কাছে প্রাধান্য, এর বাইরে অন্য কোন কিছুর প্রাধান্য আর তার কাছে কিছু হতে পারে না। এখন তার অন্য কোন স্বার্থ নেই, শুধু নিয়মিত বেদাভ্যাস, নিয়মিত জপ-ধ্যান, দায়-দায়িত্ব শূন্য, সন্তান যা বলছে সেই ভাবে চলবে ইত্যাদি। এগুলো কিন্তু সব বার্ষিক্যের অবস্থায় হচ্ছে। কম অবস্থাতেও অবশ্যই বেদাভ্যাস, জপধ্যান করে যেতে হবে। এখানে এটা বার্ষিক্য

প্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। এই রকম করলে ব্রাহ্মণ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। বিধিমত সন্ন্যাস যে নিতেই হবে তা নয়। যদি এই দশটি ধর্মের লক্ষণকে কেউ পালন করে তার সঙ্গে সর্বকর্মসন্ন্যাস, সংসারে নিজের কর্তৃত্বকে যদি সে বিসর্জন দেয় আর একমাত্র ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করাতেই যদি তার মন থাকে তাহলে সেও সন্ন্যাসী বলে বিবেচিত হব আর সে মুক্তি পাবেই পাবে। এই পর্যন্ত হল সন্ন্যাস ধর্মের বর্ণনা। এরপর সপ্তম অধ্যায়ে প্রধানতঃ রাজধর্ম নিয়ে বলছেন।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

রাজধর্ম

আলোচনার সূত্রপাতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, মনু সমগ্র জাতি, বর্ণ ও সমাজকে পূর্ণাঙ্গ রূপে দেখেন, এদের এই বিধি-নিষেধে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হবে, এদের আনা হবে না এই ধরনের কোন দৃষ্টিভঙ্গী মনুর ছিল না। যখনই মনু কাউকে ধর্তব্যের মধ্যে নিয়ে আসবেন তখন তাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন সমাজে তার স্থান কোথায়। সমাজে তোমার এই স্থান, তোমার এই স্থান হওয়ার জন্য তুমি কি কি সুযোগ সুবিধা পাবে আর তার জন্য তোমাকে কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে, এগুলোকে মনু পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। সুযোগ আর দায়িত্ব দুটো এক সঙ্গে চলে। যেমন, যিনি ব্রাহ্মণ তাঁর এই এই সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া আছে, শূদ্রের এই এই সুযোগ সুবিধা। তার সাথে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সমাজের প্রতি দায়িত্বটাও সেই রকম। দায়িত্ব যদি কেউ না পালন করে তাহলে তাকে ভুগতে হবে। তা ছাড়া বিশেষ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বাইরে সাধারণ মানুষ যারা আছে তাদের কিছু কিছু সাধারণ ধর্মের কথা এই সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান আর ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বা দণ্ডসংহিতা এই দুটোকে মিলিয়ে দেওয়ার পর যে জিনিষটা দাঁড়াবে আর তার সাথে আধ্যাত্মিক গুরু ও আচার্যরা যে আচার বিধি দিয়ে গেছেন – এই তিনটোকে এক সঙ্গে মিলিয়ে মনুস্মৃতি। মনু সংবিধানকে, দণ্ডসংহিতাকে আর ধর্মীয় গুরু ও আচার্যদের উপদেশ এই তিনটোকে এক সঙ্গে নিয়ে তাঁর এই স্মৃতিগ্রন্থ দাঁড় করিয়ে সমাজের একটা স্থিতি আনার চেষ্টা করে গেছেন। আর শেষ পর্যন্ত তাই হল। আজকে যে সংস্কৃতির ধারা ও বিধি নিয়মগুলো আড়াই হাজার বছর ধরে বিশ্বের মানব সভ্যতার মানচিত্রে ভারতবর্ষকে যে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতার স্বকীয় মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রাচীন ঐতিহ্যকে এখনও ধরে রেখেছে সেটা একমাত্র মনুস্মৃতির জন্যই সম্ভব হয়েছে, এর জন্য অন্য কোন গ্রন্থ সেই রকম কোন কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। প্রথমে দিকে একটা শ্লোকে মনু বলছেন –

অরাজে হি লোকেহস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।

রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।।৭/৩

একই ধরনের প্রজা যখন অনেক হয়ে যায় তখন সবাই নিজের মত চলতে গিয়ে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। যার জন্য তখন অরাজকতা বেড়ে যায়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নিজের খেয়াল খুশী মত চলা, বাক স্বাধীনতাকে দুর্প্রয়োগ করে যাকে তাকে গালাগাল দেওয়া, আবার আমার এই এই স্বাধীনতা আছে বলে মারামারি করা, এটাই অরাজকতা। এই সৃষ্টিটা ভগবানের। আমরা যখন মনুস্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে চলছি তখন মনু এই সৃষ্টির ব্যাপারে কি বলছেন সেটা আমাদের আগে দেখতে হবে। মনুর কাছে এই সৃষ্টিটা ভগবানের। যা কিছু এই জগতে সৃজন হয়েছে বা হবে তা ভগবানই সৃজন করেন। কিসের জন্য ভগবান সৃজন করেন? আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে বলছেন, ভগবান যখন এই জগৎ সৃষ্টি করলেন তখন এই জগতের স্থিতি রক্ষার্থে তিনি বর্ণশ্রম ধর্মের সৃষ্টি করলেন। সবাই যদি নিজেকে রাজা মনে করে, সবাই যদি নিজেকে স্বাধীন মনে করে তাহলে তো আর সংসার, সমাজ, সাম্রাজ্য কিছুই চলবে না, এই সৃষ্টিটাই ভেঙে চুরমার হয়ে বিনাশের দিকে চলে যাবে। সেইজন্য এই দুনিয়াতে কেউ উপরে থাকবে, কেউ নীচে থাকবে, এই বৈষম্যকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। মুখে আমরা যতই সাম্য সাম্য বলি না কেন, এই বৈষম্যকে কেউই মিটিয়ে দিতে পারবে না, সবাই সমান এর কোন বাস্তবতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। ‘আমরা সবাই সমান’ এই আদর্শের উপর বড় বড়

দুটো পরীক্ষা আমাদের সামনেই হয়েছিল, দেখা গেল কিছু দিনের মধ্যে এই আদর্শকে ভিত্তি করে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল সেটা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। সত্তাটা শুধু পাল্টে অন্য লোকের হাতে চলে গিয়েছিল তাছাড়া আর কিছু পরিবর্তন হয়নি। মনু অনেক আগেই নিজের অভিজ্ঞতা ও দিব্যদৃষ্টিতে এর পরিণাম দেখতে পেয়েছিলেন, তাই তিনি সাবধান করে দিলেন এই অরাজকতা যেন সমাজে না আসে। দুষ্ট লোক যেন সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার না করে। সেইজন্য সৃষ্টি হল রাজার। রাজার সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে? সেটাই মনু খুব মজার কথা বলছেন –

ইন্দ্রানিল-যমার্কানামগ্লেচ্চ বরণস্য চ।

চন্দ্র-বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হত্য শাস্বতীঃ।।৭/৪

বেদের সময়কার যত নামকরা দেবতারা আছেন, যেমন ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই সমস্ত দেবতাদের সারভূত অংশ সমূহকে একত্রিত করে ঈশ্বর রাজার ভেতর দিয়ে দিলেন। ফলে রাজা হলেন দেবতাদের অংশ দিয়ে তৈরী। তবে যিনিই রাজা হন তাঁর ভেতর এই ক্ষমতাগুলো থাকে। রাজার ভেতর থেকে যদি এই ক্ষমতা গুলো চলে যায় তখন আর রাজা রাজ্য চালাতে পারে না, তাঁর সেই ক্ষমতাটাই চলে গেছে, কি করে আর রাজ্য চালাবে! তখন রাজাকে নীচু তলা থেকে শুরু করে উঁচু তলা পর্যন্ত সবাই গালাগাল দিয়ে যাবে। কিন্তু এমনি সাধারণ সময় কেউ রাজাকে গালাগাল বা একটু নিন্দা অপবাদ করে দেখুক! তাকে রাজা শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেবে। রাজার এমন প্রতাপ ও দাপট তার কারণ রাজার মধ্য দিয়েই অগ্নিরূপ, বায়ুরূপ, সূর্যরূপ, চন্দ্ররূপ, ধর্মরূপ, কুবের রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। যে রাজার মধ্যে প্রতাপ নেই তাহলে সে কিসের রাজা! বেদের নামকরা সব দেবতাদের অংশে রাজা তৈরী হয়েছেন। বলছেন রাজাকে কিভাবে দেখতে হবে –

বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।

মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।।৭/৮

রাজা যদি বালকও হয় তাহলেও তাঁকে যেন কেউ সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা না করে। কারণ রাজা সব সময় দৈবী শক্তিতে বলীয়ান থাকে। তবে মনু এখানে যেটা বলছেন এটা অনেক আগেকার দিনের কথা হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং এই নিয়ম সবাইকে মেনে চলতে হয়। কারুর মধ্যে বিশেষ শক্তির প্রকাশ হলে তবেই সে রাজা হয়। আমাদের এখনও মনে আছে জরুরী অবস্থা জারীর পর জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে অনেক রকম অভিযোগকে কেন্দ্র করে তাঁকে প্রচুর হেনস্থা করতে শুরু করল। ইন্দিরা গান্ধী দেখলেন আমি যদি এমপি না হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে না দাঁড়াই তাহলে আমার ভবিষ্যৎকে এরা শেষ করে দেবে। বাঁচার জন্য আমাকে এমপি হতে হবে। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল সব জায়গা থেকে কংগ্রেস ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। কি করে এমপি হবেন! তখন দক্ষিণ ভারতের চিকমাংগালুরের কংগ্রেস এমপি ইন্দিরা গান্ধীর জন্য ওই সীটটা ছেড়ে দিলেন। ওখানকার বেশীর ভাগ লোকই হল অত্যন্ত গরীব আর অশিক্ষিত, কফি ক্ষেতে কাজ করে। ইন্দিরা গান্ধীর জন্য ওখানে প্রচার শুরু করতে গিয়ে কংগ্রেসের লোকেরা এদের বলতে শুরু করলেন – ইন্দিরা গান্ধীকে আমাদের জেতাতে হবে, তা নাহলে তাঁর বিরোধী লোকেরা তাঁকে জেলে পুরে দেবে। তখন অবাক হয়ে সবাই জিজ্ঞেস করছে – কেন তাঁকে জেলে ঢোকাবে? কংগ্রেসের লোকেরা বোঝাল – উনি দেশের জন্য কিছু ভালো কাজ করেছিলেন, যেটাকে লোকেরা ভুল মনে করে। তখন এরা আরও অবাক হয়ে বলছে – কেন! রাজার তো কখনও দোষ হয় না। পরে ইন্দিরা গান্ধী ওখান থেকেই জিতে পার্লামেন্টে এলেন। কিন্তু ওই একটা কথা এদের মনে এখনও সেই কবেকার চিন্তা-ভাবনাটা থেকে গেছে – রাজার কখন দোষ হয় না। এটা গ্রামের লোকেরা বলছে। রাজার মধ্যে দৈবী শক্তি আছে কিনা। দৈবী শক্তি থাকার জন্য রাজার কোন দোষ হয় না। রাজনীতি নিয়ে যখন চলে তখন দোষ অবশ্যই রাজার হয়ে থাকে। আমরা বলতে পারি এখন গণতন্ত্রের পরিকাঠামোতে এই ধরণের চিন্তা-

ভাবনা কোন মূল্যই নেই। কিন্তু যতই গণতন্ত্র এসে থাকুক না কেন, রাজশক্তির ক্ষমতা পেয়ে যখনই মসনদে বসবে তখনই তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছু দৈবী শক্তির আবির্ভাব হবেই, সে যেই ক্ষমতায় বসুক না কেন। কিছু দিন আগে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ওবামার বিরুদ্ধে ওখানকার বিরোধী এক সদস্য বলল – he is stupid, তখন তার পার্টির লোকেরাই বলল – খবরদার এই রকম মন্তব্য আর কখন করবে না, ওবামা কোন সাধারণ মানুষ নন, তিনি আমাদের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টকে এই ভাষায় কথা বলা যায় না। সে যদি স্টুপিডও হয় তাও আপনি জন সমক্ষে বলতে পারেন না। এই যে অনেকে প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানা রকমের স্লোগান দেয় রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়, মনমোহন সিং চোর হ্যায়, এই ধরনের কথা কখনই বলতে নেই। গণতন্ত্রেও রাজা যতই খারাপ কাজ করুক না কেন তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই একটা আলাদা পরিকাঠামো তৈরী করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে রাজার বিরুদ্ধে কখনই এই ভাবে নোংরা গালাগাল বা মন্তব্য করতে নেই। রাজার বিরুদ্ধে যখনই এই ধরনের কিছু খারাপ গালাগাল দেওয়া হয় তখনই কিন্তু ঈশ্বরীয় শক্তির বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে রাজা দুর্বল হয়ে যেতে পারে, রাজা দুর্বল হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে হিংসা, গুণ্ডামি, ছিনতাই, মারামারি, অরাজকতা অনেক বেড়ে যাবে। ইসলামিক দেশ গুলোর দিকে তাকালে এই জিনিসটাই দেখা যাচ্ছে, সেখানে রাজার শক্তিকে ক্ষীণ করে দেওয়া হয়েছে। পরের শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন –

একমেব দহত্যগ্নিরং দুরূপসর্পিণম্।

কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্।।৭/৮

মানুষ যদি অসাবধান বশতঃ আগুনে হাত দিয়ে দেয় তখন আগুন তার হাতকে পুড়িয়ে দেয়। আগুন তো তার শুধু হাতটুকু দক্ষ করেছে, কিন্তু রাজার ক্রোধাগ্নি যদি কারুর উপর পড়ে তখন তার সঞ্চিৎ যা কিছু আছে, পশু, শস্য, বাড়ি, রথ সব চলে যাবে। তার আর কিছুই থাকবে না। তার মানে, রাজার ক্রোধ অগ্নির থেকেও তেজ সম্পন্ন। এখন অবশ্য গণতন্ত্রের যুগ, কিন্তু তাও বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানিতে মালিক বা বস যদি কোন কারণে কারুর উপর রেগে যায় তাকে একেবারে শেষ করে দেবে। একটা ঘটনা অনেকেরই মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে কোন রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কোন নেতা কিছু সমালোচনা করেছিল। ওই নেতার মুখের উপর দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলে দিল ‘আজ থেকে তিন দিন পর তোমাকে শেষ করে দেওয়া হবে’। তিন দিন পর সেই নেতা এক জনসভাতে ভাষণ দিচ্ছিল। ওই মিটিং চলা অবস্থাতেই দুটো লোক মোটর সাইকেল করে এল, দুটো অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে মঞ্চের উঠে সোজা ওই নেতাকে গুলি করে মেরে দিয়ে আবার মোটর সাইকেলে করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়ে জেলে গেল। চার দিন পর জামানতে বেরিয়ে এল। কিছু দিন পর সরকার থেকে এদের দুজনকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দিল এরা কয়েকজন দুষ্ট লোককে পরিষ্কার করে দিয়ে রাজ্যবাসীদের মঙ্গল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজা কিনা! রাজার ক্ষমতা অনেক বেশী। মনু তাই সাবধান করে দিচ্ছেন, যদি জেনে বা না জেনে রাজার প্রতি ঘৃণা করে ফেলে তাহলে সে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। আমরা অনেক সময় ভাবি রাজ দুষ্ট লোক, কিন্তু দুষ্ট লোক হোক আর যাই হোক তার মধ্যে তেজ আছে। যে কোন কোম্পানীতে, বিশেষ করে প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর উপম্যন যদি কারুর উপর রেগে যায়, অজান্তাও যদি রেগে যায় তার সর্বনাশ হতে আর বেশী দেরী হবে না।

এখন বাড়ির রাজা কে? আলাদা করে আর বলে দিতে হবে না। সুইটজারল্যান্ডে একটা ঘটনায় জানা গেছে, কোন এক বিরাট বড় কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর একটা কুকুর ছিল। খুবই আদরের কুকুর। কুকুরের জন্মদিনে বড় করে পার্টি দেওয়া হয়। কুকুরের জন্মদিনের পার্টিতে যাদের আমন্ত্রণ জানান হবে নিয়ম হল তাদেরকে কুকুরের জন্য উপহার নিয়ে আসতে হবে। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক ওই কোম্পানী থেকে অনেক কন্ট্রাক্ট পেতেন। একবার কুকুরের জন্মদিনে ওই ভারতীয় ভদ্রলোককেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি মালিকের স্ত্রীর জন্য সোনার কিছু উপহার নিয়ে গেছেন, কিন্তু কুকুরের জন্য যে কিছু নিয়ে যেতে হয় সেটা আবার জানতেন না। যার জন্য মহিলা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে নিজেকে অপমানিত মনে করেছেন। এত রেগে গেছেন যে

নিজের স্বামীকে বলে দিলেন কোন অবস্থাতেই যেন ওই ভদ্রলোক কোন কন্ট্রাক্ট না পায়। তারপর তো বেচারী চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কোম্পানির মালিক আবার এই ভদ্রলোককে একটু স্নেহ করতেন। তিনিও একদিন ডেকে বললেন আমার কিছু করার নেই, আমার মিসেসের কুকুরের জন্মদিনে কুকুরের জন্য তুমি কোন উপহার নিয়ে যাওনি সেইজন্য উনি খুব রেগে গেছেন। ভারতীয় এই ভদ্রলোকও একজন নামকরা ব্যবসায়ী, এদেরও খুব বুদ্ধি। উনি সব শোনার পর মালিকের স্ত্রীকে ফোন করেছেন – ম্যাডাম! সেদিন আমাকে খুব তাড়াহুড়ো করে আপনাদের ওখানে যেতে হয়েছিল বলে কুকুরের জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারিনি আর তাছাড়া আপনার কুকুরের জন্য একটা বিশেষ ডায়মণ্ড নেকলেস অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম কিন্তু ওটা তখনও রেডি হয়নি। আজকেই এইমাত্র সেটা আমার হাতে ডেলিভারি এসেছে, তা আপনি আমাকে যেদিন ডেট দেবেন সেদিন আমি ওটা নিয়ে আসব। শুনে ভদ্রমহিলা খুব খুশী হয়ে গেলেন, এরপর থেকে আবার কন্ট্রাক্ট পেতে শুরু হয়ে গেল। বলছেন অজান্তায়ও যদি আপনার প্রতি রাজার দ্বেষ্ট হয়ে যায় তাহলেও আপনার আর কোন নিস্তার নেই। এরপর বলছেন –

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।

দণ্ডঃ সুশ্রেয়ঃ জাগতি দণ্ডঃ ধর্মঃ বিদুর্বুধাঃ।।৭/১৮

প্রশাসন জগতে এটি একটি খুব মৌলিক নিয়ম। ডাঙা, মানে দণ্ডই সব প্রজাকে শাসন করে সোজা রাখে। প্রজা রক্ষা ও প্রতিপালন একমাত্র দণ্ড দিয়েই সম্ভব। দুষ্ট লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই দণ্ডই একমাত্র ভরসা। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন এই রাজদণ্ডই তাকে নিরাপত্তা দিয়ে শান্তিতে ঘুমোতে সাহায্য করে। বিদ্বান বুদ্ধিমানরা জানেন ধর্ম মানে দণ্ড। রাজার হাতে যে রাজদণ্ড এটাই ধর্ম, তাছাড়া আর কোন কিছু ধর্ম নয়, কারণ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের রক্ষণ রাজার এই ধর্ম রাজদণ্ড দ্বারাই পালিত হয়। এক কথায় যদি রাজার ধর্ম বলতে বলা হয় তাহলে বলা যেতে পারে, রাজার একটাই ধর্ম দুষ্টের দমন আর রাজার একটাই কর্তব্য শিষ্টের রক্ষণ। এটা একমাত্র সম্ভব দণ্ড দ্বারা, তা ছাড়া আর কোন ভাবেই হয় না। এটা কারা জানেন? দণ্ডঃ ধর্মঃ বিদুর্বুধাঃ, যাঁরা বুধঃ, যাঁদের আমরা জ্ঞানী বলে জানি, তাঁরাই জানেনই রাজার ধর্ম মানে ডাঙা। যেমনি কড়া হাতে শাসন করতে শুরু করবে সব বদমাইশ গুলো সোজা হয়ে যাবে। শুধু যে রাজাই কড়া হাতে শাসন করবে তা নয়, স্কুল, কলেজ, বাড়ি, অফিস সর্বত্র একজনকে অন্তত কড়া হাতে হবে তা নাহলে সব কিছু শিথিল হয়ে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। যে শিক্ষক কড়া প্রকৃতির তাঁর ক্লাশে ছেলেরা দুষ্টমি করতে সাহস পায় না, কিন্তু নরম শিক্ষক পেলেই ছেলেরা ক্লাশের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ধুম মачিয়ে দেবে।

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডঃ দণ্ডেয়তন্দ্ৰিতঃ।

শূলে মৎস্যনিবাপক্ষ্য দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ।।৭/২০

রাজা যদি দণ্ড বিধানের দ্বারা দুষ্টের দমন না করে তাহলে, জেলেরা যেমন ছিপ দিয়ে মাছকে বিদ্ধ করে আগুনে ভাজা ভাজা করে, ঠিক তেমনি দুষ্ট বলবান লোকেরা সাধারণ দুর্বল লোকদের বিদ্ধ করে আগুনে শৌঁকে শৌঁকে খাবে অর্থাৎ সবাইকে উৎপীড়ন করবে।

সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।

দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্বং জগদভোগায় কল্পতে।।৭/২২

পবিত্র ও ভালো মানুষ জগতে অতি দুর্লভ

পৃথিবীতে যত লোক আছে সব লোক দণ্ডের ভয়েই সোজা থাকে। অর্থাৎ বলতে চাইছেন সবাই দণ্ডের ভয়েই সুপথগামী হয়, সবাই দণ্ডের বশীভূত। কারণ দুর্লভো হি শুচির্নরঃ, স্বাভাবিক ভাবে একজন মানুষ পবিত্র হবে, ভালো হবে এটা এই জগতে একান্তই দুর্লভ। মানুষ ভালো কিসের জন্য হচ্ছে? ডাঙার ভয়ে, খারাপ কাজ করলে শাস্তির ভয় আছে। আমরা চুরি-চামারি করি না কেন? পুলিশের ভয়ে। আবার অন্য দিকে আমাদের মধ্যে

ভগবানের ভয়ও ঢোকান আছে। যদি কেউ বলে আমি ভালো লোক। তাকে বলতে হয় – তোমার মনে ভয় আছে বলে তুমি ভালো। শাস্তির ভয় যদি না থাকে, ডাঙর ভয় যদি না থাকে তখন প্রলোভনে পড়লে কি করবে নিজেকে একবার ভেবে দেখ। সবার মধ্যে ভয় আছে বলে ঠিক আছে, কেউ রাজাকে ভয় পায়, কেউ ভগবানকে ভয় পায়, কেউ আবার কর্মকে ভয় পায়। কিন্তু যখন আমি বলব আমি এটা করব, কেন করব? আমি এটা করতে ভালোবাসি। ওখানেই ব্যাপারটা মিটে গেল। আমি টাকা চুরি করি না। কেন করি না? পুলিশের হাতে যদি ধরা পড়ি তখন জেল খাটতে হবে, বদনাম হবে। অথবা এই কারণে চুরি করি না, কারণ ভগবান সব কিছু দেখছেন, চুরি করলে ভগবান শাস্তি দেবেন। অথবা আমি চুরি করি না, কারণ এই কর্মটা ঘুরে আমার কাছেই আবার ফিরে আসবে। রাজার ভয়, ভগবানের ভয় আর কর্মের ভয়, এই তিনটে ভয়ের কারণেই আমরা ভালো লোক, ভদ্রলোক।

কিন্তু এমন কে আছেন যিনি রাজাকে ভয় করেন না, ভগবানকেও ভয় পান না আর কর্মের ব্যাপারে তাঁর কোন ভয় নেই অথচ বলতে পারেন আমি টাকা চুরি করবো না? মানে ভয়ের জন্য সে ভালো লোক নয়, অথচ টাকা চুরি করবে না বলছে। ঈশোপনিষদে প্রথম মন্ত্রে বলছেন মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্, যখন কেউ দেখছেন ঈশাবাস্যমিদং, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই তখন তাঁর মনে লোভ কি করে আসবে আর কেনই বা লোভ করবে। আবার যেখানে বলছেন তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতি, যিনি একত্ব দেখছেন অর্থাৎ যিনি নিজেকে সবার মধ্যে দেখছেন আবার সবাইকে নিজের মধ্যে দেখছেন তখন তাঁর মধ্যে শোক মোহ কোথা থেকে আসবে! চুরি যখন করে তখন মোহে পড়েই করে, আমি চাইছি ওর পকেটের টাকাটা আমার পকেটে চলে আসুক, এটাই মোহ। শোক মোহ কার হয়? যার মধ্যে দ্বৈত বোধ আছে। কিন্তু যিনি অদ্বৈত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যিনি দেখছেন আমিই সব কিছু হয়েছি। তখন সে কেন আর কাকে নিয়ে শোক মোহ করবে। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি টাকা চুরি করেন না কেন? আমাদের বাচ্চা বয়সে চুরি করতে বাবার ভয় ছিল, স্কুলে চুরি করতে গেলে মাস্টারের ভয় আছে, সমাজে চুরি করতে গেলে পুলিশের ভয় আছে। আর এদের ভয় না থাকলে ভগবানের ভয় আছে অথবা কর্ম খারাপ হওয়ার ভয় আছে। যারা দ্বৈত বোধে আছে তারাও ভয়েই চুরি করবে না, কারণ তারা বলবে ভগবান সব দেখছেন। কিন্তু যিনি অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি ওই পথেই যাবেন না। তাঁর মধ্যে একত্ব বোধ বিরাজ করছে, টাকা তোমার কাছেই থাকুক আর আমার কাছেই থাকুক একই ব্যাপার, চুরির চিন্তা মাথাতেই আসবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই স্বভাবে গুচি পবিত্র হয় না। সেইজন্য এই দণ্ডের ব্যবস্থা, ডাঙা দিয়ে আগে ভালো পথে নিয়ে আসতে হয়। এই দণ্ডের ভয়েই সবাই নিজের নিজের জিনিষ ভোগ করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয় –

দেব-দানব-গন্ধর্ব রক্ষাংসি পতগোরগাঃ।

তেহপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ।।৭/২৩

সমস্ত লোকে যত রকমের প্রাণী হতে পারে দেবতা মানে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দানব, গন্ধর্ব যেই হোন না কেন, রাক্ষস হোক, পাখী হোক, সর্প হোক এরা সবাই কিন্তু পরমাত্মার ভয়ে নিজের নিজের কাজে প্রবৃত্ত হয়ে জগতের সবার ভোগের ব্যাপারে সহায়তা করে চলেছে। কঠোপনিষদেও এই একই কথা বলছেন – ভয়াদস্যগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ – এই জগতে যে যেখানে যা কাজ করছে সবাই সেই পরমাত্মার ভয়েই করছে। কিন্তু সব রাজার দ্বারা দণ্ড প্রয়োগ হয় না। কাদের দ্বারা হয় না?

অপদার্থ রাজার লক্ষণ

সোহসহায়েন মূঢ়েন লুক্কেনাকৃতবুদ্ধিনা।

ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সন্তেন বিষয়েষু চ।।৭/৩০

অপদার্থ রাজা কারা হয়? মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত প্রভৃতি অমাত্যদের কাছ থেকে কোন সহায়তা পায় না, বা তাদের ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে না, এমন রাজা অপদার্থ হয়। আর রাজা যদি মন্দবুদ্ধি হয়,

লোভী হয়, শাস্ত্রজ্ঞানরহিত হয় এবং সব সময় ভোগে লিপ্ত থাকে এই ধরনের রাজারা অপদার্থ হয়। গণতন্ত্রে যখন কোয়ালিশন সরকার হয় তখন তার রাজা খুব অসহায় হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শা জাফর ছিলেন নাম কা ওয়াস্তে দিল্লীর বাদশা। মীরাটে প্রথম বিদ্রোহ হওয়ার পর ওখানকার সব সিপাহীরা দিল্লীতে পৌঁছে বাহাদুর শাকে বলল আপনি আমাদের রাজা হন। ওদের দেখেই বাহাদুর শা নিজের অন্দরমহলে লুকিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ের জোরে তাঁকে টেনে নিয়ে এসে সব সিপাহীরা বলে দিল আপনি আজ থেকে আমাদের রাজা। তখন তাঁর আশি বছর বয়স। আর এতদিন ইংরেজরা রাজত্ব করতে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন রাজা কাকে বলে। রাজা তো হয়ে গেল। কিন্তু অসহায়, তাঁর নিজের তো কোন ক্ষমতা নেই। যে যা খুশী করে যাচ্ছে। তিনি একটা একটা করে ফরমান জারী করছেন কিন্তু সেটাকে কেউই মানছে না। শেষে তিনি কড়াকড়ি করতে যাচ্ছেন, তাতে আবার অন্য ধরনের গোলমাল লেগে যাচ্ছে। তারপর তিনি বলতে শুরু করে দিলেন আমি রাজমহল ছেড়ে কোন সুফির দরগায় চলে যাব। ছেড়ে চলার ভয় দেখালে তখন আবার সব কিছু ঠিকঠাক চলত। এই রাজা অসহায়, কি দণ্ড সে দেবে! তার সাথে মূঢ়, মুর্থ রাজা কি রাজকার্য চালাবে! আর রাজা যদি লোভী হয় সেও রাজকার্য চালাতে পারে না। এই কারণে আমাদের দেশে যে অনেক নিয়ম-কানুন তৈরী করা হয়েছিল শুধু রাজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। রাজা যদি বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বিষয় ভোগে মত্ত থাকলে রাজকার্যে কি করে সে মন দেবে! অকৃত বুদ্ধি মানে যার শাস্ত্র জ্ঞান নেই, যে রাজার কোন শাস্ত্র জ্ঞান নেই সেই রাজা কখনই দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে না। এই ধরনের রাজার মনের সেই ক্ষমতাই নেই, মন যদি পরিস্কার না থাকে, সচেতন না থাকে সেই মন দিয়ে কোন কিছুই করা যায় না, রাজ্য চালানো তো দূরের কথা।

প্রথমে রাজাকে দেখতে হবে জিনিষটা এই রকম। তারপর দেখতে হবে এই কাজের জন্য উপযুক্ত নিদান এটা। তৃতীয় এই নিদানকে প্রয়োগ করতে হবে। এই তিনটে স্তরে রাজকার্য চলে। যার বুদ্ধিই নেই সে রাজকার্য চালাতে পারবে না। এরা প্রথমে বুঝতে পারে না সমস্যাটা কি, দ্বিতীয় এই সমস্যার নিদানটা কি সেটা বুঝতে পারে না, তৃতীয় ওই নিদানের প্রয়োগটা কিভাবে করতে হবে সেটাও জানে না। রাজকার্য চালাতে গেলে এই তিনটে জিনিষ করতে হবে – প্রথম সমস্যাটা কি এটাকে আগে ধরতে হবে, দ্বিতীয় সমস্যাটাকে ধরার পর এর নিদান কি সেটাকে ঠিক করতে হবে এবং তৃতীয় উপযুক্ত সময়ে সেই নিদানকে প্রয়োগ করা। শরীর খারাপ হলে প্রথমে রোগটা কি সেটা ধরতে হবে, এই রোগের কি ওষুধ সেটা জানা চাই আর ওষুধটা কি মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে জানতে হবে। রাজার এটাই কাজ। কিন্তু রাজা যদি কামী হয়, লোভী হয়, মুর্থ হয়, শাস্ত্রজ্ঞানহীন হয় আর যদি অসহায় হয়, সবই আছে কিন্তু অসহায়, এই রাজা কি করে আর রাজকার্য পরিচালনা করবে! এটাই এখানে বলছেন। যদিও আমরা রাজার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করি কিন্তু এই রকম অপদার্থ রাজা হলে সব আশাই নিরাশায় পরিণত হয়।

স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্ ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুশু।

সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ ক্ষমাম্বিতঃ।।৭/৩২

যখন রাজা বংশানুক্রমে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তখন সে ন্যায় অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করবে। শত্রুর রাজ্যের উপর কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করতে হবে। কারণ শত্রুকে বেশী ক্ষমতা দেখাতে হবে। এটা প্রায়ই দেখা যায় যখনই কোন রাজার সৈন্য শত্রু রাজ্যে পৌঁছে যায় তখন তারা সেখানে খুব অত্যাচার করতে শুরু করে। এটাই নিয়ম। নিজের রাজ্যের প্রজাদের উপর যখন দণ্ডের বিধান দেবে তখন খুব ন্যায় সম্মত ও শাস্ত্র সম্মত ভাবে দণ্ডের বিধান খুব সহজ সরল ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। শত্রুর রাজ্যে রাজাকে কিন্তু খুব কঠোর ও কড়া হতে হবে। মহম্মদ ঘোড়ী আর পৃথ্বিরাজের মধ্যে যে লড়াই হত সেই সময় প্রায়শই মহম্মদ ঘোড়ী যখন হেরে যেত তখন নিজের লোকেদের যেমন নানা রকমের উপহার দেওয়া হয় সেই রকম পৃথ্বিরাজের পক্ষ থেকে শত্রু সৈন্যদের উপহার দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এখানে এই ধরনের আচরণ করতে নিষেধ করা হচ্ছে, শত্রু দেশ থেকে এসেছে, হেরে গেছে এবার সব কটাকে শেষ করে দাও। পৃথ্বিরাজ করলেন না, পরে

তাকে ভুগতে হল। তোমার নিজের প্রজাদের সাথে এক রকম ব্যবহার করতে হবে কিন্তু শত্রু দেশের প্রজাদের সাথে অন্য রকম ব্যবহার হবে। এখানে সেইজন্য কমন সিভিল কোর্ট, কমন ক্রিমিনাল কোর্ট, কমন জাস্টিস বলে কিছু হয় না, মনু রাজধর্মে এই ধরনের কমনে বিশ্বাস করেন না। আর যারা রাজার স্বাভাবিক মিত্র তাদের সাথে রাজার ব্যবহার সহজ সরল হবে। ব্রাহ্মণ যদি ছোটখাট অপরাধ করে থাকে রাজা তাকে ক্ষমা করে দেবে। কারণ ব্রাহ্মণ যে কোন রাজ্যের জন্য ব্রাহ্মণ, বিদ্বদজনরা হলেন রাজ্যের আভূষণ। ব্রাহ্মণ ও বিদ্বদজনদের উপর বেশী কড়াকড়ি নিয়ম করতে নেই।

রাজার যশ ও অপযশ কিভাবে হয়

এবংবৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্জেনাপি জীবতঃ।

বিস্তীর্ণতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাস্তসি।।৭/৩৩

অতন্তু বিপরীতস্য নৃপতেওরজিতাত্মনঃ।

সংক্ষিপ্যতে যশো লোকে ঘৃতবিন্দুরিবাস্তসি।।৭/৩৪

রাজা যদি অজিতেন্দ্রিয় হয়, তার থেকে আরও খারাপ হবে যদি প্রতিকূল দণ্ড দিয়ে থাকে। প্রতিকূল দণ্ড হল, যাকে যেমন দণ্ড দেওয়ার কথা তাকে তেমন দণ্ড না দেওয়া, যাকে বেশী দণ্ড দেওয়ার কথা তাকে লঘু দণ্ড যার লঘু দণ্ড পাওয়ার কথা তাকে গুরু দণ্ড দিচ্ছে। তখন সেই রাজার কি হবে? যদি একটা জলাশয়ে এক ফোঁটা ঘি দিলে যেমন ঘি স্থিত হয়ে থাকে, এই রাজার যশ জলাশয়ে এক ফোঁটা ঘিয়ের মত হয়ে যায়। মানে এই রাজা কখনই সম্মান পায় না। প্রতিকূল দণ্ড দিলে রাজার মান, যশ সব হ্রাস পেয়ে যায়।

তার আগের শ্লোকে বলছেন যে রাজা সর্বদা সদাচার পালন করে এবং ন্যায় সম্মত ও শাস্ত্র সম্মত ভাবে দণ্ড বিধান করে রাজ্যশাসন করে, সেই রাজার যশ জলে এক ফোঁটা তেলের সমান ছড়িয়ে যায়। যশ বিস্তারের ব্যাপারটা বোঝাতে মনু এখানে খুব সুন্দর উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। এক ফোঁটা তেল যদি জলে দেওয়া হয় তখন তেলটা আস্তে আস্তে জলের উপর ছড়িয়ে যায়, কিন্তু এক ফোঁটা ঘি যদি জলে দেওয়া হয় সেটা ওইখানেই স্থির থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। জলে ঘি ও তেলের অবস্থানের এটাই তফাৎ। জলে ঘি আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত হয়ে যায় আর তেল জলে আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকে। রাজা যদি ঠিক ঠিক আচরণ করে তখন তার যশ জলে তেলের মত ছড়িয়ে যায়, রাজা যদি ঠিক ভাবে কাজ না করে রাজার যশ ঘিয়ের মত সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রকাররা খুঁটিনাটি কত কিছু জানতেন, আর শুধু জানতেনই না, তাকে কি সুন্দর উপমায় ব্যবহার করে একটা জিনিসকে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মনুর কত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল এখানেই বোঝা যায়। এই কারণেই বলা হয় বিদ্যাচর্চা শাস্ত্রচর্চা করলে বুদ্ধি অনেক খুলে যায়। রাজাকে বলছেন –

স্বৈ স্বৈ ধর্মে নিবিষ্টানাং সর্বেষামনুপূর্বশঃ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোহভিরক্ষিতা।।৭/৩৫

চারটি বর্ণের মানুষ যাতে নিজ নিজ বর্ণের ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকতে পারে এবং ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি চারটি আশ্রমের রক্ষার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে ব্যাখ্যাকাররা বলছেন রাজা যদি এদের রক্ষা না করে তাহলে রাজার পাপ হবে কিন্তু এরা যদি কেউ স্বধর্মত্যাগী হয় তখন এদের রক্ষা না করলে রাজার পাপ হবে না। এরপর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে যদিও রাজার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে কিন্তু সবার জন্যই এটা প্রযোজ্য –

বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।

বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে।।৭/৩৮

বৃদ্ধাংশ নিত্য সেবেত – বৃদ্ধ বলতে যদিও আমরা বয়স্ক মানুষ বুঝি কিন্তু এখানে ব্যাখ্যাকাররা বৃদ্ধের সংজ্ঞা দিচ্ছেন যাঁর দেহ ও মন পবিত্র এবং জ্ঞান ও তপস্যার দিক দিয়ে বরিষ্ঠ, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ, তপস্বী, পবিত্র হৃদয় সম্পন্ন ও বয়স্ক এঁদের নিত্য সেবা করবে। যাঁরা এই প্রকার বৃদ্ধদের নিত্য সেবা করে রাক্ষস অর্থাৎ ক্রুড় স্বভাবের লোকেরাও তাঁদের সম্মান করে। বৃদ্ধ পুরুষদের যাঁরা সেবা করেন ক্রুড় লোকেরাও তাঁদের সম্মান করে এটা মনু কোথা থেকে এনেছেন জানা নেই। মহাভারতে একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে। একবার অর্জুন কোন কারণে যুধিষ্ঠিরের উপর রেগে গিয়ে অস্ত্র ধারণ করে নিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের গলা কেটে দেবেন বলে। ঘটনাস্থলে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন রকমে অর্জুনকে অস্ত্র সংবরণ করালেন। অর্জুনকে নিরস্ত্র করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘হে অর্জুন! মনে হচ্ছে তুমি কোন দিন বৃদ্ধজনের সেবা করোনি। তাই তুমি এত অসহিষ্ণু’। বৃদ্ধজনের সেবা করলে মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা বেড়ে যায়। বৃদ্ধ যাঁরা তাঁদের সব কিছুই বেনিয়মে চলে, খাবার খেতে চায় না, জল খেতে চায় না, শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক মত কাজ করে না, কখন ঘুমোবে, কখন ঘুম ভেঙে আপনাকে ডাকবে, সব সময় চাইবে পাশে কেউ বসে থাকুক, একটা কথাকেই হাজার বার জিজ্ঞেস করবে, মানে সুস্থ লোককে একেবারে পাগল করে দেবে। এই রকম বৃদ্ধজনের যিনি সেবা করছেন তার মানে তাঁর অসম্ভব ধৈর্য এসে গেছে। মনু বলছেন, এই ধরনের লোককে রাক্ষসরাও সম্মান করে। তার সাথে বলছেন যিনি বেদ জানেন, যিনি ব্রাহ্মণ, যিনি তপস্যা করছেন, যাঁর অস্ত্রধারণ পবিত্র এঁদেরকেও সব সময় সেবা করতে হয়। এঁদেরকে যাঁরা সেবা করেন তাঁদের সমাজ সম্মান করে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের যে ইদানিং এই মূল্যবোধ গুলো হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এগুলোই আমাদের ঠিক ঠিক আদর্শ।

তেভ্যোহধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।

বিনীতাত্মা হি নৃপতি ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।।৭/৩৯

রাজা যদি বিনীতাত্মা হন অর্থাৎ যদি তাঁর বুদ্ধিবল ও অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান থাকার জন্য খুব বিনয়ী হন তবুও সেই রাজার উচিত বৃদ্ধজনদের কাছ থেকে বিনয় ও কর্তব্যের শিক্ষা নেওয়া। যাতে আরও কিভাবে রাজার মধ্যে বিনয় আসতে পারে, আরও কিভাবে শীল আসতে পারে এগুলো শিখতে পারে। যে রাজার মধ্যে এই রকম বিনয় আছে, কিন্তু এর আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে রাজার মধ্যে তেজ আছে, দণ্ড দেওয়ার শক্তি আছে কিন্তু তার সাথে বিনয়ী। রাজা খুব বিনয়ী কোথায় বোঝা যায়? রাজা যখন মাথা নত করে। রাজা কোথায় মাথা নত করে? বৃদ্ধের সামনে, বিপ্রের সামনে, বেদজ্ঞাতার সামনে, তপস্বীর সামনে আর পবিত্র হৃদয়ের সামনে। এখানে মনু বলে দিচ্ছেন যদিও রাজা আগে থেকেই বিনয়ী ও বিনীত চিত্ত, তা সত্ত্বেও তাকে এই ধরনের ব্যক্তিত্বকে নিত্য সেবা করে সম্মান করে এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে হবে, তবেই রাজা কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যদি বিনয়শীল না হয়, বৃদ্ধদের সেবা না করে আর তাদের কাছ থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ না করে তখন সেই রাজা শীঘ্রই বিনাশের দিকে চলে যায়। বড় বড় অনেক রাজনৈতিক নেতাদেরও আমরা চোখের সামনে বিনাশ হয়ে যেতে দেখেছি, কারণ এরা বয়স্কদের সম্মান দিত না, গুণীর আদর করত না। তারপর আবার রাজার কিছু দোষের কথা বলছেন –

রাজার কয়েকটি দোষ

মৃগযাক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদ স্ত্রিয়ো মদঃ।

তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।।৭/৪৭

মৃগয়া – রাজার শিকারের খুব নেশা থাকে, আকবরের এই সমস্যা ছিল। আকবরের শিকারের এমন নেশা ছিল যে গ্রামগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে ওখানে জঙ্গল তৈরী করে দিয়েছিল যাতে শিকার করতে পারে। অক্ষঃ – পাশা খেলার নেশা, দিবাস্বপ্নঃ – দুপুরে নিদ্রা যাওয়া, পরিবাদ – অনর্থক বকবক করা, তর্কবিতর্ক করা, পরনিন্দা চর্চা করা, স্ত্রিয়ো মদঃ – স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যধিক আসক্তি আর মদ্যপান, তৌর্যত্রিকং – নাচ-গান-বাজনা এই তিনটি বিষয়ে আসক্তি, তার থেকেও মারাত্মক বৃথাট্যা – অনর্থক ঘুরে বেড়ানোর রোগ। রাজা

সারাদিন করবেটা কি! সব রাজাকে তো আর যুদ্ধ করতে হত না। যখন রাজা দেখে কোন কাজ নেই তখনই খুব মুশকিলে পড়ে যায়, হয় শিকারে চলে যাবে, তা নাহলে পাশা খেলতে বসে যাবে, তা নাহলে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে, না হলে মেয়েদের নিয়ে ফুটি করবে, এই ধরনের দশটি দুর্গুণ রাজার মধ্যে দেখা যায়।

বৃথা ভ্রমণ শুধু রাজার জন্যই দোষের নয়, সবার জন্যই বলা হচ্ছে। পূজোর সময় সব বাঙালীরা কলকাতা ছেড়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। সবার মুখে এক কথা – এবার পূজোয় কোথায় চললে? পূজোর সময় সবাইকে যেন প্রাণ ছেড়ে কলকাতা থেকে পালাতে হবে। কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে, কেন বেড়াতে যাচ্ছে ভেবে দেখছে না। না আমাদের বেরোতে হবে, পূজোর সময় আমরা এখানে থাকবো না। মনু বলছেন অনর্থক ঘোরাঘুরি যারা করে তারা বিনাশের দিকে এগিয়ে যায়। কলকাতায় এত দূর্গাপূজা হয়, দেবীর ভাসান হয়ে যাওয়া পর অসুরগুলো মনে হয় শহরে থেকে যায় সেই ভয়ে সব কলকাতা ছেড়ে পালায়। বৃথাটা, মিহিমিহি বেড়ানো, এটাকে বলছেন রোগ। তীর্থে যাওয়াটা মানুষের আলাদা একটা সঙ্কল্প থেকে হয়, তার একটা আলাদা মানসিকতা তৈরী হয়। কারো সাথে দেখা করতে যাওয়া সেটা আলাদা। অনর্থক ঘুরে বেড়ানোটা একটা রোগ, রাজার জন্য এটা বিশেষ রোগ। রাজার আরও কিছু দোষের কথা বলতে গিয়ে যেমন বলছেন, অপরের নিন্দা করা, দুঃসাহস, হিংসা করা, গালাগালি করা ইত্যাদি এই জিনিষগুলো রাজার দোষ, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। অন্য একটি শ্লোকে বলছেন –

ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।

ব্যসন্যধোহধো ব্রজতি স্বর্ঘ্যাত্যব্যসনী মৃতঃ।।৭/৫৩

ব্যসন মানে কোন জিনিষের প্রতি নেশা বা আসক্তি, যেমন শিকারের নেশা, জুয়া খেলার নেশা, মেয়েদের প্রতি আসক্তি, এটাও একটা নেশা, এই নেশায় নিত্য নতুন মেয়ে দরকার, মদ খাওয়া এগুলো সব ব্যসনের মধ্যে পড়ে। আবার এখানে পরনিন্দা পরচর্চা, পিঠ পেছনে কারুর নিন্দা করা, অপরের ভালো সহ্য না করা এগুলোও ব্যসনের মধ্যে ধরা হয়েছে। বলছেন, রাজার কোন কিছুতে ব্যসন হওয়ার থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো। ব্যসনী এক নরক থেকে আরেক নরকে যেতে পারে। কিন্তু যার কোন ধরনের ব্যসন নেই সে মৃত্যুর পর সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে। কারুর যদি দুটি ছেলে থাকে, একটি ছেলে ব্যসনী আরেকটি ছেলে মারা গেল। মনুর মতে যে ছেলেটি মারা গেল সে অনেক ভালো, সোজা স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু যে ব্যসনী সে এক নরক থেকে আরেক নরকে ঘুরপাক খেতে থাকবে। ব্যসনের ব্যাপারে মনু খুব কড়া কথা বলছেন। এরপরে রাজা তার কাজকর্ম কিভাবে করবে বলছেন – মন্ত্রীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে, দূর্গ নির্মাণ কিভাবে করবে, দূত রূপে কি ধরনের লোককে নিযুক্ত করবে ইত্যাদি। এগুলো এখন আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এরপর একটা শ্লোকে মনু বলছেন –

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।

বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিম্পতেৎ।।৭/১০৬

এটা খুব মজার শ্লোক। রাজাকে বলা হচ্ছে, তুমি বকের মত অর্থ চিন্তন করবে। বক যেমন এক পায়ে জলাশয়ের কাছে চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শুধু চিন্তা করতে থাকে কখন মাছ আসবে। অর্থ চিন্তনও ঠিক এইভাবে এক মন দিয়ে করতে হবে। রাজার পরাক্রম হবে সিংহের মত। যখন শত্রুর নাশ করতে হবে তখন নেকড়ের মত। নেকড়ে সব সময় জন্তু জানোয়ার, পশুপালকদের এক মনে লক্ষ্য করতে থাকে কখন অসাবধান হচ্ছে। একটু ফাঁক পেলে নেকড়ে শিকার করে তাকে একেবারে ছিড়ে ফালি ফালি করে দেব। শেষে বলছেন শশবচ্চ বিনিম্পতেৎ - খরগোশ এমন এক প্রাণী একে যতই আপনি ঘেরা দিয়ে রাখুন ও ঠিক পালিয়ে যাবে। শত্রু যদি রাজাকে ঘিরে ফেলে খরগোশের মত পালিয়ে যাওয়ার দক্ষতা যেন তার থাকে। এরপর রাজার চারটে নীতিকে নিয়ে বলছেন –

রাজার চারটে নীতি

সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্গামপি পণ্ডিতাঃ।

সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নীত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে।।৭/১০৯

রাজার চারটে নীতি, সাম-দান-দণ্ড-ভেদ। রাজা যদি শত্রুর উপর বিজয়ী হতে চায় তাহলে রাজার যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের সকলকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চার প্রকার উপায়ের দ্বারা নিজের বশীভূত করবে। যদি তাদের মধ্যে যাদের সাম, দান ও ভেদ এই প্রথম তিনটি উপায়ে নিবৃত্ত করা না যায় তখন ধীরে ধীরে তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করে বশে আনতে হবে। সাম হল সমঝোতা করে নেওয়া – কথাবার্তা বলে সন্ধিব্যবস্থা দিয়ে শত্রুকে হাতে রাখতে হয়। কথাবার্তা আলোচনার মাধ্যমে যদি শত্রুকে বশে না আনা যায় তখন তাকে টাকা-পয়সা বা কিছু উপহার দিয়ে হাতে আনতে হয়। দানেও যদি না হয় তখন তৃতীয় পন্থা হল দণ্ড, আক্রমণ করে তাকে নিজের কজায় রাখতে হয়। এই তিনটির মধ্যে যদি কোনটাই কাজে না লাগে তখন ভেদ। শত্রুর নিজেদের মধ্যে, তার মিত্র পক্ষদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করে গোলমাল লাগিয়ে দেওয়া। বলা হয় ব্রিটিশরাই প্রথম রাজনীতিতে এই Divide and rule policy নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ভারতে এই রুল চিরদিনই ছিল। পাকিস্তানের এক মন্ত্রী কিছু দিন আগে বলছিলেন কিছু দেশ চায় না ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে সন্ধিব্যবস্থা হোক। ভারত আর পাকিস্তান যদি জোট বাঁধে তাহলে এশিয়াতে এই দুটো দেশ প্রচণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠবে, তাই কিছু দেশ দুটো দেশের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে রেখেছে। পাকিস্তানের মন্ত্রী অবশ্য কোন দেশের নাম নেয়নি। কিন্তু এটা ঠিক ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যদি এক জোট হয়ে কাজ করে তাহলে আমেরিকা চীন এদের খুব মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে আমেরিকা এই চারটি নীতি খুব সুন্দর প্রয়োগ করে যাচ্ছে, পাকিস্তানকে টাকা দিয়ে বশ করে রেখেছে, ইরাক-ইরানে দণ্ড নীতি প্রয়োগ করে বশিষ্ক করে যাচ্ছে। আর দুটো দেশের মধ্যে সব সময় ঝগড়া লাগিয়ে রাখে।

একটা পরিসংখ্যানে দেখাচ্ছিল যে, আমেরিকার বড় বড় আর্মি অফিসাররা অবসর নেওয়ার পর ওখানকার নামকরা অস্ত্র তৈরীর কোম্পানীতে উচ্চ পদে গিয়ে যোগ দেয়। কোম্পানীর ওই উচ্চপদে গিয়ে এরা, আগে থাকতে যোগাযোগ থাকার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝিয়ে দেয় আপনাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ঝামেলা করতে পারে, আপনারা আমাদের এই অস্ত্রগুলো কিনে নিন। তারপর শত শত কোটি টাকা দিয়ে এরা অস্ত্র কিনে নিল। তারপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বলবে – এই দেখুন আপনাদের পাশের রাষ্ট্রে এই ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে ফেলেছে, আপনারা কিন্তু সাবধান হয়ে যান। তারপর তারা আবার আরও আধুনিক অস্ত্র কিনতে শুরু করে দিল। গোলা বারুদের একটা সময় থাকে, কিছু বছর পর এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে দুই রাষ্ট্র সব সময় এদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে যাচ্ছে। অন্য দিকে ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসির মত কোম্পানী গুলো এদের ব্যবসা আবার দাঁড়িয়ে আছে শান্তির উপরে। দেশে যদি শান্তি না থাকে ম্যাকডোনাল্ডে কে যাবে খাওয়া-দাওয়া করতে! মজা করে একটা লেখা বেরিয়েছিল, যে দুটো দেশে ম্যাকডোনাল্ড আছে সেই দুটো দেশ কখন লড়াই ঝগড়াতে নামেনি। পরিসংখ্যানেও এই কথাই বলা হয়। ওরা বলেছিল ভারত পাকিস্তান আর যুদ্ধ হবে না, কারণ ভারতেও ম্যাকডোনাল্ড খুলে গেছে পাকিস্তানেও ম্যাকডোনাল্ড ব্যবসা করতে শুরু করেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। কারণ যখনই অর্থনীতি খারাপ হবে তখন এদের ব্যবসা মার খাবে। অন্য দিকে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরী করে রাখবে। চায়নার কাছে এই আছে তোমরাও জোগাড় কর, আমরা তোমাদের সাহায্য করব। এগুলোই ভেদ নীতি। তোমার শত্রুকে কখনই মাথা তুলতে দেবে না। এটাই এখানে বলছেন রাজা যেন সব সময় এই ভেদ নীতিকে ব্যবহার করে। মহাভারতের একটা নীতি নিয়ে বলছেন –

রাষ্ট্রো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।

ভূত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষদিমাঃ প্রজাঃ।।৭/১২৩

ভারতের ঘুষের সমস্যা প্রথম থেকেই আছে। তখনকার দিনেও ঘুষের প্রচুর সমস্যা ছিল। রাজার যে সব কর্মচারীরা ছিল এদের মধ্যে অনেক ঘুষখোর কর্মচারী ছিল। এখন যে এত দুর্নীতি নিয়ে সোরগোল চলছে

এটা নতুন কিছু নয়, দুর্নীতি ভারতে চিরদিনই ছিল, এটা মনুষ্যত্বেরই বলছে। এই শ্লোকে বলছেন – এই যে দুষ্ট লোক যারা ঘুষ নেয়, টাকা নিয়ে কথা চেপে দেয়, এই ধরনের বদমাইশ কর্মচারীদের উপর রাজার যেন বিশেষ নজরদারি থাকে। মহাভারতেও এই ধরনের শ্লোক আছে। রাজা কিভাবে প্রজাদের থেকে কর নেবে বলছেন –

যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যাং বার্যোকোবৎষট্ পদাঃ।

তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্যাদিকঃ করঃ।।৭/১২৯

জৌক যেমন অল্প অল্প করে রক্ত শুষে নেয়, ভ্রমর যেমন ফুল থেকে অল্প অল্প করে মধু সংগ্রহ করে আর বাছুর যেমন গাভী থেকে অল্প পরিমাণে দুধ টেনে নেয়, ঠিক তেমনি রাজা প্রজাদের কাছ থেকে অল্প অল্প করে কর আদায় করবে। বেশী বেশী করে কর আদায় করলে প্রজারা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায় বা বিদ্রোহ করে দেয়। এগুলোই হল ঠিক ঠিক রাজধর্ম। ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে রাজা কি রকম করবে বলছেন –

শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিং ধর্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।

সংরক্ষ্যেৎ সর্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্।।৭/১৩৫

মনু বলছেন ব্রাহ্মণ যদি কোন রাজ্যে কষ্ট পায়, লাঞ্ছিত হয় তখন সে রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য সাবধান করে মনু বলছেন – কোন রাজ্যে যদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের আগমন হয় তখন সেই ব্রাহ্মণের আচরণ, শিক্ষা যোগ্যতা ভালো করে বিচার করে দেখার পর সেই ব্রাহ্মণকে রাজ্যে কি রকম কাজে লাগান যেতে পারে সেই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে তাকে সেই রকম কাজে লাগাতে হবে। যেভাবে মানুষ তার ঔরস জাত সন্তানকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করে, রাজাও ঠিক সেই ভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের রক্ষা করবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত – বিদ্বান পুরুষদের সব সময় রক্ষা করতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের গোলপার্কে কালচারাল ইনস্টিটিউটে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। ওনার কোন লেখাটেখা কোথাও বেরোত না, খুব খিটখিটে ছিলেন। এই নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। একবার এক মহারাজ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকে বলছেন ‘মহারাজ! এই পণ্ডিত তো আমাদের কোন কাজেই লাগে না, ওনাকে না রাখলেই তো হয়’। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী হেসে বলছেন ‘এই রকম দু-তিনজন লোককে রাখতে হয়, এতে প্রতিষ্ঠানের সম্মান বাড়ে’। যে প্রতিষ্ঠানে পণ্ডিত লোক, বিদ্বান থাকেন সেই প্রতিষ্ঠানের সম্মান বাড়ে। আইনস্টাইনকে যে প্রিন্সটনের কর্তৃপক্ষরা রেখে দিয়েছিলেন তাতে তাদের প্রতিষ্ঠানের খুব নামডাক হয়ে গিয়েছিল। সেটাই বলছেন, রাজা যখন দেখবে তার রাজ্যে কোন শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রয়েছেন তখন তাঁর জন্য রাজাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, একটা পদে নিযুক্ত করে সেই পণ্ডিতকে রাজ্যে রেখে দিতে হবে, যাতে তাঁকে তাঁর পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার কোন চিন্তা না করতে না হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য এগুলো খুব দরকার। যে সমাজ বিদ্যাকে সম্মান দেয় না, সেই সমাজ কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। রাজাকে তাই খুব সাবধান করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশে যে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার, বিজ্ঞানে ভাটনগর পুরস্কার এগুলো এই ভাব থেকেই প্রচলন করা হয়েছে। তবে এটা আরও নীচু স্তর থেকে শুরু করা দরকার, এই পুরস্কার গুলো অনেক উপরের স্তরে দেওয়া হয়। জেলা, পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করলে আরও অনেক বিদ্বানকে এর আওতার মধ্যে নিয়ে আসা যেত। কেউ হয়ত খবর দিল, আমাদের গ্রামে একজন ভালো পণ্ডিত আছেন, কিন্তু এনার কোন চাকরি নেই। তখন রাজ্য স্তর থেকে যদি সম্মান দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে উনি মাসে কটি টাকা পেয়ে যাবেন। সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সব সমাজেই বিদ্বান গুণীজনদের এইভাবে সম্মানের দ্বারা গুণের আদর করতে হয়।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ।।৭/১৪০

পরিস্থিতি ও অবস্থা দেখে রাজাকে কখন কঠোর হতে হবে আবার সময় বিশেষে রাজাকে মৃদু অর্থাৎ নরম কোমল স্বভাবের হতে হবে। যে রাজা পরিস্থিতি অনুযায়ী দরকার পড়লে কঠোর হয়ে যায় আবার দরকার

হলে মৃদু হয়ে যায় সেই রাজাকেই সবাই সম্মান করে, সেই রাজাই সকলের প্রিয় হয়। রাজা যদি সব সময় কঠোর ভাব দেখায় তাহলে সে সম্মান পাবে না। আবার সব সময় যদি কোমল স্বভাবের হয় তাহলেও সম্মান পাবে না, সবাই মাথায় চড়ে বসবে। অবস্থা দেখে কঠোর হতে হবে আবার অবস্থানুযায়ী খুব মৃদু হতে হবে।

রাজা বেঁচে থেকেও মৃত

বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রদ্বিধ্বংসে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।

সংপস্যতঃ সভ্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি।।৭/১৪৩

রাজা আছে, রাজার মন্ত্রী আছে, রাজার অনুচরবর্গরা আছে, রাজার সব কিছুই আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও দস্যু বদমাইশরা, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রজাদের সর্বস্ব অপহরণ করে নিচ্ছে, উৎপীড়ন করছে তাহলে বুঝে নিতে হবে এই রাজা বেঁচে থেকেও মৃত, এই রাজার কোন দাম নেই। রাজ্য যদি সামলাতে না পারে, প্রজাদের দুষ্ট লোকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে যদি না পারে সেই রাজা কিসের রাজা। গণতন্ত্রে এই ধরনের অনেক সমস্যা থাকে। গণতন্ত্রে ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে মাফিয়াদের সাহায্য নিতে হয়। ক্ষমতায় আসার পর এই মাফিয়াদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। এই কারণে মনু কখনই গণতন্ত্রের পক্ষে বলবেন না। আমাদের ভারতের কথা ছেড়ে দিন, আমেরিকা, ব্রুটেন যারা নিজেদের সব থেকে বড় গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক মনে করে, ওখানেই সরকারকে দুষ্টদের কত রকমের সুযোগ সুবিধা দিতে হচ্ছে। ক্ষত্রিয়দের পরম ধর্মই হল প্রজা রক্ষণ। ক্ষত্রিয় যে শাস্ত্রোক্ত ফল পাবে সেটা পাবে একমাত্র প্রজা রক্ষণের দ্বারা।

কাদের উপস্থিতিতে রাজা গোপন মন্ত্রণা করবে না

জড়মুকাম্বধিরাত্তৈর্যগ্যোনান্ বয়োহতিগান্।

স্ত্রীশ্লেচ্ছব্যধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেৎপসারয়েৎ।।৭/১৪৯

রাজা যখন মন্ত্রী ও আমলাদের সাথে কোন গোপন মন্ত্রণা করবে তখন সেখানে যেন এই ধরনের কোন লোক কোন ভাবেই উপস্থিত না থাকে – প্রথম, জড় প্রকৃতির লোক, মানে পাগল, উন্মাদগ্রস্ত লোক। দ্বিতীয় মুক, তৃতীয় অন্ধ, চতুর্থ কালা, পঞ্চম শুক-সারি জাতীয় পাখী, যারা কথা বলতে পারে, ষষ্ঠ অতিবৃদ্ধ, সপ্তম স্ত্রীলোক, অষ্টম শ্লেচ্ছ জাতি, নবম ব্যাধিগ্রস্ত লোক এবং দশম বিকলাঙ্গ।

আমি হয়তো ভাবছি এ তো কানে কালা, আমাদের কথা শুনতে পারবে না। কিন্তু সে কানে কালা নাও হতে পারে, সে হয়তো কালার ভাণ করে মন্ত্রণা শুনতে চাইছে। আমার পোষা টিয়া পাখিটা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারে, আমি মন্ত্রণা করছি হঠাৎ টিয়া পাখিটা একটা শব্দ শিখে নিল। এখন পাখী ওই শব্দটাই চৈঁচাতে থাকল। আমি মন্ত্রণা করার সময় হয়তো বললাম অমুক লোকটাকে মারতে হবে, অমুক লোক মরুক! টিয়া পাখি হয়তো ওই শব্দটাই শিখে নিয়ে চৈঁচাতে থাকল অমুক লোক মরুক, অমুক লোক মরুক। এমনিতে মনে হবে এই দশ ধরনের প্রাণীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু করবে! সেইজন্য মন্ত্রণা করার সময় রাজাকে খুব বেশী করে সাবধান থাকতে হবে। অন্য দিকে বলছেন –

ভিন্দন্ত্যবমতা মন্ত্রং তৈর্যগ্যোনাস্তৈব চ।

স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষণ তস্মানুদ্রাদ্তো ভবেৎ।।৭/১৫০

শুধু তাই নয়, এদের মনের মধ্যে সব সময় একটা হীনমন্যতা ভাব কাজ করে। যদি কোন ভাবে এরা নিজেকে অপমানিত বোধ করে তখন গোপন মন্ত্রণা এরা প্রকাশ করে দিতে বিলম্ব করবে না। যদি কোন শক্তিমান পুরুষকে বলেন – এটা অত্যন্ত গোপন কথা, এই কথা শুধু তোমার আমার মধ্যেই যেন থাকে, বাইরে আর যেন কেউ না জানতে পারে। তখন এই কথা দুজনের মধ্যেই থেকে যাবে। কিন্তু এই ধরনের দশ প্রকার প্রাণীর মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষিত হয় না। মূক, অন্ধ, বধির, বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত এরা মানসিক ভাবেই ভেতরে

ভেতরে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। কোন কারণে যদি এদের কেউ অপমানিত হয়ে যায় বিশেষ করি স্ত্রী যদি অপমানিত হয়ে যায়, তখন আপনাকে শেষ করার জন্য রাষ্ট্রায় নেমে যাবে। পুরুষ বিশেষ করে বলবান কোন কারণে যদি অপমানিত হয়েও যায় সে হজম করে নেবে কিন্তু কখন বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না, কিন্তু বাকিরা হজম করে নিতে পারে না। অপমান জিনিষটা সবাই সহ্য করতে পারে না। রাজা শিরোজয়ী কি করে হয়?

কাজ করার আগে রাজাকে তিনটে জিনিষকে আগে জানতে হয়

আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্তে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।

অতীতে কার্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভিনাভিভূয়তে।।৭/১৭৯

আমি যে কাজগুলো এখন করছি ভবিষ্যতে এর ফলাফল কি রকম হবে, বর্তমানে যে কাজগুলো করার আছে সেগুলো দেরী না করে, ফেলে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে করে দেওয়া আর অতীতে যে কাজগুলো করা হয়েছে সেই কাজগুলোর মধ্যে কার্য বিশেষকে জানা, এই তিনটে জিনিষকে যে রাজা ঠিক ঠিক জানে সেই রাজা কখন শত্রু দ্বারা পরাভূত হয় না। আমি একটা বাড়ি কিংবা গাড়ি কিনতে যাচ্ছি, এই গাড়িটা কেনার জন্য ভবিষ্যতে আমার ভালো কি খারাপ যেটাই হোক সেটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি, বর্তমানে আমার কি কর্তব্য, যেটা কর্তব্য সেটা একটুও কাল বিলম্ব না করে এক্ষুণি করে ফেলতে পারছি আর তৃতীয় এর আগে আগে আমার দ্বারা যে কাজগুলো হয়েছিল সেখানে কি কি কাজ হয়েছিল, কি রকম হয়েছিল, কি ভুল হয়েছিল – এই তিনটে জিনিষকে যে ঠিক ঠিক মাথায় রেখে চলে, কক্ষণ তার কেউ কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা এর আগে আগে যা করেছি ভুলে যাই, যেগুলো এক্ষুণি করা দরকার সেগুলো না করে অকাজ গুলো করতে থাকি, ভবিষ্যতে যে কাজগুলো করব আগে থাকতে সেই কাজ গুলোর গুণ দোষ বিচার করতে পারিনা। যার জন্য আমরা সব জায়গায় সবার কাছে হেনস্থ হই। পরের শ্লোকেই বলছেন –

রাজনীতি ও জীবনের মূল নীতি

যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।

তথা সর্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ।।৭/১৮০

বলছেন, রাজার শত্রুই হোক, মিত্রই হোক কিংবা উদাসীন বা নিরপেক্ষই হোক, রাজা যে কাজ করলে এদের কেউই রাজাকে পীড়িত করতে পারবে না সেটাই হল রাজনীতি। যদিও এখানে বলা হয়েছে সংক্ষেপে এটাই রাজনীতি, কিন্তু এই শ্লোকটা শুধু রাজনীতিই নয়, প্রত্যেককে জীবনে এই শ্লোকটিকে প্রয়োগ করা দরকার। রাজাই হোক আর সাধারণ মানুষই হোক, সবার জীবনে এই তিন ধরনের মানুষ থাকবে – শত্রু থাকবে, মিত্র থাকবে আর উদাসীন মানে নিরপেক্ষ লোকও কিছু থাকবে। এখন আমি এমন একটা কাজ করলাম যার জন্য শত্রু রেগে গেল, শত্রুর কাজই হল রেগে যাওয়া। আমি হয়তো শত্রুর এই রাগকে কোন গুরুত্বই দিলাম না, রেগে গেছে তো বয়ে গেছে। কিন্তু এবার এমন একটা কাজ করলাম যার জন্য যে নিরপেক্ষ লোক সে চটে গেছে। এই কাজ করাটা কিন্তু তাহলে ঠিক হয়নি। আর শেষে এমন একটা কাজ করলাম যার জন্য আমার মিত্র দেশ, যার রাজা আমার বন্ধু, সে আমার উপর চটে গেল। তখন এই কাজটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ বলেই বুঝতে হবে। রাজনীতি বা জীবনের নীতিটাই বা কি? বলছেন এমন কাজ করবে না যেটা তোমার বন্ধু, শত্রু ও উদাসীন এই তিনজনকেই পীড়িত করছে। অনেক সময় দেখা যায় সত্যিই আমরা এমন ধরনের কিছু কাজ করে থাকি যার জন্য নিরপেক্ষ লোকরাও বিরক্ত হয়ে আমাদের পীড়া দেয়। কিন্তু সন্ন্যাসীরা অনেক পীড়া গায়ে লাগান না। সন্ন্যাসী হয়তো রাষ্ট্র দিয়ে যাচ্ছেন একটা সাধারণ লোক তাঁকে সন্ন্যাসের নামে ব্যঙ্গ করে টিটকারি করল। সন্ন্যাসীর কাছে এই লোকটি উদাসীন, সন্ন্যাসী তাকে জানেও না চেনেও না। সন্ন্যাসী এই পীড়া গায়েই নেবেন না। কিন্তু হয়তো একজন সন্ন্যাসী কোন মহিলাকে নিয়ে রাষ্ট্রাঘাটে ঘোরাঘুরি করেন তখন যে উদাসীন সেও তাঁকে পীড়া দেবে, সন্ন্যাসীর যে শত্রু সেতো পীড়া দেবেই। সন্ন্যাসীর যে মিত্র সেও তাঁকে পীড়া দেবে, কি হচ্ছে তোমার, এই অধঃপতন কি করে তোমার হল! মনু রাজাকে উদ্দেশ্য করে সবাইকে এই

ধরণের কাজ করতে নিষেধ করছেন। সব থেকে ভালো সেই কাজটাই হবে যে কাজ করলে মিত্রও পীড়া দেবে না, উদাসীনও পীড়া দেবে না এবং শত্রুও পীড়া দেবে না। যদি একেবারেই এই ভালো কাজ না করা যায় তখন এমন কাজই করবে যাতে অন্ততঃ মিত্র আর উদাসীন পীড়া না দেয়। শত্রু দিলেও দিতে পারে। এটাই রাজনীতি, শুধু রাজনীতি নয় এটাই জীবনদর্শন। যখনই আমরা কোন কাজ করতে যাব তখনই এটা ভেবে দেখতে হবে, এই কাজটা করলে আমার শত্রু হোক, মিত্র হোক বা উদাসীন হোক কেউ আমায় পীড়া দেবে না। যেমন আমি যদি খুব জপ-ধ্যান করি তাহলে কি আমার শত্রু এর জন্য আমাকে পীড়া দিতে আসবে? কখনই আসবে না। আমার যে মিত্র সে কি আমাকে পীড়া দেবে? কখনই দেবে না। যারা উদাসীন তারা কি পীড়া দেবে? কখনই দেবে না। তাহলে এই কাজটা ঠিক আছে।

দৈব ও কর্ম প্রচেষ্টা

সর্বং কর্মেদমায়ন্তং বিধানে দৈবমানুষে।

তয়োদৈবমচিন্ত্যং তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া।।৭/২০৫

মনুস্মৃতির দর্শন হল সর্বং কর্মেদমায়ন্তং, এই জগতে যা কিছু কর্ম হয় সব কর্ম দৈব আর মানুষ এই দুটোর চেষ্টার উপর চলে। এর মধ্যে দৈব হল পূর্বকর্মকৃত, এরা আগের আগের জন্মে যত কর্ম করা হয়ে আছে সেটাই দৈব। আর মনুষ্যকৃত কর্ম মানে, মানুষ এখন যে কর্মগুলো করছে। এখন আমি যা কর্ম করছি এর সাথে যোগ হবে আমি আগের আগের জন্মে যা যা কর্ম করেছি। সেইজন্য বলছেন, যদিও আমার ভাগ্যে আছে কিন্তু আমি চেষ্টা করছি না তাহলে আমি দৈব কর্মের ফলও পাবো না। অন্য দিকে আমি প্রচুর চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু পেছনের দিকে আমার কর্মশায়ে কোন সেই রকম কর্ম করা নেই, তখনও আমি এই চেষ্টার ফল পাবো না। তার মানে আমার হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

এখানে এর অন্তর্নিহিত ভাবটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার। আমি আগের আগের জন্মে যেমন যেমন কর্ম করেছি সেই কর্মের ফল কখন দেবে? এখন যে কর্ম করছি তার সঙ্গে। মনে করুন দুই বন্ধু দশ কাঠা জমিতে চাষ করছে। দুজনের সমান জমি, সমান বীজ, সমান সার, সমান জল আর একই দিন থেকে চাষ করা শুরু করল। ফসল যখন হবে তখন দুজনের কম বেশী হবে, সমান ফসল কখনই হবে না। কেন আলাদা ফসল হচ্ছে? বলছেন, পূর্ব পূর্ব জন্মে যে কর্ম করা আছে তার জন্য আলাদা পরিমাণের ফসল হচ্ছে, আর তার সাথে এই জন্মে যে কর্মফল আছে সেটাও কাজ করছে। একজন যদি বলে আমার কর্ম খুব ভালো, তাহলে আমি যাই যেখানে কাঁকড় পাথুরে জমি আছে সেখানে গিয়েই চাষ করি। সেটা হবে না। তবে কর্ম ভালো আছে বলে অন্যদের তুলনায় হয়তো একটু ভালো হবে। তবে কাজ করার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আমি যদি পুরো দমে চেষ্টা চালাই আর আমার আগের কর্ম যদি ভালো থাকে আমাকে কিন্তু ভালো ফল দেবে। সেইজন্য আমাদের চেষ্টাটা সব সময় চালিয়ে যেতে হয়। আবার চেষ্টাটা খুব জোর চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফল পাচ্ছে না, তার মানে পেছনে তার ভালো কর্ম নেই। সেইজন্য এই ভেবে হতাশা হওয়া উচিত নয় – আমি এত চেষ্টা করছি কিন্তু কোন ফল পাচ্ছি না। তোমার তো পাওয়ার কথা নয়, তবে এখন তুমি যে এত চেষ্টা করে যাচ্ছ এই কর্মের ফল এখন না দিলেও এগুলো জমছে, এক সময় গিয়ে অবশ্যই দেবে। এটাই এখানে বলছেন, দৈব আর পুরুষকার এই দুটো একসাথে চলে। পুরুষকার যদি না থাকে দৈব ফল দেবে না, দৈব যদি না থাকে পুরুষকার ফল দেবে না। সেইজন্য পুরুষকার সব সময় চালিয়ে যেতে হয়, ফল যদি এলো তো ভালো। ফল না এলেও ভেঙে পড়তে নেই। ফল যদি আসে তার মানে তার আগের সুকৃতি আছে, ফল যদি না আসে তার মানে সুকৃতি ছিল না। কিন্তু এখন যে পুরুষকার চালিয়ে যাচ্ছে তার ফল পরে অবশ্যই আসবে, তার জন্য মন খারাপ করে চেষ্টা বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকতে নেই। দৈব আর পুরুষকার এক সঙ্গে চলবে। আপনি একটা চাষ-বাস শুরু করলেন। দেখা গেল গ্রামে সবার থেকে চাষ-বাস আপনারই ভালো হচ্ছে। আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন আমি তো সেই রকম চাষ করতে পারিনা কিন্তু এত ফসল কি করে হচ্ছে! অবাকের কিছুই নেই, আগের জন্মে আপনার করা আছে বলে হচ্ছে। কয়েক বছর পর হঠাৎ দেখা গেল আপনি

আর সেই রকম ফসল পাচ্ছেন না। তার মানে কি? আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স যেটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। তাহলে এখন আপনি কি করবেন? লেগে থাকতে হবে। হতাশার ভাব, অসহায় বোধ কখনই আসতে দিতে নেই। এটা ভালো করে বুঝতে হবে – এতদিন যেটা পেয়েছি সেটা ফোকটে এসেছে, এবার আমাকে খেটে মেহনত করে ব্যাঙ্কের সেভিংসে টাকা জমাতে হবে। এগুলো নিয়ে খুব সুন্দর কাহিনী আছে।

রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) ঠাকুরের মহাসমাধির পরে বৃন্দাবনে খুব কঠোর তপস্যা করছিলেন। ওই কঠোর তপস্যা দেখে আরেকজন তপস্বী রাজা মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন ‘ঠাকুরের কৃপাতে আপনার তো সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে, তাও এত তপস্যা কেন করছেন?’ রাজা মহারাজ খুব সুন্দর বলছেন ‘ঠাকুর আমাকে সবই দিয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু এবার আমাকে সব কিছু বুঝে নিয়ে আয়ত্ত করতে হবে’। তার মানে, দৈব দিয়ে যা কিছু আসছে সেটা কিন্তু পুরোপুরি আপনার নয়, পুরুষকার দিয়ে যেটা আসছে সেটাই ঠিক ঠিক আপনার নিজস্ব। দৈব যখন শেষ হয়ে শুকিয়ে যায় তখনই বোঝা যায় আপনি ঠিক ঠিক কিসের যোগ্য। অনেক রাজনৈতিক নেতাদের দেখা যায় অল্প কিছু দিনের মধ্যে বিরাট ক্ষমতাবান হয় উঠতে। ছিল বাসের কণ্ঠস্বর হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী। কিছু দিন থাকার পর ওখান থেকে পতন হতে শুরু হয়, পড়তে পড়তে একটা অবস্থা পর্যন্ত যাবে। এবার ওই অবস্থা থেকে আর নীচে সে যাবে না। ওই অবস্থাটাই তার প্রকৃত নিজস্ব অবস্থা। তার আগে পর্যন্ত যেটা ছিল সেটা দৈব। আরেকটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে।

একজনের খুব ইচ্ছে হল সে সঙ্গীত সাধনা করবে। তার জন্য প্রথমে সে সঙ্গীতে অনুশীলন না করে মা সরস্বতীর খুব সাধনা করতে থাকল। তার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মা সরস্বতী এসে তাকে একটা বীণা দিলেন। বীণা দিয়ে বললেন – তুমি এই বীণার উপর হাত রেখে যা বাজাতে চাইবে বীণা নিজে থেকেই বাজতে শুরু করে দেবে। ব্যস্, কয়েকদিনের মধ্যে তার বিরাট নামডাক হয়ে গেছে। দেশের সেরা বীণাবাদক রূপে তাকে সবাই জানে। তার গান-বাজনা শুনে সেই দেশের রাজকুমারী অভিভূত হয়ে গেছে। বীণাবাদককে রাজকুমারী বলেই দিল ‘আপনি যদি আমাকে এত সুন্দর বীণা বাদন শিখিয়ে দেন তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করব’। কিন্তু সে তো কাউকে বীণা বাদন শেখাতে পারবে না, কারণ বীণাতো আপনা থেকেই বাজে। সিডি প্লেয়ারে কত সুন্দর সুন্দর গান বাজে কিন্তু সিডি প্লেয়ার তো কাউকে গান শেখাতে পারবে না। সে বেচারী তখন মনের দুঃখে সমুদ্রের পারে গিয়ে বীণাটাকে ভেঙে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে এবার সে নতুন করে গান-বাজনা শিখতে শুরু করল। এই কাহিনীর মূল তত্ত্বটা হল দৈব দিয়ে যা কিছু হয় সেটা নিয়ে কখন লাফালাফি করতে নেই, ওটা আপনার নিজস্ব নয়, আপনি যেটা আপনি সেটা। দৈব আছে বলে আপনি খুব উপরে উঠতে শুরু করে দিলেন, কিন্তু একটা সময় দৈব শেষ হয়ে যেতে বাধ্য। তখন আবার নীচে পড়তে শুরু করবেন। নীচে পড়বেই, কেউ বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু নামতে নামতে একটা জায়গায় এসে থেমে যাবেন, এই জায়গাটাই আপনার আসল স্থিতি। এবার এখান থেকে আপনাকে পুরুষকারের দ্বারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেমন বীণাবাদক সঙ্গীত শিক্ষা করতে অনুশীলন শুরু করে দিল। এবার এখান থেকেই আবার আপনি উপরে উঠতে থাকবেন। মনুর এটা একেবারে দৃঢ় তত্ত্ব। মহাভারতে অবশ্য অনেক সময় দৈবের পক্ষে অনেক কিছু বলবে, আবার অনেক সময় পুরুষকারের পক্ষে অনেক কিছু বলবে। মনুস্মৃতিতে এসব কিছু নেই, এখানে একেবারে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন – তোমাকে পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি এখন যেমন যেমন করছ তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স যেমন আছে তোমার ফলও তেমন তেমন আসবে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স যদি না থাকে তাহলে ফাঁকাই থাকবে, কিছুই হবে না। কিন্তু এখন তুমি যা করছ এটাই আবার তোমার দৈবে গিয়ে যোগ হচ্ছে, ফল তোমাকে অবশ্যই দেবে, এই জন্মে না দিলে পরের জন্মে অবশ্যই দেবে।

রাজাকে যে চারটে জিনিষকে সব সময় রক্ষা করে যেতে হবে

আপদর্থে ধনং রক্ষেন্দু দারান্ রক্ষেন্দু ধনৈরপি।

আত্মানং সততং রক্ষেন্দু দারৈরপি ধনৈরপি।।৭/২১৩

যদিও এই শ্লোকটি রাজধর্মের জন্য বলা হচ্ছে, কিন্তু এটা আমাদের সবারই জন্য প্রযোজ্য। (১) আপৎ কালে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ধন সঞ্চয় করবে। (২) বৃদ্ধ বয়সের জন্য, রোগব্যাধির জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সব সময় অর্থ সঞ্চয় করে রাখবে। (৩) ধর্মপত্নীর কোনও বিপদ উপস্থিত হলে ওই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তাঁকে রক্ষা করবে। আর (৪) ধর্মপত্নী আর ধন এই উভয়ের বিনিময়ে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করবে। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না বাপু। মনুস্মৃতি কিন্তু পরিষ্কার কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছে। মনু এখানে গৃহস্থের জন্যই কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন। বলছেন কামিনী আর কাঞ্চন, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী যদি না থাকে গৃহস্থ কেঁদে মরবে। স্ত্রীকে পাশে রাখতে গেলে তোমার কাঞ্চন দরকার। সেইজন্য স্ত্রী আর অর্থ এই দুটোকে বৃদ্ধ বয়সের সম্বল মনে করে নিজের কাছে সামলে রাখবে। রাজাকে বলা হচ্ছে এই দুটো দিয়ে তুমি আত্মরক্ষা করবে। তফাৎ হল ঠাকুরের ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম, সন্ন্যাসী ধর্মে কামিনী-কাঞ্চন প্রথমেই ছাড়তে হচ্ছে। কিন্তু এখানে রাজধর্মের কথা চলছে, এই কথাগুলো মূলতঃ রাজার উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে। রাজাকে সব সময় আত্মরক্ষা করতে হবে, স্ত্রী যদি পাশে না থাকে রাজা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। স্ত্রীকে কাছে রাখা মানেই তাকে টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে, গয়নাগাঁটি, শাড়ি এগুলো দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে হবে। রাজার জন্য তাই কামিনী আর কাঞ্চন অত্যন্ত জরুরী। টাকা আর স্ত্রী এই দুটো দিয়েই রাজা যেন আত্মরক্ষা করে। কথামত পড়ে অনেকে ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগকে ভুল বুঝে মনে করে আমাদেরও এই দুটো ত্যাগ করতে হবে। না! তা করলে চলবে না। ঠাকুর যা বলছেন ঠিকই বলছেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হল সাধু সন্ন্যাসীদের ধর্ম, যে ঈশ্বরের পথে পুরোরপুরি চলে গেছে তাকে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি রাখা কোন ভাবেই চলবে না। কিন্তু গৃহস্থের জন্য স্ত্রী আর অর্থ খুব জরুরী। অর্থ আর স্ত্রী যদি না থাকে গৃহস্থকে রক্ষা করবে কে!

মজার ব্যাপার হল এই কথা মনু স্ত্রীকে বলছেন না, বরঞ্চ স্ত্রীকে এর আগে বলছেন বৃদ্ধা অবস্থায় তুমি সন্তানের অধীনে থাকবে। মনু এটা ধরে নিয়েই বলছেন স্বামী আগে মারা যাবে। যদিও সব সময়ই মেয়েদের চির সৌভাগ্যবতী হওয়ার আশীর্বাদ করা হয়। কিন্তু আমরা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখা যাবে পুরুষ যদি আগে মারা যায় তখন এটাই মঙ্গলের হয়। কারণ মেয়েরা মানসিক দিক দিয়ে খুব দৃঢ় হয়, মেয়েদের সহ্য গুণও পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। মেয়েদের যদি দুটি সন্তান আর নাতিপুতি হয়ে তখন ওরা মানসিক ভাবে প্রচণ্ড স্বাবলম্বী হয়ে যায়, স্বামীর উপর সে আর নির্ভর করে থাকে না। কিন্তু পুরুষরা এটা আবার সামলাতে পারে না, বৃদ্ধ বয়সে যদি স্ত্রী মারা যায় তখন দুনিয়ায় তার মত অসহায় আর কেউ নেই। স্ত্রীর বয়স সব সময় স্বামীর থেকে কম রাখার প্রথার পেছনে অন্যতম কারণ এটাই। কারণ যে কোন মহিলার সন্তান আর নাতি নাতনী হয়ে গেলে সে নিজের জীবন চালিয়ে নেবে কিন্তু পুরুষ মানুষ পারে না। পুরুষের এই অসহায়তার কথা মাথায় রেখেই মনু পুরুষদের বলছেন – তুমি টাকা আর স্ত্রীকে খুব সামলে রাখবে।

এতক্ষণ রাজধর্ম নিয়ে মনুস্মৃতি কি বলছে তারই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। শাসন ব্যবস্থায় অনেক রকম পদ্ধতি আছে, যেমন গণতন্ত্র আছে, একনায়কতন্ত্র আছে, রাজতন্ত্র আছে যেখানে বংশানুক্রমে একজন রাজা আছে। এর মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে যার নাম প্লুটোক্রেসি, শাসন ব্যবস্থায় প্লুটোক্রেসি একটা বিশেষ পদ্ধতি যেখানে কিছু লোক স্থায়ী ভাবে থাকে আর কিছু লোক একটা সময়ের পর পাল্টাতে থাকে। কিছু কিছু মঠ মিশনের সংগঠন অনেকটা প্লুটোক্রেসির মত চালান হয়। এখানে যিনি অধ্যক্ষ হয়ে গেলেন তিনি আমৃত্যু অধ্যক্ষই থাকবেন কিন্তু সেক্রেটারিরা পাল্টাবেন, ট্রাস্টিস সদস্যরা পাল্টাবেন। এটাও একটা শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতি। একটা জায়গায় যদি স্থিতিশীলতা না থাকে তাহলে সমাজ ও সংগঠন কোনটাই দাঁড়াতে পারে না। যেমন বেলুড় মঠের যিনি অধ্যক্ষ হন সবাই বিশ্বাস করেন তাঁর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ আবির্ভাব হয়েছে। প্রায়ই সংবাদে দেখা যায় বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের বিপ্লব, বিদ্রোহ হচ্ছে যার ফলে অনেক দেশের শাসনকর্তাকে অর্থাৎ সেখানকার রাজাকে জেলের মধ্যে বন্দী করে দেওয়া হচ্ছে। রাজাকে যদি বন্দীই করে রাখা হয় তাহলে সে কিসের রাজা। সেইজন্য মনু রাজা যাতে খুব সাবধানে রাজ্য শাসন করতে পারে আর রাজার প্রতি প্রজাদের দৃষ্টিভঙ্গীও যাতে খুব স্বচ্ছ হয় তার জন্য মনু এই রাজধর্ম তৈরী করে দিলেন। এই রাজধর্ম যে মনুই তৈরী করে গেছেন তা নয়, আমাদের ঋষিরা তাঁদের গুহ্য পবিত্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এবং

অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছিলেন সমাজ ও দেশের সবার মঙ্গলের জন্য রাজাকে এইভাবে চলতে হবে, এই এই ধর্ম তাকে পালন করতে হবে, এটাই পরে রাজধর্ম রূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রাজাকে কখন মানুষ বুদ্ধি করতে নেই, রাজা রাজাই, কারণ কিছু দেবতার শক্তি ও গুণ রাজার ভেতরে বিদ্যমান। কোন বালকও রাজাকে অবজ্ঞা করতে পারে না। যার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির কোন কার্টুন করা হয় না। কারণ ভারতের রাজা হলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাজা নন।

রাজার ধর্মই হল দুষ্টির দমন শিষ্টির রক্ষণ। সেইজন্য ডাঙাই রাজার প্রধান ধর্ম। বলছেন শিষ্ট লোক যখন ঘুমিয়ে থাকে ডাঙা তখন জেগে থাকে। জেগে থাকা ডাঙাই সব কিছু চালায়। রাজা যদি এই ডাঙা ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ না করতে পারে তাহলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে। মনু এখানে খুব দামী একটা কথা বলছেন – স্বভাবতই মানুষ কখন ভালো হয় না, সুযোগ পেলেই সে বদমাইশি করবে। রাজাকে সেই কারণেই ডাঙার উপযুক্ত ব্যবহার করতে হয়। ডাঙার ভয়েই বেশীর ভাগ মানুষ ঠাণ্ডা থাকে। মানুষের এই স্বভাব ঠিক হয় তখনই যখন সে একত্ব দর্শন করে, সর্বভূতে সে নিজেকে দেখে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখে। অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মানুষ স্বভাবতই সৎ হয়ে যায়, তখন কে তাকে দেখছে, কে দেখছে না, কে লক্ষ্য রাখছে, কে লক্ষ্য রাখছে না, কোন দিকেই তার আর দৃষ্টি থাকে না, সব সময়ই সে সৎ থাকে। মনু এঁদের জন্য শাস্ত্র লিখছেন না, এগুলো সব গৃহস্থদের জন্য লিখছেন।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়ও রাজধর্মেরই একটা অংশ। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যখন কোন বিবাদ হবে, অন্যায় হবে তখন রাজা কি ভাবে বিচার করে দণ্ড বিধান করবে। আমরা এর আগেও বলেছি যে, মনুসূত্রেতে সব কিছুই মিলিয়ে মিশিয়ে আছে, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড, সংবিধান সব কিছুই এখানে আছে আর তার সঙ্গে ধর্ম কিভাবে পালন করতে হবে সেটাও বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে প্রায় চারশটির মত শ্লোক আছে, আর রীতিমত বড় অধ্যায়। কিন্তু এর বেশীর ভাগই এখন আর আমাদের কাজে লাগে না, কারণ অনেক দণ্ডের বিধান এখন উঠেই গেছে আর বাস্তবে চলেও না।

বিবাদের কারণ

মনু এই অধ্যায়ের প্রথমের দিকেই উল্লেখ করে দিচ্ছেন কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাদ হতে পারে। যখন একজন আরেকজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে, কেউ কারুর কাছে কিছু গচ্ছিত রেখেছে তারপর সে আর সেটা ফেরত পাচ্ছে না, একজন একটা জিনিষের মালিক নয় কিন্তু বিক্রী করে দিয়েছে, যখন অনেকজন মিলে কোন ব্যবসা করছে এইভাবে মনু একটা তালিকা তৈরী করে দিয়েছেন কোন কোন পরিস্থিতিতে বিবাদ হতে পারে। এছাড়া যদি কেউ কারুকে কিছু দান করেছে, পরে দেখা গেলে লোকটি এই দানের উপযুক্ত নয়, তখন তার থেকে ওই দান ফেরত চাইতে গেলে ঝগড়ার একটা কারণ হয়। কর্মচারীদের প্রাপ্য মাইনে ঠিক সময়ে না দেওয়া হলে বিবাদের কারণ হবে। যদি চুক্তিপত্র না মানা হয় সেটাও বিবাদের কারণ হবে। মাল কেনা-বেচা নিয়েও বিবাদ হয়, নিজের জমি-জমার সীমানা নিয়ে বিবাদ, মারপিট করলে, কেউ কাউকে গালাগাল দিলে বা কটু কথা যদি কাউকে বলে থাকে, চুরি ডাকাতি, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, পর পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী যদি সম্পর্ক রাখে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে, পৈত্রিক সম্পত্তির বিভাজন, জুয়া খেলা এগুলো সবই বিবাদের কারণ। মনু আঠারোটি অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলছেন এই আঠারোটি অবস্থায় বিবাদের সম্ভবনা থাকবে। এই আঠারোটি বিবাদের মীমাংসার জন্য রাজাকে বিধান দিতে হয়। এরপর একের পর এক মনু বলে যাবেন, এই বিবাদ হলে এই রকম দণ্ড, এই রকম হলে এই দণ্ড ইত্যাদি। মনু যে দৃষ্টিতে এই দণ্ড বিধানকে দেখেছেন বর্তমান কালেও আইনী ব্যবস্থা মোটামুটি মনুর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আধার করেই চলছে।

মনুসংহিতাতে অতিসাহস কথার অর্থ সর্বোচ্চ অপরাধ। যদিও এখন ফাঁসির আদেশ খুব একটা দেওয়া হয় না, কিন্তু যখন দেওয়া হয় তখন এর একটা টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করা হয়, বলা হয় rarest of the

rare cases। বিরলতমের বিরল অপরাধ না হলে ফাঁসি দেওয়া হয় না। ফাঁসি তখনই দেওয়া হবে যখন বলবে rarest of the rare cases। অতিসাহস ওই অর্থেই হয় – বিরলতম অপরাধ। ডাকাতি করা, খুন করা, আগুন লাগিয়ে দেওয়া মনুসংহিতার মতে এগুলো অতিসাহস। অতিসাহসের শাস্তিটাও সর্বোচ্চ শাস্তি হবে। অষ্টম অধ্যায়ের বারো নম্বর শ্লোকে প্রথমেই ঠিক করে দিচ্ছেন, যে সভায় ন্যায় বিচার করা হবে সেই সভার পরিবেশ এবং অন্যান্য সব কিছু কি রকম হতে হবে –

বিচারসভায় অধর্মের ফল

ধর্মো বিদ্বস্ত্বধর্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।

শল্যধ্বংস্য ন কুন্তন্তি বিদ্বাস্তত্র সভাসদঃ।।৮/১২

একটা সভা যেখানে অধর্ম ধর্মকে বিদ্ধ করে দিচ্ছে, অসত্য ভাষণের দ্বারা সত্যধর্মকে নাশ করে দেওয়া হচ্ছে, যেটা আজকাল আমাদের বিচারালয়ে হয়ে থাকে, উকিলরা নিজেদের মক্কেলকে বাঁচানোর জন্য এমন মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যার দ্বারা তারা সত্যধর্মকে বিদ্ধ করে দিচ্ছে। তখনকার দিনে যখন কোন বিচার হত সেখানে তখন ব্রাহ্মণরাই থাকতেন, গ্রামে কোন বিবাদ হলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণরাই মীমাংসা করে রায় দিতেন। রাজার যাঁরা মন্ত্রী হতেন তাঁরাও ব্রাহ্মণ হতেন। বলছেন, যে সভাতে ধর্মকে বিদ্ধ করে দেওয়া হয়, সত্যের উপর অসত্য একেবারে ছেয়ে যায়, সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণরা যদি এই অসত্য ও অধর্মকে দূর করে অন্যায় ভাবে যে নিরীহ ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হচ্ছে তাকে রক্ষা না করতে পারে তখন ওই সভাতে যে ব্রাহ্মণরা উপস্থিত থাকবেন তাঁরা ওই অধর্মরূপ শল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে উল্টে পড়ে যাবেন। ব্রাহ্মণ বলতে এখানে জ্ঞানী পুরুষদের বোঝান হচ্ছে। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি অধর্ম হচ্ছে দেখেও চুপ করে থাকেন, কোন প্রতিকার যদি না করেন তাহলে অন্যায় ভাবে সাজা দেওয়ার সব পাপ জ্ঞানীর লাগবে। বেশীর ভাগ উকিলরা আজকাল তাই করছে। সেইজন্য ঠাকুর উকিলের দেওয়া জিনিষ নিতে পারতেন না। মনু এই জিনিষকে একেবারেই বরদাস্ত করতেন না, তুমি জানো তোমার চোখের সামনে একজন অধর্ম করছে কিন্তু তুমি এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করছো না, মনু একে মহৎ পাপ বলছেন।

ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাকে রক্ষা করে

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোহবধীৎ।।৮/১৫

যদি কেউ নিজের ধর্মকে নাশ করে তাহলে সেই ধর্মই তাকে নাশ করে দেবে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা ধর্ম আছে, যেমন একজন সন্ন্যাসীর জন্য সন্ন্যাস ধর্ম, গৃহস্থের জন্য গৃহস্থ ধর্ম। সন্ন্যাসী যদি এখন সন্ন্যাস ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকেন তখন এই নষ্ট হওয়া ধর্মই সন্ন্যাসীকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাবে। ধর্মকে যে রক্ষা করে চলছে, ধর্মই তাকে সব দিক থেকে রক্ষা করবে। তার মানে দাঁড়াল, আমি যখন আমার ধর্মকে রক্ষা করছি তখন ধর্মই আমাকে রক্ষা করবে আর আমি যদি ধর্মকে রক্ষা না করি তখন এই নষ্ট হওয়া ধর্মই আমার সব কিছু নাশ করে দেবে। সেইজন্য প্রত্যেককেই নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাটা খুব দরকার। একজন ডাক্তারের ধর্ম হল রোগীকে চিকিৎসার দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা করে তার রোগকে নিরাময় করা, আর এর জন্য সে কিছু পারিশ্রমিক পাচ্ছে। ডাক্তারের উদ্দেশ্য যদি অর্থ রোজগার করা হয়, আর সেই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে গিয়ে রোগীকে ঠকায়, সেবা-শুশ্রূষা আর চিকিৎসায় অবহেলা করে শুধু যদি টাকাই গুনতে থাকে, তার মানে ডাক্তার তার ধর্মটাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে ধর্মটা নষ্ট হয়ে গেল, এই নষ্ট ধর্মটাই আস্তে আস্তে ডাক্তারকে শেষ করে দেবে। কি ভাবে নষ্ট করে দেবে সেটা মনু বর্ণনা করছেন না। হয়তো দেখা যাবে মদ খেতে শুরু করে দিল, তা নাহলে জুয়া খেলতে শুরু করে দিল, মাথা খারাপ হয়ে গেল এই রকম অনেক কিছু হতে পারে। যখনই দেখা যায় কারুর জীবনে খুব অশান্তি আর দুর্ভোগ চলছে, তার কিংবা তার বাড়ির লোকেরদের প্রচুর অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, অঘটন ঘটছে, বুঝবেন কোথাও ধর্মকে অবহেলা করা হয়েছে। যে ধর্ম আমাকে রক্ষা করবে সেই ধর্মকে অবহেলা করলে সেই ধর্মই আমাকে মারতে শুরু করে দেবে। ভারতকে এই জন্যই বলা হয়

ধর্মপ্রাণ দেশ। বর্তমান যুগের লেখকরাও স্বীকার করেন ভারত হল পৃথিবীর সব থেকে ধর্মপ্রাণ দেশ। ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ শুধু এই সব কারণে।

কারুর খুব রোগ-ব্যাদি হলে অনেককে বলতে শোনা যায় – যত পাপ কর্ম করেছিলে সেগুলো এখন ফেটে বেরোচ্ছে, যাও সত্যনারায়ণের পূজা দাও। আমরা যেটা ভুল করি তা হল, আমরা মনে করি সে পাপকর্ম করেছে তাকে এবার মরতে দাও, আমরা সাহায্য করতে যাবো না। কিন্তু স্বামীজী এই ধরনের সঙ্কীর্ণ নেতিবাচক মনোভাবকে প্রচণ্ড নিন্দা করছেন। স্বামীজী বলছেন, তার পাপের জন্য আজ তার এই দুরবস্থা, তুমি এগিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য কর তাতে তার কিছু না হলেও তোমার কর্মটা ঠিক হবে।

সেইজন্য বলছেন *তস্মাদ্বর্মো ন হন্তব্যো*, নিজের ধর্মকে কখন নাশ করবে না। আপনি নিজেই নিজের ধর্ম ঠিক করে নিয়ে বলতে পারেন আজ থেকে এটাই আমার ধর্ম। আর একটা আছে আপৎধর্ম, একটা বিশেষ পরিস্থিতি হয়ে গেছে, আমার প্রাণ সংশয় হয়ে গেছে, এই অধর্ম না করলে আমার প্রাণ বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। তখন সেটা আপাত দৃষ্টিতে অধর্ম হলেও করে নিতে হবে, প্রায়শ্চিত্ত পরে করে নেওয়া যাবে। এই আপৎধর্ম ছাড়া নিজের ধর্মকে কখনই ছাড়তে নেই। অধর্মের এটাই নিয়ম প্রথমে খুব ভালো ফল দেবে। ঠাকুর বলছেন, সুন্দরী কাঠ প্রথমটায় হুশ করে জ্বলে উঠবে, তারপর পেছন থেকে এমন জল বেরোতে থাকে যে পুরো আগুনটাকেই নিভিয়ে দেয়। শুধু যে মনু বলছেন তা নয়, ঠাকুরও বলছেন। পরে অধর্ম এমন মার মারতে শুরু করে যে সে বুঝতেই পারে না কেন এমন হচ্ছে। মানুষের রক্ষা হয় সব সময় ধর্ম থেকে। যারাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করেছে, সকাল বিকেল পূজো করেছে, জপ-ধ্যান করেছে, দান করেছে এরা সবাই সুরক্ষিত।

মা নো ধর্মো হতোহবদীৎ, এমন কি যে যদি দেখা যায় কেউ অসত্য ভাষণ দিচ্ছে তাকেও ধমক দিয়ে তার ধর্মকে রক্ষা করা। যে কোন পরিস্থিতিতে ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। ধর্মকে কখনই ডান দিক বাম দিক যেতে দিতে নেই। ঠাকুর বলছেন – দেখো! গ্রামে কোন বিবাদ হলে বিচার করবে বলে বিশ ক্রোশ দূর থেকে পালকি পাঠিয়ে দেয় রোগ-প্যাটকা এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসার জন্য। গ্রামের লোক জানে এর হাতেই ধর্ম ঠিক থাকবে। *ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ*, যিনি নিজের ধর্মকে রক্ষা করেন ধর্মই তাঁকে রক্ষা করে, যিনি নিজের ধর্মকে নাশ করেন, সেই নষ্ট ধর্ম সেই মানুষকেই নাশ করে দেবে, এটাও মহাভারতের শ্লোক। সেইজন্য প্রথমে বুঝে নিতে হয় আমার ধর্মটা কি। স্বধর্মের পরিভাষা কি হবে সেটা আবার ঠিক হয় বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম এই রকম কয়েকটি ধর্মকে মিলিয়ে। অবস্থা বিশেষে কার কি কাজ করতে হবে সেগুলো মিলিয়ে ঠিক হয় স্বধর্ম। তারমধ্যে আবার সামান্য ধর্মও আছে, যেটা প্রত্যেক মানুষকে করতে হয়। প্রচুর অধর্ম করে যারা মনে করছে আমাকে আর কে দেখতে পাচ্ছে, সব কিছুতো ভালোই হচ্ছে, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী সব লক্ষ্য রাখছেন, একটা সময়ের পর ঠিক আমাদের মারবেন, অন্তর্যামী ছাড়বেন না। আর শুধু যে একবারই মারবেন তা নয়, কারণ পাপকর্ম, অধর্ম যে করা হয় তারও অনেক স্তর আছে, যেমন গর্হিত কর্ম, অতিগর্হিত কর্ম। অতিগর্হিত কর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। যেমন কাউকে খুন করে দিল, কিংবা নিজেই বিষপান করে নিল, এর ফল সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। আর যদি গর্হিত কর্ম, যেটা একটু কন্মের দিকে, এর ফল যে কবে দেবে তার কোন ঠিক নেই, এই জন্মে দেবে, না বুড়ো বয়সে দেবে, না পরের জন্মে দেবে কোন ঠিক নেই। সেইজন্য ছোটখাট ভুলগুলোই বেশী গোলমালে। সামান্য দোষগুলো একটু প্রায়শ্চিত্ত করে নিলে মিটে যায়, কিন্তু গর্হিত কর্ম যে কবে ফল দেবে বলা খুব মুশকিল। এরপরে বলছেন –

বৃষভ ও বৃষল

বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।

বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্বর্মং ন লোপয়েৎ।।৮/১৬

ধর্মকে বৃষ বলা হয়। যার জন্য ভাগবতেও ধর্মকে বৃষভ বলা হয়েছে। বৃষ মানে, যে কামনা পূর্তি করে। তাই যে ধর্ম পালন করে তার সব মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। অন্য দিকে যে ধর্মের নাশ করে তাকে বৃষল

বলে। বৃষল মানে যে সব কিছু কেটে দেয়। শূদ্রের মানেও তাই, যে ধর্ম পালন করে না। মনুর মতে শূদ্র তাকেই বলা হয় যে ধর্ম পালন করে না। আমরা জন্মগত ভাবে যে শূদ্রের কথা বলি মনুর কাছে সেইভাবে কেউ শূদ্র হয় না। মনু বিক্ষিপ্ত ভাবে কোন কিছুকে নেন না, যেটাই তিনি নিয়েছেন সেটাকে সামগ্রিক রূপেই নিয়েছেন। সামগ্রিক রূপে নেওয়ার ফলে কি হচ্ছে? গীতায় ভগবান বলছেন গুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মহতিজায়তে, যাঁরা যোগ সাধনা করছেন তাঁরা ভালো বংশে গিয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। তাই যারা ভালো কর্ম করেছে তারা ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়। অন্য রকম কর্ম করলে অন্যান্য জায়গায় গিয়ে জন্ম নেয়। আর যে কোন ধর্মই পালন করে না সে শূদ্র বংশে জন্মাবে, কারণ তার কোন দায়-দায়ীত্ব নেই। শূদ্রদের তো বলেই দেওয়া হয়েছে তোমার কোন দায়-দায়ীত্ব নেই, যা খুশী তোমার করতে পার, যার মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হবে খাও, যত খুশী বিয়ে করার কর। কিন্তু তার জন্য তুমি কোন সুযোগ সুবিধাও পাবে না। যদি তুমি উপরে আসতে চাও তাহলে তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটে বর্ণের লোকদের সেবা কর। কথা হল এই প্রথা কতটা ঠিক কতটা ভুল এই নিয়ে আমরা আলোচনা করতেই পারবো না। তার কারণ হল মনুর এই সিদ্ধান্তগুলো পুনর্জন্মের ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। মনুকে অস্বীকার করার অর্থই হল পুরো হিন্দু ধর্মকে অস্বীকার করা। সমস্যা হল বাইরে এই সব কথা বলা যায় না, বললে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কারণ শূদ্রের সংজ্ঞাটাই অত্যন্ত গোলমালে। মনু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যারা কোন ধর্মাচরণ করে না তারাই শূদ্র। কিন্তু কোন শূদ্র যদি ধর্মাচরণ করে তখন কি হবে? মনু এই ব্যাপারেও পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, যে শূদ্র ধর্মাচরণ করে একজন ব্রাহ্মণের যে গতি হয় তারও একই গতি হবে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মনু যখন শূদ্রের এই সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তখন ভারতে বাইরে থেকে অনেক বিদেশী জাতিদের অনুপ্রবেশ হচ্ছিল, এদেরকে তো সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাঙ্গনে বসানো যাবে না। তার জন্য তাদের সময় দিতে হবে, সেইজন্য মনু এই জিনিষগুলো করে গিয়েছিলেন। সেইজন্য বলে দিলেন তারাই বৃষল যারা ধর্মের আচরণ করে না, ধর্মকে যারা জীবন চর্চা থেকে সরিয়ে দিয়েছে তারাই শূদ্র। পরের শ্লোকটিও খুব সুন্দর –

মানুষের একমাত্র সুস্থতা তার ধর্ম

এক এব সুহৃদ্বর্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্বি গচ্ছতি।।৮/১৭

এই জগতে তোমার একমাত্র বন্ধু হল ধর্ম। তোমার ধর্ম ছাড়া আর কেউই তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়। কারণ মৃত্যুর পর ধর্মই তোমার অনুগামী হবে, বাকি সব কিছু এখানেই থেকে যাবে। বাকি মানে, তোমার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, আত্মীয়, সম্পত্তি সব কিছুকে বোঝাচ্ছেন। যেমনি তোমার মৃত্যু হল সঙ্গে সঙ্গে সব তোমার খসে পড়ে গেল। তুমি যখন মরবে তখন ধর্মই একমাত্র তোমার সাথে হাটতে হাটতে যাবে। এই ধর্মই তোমাকে বিভিন্ন লোকে নিয়ে যাবে, সেখানে তোমাকে বিভিন্ন ফল দেবে। ধর্মই সেখান থেকে আবার তোমাকে নতুন জন্মের দিকে নিয়ে আসবে। সেইজন্য তুমি ধর্মেই মন দাও, ধর্মের আচরণ করে ধর্মকে লালন পালন কর।

নানা রকম কথা বলতে গিয়ে একটা জায়গায় মনু বলছেন, যে রাজ্যে শূদ্র বিচার করে সেই রাজার রাজ্য কাদায় নিমগ্ন গরুর মত দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে যায়। এখানে জন্মজাত শূদ্র বলছেন না, শূদ্র বলতে এখানে বোঝাচ্ছেন অশিক্ষিত ও অসংস্কৃত ব্যক্তি। বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সব কিছুকে খুব সহজে বিশ্লেষণ করা খুব মুশকিল। স্বামীজীও বলছেন বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এরা একজন উপর আরেকজনের খুব প্রভুত্বশালী হয়। স্বামীজী সারা বিশ্ব থেকে অনেক গুলো উপমা দিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে অমুক দেশে ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্রে চলে গেছে, অমুক দেশে শূদ্র থেকে আবার ক্ষত্রিয়ে চলে গেছে। এগুলোকে সহজীকরণ করা খুব মুশকিল। ভারতের বিচার ব্যবস্থা যাদের হাতে আছে সেখানে পড়াশোনা করা বিদ্বান লোকেরাই যাচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থায় যে অসাধুতার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এগুলো সবই শূদ্রের আচরণ। জজ সাহেবদের আমরা ব্রাহ্মণ বলব না কি শূদ্র বলব এটা বলা খুব মুশকিল। শিক্ষা-দীক্ষা থেকে জজ সাহেবরা অবশ্যই ব্রাহ্মণ, কারণ তাঁরা সবাই আইন পরীক্ষায় পাশ করেছেন, জুডিসিয়ারি

পরীক্ষা পাশ করতে হয়েছে আর ওই স্তরে যাওয়ার জন্য বাড়িতে একটা পরিবেশ ও পারিবারিক সংস্কৃতি থাকা চাই। কিন্তু তারপরেও সংবাদপত্রে বিচার ব্যবস্থার যেসব খবর উঠে আসছে সেগুলোকে আমরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণোচিত আচরণ বলে মানতে পারবো না।

বিচার করার সময় বিচারককে কি কি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে

বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্।

স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ।।৮/২৫

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।

নেত্রবক্তৃবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেহন্তর্গতং মনঃ।।৮/২৬

এখানে মানুষের মনস্তাত্ত্বিকের পুরো ব্যাপারটাকে ছোট্ট একটা শ্লোকের মধ্যে (৮/২৬) রেখে দিয়েছেন। যাদের তুমি বিচার করছ তাদের মনটাকে ধর। কিভাবে ধরবে? আকার – তার ভঙ্গিমাটা কেমন, ইঙ্গিত – তার চালচলন কেমন, গমনভঙ্গি – তার হটাচলাটা কেমন, সোজা হাটছে কিনা, চেষ্টা – তার শরীরের নড়াচড়া কেমন, কথা বলার ভঙ্গি, তার চোখের চাহনিটা ভালো করে দেখ, মুখের বিকার দেখ। এই জিনিষগুলো দিয়ে মানুষের মনের ভাব ধরা পড়ে। তার আগের শ্লোকে (৮/২৫) এটাই বলছেন – গলার স্বর, কথা বলার সময় ঘাবড়ে যাচ্ছে কিংবা বড্ড বেশী গলা কাঁপছে কিংবা তোতলাচ্ছে এগুলোতে বোঝা যায় কিছু গোলমাল আছে। এছাড়া তার মুখের ভাবটা দেখ, মুখটা কি উদাস দেখাচ্ছে, নাকি মুখে হাসি আছে। ইঙ্গিত মানে চোখের চাহনি, সরাসরি চোখের দিকে তাকাচ্ছে, নাকি চোখের দৃষ্টিটা একটু নীচের দিকে। শরীরটা কাঁপছে কিনা, কিংবা ঘেমে যাচ্ছে কিনা, রোমগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিনা, এগুলোকে বলা হয় আকার। চেষ্টিত বলতে বোঝায়, লোকটির শারীরিক ভাষা, কথা বলার সময় অযথা হাত রগড়াচ্ছে, আঙুল ফাটাচ্ছে। বলছেন এগুলো দিয়ে অর্থিপ্রত্যার্থিসাক্ষি, অর্থাৎ যে অভিযোগ করেছে, অভিযুক্ত আর সাক্ষী এই তিনজনকে এই জিনিষগুলো দিয়ে ভালো করে অধ্যয়ন করবে। আমাদের এখানে বিচারকরা দেখেন কাগজে কি আছে দুই পক্ষের উকিলরা কি কি সওয়াল করেছে এগুলোর উপর রায় দেবেন। মনু ওই দিক দিয়েই যাচ্ছেন না, বলছেন তুমি আগে তার শরীরের ভাষাটা লক্ষ্য কর, লক্ষ্য করে বোঝার চেষ্টা কর এরা আদৌ কোন গোলমাল করেছে কিনা আর গোলমাল করে থাকলে কি গোলমাল করেছে। এই নিয়ে সত্যিকারের একটা বিখ্যাত কাহিনী আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একবার ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের যৌথ বাহিনী জার্মানিকে আক্রমণের জন্য অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছে। একটা সময় যৌথ বাহিনীর প্রধানরা লক্ষ্য করলেন যে তাদের সব খবর জার্মানির কাছে চলে যাচ্ছে। কারণ চারিদিকে গুপ্তচরদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে। আমার কথা আপনার কাছে আছে, আবার আপনার কথা যে আমার কাছে চলে আসছে সেটার খবর আপনার কাছে যাচ্ছে, আবার আমার খবর আপনার কাছে চলে গেছে সেটা আমি জানি, মানে বিশাল নেটওয়ার্কিং থাকে। যৌথ বাহিনীর সেনাপ্রধানরা অনেক করে ধরার চেষ্টা করছে কোথা থেকে, আর কিভাবেই বা আমাদের সব খবর জার্মানিদের কাছে আগে থাকতেই চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের আশেপাশে রয়েছে যে জার্মানির লোক। একটা সময় এরা একজনকে সন্দেহ করছে যে, এই লোকটিই জার্মানির গুপ্তচর। যেখানকার কথা হচ্ছে সেখানকার লোকেরা কেউ জার্মান ভাষা জানেনা। এবার ঐ সন্দেহভাজন লোকটিকে সেনা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে, আনার পর ওর উপর এক নাগাড়ে জেরা করে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হল আপনি কি জার্মান? লোকটি বলল আমি জার্মান ভাষাও জানিনা। জেরার পর বেরিয়ে এল, লোকটি গত কুড়ি বছর ধরে ঐ অঞ্চলেই বসবাস করছে। মানে যখন থেকে ওখানকার লোকেররা ওকে জানে তখন থেকেই সে ওখানে আছে। ঐ অঞ্চলের সব কিছুই তার নখদর্পণে, ওখানকার চাষবাস, আবহাওয়া কখন কেমন হয়, সব কিছুই ওর জানা। একা একা থাকে, কিন্তু জানে সব কিছু। কোন ভাবেই বোঝা যাচ্ছে না যে লোকটি একটি গুপ্তচর, মানে জার্মানির সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই এটা ও প্রমাণ করে দিয়েছে। এই ভাবে দিনের পর দিন ওকে সকালে ডাকা হয়, সারাদিন জেরা করে বিকেলে ছেড়ে দেওয়া হয়। যতই ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি জার্মান কখন গিয়েছ, জার্মান ভাষা

জানো কিনা, বারবার সে না বলেই যাচ্ছে। আসলে লোকটি কিন্তু জার্মানদেরই গুপ্তচর ছিল। অনেক দিন আগেই একে জার্মান সৈন্য বিভাগ থেকে ঐখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন প্রয়োজন হবে তখন তাকে কাজে লাগান হবে। এদিকে সবাই মোটামুটি হাল ছেড়েই দিয়েছে, কিছুতেই প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে লোকটি গুপ্তচর। শেষ দিন যৌথ বাহিনীর অফিসার বললেন আজকে আমার শেষ একটা বাণ ওকে মারব, ঐটাকে যদি ও কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে ওর কাছে মিথ্যে সন্দেহ করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দেব। সেইদিন ছিল শেষ জেরা, সব জেরাটো হয়ে যাবার পর অফিসার তার শেষ বাণটা মেরেছে, হঠাৎ লোকটাকে জার্মান ভাষায় বলল – তোমার কোন দোষ নেই, তুমি যেতে পার। বলেই লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে ওর চোখের পাতাটা আনন্দের অভিব্যক্তিতে ঠক্ করে নড়ে উঠল। অফিসারের ওই একটি কথাতেই লোকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ওতো ভালো করে জানে যদি ধরা পড়ে যাই সোজা ফায়ারিং স্কোয়াডে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কাহিনীটার শেষ লাইনটা হচ্ছে – তারপরে সেই মুহূর্ত থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডে যাওয়া পর্যন্ত তারা জার্মান ভাষাতেই কথা বলল। চোখটা একটু নড়েছে তাতেই ধরা পড়ে গেছে। এতদিন বলে আসছিল আমি জার্মান ভাষা জানিনা, কিন্তু যাই ওকে জার্মান ভাষায় বলা হল, তুমি মুক্ত, মানে অতটা টেনশান তৈরী করার পরে হঠাৎ করে টেনশানটা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে ছাপ পড়ে গেছে। ব্যস্, ফায়ারিং স্কোয়াড ছাড়া আর কোন পথ নেই। বলা হচ্ছে তারপরে আর কোন ভাণ করেনি যে সে জার্মান জানেনা।

মনুও জানতেন মানুষ যতই কায়দা মারুক, ভেতরের পাপকে কিন্তু সেই কখনই চেপে রাখতে পারবে না, ও বেরোবেই। সেইজন্য বিচারের রায় দেওয়ার আগে সব দিক দেখতে হয়। গোয়েন্দারাও যখনই কোন সন্দেহভাজন কাউকে তুলে নিয়ে জেরা করে তখনও এই জিনিষগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকে। শুধু যে ডাঙা মেরে কথা আদায় করে তা নয়, ওদের অনেক রকম পদ্ধতি আছে কথা বার করার। মনু বলছেন তার মুখের কথা শুনে তাকে বিচার করবে না, তার ভেতরে কি চলছে সেটাকে ধরবার চেষ্টা কর আর সেই অনুযায়ী বিচার কর। পরের শ্লোকে রাজার উপর দায়ীত্ব দিয়ে মনু বলছেন –

রাজার কয়েকটি দায়ীত্ব

বালাদায়াদিকং রিক্খং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।

যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ।।৮/২৭

যদি কোন শিশু অনাথ হয়ে যায়, রাজা তখন সেই অনাথ বালকের ধনসম্পত্তি তত দিন নিজের কাছে রেখে বিশেষ ভাবে রক্ষা করবেন যতদিন সেই বালক বেদ অধ্যয়ন করে গুরুগৃহ থেকে গৃহস্থশ্রমে এসে সংসার ধর্মে রত না হয় বা যতদিন না সে নাবালক থেকে সাবালক হচ্ছে। রাজাকে নিশ্চিত করতে হবে এই অনাথ শিশুর সম্পত্তিতে যেন কেউ হাত না দেয়। পরের শ্লোকটিও খুব সুন্দর –

বশাহপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।

পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ।।৮/২৮

যদি কোন স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, বিয়ে করেছে কিন্তু সন্তান হয়নি, সন্তান ছিল মারা গেছে, পতিব্রতা বিধবা, মানে স্বামী মারা গেছে কিন্তু আর বিয়ে করেনি আর রুগ্না স্ত্রী যার কেউ নেই, এদের যা সম্পত্তি আছে রাজার দায়ীত্ব হল এই সম্পত্তিকে সব দিক থেকে রক্ষা করবে। অনাথ বালকের সম্পত্তি যে ভাবে রাজা রক্ষা করবে সেই ভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রী বন্ধ্যা হতে পারে, সন্তানহীন বিধবা হতে পারে, স্বামী পরিত্যক্তা হতে পারে, বা শুধু পতিব্রতা নারী হতে পারে যার স্বামী নেই অথবা রুগ্না স্ত্রী হতে পারে। অর্থাৎ যে কোন নারী সে যদি অসহায় হয় তার সম্পত্তি রক্ষা করা রাজার দায়ীত্ব।

রমাবাঈ সার্কেল আমেরিকাতে স্বামীজীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে বলেছিল – এরা সেই হিন্দুধর্মের প্রচার করছে যে ধর্ম বিধবাদের পীড়িত করে আসছে। স্বামীজী এর বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করতে রুচী বোধ করেননি।

কিন্তু তিনি যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেন তিনি স্বামীজীর হয়ে খুব কড়া একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি ঠিক এটাই লিখেছেন, মনু বিধবার সম্পত্তির ব্যাপারে একেবারে নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন – প্রথমে বাড়ির লোকরা বিধবার সম্পত্তি রক্ষা করবে। এরপর মনু রাজাকে নির্দেশ দিচ্ছেন বিধবার সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে। শুধু তাই না পরে বলছেন রাজা যদি বিধবার সম্পত্তি রক্ষা না করে তবে রাজার উপর দেবতাদের অভিশাপ লাগবে। এরপর বিধবাদের জন্য হিন্দুদের সূতি আর কি বলবে – বাড়ির লোকদের বলে দিচ্ছেন বিধবাকে ভালো ভাবে দেখবে, রাজাকে বলছেন বিধবাকে রক্ষা করবে, আর যদি না রক্ষা করতে পার তাহলে তোমার উপর দেবতার অভিশাপ লাগবে। এরপর রমাবাঈরা আর কি আশা করতে পার। আসলে হিন্দুরা বিধবাদের যে সম্মান দিয়েছে এই সম্মান কোন ধর্মে ধারে কাছে পাওয়া যাবে না। গরীব মানুষের উপর অত্যাচার প্রথম থেকেই হয়ে আসছে, আর গরীবের উপর অত্যাচার সব ধর্মে সব দেশেই হয়ে আসছে। অন্য দিকে লোভী মানুষ সব সমাজে, সব দেশেই পাওয়া যাবে। ভারতে কিছু লোভী ব্রাহ্মণ বিধবার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য নিয়ে এল সতীদাহ প্রথা, বিধবাকে পুড়িয়ে যদি সতী করে দেওয়া যায় তাহলে বিধবার সম্পত্তি আমাদের হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মের কোন সূতিতে কোথাও কোন বিধান নেই যে স্বামী মরে গেলে স্ত্রীকেও একই চিতায় পুড়িয়ে মারতে হবে। এগুলো তো দুষ্ট লোকের আচরণ। লোভী দুষ্ট এরা তো সব দেশে সব সমাজেই বাস করে, তার জন্য শুধু একা হিন্দু ধর্মকে কেন লক্ষ্য করে এত কথা বলা হচ্ছে? দুষ্ট, লোভীদের আচরণ দিয়ে কখনই ধর্মের বিচার হয় না। মনুসূতি এখানে একেবারে পরিস্কার, বিধবার সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজার। রাজা রামমোহন রায় যখন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তখন তিনি মনুসূতির এই বিধান গুলোকেই তুলে ধরেছিলেন।

জীবন্তীনাস্ত তাসাং যে তদ্ধরেষুঃ স্ববান্ধবঃ।

তান্ত্রিয্যাচৌরদণ্ডেন ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।।৮/২৯

এর আগে যে কজন স্ত্রীদের কথা বলা হল, যদি তাদের সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনরা এই ধরণের জীবিত স্ত্রীদের সম্পত্তি রক্ষণের নাম করে বা অন্য কোন বাহানা করে যদি তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তাহলে রাজা এদের চোরের যা শাস্তি হয় সেই শাস্তি দেবে। চোরের আবার ছোট বড় আছে, কি পরিমাণ টাকা চুরি করেছে, কি ধরণের জিনিষ আর কত মূল্যের জিনিষ চুরি করেছে সেই অনুযায়ী তার শাস্তিও সেই রকম হবে। এখানে কিন্তু কোন ছাড় দেওয়া হবে না, যদিও সে বলে আমি তো রক্ষা করতেই চেয়েছিলাম, আমি ওর ভালোর জন্যই বেচে দিয়েছি, এই সব কথা বলে ছাড় পাবে না।

কারা সাক্ষী হতে পারবে না

এরপর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাজা সম্পত্তির ব্যাপারে কি কি করবে এক এক করে বলে যাচ্ছেন। যেমন কারুর সম্পত্তি অনেক দিন পড়ে ছিল রাজা একটা সময় পর্যন্ত সেই সম্পত্তিকে কিছু দিনে সামলে রেখেছেন। তারপর যদি কেউ এসে দাবী করে, সেই ক্ষেত্রে রাজা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবে সত্যিই সে এই সম্পত্তির দাবীদার কিনা। এরপর সাক্ষীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা কিভাবে হবে বলছেন। কারা কার সাক্ষী হতে পারবে না বলতে গিয়ে মনু তখন নিজে বলছে – কারিগর, কারিগর বলতে এখানে কামার মিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি। নট, যারা নাচ-গান করে বেড়ায়, বৈদিক ব্রহ্মচারী আর সন্ন্যাসী, এদের কখনই যেন সাক্ষী না বানায়। লৌকিক ব্যবহারের দিক দিয়ে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের এই সব ব্যাপারে বিরক্ত করতে নেই। কিছু পেশার লোক আছে যারা একটু নীচু শ্রেণীর, এদের মনটা নীচের দিকে থাকে, এদেরকে সাক্ষী বানাবে না। যারা দাস বৃত্তিতে নিযুক্ত, ক্রীতদাস ইত্যাদি যে কোন দাসই হোক এদেরকে সাক্ষী নিয়োগ করবে না। চোর, লোকনিন্দিত, যে ক্রুত কর্ম করে এদের সাক্ষী বানাবে না, এদেরকে সাক্ষী হিসাবে মানাই হবে না। কোর্টে যে কোন লোককে সাক্ষী করে নিয়ে গেলে হবে না। এই প্রকার কিছু লোকদের বিশ্বাস করা যায় না। খুব বৃদ্ধ যদি হয়, বাচ্চা ছেলে যদি হয় তাহলেও বিশ্বাস করবে না। এই ধরণের অনেক নাম করে যাচ্ছেন যাদের সাক্ষী বানাতে নিষেধ করা হচ্ছে। এখন তো যে দেখে নিয়েছে তাকেই সাক্ষী বানিয়ে নেওয়া যায়।

সাক্ষীর কথা বলতে গিয়ে একটা শ্লোকে খুব মজার ব্যাপার বলছেন, যদি কোন নারীর ব্যাপারে বিচার চলে সেই ক্ষেত্রে নারীকেই সাক্ষী বানাবে। দ্বিজের ক্ষেত্রে দ্বিজকেই সাক্ষী করতে হবে। যারা শূদ্র তাদের জন্য শূদ্র সাক্ষী আর চণ্ডালের ক্ষেত্রে চণ্ডাল সাক্ষী। এইভাবে সাক্ষী হলে বিচারটা ভালো হয়। একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে সাক্ষী হয় তখন সেই বিচার কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াতে বলা খুব মুশকিল। ঠিক তেমনি শূদ্রের ক্ষেত্রে যদি ব্রাহ্মণ সাক্ষী হয় সেখানেও গোলমাল হতে বাধ্য। সেইজন্যই বলা হচ্ছে যে জায়গাতে নিজেকে স্বস্তি অনুভব করে, এখানে আমি নিজেকে সহজ করে নিতে পারব, তারাই যেন সাক্ষী হয়। কোন মহিলাকে নিয়ে একটা মামলা উঠেছে, সেখানে কোন পুরুষকে সাক্ষী নেবে না, পারলে স্ত্রী যদি সাক্ষী হয় তাহলে ভালো।

আবার অন্য দিকে বলছেন – ঘরে যদি কিছু হয়ে থাকে, জঙ্গলে যদি কিছু হয়ে থাকে, চোর-গুণ্ডারা কোন আঘাত করে দিয়েছে, এই ধরনের ঘটনা যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে যেমন সাক্ষী পাবে সেই সাক্ষী দিয়েই বিচার করবে। একদিকে সবার জন্য একটা নিয়ম হয়ে গেল আবার অন্য দিকে বলে দিচ্ছেন এদেরকে সাক্ষী করবে না, যেমন ধরুন ঘরের ভেতরে ঝগড়া হয়েছে, ঘরের ভেতরে ঝগড়া হলে সেই রকম সাক্ষী তো পাওয়া যাবে না, তখন যাকেই সাক্ষী পাবে তাকেই নেবে। আবার এটাও বলে দিচ্ছেন যদি ভালো সাক্ষী না পাওয়া যায় তখন সাক্ষী না করতে যাদের নিষেধ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তখন তাদের মধ্যে থেকেই সাক্ষী নেবে। এরপর একটা শ্লোকে বলছেন –

পাপী কখনই পাপকে নুকোতে পারবে না

মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।

তাংস্ত দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বসৈবান্তরপুরুষঃ।।৮/৮৫

যে পাপী পাপ করে সে অনেক সময় মনে করে আমাকে পাপ করতে কেউ দেখেনি, কেউ আমাকে জানতে পারলো না। কিন্তু এর পরের পংক্তিতেই বলছেন দেবতারা দেখেন। আর আমাদের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে ভগবান, অন্তরাত্মা বসে আছেন তিনি সব কিছু ওই দেবতাদের মাধ্যমে জানতে পারেন।

দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং চন্দ্রার্কাগ্নির্যমানিলাঃ।

রাত্রিঃ সন্ধ্যা চ ধর্মশ্চ বৃত্তজ্ঞাঃ সর্বদেহিনাম্।।৮/৮৬

আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত জীবাত্মা, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় এবং ধর্ম এঁরা সবাই হলেন বেদেরই দেবী দেবতা, এঁদের সবারই মূর্ত রূপ আছে, এঁদের সবার সাথে আছে আবার তন্মাত্রা গুলো। বলছেন এই দেবতা ও দেবীরা আমাদের সব কাজের সাক্ষী, আমরা যা করছি শুভ অশুভ সব এনারা লক্ষ্য রাখেন। আমি কোন অশুভ কাজ করলাম, সেটা রাজা হয়তো জানতে পারল না, সমাজও হয়তো জানতে পারলো না, ভাবছি আমি রাজার কোপ থেকে বেঁচে গেলাম, সমাজের কোপ থেকে বেঁচে গেলাম। কিন্তু আমি বাঁচতে পারবো না, অন্তর্যামী সব দেখছেন কিনা, অন্তর্যামী ঠিক আমাকে মারবে। এর আগে যেটা বলা হল, পাপকর্ম করলে কোন না কোন ভাবে ঘুরিয়ে মারবেই, আজই মারুক আর কালই মারুক, বাঁচতে পারবে না। এর পরের শ্লোকটিও খুব সুন্দর এবং মজার –

সাক্ষীকে কখন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হবে

ক্রহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ক্রহীতি পার্থিবম্।

গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্ত পাতকৈঃ।।৮/৮৮

মনুর কাছে মূল্যবোধ জিনিষটা কখনই স্থিতিশীল নয়, ওনার কাছে মূল্যবোধ সব সময়ই গতিশীল। একই নিয়ম যে সবার ক্ষেত্রে সব জায়গায় প্রযোজ্য হবে এই জিনিষটা মনু জানেনই না, জানেনও না, বোঝেনও না আর মানবেনও না। Justice for all, কানুন অস্কা হ্যায়, এগুলো ভারতীয়দের একটা অদ্ভুত

ধারণা। মনু এই শ্লোকে বলছেন সবাইকে সমান ভাবে কখনই দেখা যায় না। ব্রহ্মীতি ব্রাহ্মণং, যদি ব্রাহ্মণ সাক্ষী থাকে তখন তাকে বলবে – বলুন কিভাবে হয়েছে। পৃচ্ছেৎ সত্যং, ক্ষত্রিয় সাক্ষী হলে বলবে – সত্যি কথা বল কি হয়েছে। ব্রাহ্মণক শুধু বলবে – বলুন। কারণ ধরেই নিচ্ছে ব্রাহ্মণ সত্যি কথাই বলবে। ক্ষত্রিয় ডান দিক বাম দিক করবেই। তাই যিনি ন্যায় দেবেন সেই বিচারক ক্ষত্রিয়কে বলবেন – সত্যি কথা বলুন। এবার সাক্ষী যদি বৈশ্য হয় তাকে বিচারক বলবেন – গরু, ধান, সুবর্ণ চুরি করলে যে পাপ লাগবে মিথ্যে কথা বললে তোমার সেই পাপ লাগবে, সেইজন্য সত্যি কথা বল কি হয়েছে। বৈশ্যের ক্ষেত্রে আরেক ধাপ নেমে গেলেন। সাক্ষী যদি শূদ্র হয় তাকে বলবেন – তুমি যদি মিথ্যা কথা বল তাহলে জগতের যত পাপ সব তোমার লাগবে, তাই সত্যি করে বল কি হয়েছে। মনু জানতেন, শূদ্র, যে এখনও সুশিক্ষিত নয়, ধর্মাচরণে ও সংস্কৃতিতে যে এখনও উন্নত হয় নি, এখনও সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে যদি শুধু বলা হয় – তুমি বল কি জানো এই ব্যাপারে। তখন সে নিজের মত করে একটা মিথ্যা কথা বলে দেবে। মনু ধরেই নিয়েছেন ব্রাহ্মণ সত্যি কথাই বলবে, ক্ষত্রিয় সত্যি কথা নাও বলতে পারে, বৈশ্য আরও কম সত্যি কথা বলবে আর শূদ্র তো সত্যি কথা বলবেই না। সেইজন্য বৈশ্য ও শূদ্রকে ভয় দেখাতে বলছেন।

শূদ্রের জন্য আরও অনেক পাপের ভয় দেখাতে বলা হচ্ছে যেমন – ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী, স্ত্রী-হত্যাকারী, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির যে পাপ হয় মিথ্যা সাক্ষী দিলে ওই সব পাপ তোমার লাগবে। এই রকম একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে ওকে ভয় দেখিয়ে ওর থেকে সত্যি কথাটা আদায় করা যায়। বিচারকদের এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সাক্ষীর থেকে সত্যি কথাটা বার করা। কিভাবে সত্যি কথাটা বার করবে তার কিছু উপায় বলে দিলেন। এর পরেও যদি কোন উপায় লাগাতে হয় লাগাতে পারো তাতে কোন অসুবিধা নেই। এরপরে যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় তাদের কি কি পাপ হয় এক এক করে বলে যাচ্ছেন।

এবার যারা গোরক্ষা করছে অর্থাৎ গোয়ালার কাজ করছে, যারা ব্যবসা করছে, ছুতোরের কাজ করছে, যার সু্যপ তৈরী করে, যারা নাচ-গান করে এগুলো হল এদের নিজস্ব পেশা। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি এই ধরনের কোন পেশায় নিযুক্ত থাকে তাহলে তখন কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের মত ব্যবহার করবে। মনুর কাছে জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণত্বের কোন দাম নেই। এখানে বলছেন, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম করছে, সেই ব্রাহ্মণ যখন বিচারালয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে তখন তাকে শূদ্রের মতই দেখবে। শূদ্রের কথার যে দাম এদের কথারও ঠিক সেই দাম।

শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্র্তোক্তৌ ভবেদধঃ।

তত্র বক্তব্যম্ভূতং তদ্ধি সত্যাদিশিষ্যতে।।৮/১০৪

এই শ্লোকটাও মহাভারত থেকে এসেছে, যদিও সরাসরি না এসে একটু ঘুরে এসেছে। যদি কোন ক্ষেত্রে সাক্ষী সত্যি কথা বলে দিলে কোন নিরপরাধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড হয়ে যেতে পারে, মানে পুরোটাই এই সাক্ষীর উপরই বিচারের রায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই ক্ষেত্রে তখন অসত্য ভাষণ দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে, সেখানে সত্য কথা বলো না, এই রকম ব্যাপারে মিথ্যা বলা সত্য কথা বলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও মনু পুনর্জন্ম জানেন, পুনর্জন্মের সব ব্যাপারটা জানেন, মুক্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য মানছেন, কিন্তু তিনি এটাও জানেন এই জীবনটা হল অত্যন্ত মূল্যবান। এর পরের জন্ম কবে হবে আর কোথায় গিয়ে জন্ম নেবে কোন ঠিক নেই। সেইজন্য বলছেন যদি তোমার সত্য কথায় কারুর প্রাণবধ হয় তাহলে তুমি কিন্তু অসত্য ভাষণ করবে, সত্যি কথা বলো না। এখানে এটা বলছেন না যে তোমার কোন সন্দেহ আছে কিনা, যদি তুমি দেখ তোমার সত্য কথায় কারুর প্রাণদণ্ড হতে যাচ্ছে তাহলে তুমি আগে তার প্রাণ বাঁচাও, তার জন্য তুমি মিথ্যা কথাই বল। এই যে মিথ্যা ভাষণ করা হল, এর জন্য তাকে কি করতে হবে বলছেন –

বাগ্দৈবতৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।

অনৃতসৈন্যসন্তস্য কুর্বাণা নিক্ষুতিং পরাম্।।৮/১০৫

সরস্বতী দেবী হলেন বাণীর দেবী, জিহ্বার তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাক্ষীতে মিথ্যা কথা বলে তাঁকে অপমানিত কর হল। সেইজন্য বলছেন মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার পর সরস্বতী দেবীর উদ্দেশ্যে একটা যজ্ঞ করে নেবে। যে মিথ্যা কথা বলা হল এই যজ্ঞ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। মনু এখানে একেবারে পরিস্কার – তোমার কথাতে যদি কারুর প্রাণদণ্ড হয়ে যায় সেখানে তুমি নিমিত্ত হতে যেও না। আর এই যে মিথ্যা কথা বললে তার জন্য একটা যজ্ঞ করে নেবে তাতে সরস্বতী দেবীর প্রতি যে অবমাননা করা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। এখানে মনু ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র সবাইকে সমান দেখছেন, উনি এটা বলছেন না যে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না তাকে মা সরস্বতী ছেড়ে দেবেন।

সাক্ষী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে কি করে বোঝা যাবে

যস্য দৃশ্যেত সপ্তাহাদুক্তবাক্যস্য সাক্ষিণঃ।

রোগোহগ্নির্জাতিমরণমৃণং দাপ্যো দমঞ্চ সঃ। ৮/১০৮

যদি দেখা যায় একজন সাক্ষী বিচারে সাক্ষ্য দিয়েছে, সেই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক একটা রায় দিয়েছেন। এবার এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল সেই সাক্ষীর বাড়িতে কারুর কোন একটা বড় রকমের রোগ হয়ে গেছে কিংবা আগুন লেগে গেছে কিংবা তার নিকটতম কেউ মারা গেছে, তাহলে বুঝতে হবে যে সাক্ষী দিয়েছিল সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তখন বিচারক তাঁর রায়টাকে পুরো পাল্টে দেবেন। স্মৃতিশাস্ত্রের এটা এক বিচিত্র নিয়ম। একজন ‘ক’ বাবু আছেন, তাকে টাকা ধার দিয়েছিল ‘খ’ বাবু। ‘ক’ বাবু এখন অস্বীকার করছে যে, আমি কোন টাকাই নিইনি। এই নিয়ে দুজনের ঝগড়া গড়িয়ে বিচারকের কাছে এসেছে। একজন ‘গ’ বাবু সাক্ষী হয়ে বলল ‘ক’ বাবু ঠিক। ‘খ’ বাবু তার টাকাটা আর ফেরৎ পেলেন না। এরপর দেখা গেল এক সপ্তাহের মধ্যে ‘গ’ বাবুর বাড়িতে আগুন লেগে গেল, বা তার বাড়ির কারুর উৎকট রোগ হয়ে গেল, বা তার বাড়ির কেউ মারা গেল। তখন বুঝতে হবে ‘গ’ বাবু কিছু একটা গোলামাল করেছিল। কিন্তু যদি সব কিছু পরিস্কার থাকে সেখানে কোন ব্যাপার নেই। এখানে ব্যাপারটা হল ওই সাক্ষীর উপর নির্ভর করে যদি কোন বিধান দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর যদি সাক্ষীর উপর এই সব কাণ্ড ঘটে তখন বিচারক সেই টাকাটা আদায় করে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা ভাষণ দোষের নয়

মনু সাবধান করে দিচ্ছেন, মানুষ যেন সাধারণ জিনিষের জন্যও মিথ্যা ভাষণ না করে, মিথ্যা শপথ না গ্রহণ করে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বা মিথ্যা শপথে দোষের মধ্যে পড়ে না। এই ভাবনাটাও মহাভারত থেকে এসেছে –

কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেক্ষনে।

ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্। ৮/১১২

একজন কামী লোকের একাধিক স্ত্রী আছে। এখন একজন স্ত্রীর কাছে গিয়ে সেই পুরুষ যদি শপথ খেয়ে মিথ্যা বলে ‘মাইরি বলছি! আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি, সত্যি বলছি তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী’। মনু বলছেন এই মিথ্যাটা মিথ্যের মধ্যে নয়। বিবাহেষু, বিয়ের সময় নতুন স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে বলল ‘কথা দাও! তুমি অন্য কোন নারীকে আর বিবাহ করবে না’। কিংবা উল্টোটাও যদি হয় নতুন স্বামী ফুলশয্যার রাতে স্ত্রীকে বলল ‘তুমি আমাকে কথা দাও আমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে আর ভালোবাসবে না’। এরপর দুদিন যেতে না যেতেই একজন তার শপথ ভেঙে দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করে নিল। মনু বলছেন এতেও পাপ লাগবে না। তারপর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করার সময় মেয়ের বাবা যদি মিথ্যা কথা বলে ‘আমার মেয়ের মত এমন গুণবতী রূপবতী ভূভারতে কোথাও পাওয়া যাবে না’। আবার বিয়ে করাতে গিয়ে কুটুমবাড়িতে বলে আমার এত গরু আছে, এত জমি আছে। যদিও এগুলো মিথ্যা কথা বলছে তাতে কিন্তু দোষ হবে না। সব থেকে বড় কথা হল মেয়ের বিয়েটা কোন রকমে দিয়ে দেওয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যদি এই

ধরণের মিথ্যা কথা বলে তাতে দোষ হয় না। তার সঙ্গে বলছেন ব্রাহ্মণের উপকার করার জন্য বা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে যদি মিথ্যা কথা বলতে হয়, এমন কি যদি দিব্যি দিয়েও মিথ্যা কথা বলে তখন সেই মিথ্যা কথার জন্য দোষ হয় না। এই সব বলার পর আবার সাক্ষীর ব্যাপারে বলছেন –

মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য সাক্ষীর শাস্তির বিবিধ বিধান

লোভান্মোহাডুয়ান্নৈত্রং কামাৎ ক্রোদান্তথৈব চ।

অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে।।৮/১১৮

সাক্ষীর সাক্ষ্যকে কখন অসত্য বলে গ্রহণ করা হয়? যখন লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা এবং বালসুলভ আচরণ বা অনবধানতাবশতঃ সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তখন সেই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করতে হবে। মানুষের মধ্যে মনের বিভিন্ন যে আবেগ প্রবণতা কাজ করে তার প্রভাবে মানুষ মিথ্যা কথা বলে, তাই এদের কথাকে মিথ্যা বলেই মনে করতে হয়। যদি দেখা যায় কোন সাক্ষীর মধ্যে লোভ আছে, সেই লোভে পড়ে সে সাক্ষী দিচ্ছে, অথবা তার মোহ আছে সেই মোহবশতঃ মিথ্যা কথা বলে কাউকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে বা তার ভয় আছে, কেউ ভয় দেখিয়ে তাকে সাক্ষ্য দেওয়াতে নিয়ে এসেছে, এই ধরণের সাক্ষ্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয় না। এরপর মজার ব্যাপার বলছেন –

লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যন্ত মোহাৎ পূর্বং তু সাহসম্।

ভয়াদ্ দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্বং চতুর্গুণম্।।৮/১২০

এখানে বলছেন, লোভে পরে যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষী দেয় তার শাস্তি এক রকম হবে, মোহে পড়ে সাক্ষী দিলে আরেক রকম শাস্তি হবে বন্ধুত্বের জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিলে অন্য রকম শাস্তি ইত্যাদি। এখনকার দিনে শাস্তি দিলে অর্থের জরিমানা করা হয়, তেমনি তখনকার দিনে টাকা দিয়ে যে জরিমানা করা হত সেটাকে বলা হত পণ। তখন তিন ধরণের শাস্তি ছিল – প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস আর উত্তম সাহস। প্রথম সাহসে আড়াই’শ পণ, মধ্যম সাহসে তার দ্বিগুণ মানে পাঁচশ পণ। আর উত্তম সাহসে চার গুণ হবে, মানে এক হাজার পণ। শাস্তির বিধান যখন দেওয়া হয় তখন মনু এটাই বলে দেবেন এই রকম দোষের জন্য প্রথম সাহস, এই ধরণের দোষের জন্য মধ্যম সাহস আর এই দোষের জন্য উত্তম সাহস। আবার যদি বলে মধ্যম সাহসের তিন গুণ, তার মানে পনের’শ পণ। এই শ্লোকে যেমন বলছেন লোভবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তার দণ্ড হবে উত্তম সাহস মানে এক হাজার পণ। তেমনি মোহবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে প্রথম সাহস, মানে আড়াই’শ পণ। ভয়ে সাক্ষ্য দিলে মধ্যম সাহস, আর বন্ধুত্বের খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে প্রথম সাহসের চতুর্গুণ। এইভাবে মনু পর পর বলে যাচ্ছেন কোন দোষে কি দণ্ড দিতে হবে। তারপরেই একটা শ্লোকে গিয়ে বলছেন –

গুণীলোকের প্রতি রাজা কিভাবে দণ্ড বিধান করবে

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চ বাপ্যদণ্ডয়ন্।

অযশো মহদাপ্লোতি নরকধৈঃব গচ্ছতি।।৮/১২৮

বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্যাদ্গিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্।

তৃতীয়ং ধনদণ্ডং তু বধদণ্ডমতঃপরম্।।৮/১২৯

যার শাস্তি পাওয়ার কথা নয় তাকে যদি রাজা শাস্তি দেয়, এবং যারা দণ্ডের যোগ্য তাদের দণ্ড না দিলে সেই রাজার এই লোকে গুরুতর অযশ হয় আর মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। যিনি গুণীলোক, তিনি যদি প্রথমবার অল্পস্বল্প দোষ করেন তাহলে রাজা তাঁকে বাগ্‌দণ্ড দিয়ে দেবে, ‘তুমি এটা অন্যায় করেছ, এরকম আর করবে না’ এই রকম নরম কথা বলে ভর্ৎসনা করে দেবে। দ্বিতীয়বার অন্যায় করলে ধিক্‌ দণ্ড, মানে ধিক্কার করবে। তৃতীয়বারে আর্থিক দণ্ড। চতুর্থবারে বধদণ্ড, শরীরে ডাঙা মারা বা অপরাধের গুরুত্ব বুঝে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড দিতে হবে। গুণী লোকের জন্য এই ধরণের দণ্ডের কথা মনু বলছেন। গুণীদের

এমনিতে শাস্তি দেওয়া মনু পছন্দ করেন না, কিন্তু আমরা এখন বলি আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। মনু কিন্তু এইভাবে দেখতেন না। আবার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মনু একটা মজার কথা বলছেন –

মালিকানা কখন হবে এবং কখন হবে না

যৎকিঞ্চিদশ বর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী।

ভূজ্যমানং পরৈস্তৃষ্ণিং ন স তল্লক্ষুমহতি।।৮/১৪৭

কোন লোক অন্য কারোর দ্রব্য বা সম্পত্তি দশ বছর ধরে ভোগ করে যাচ্ছে আর সেই দ্রব্য বা সম্পত্তির মালিক তাকে কিছু বলছে না, তখন দশ বছর পর ওই দ্রব্য বা সম্পত্তির মালিক যে ভোগ করছে তারই হয়ে যাবে। ইদানিং কালেও এই ধরনের ঝামেলা ভাড়াটিয়াদের নিয়ে প্রায়শই কোর্ট পর্যন্তে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মনু কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন দশ বছর ধরে তোমার জিনিষ একজন ভোগ করে যাচ্ছে, দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তুমি সেই জিনিষের মালিকানা দাবী করে ফেরত চাইতে পারো না।

যদি কেউ ছল করে, চালাকি করে কোন জিনিষ ধার করে পরে বিক্রী করে দিল কিংবা দান করে দিল বা ভোগ করা হয় বা বলপূর্বক যদি কিছু লিখিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেগুলি সবই অকৃত-অসিদ্ধ, একথা মনু বলছেন। তার মানে হল, ‘ক’ বাবু ‘খ’ বাবুর জিনিষ চুরি করে নিল, তারপর সেটা ‘গ’ বাবুকে বিক্রী করে দিল। তখন ওই বিক্রী মান্য হবে না। ভারতীয় সংবিধানে এখনও এই নিয়মটা চলছে। চুরির মাল যদি বিক্রী করে দেওয়া হয়, যে সেই মাল কিনেছে তার উপরও চুরির দায় বর্তাবে। এইভাবে অনেক রকম আইন-কানুনের কথা বলে যাচ্ছেন।

বিবাহ বিষয়ক কিছু ধারণা

বিবাহ যোগ্য কন্যার পবিত্রতা, গুণ নিয়ে অনেক আলোচনা করার পর এক জায়গায় বলছেন, যদি কোন মেয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় তখন সেই বিবাহে ধর্ম কার্যের আর ততটা গুরুত্ব নেই। শেষে বিয়ের ব্যাপারে বলছেন। হিন্দু মতে বিবাহ কখন মান্যতা প্রাপ্ত হবে? মনু এখানে বলছেন –

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্ৰা নিয়তং দারলক্ষণম্।

তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বিঃ সপ্তমে পদে।।৮/২২৭

যখন সপ্তপদী হয়ে যায়, অর্থাৎ বর ও কনে সাত পা একসঙ্গে যখন হাটবে তখনই বিবাহটা মান্য বলে গ্রাহ্য হবে। সাক্ষী সেখানে অগ্নিকে রাখা হয়েছে, নাকি দেবতাকে রাখা হয়েছে, নাকি কোন মানুষকে রাখা হয়েছে সেটার উপর বিবাহের মান্যতা নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে বিয়ের উদ্দেশ্যে যখন সাত পা দুজনে একসাথে হাটল তখনই নারী সেই পুরুষের সহধর্মিণী হয়। এটাকে মনু বলছেন সপ্তপদী, মানে সাত পা এক সঙ্গে চলল। এখান থেকেই এখন এসেছে সাত পাকে বাঁধা, সাত পাক প্রদক্ষিণ। কিন্তু শব্দটা হল সপ্তপদী। মহাভারতে সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনীতে সাবিত্রী যমরাজকে বলছেন – কারো সাথে সাত পা এক সঙ্গে চললে তার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, আমি তো আপনার সাথে এতক্ষণ সাত পা চলেছি, এখন তাই আপনি আমার বন্ধুর মত হয়ে গেছেন। এই রকম প্রচুর আইন-কানুনের কথা বলে যাচ্ছেন, আমরা শুধু একটা ধারণা যাতে করতে পারি মনু সব কিছুকে কিভাবে দেখতেন তার জন্য সামান্য কিছু আলোচনা করে নিচ্ছি।

বর্ণানুযায়ী জরিমানার হার নিরূপণ

পঞ্চাশদ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।

বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশৎ শূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।।৮/২৬৮

ব্রাহ্মণ যদি কোন ক্ষত্রিয়কে গালিগালাজ করে তখন ব্রাহ্মণকে পঞ্চাশ পণ জরিমানা দিতে হবে, সেই ব্রাহ্মণই যদি বৈশ্যকে গালিগালাজ করে তখন পঁচিশ পণ জরিমানা দিতে হবে আর শূদ্রকে গালিগালাজ করলে

বারো পণ দণ্ড দিতে হবে। এই নয় যে ব্রাহ্মণ কটু কথা বললে ছাড় পেয়ে যাবে তবে শাস্তিটা কম বেশী হয়। তার মানে সমাজে সম্মান যার যত বেশী তাকে যদি অপমানিত করা হয় তার শাস্তিটাও সেই অনুপাতে বেশী হবে। আমরা মনে করতে পারি এগুলো কি ধরনের বিচার! কিন্তু এখনও তাই হয়, মানহানি মামলায় দেখা হয় যে ব্যক্তির মানহানি করা হয়েছে সেই ব্যক্তির সমাজে যে রকম মান সম্মান আছে, সেই অনুসারে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। মনু এখানে পরিস্কার করে দিচ্ছেন ব্রাহ্মণের সম্মান বেশী, ক্ষত্রিয়ের তার থেকে একটু কম, বৈশ্যের আরও কম আর শূদ্রের একবারে কম। কিন্তু শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের খুব খারাপ কথা বলে গালি গালাজ দেয় তার জন্য মনু শূদ্রের জন্য খুব কড়া কড়া শাস্তির বিধান দিয়ে রেখেছেন। এরপর একটা শ্লোকে বলছেন –

কানাকে কানা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ

কাণং বাহপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্।

তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্যাপণাবরম্।।৮/২৭৪

এটাও খুব উল্লেখনীয় শ্লোক। শারীরিক প্রতিবন্ধী যুক্ত অনেক মানুষ আছে, যেমন কানা, বোবা, খঞ্জ। এই ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী কোন লোককে অপমানিত করার জন্য কানা, খোঁড়া বলে যদি কেউ সম্বোধন করে তাহলে রাজা যেন অন্ততঃ এক পণের দণ্ড অবশ্যই দেয়। ইদানিং একটা আইন চালু হয়েছে, কেউ যদি কোন চামারকে চামার, ঝাড়ুদারকে ঝাড়ুদার বলে সম্বোধন করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে নেওয়া হবে। দেশের সর্বত্র এই আইন আছে, কাউকে অপমান করার জন্য তার যেটাতে দুর্বলতা সেটাকে নিয়ে কিছু বলা হলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়ে যাবে। এই আইনগুলো মনুই দিয়ে গেছেন। এখান থেকে সরে এসে আবার অন্য বিষয়ে চলে গিয়ে বলছেন –

অপরের পাপ কিভাবে অন্যের উপর চলে আসে

অন্নাদেৰ্জ্জণহা মাষ্টি পত্যৌ ভার্যাপচারিণী।

গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিব্লিষম্।।৩৮/৩১৭

রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।

নির্মলাঃ স্বৰ্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।।৮/৩১৮

মনুও ভ্রূণ হত্যাকে মারাত্মক পাপ বলছেন। বলছেন, ভ্রূণ হত্যাকারীর অন্ন যে ভক্ষণ করে ওই ভ্রূণ হত্যাকারী নিজের পাপটা তখন তার উপর দিয়ে দেয়। সেইজন্য যার তার বাড়িতে, অপরিচিতের অন্ন খাওয়া হিন্দু সমাজ ভালো চোখে দেখা হয় না। কে কোথায় কি পাপ কাজ করে বেড়াচ্ছে আমরা জানতে পারছি না, তাই খুব সাবধান করে দিচ্ছেন, খুব পরিচিত বা ঘনিষ্ঠের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী, নিজের স্বামী জীবিত থাকতে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করে বেড়ায় তাহলে সেই স্ত্রীর পাপটা তার স্বামীর উপর চলে আসে। শিষ্য যদি পাপ করে, মানে সন্ন্যাস-বন্দনাদি যদি না করে, জপ-ধ্যান যদি না করে, তখন ওই শিষ্যের পাপ গুরুর কাছে চলে আসে। যজমান যদি পাপ করে থাকে তাহলে তার পাপটা পুরোহিতের উপর যায়। শেষে বলছেন চোর যদি দণ্ড না পায় তাহলে চোরের পাপ রাজার উপর আসে।

মনুস্মৃতির বিভিন্ন সামাজিক বিধান (পাপ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়, রাজার পাপের দণ্ড এক হাজার গুণ বেশী, সামাজিক মর্যাদানুযায়ী পাপের শাস্তি, আততায়ীর সংজ্ঞা, পরস্পরের সাথে কিভাবে সংগ্রহ হয়, ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড কিভাবে হবে)

পরের শ্লোকে বলছেন, এর আগে যত পাপের কথা বলা হয়েছে এই সব পাপ যারা করেছে তারা যদি রাজার দ্বারা প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করে নেয় তাহলে তাদের সেই পাপটা রহিত হয়ে যায় এবং ধার্মিক পুরুষ যেমন নির্বিবাদে স্বর্গে গমন করেন সেই রকম এরাও নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গে গমন করবে। আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করছি, সেখানে আমি একটা দোষ করলাম। কোম্পানির ডিরেক্টর আমাকে একটা শাস্তি দিয়ে দিল। শাস্তিতে দুটো জিনিষ হচ্ছে, একটা হল শাস্তিতে আমার কিছু ক্ষতি হয়তো হল, কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টর মানে তিনি

কোম্পানির রাজা, রাজার কাছে শাস্তি পেয়ে গেলে পাপটা মিটে যায়। আবার এমন কিছু কিছু পাপ আছে জানা যায় না, তখন গায়ত্রী পুরস্চরণাদি নাম-জপ করলে কেটে যায়। পরের একটা শ্লোকে মনু খুব সুন্দর বলছেন –

কার্যাপণং ভবেদগুণ্যং যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।

তত্র রাজা ভবেদগুণ্যঃ সহস্রমিতি ধারণা।।৮/৩৩৬

যে পাপের জন্য একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এক কাহন দণ্ড হবে, সেই একই অপরাধ যদি রাজা করে সেই ক্ষেত্রে রাজাকে হাজার গুণ দণ্ড বেশী দিতে হবে। একজন কর্মচারী একশ টাকা ঘুষ নিলে যদি হাজার টাকা দণ্ড হয় তাহলে রাজার ওই একশ টাকা ঘুষ নেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে হবে। ভাগ্যিস দেশে এখন মনুস্মৃতি পালন করা হয় না, তা নাহলে সব নেতারা এত দিনে তিহার জেলে বন্দী হয়ে থাকতে হত।

তারপর এক এক করে বলছেন বিভিন্ন মানুষ যে পাপ কাজ করছে সেই পাপের শাস্তি সেই মানুষের তার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা হবে। আবার বলছেন, যেখানে কোন ঘেড়া দেওয়া নেই সেখানে যদি ফল, ফুল হয়ে থাকে আর সেটা কেউ নিয়ে নিলে চুরির মধ্যে ধরা হবে না। এরপর আততায়ীর ব্যাপারে বলছেন গুরু, বালক, বৃদ্ধ আর বেদজ্ঞ যদি আততায়ী হয়ে আসে তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বধ করে দিতে হবে। আততায়ীর সংজ্ঞা হল, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, বিষ প্রয়োগ করা, কাউকে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা, সম্পত্তি অপহরণ করা আর নারী অপহরণ করা, এই কাজগুলো যারা করে তাদের আততায়ী বলা হয়। আততায়ী হলেই তাকে বধ করে দিতে হবে। ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল আততায়ীদের নাশ করা। গীতাতে এই আততায়ী শব্দটা এসেছে। ধর্মযুদ্ধ কেন বলছেন? কেননা দুর্যোধনরা হল আততায়ী। আর শাস্ত্রই বলছে আততায়ী হলে তাকে মেরে ফেল। দুর্যোধনরা কেন আততায়ী? ভীমকে বিষ প্রয়োগ করেছিল, বারণাবতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সম্পত্তি অপহরণ করেছিল, এইসব দেখে বলা হচ্ছে কৌরবরা আততায়ী। এর একটি দোষও যদি কারুর মধ্যে থাকে তাহলেই সে কিন্তু আততায়ী। গুরু হোক, বাচ্চা হোক, বৃদ্ধ হোক আর বেদজ্ঞই হোক সে যদি আততায়ী হয় তাহলে তাকে বধ করে দাও। যদি আপনাকে কেউ বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে, আপনার বাড়িতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করেছে কিংবা আপনার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তক্ষুণি তাকে বধ করে দিলে আপনার কোন পাপই লাগবে না।

তারপর পরস্পর সন্তোষ নিয়ে বিরাট লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছেন। বলছেন পরস্পরকে যদি সুগন্ধী তেল বা ফুল পাঠানো হয়, পরস্পর সাথে যদি হাসি-ঠাট্টা করা হয়, পরস্পর বস্ত্র, অলঙ্কার, প্রসাধন যদি স্পর্শ করা হয়, একই পালঙ্কে যদি বসে, নির্জন স্থানে যদি ভ্রমণ করে তখন তাকে বলা হয় সংগ্রহণ। সংগ্রহণ যদি হয় তার শাস্তির আবার বিরাট বড় তালিকা দেওয়া হয়েছে। পরস্পর সঙ্গে সামান্যতম সঙ্গ করার অনুমতি মনু কখনই দেবেন না। এর সাথে অনিচ্ছায় যদি কোন নারী বা কন্যার সাথে কেউ সম্পর্ক করে তার আবার একটা লম্বা তালিকা দিচ্ছেন।

আবার ঘুরে ফিরে বলছেন যদি কোন গুরুতর অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ড দিতে হয় তাহলে সেই ব্রাহ্মণের মাথা মুড়িয়ে দিলে সেটাই তার প্রাণদণ্ডের সমান হয়ে যাবে। তখনকার দিনে একটা শাস্তি ছিল মাথা নেড়া করে গাধার পিঠে বসিয়ে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিত, এটাই মৃত্যুদণ্ডের সমান। এইসব নিয়ে মনুর অনেক সমালোচনা করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে মনু নিজে থেকে কটা বলেছেন আর এর আগে থেকে কটা হয়ে আসছিল আমাদের জানা নেই। এক জায়গায় মনু বলছেন এই রকম হলে যারা জ্ঞানী পুরুষ তাদের বেশী দণ্ড দেবে, আবার অন্য জায়গায় বলছেন জ্ঞানীকে কম দণ্ড দেবে।

শেষে বলছেন, চোর, পরস্পর সন্তোষকর্তা, কটুভাষী, সাহস কর্মকর্তা মানে যারা ডাকাতি গুণ্ডামি করে আর যারা খুব খারাপ কাজ করে মানে কাউকে পিটিয়ে দিল, মারপিট করেছে এই সব অপরাধীদের যে রাজা বশে রাখে তখন সেই রাজার সুনাম হয়।

এর আগের অধ্যায়টা ছিল রাজধর্মের উপর। এর পরের এই অধ্যায়টা রাজধর্মেরই অঙ্গ, এখানে রাজা কোন কোন অন্যায় কাজে কাকে কি রকম দণ্ড দেবেন, সাক্ষী বিচার কিভাবে হবে আর সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য মনু কি কি পদক্ষেপ নিতে বলছেন। নবম অধ্যায়ে নারীদের অধিকার, তার সুরক্ষা নিয়ে মনু আলোচনা করছেন।

নবমোহধ্যায়ঃ

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।৯/৩

নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে মনুর দৃষ্টিভঙ্গী

এর আগেও এই নিয়ে আলোচনা করে হয়েছে। শৈশবে মেয়েকে তার বাবা রক্ষা করবে, যৌবনে তার স্বামী রক্ষা করবে, স্ত্রী যখন বৃদ্ধাবস্থায় চলে যাবে, যখন তার স্বামী থাকবে না তখন তার পুত্র তাকে রক্ষা করবে। কোন অবস্থাতেই মেয়েকে কখন স্বাধীনতা দেবে না। কিছু দিন আগে কর্ণাটকের এক জজ সাহেবের কাছে আঠাশ বছরের এক মহিলা একটা ডিভোর্সের মামলা নিয়ে এসেছিল। জজ সাহেব বলছেন – ‘স্বামী তোমাকে মেরেছে এতে কি এমন হয়েছে, স্বামীরা তো স্ত্রীদের একটু আধটু মারধোর করেই থাকে। তোমার তো নারী জাতি, মায়ের জাত, তোমরা তো সব সহ্য কর’। সেখানে একজন মহিলা বিচারক ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে জজ সাহেব বলছেন – ‘এই দেখো, ইনি একজন মহিলা বিচারক, আমিও বিচারক কিন্তু উনি যা সহ্য করেছেন আমাকে কি তাঁর মত ব্যাথা সহ্য করতে হয়েছে! একটু সহ্য করে নিলে কি হয়েছে! যাও! স্বামীর সঙ্গে মিল করে নিয়ে থাক’। বিচারকের এই মন্তব্য নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। এমন কি যত নারী সংগঠন আছে এরাও সবাই প্রতিবাদী হয়ে পড়েছে। যার জন্য এই বিচারকের এজলাসে যত নারী সম্বন্ধিত মামলা ছিল সব মামলা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তারা বলছে একজন হাইকোর্টের বিচারক এই ধরনের উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারেন না।

নারী স্বাধীনতা আর কতটা নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এটি একটা খুব পুরনো বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয়। মনু ছিলেন একজন ঋষি, ঋষির অন্তর্দৃষ্টি অনেক গভীরে, তিনি বলছেন নারীকে কোন স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। কেন দেওয়া যাবে না? সমাজকে চোখের মণির মত রক্ষা করতে হলে নারীর স্বাধীনতার ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে। যখনই ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা আসে তখন তো সবাই যে যার মত স্বাধীন – তখন আমরা সবাই রাজা এই রাজার রাজত্বে। নিজের সন্তান অন্যায় করলে বাবা মা একটা চড় মারলে থানায় কেস হয়ে যাচ্ছে, মেয়েকে কিছু বললে গলায় দড়ি দিয়ে দিচ্ছে। সমাজ চালাতে গেলে, সমাজকে রক্ষা করতে হলে এই ধরনের ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না। একবার কোন এক আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এক আদিবাসী মহিলা খুব কাঁদছে কারণ তার স্বামী নাকি তাকে একটুও ভালোবাসে না। কি করে বুঝলে তোমার স্বামী তোমাকে ভালোবাসে না? মহিলাটি বলছে ‘এই দেখুন না, আমার পাশের বাড়ির মেয়েটিকে তার বর রোজ এত মারে আর আমার স্বামী আমাকে একদিনও মারে না’। মারে না যখন তখন ভালোবাসা কি করে হবে! এগুলো খুব জটিল সমস্যা, কিন্তু এটাই বাস্তব। এই সমস্যার নিদান চার হাজার পাঁচ হাজার বছরেও পাওয়া যায়নি, কোনটা করা ঠিক আর কোনটা করা ঠিক নয় এর তল্লাশ এখনও চলছে।

তবে আমরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে আর অভিজ্ঞতা দিয়ে যেটুকু বুঝেছি তাতে সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয়, সমাজকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আমাদের মনুর কথা মতই চলতে হবে। তাতে যেটা হয় তাহল, এইভাবে চালালে কিছু দিন পরে এটাই পুরুরের বাঁধা জলের মত স্থায়ী রূপ নেবে। তখন আবার

স্বাধীনতা দিতে হয়। স্বাধীনতা দেওয়ার কিছু দিন পরে আবার তাণ্ডব শুরু হবে। যখন তাণ্ডব শুরু হয় তখন আবার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হয়। তারপর বলছেন –

কালেহদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।

মৃতে ভর্তরি পুত্রস্ত বাচ্যো মাতুররক্ষিতা।।৯/৪

মেয়ের একটা বয়স হয়ে গেলে, অর্থাৎ ঋতুদর্শনের আগে পিতা যদি কন্যাকে বিয়ে দিয়ে পাত্রস্থ না করে তখন বাবা লোক সমাজে নিন্দনীয় হন। মেয়েকে একটা বয়সের পর বাড়িতে বসিয়ে রাখতে নেই। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার এই ভাবটা মনুর কাছ থেকেই এসেছে। প্রকৃতির জগতে পুরুষ-নারীর মিলনের ব্যাপারটা অত্যন্ত বিচিত্র ও রহস্যময়, সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে ওই সময়ে দুজন দুজনকে ঠিক খুঁজে বারও করে নেয়। একটা ছোট্ট পোকা যে চোখে দেখতে পায় না সেও ওই সময়ে ঠিক খুঁজে খুঁজে তার সঙ্গীর কাছে চলে আসে। বাঘ জঙ্গলে মিলনের জন্য যখন ডাক ছাড়ে, সেই ডাক বাঘিনী কত দূর থেকে শুনতে পেয়ে ঠিক তার প্রিয়তমের কাছে চলে আসে। মেয়ে হাতী যখন এই ডাক দেয়, হাতী আবার মুখ খুলে ডাক দেয় না, গলা থেকে একটা অন্য ধরনের আওয়াজ বার করে, এই আওয়াজটা অন্য কোন প্রাণী শুনতেও পায় না, একমাত্র পুরুষ হাতিই শুনতে পারে। দশ কিলোমিটার দূর থেকে ওই আওয়াজ সে শুনতে পায়, শোনে আবার তার পা দিয়ে। গলা দিয়ে মেয়ে হাতী যে বিচিত্র আওয়াজ করে তাতে একটা কম্পন হয়, সেই কম্পনটা আবার পুরুষ হাতি পা দিয়ে ধরে, সেখান থেকে সরাসরি তার মস্তিষ্কে চলে যায়। এমনই নারী-পুরুষ মিলনের রহস্য। মিলন মানেই নারী। সমাজ যে চলবে, সেটা চলবে নারীর শক্তিতেই। সেইজন্য বলছেন, যখন দেখবে মেয়ের সন্তান উৎপাদনের বয়স হয়ে গেছে তখনই মেয়েকে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে দেবে। যদি না কর তাহলে পাপ হবে।

স্ত্রীকে রক্ষা করলে সব কিছু রক্ষিত হয়

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।

স্বধ্বং ধর্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।।৯/৭

এই শ্লোকের শেষাংশটা অত্যন্ত মূল্যবান – জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি। নিজের স্ত্রীকে যদি রক্ষা করা হয় তাহলে সব কিছু রক্ষিত হয়ে যায়। কি কি রক্ষা হয় – স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ। নিজে, নিজের সন্তান, নিজের চরিত্র, নিজের কুল, নিজের আত্মা এই সব কিছুর রক্ষা হয়ে যায় যদি একমাত্র স্ত্রীর রক্ষা করা হয়, স্ত্রীকে যদি ঠিক ভাবে রাখা হয়। আমরা যে মনে করি মনু শুধু নারীদের নিন্দা করে গেছেন তা নয়। মনুর কাছে পরিষ্কার, আমার যে বংশ, আমার যে কুল, আমার ধর্ম, আমার অর্থ সমৃদ্ধি, আমার কাম, আমার সন্তান এই সব কিছু নির্ভর করছে একজন নারীর উপর, সেই নারী হল আমার স্ত্রী। স্ত্রীকে যদি খুব সামলে না রাখা হয় তাহলে কিন্তু সব কিছু নাশ হয়ে যাবে। স্ত্রী হল ক্ষেত আর পুরুষ বীজ। ক্ষেতের মাটি যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে সব চাষবাশ সর্বনাশ হয়ে যাবে, বীজ যতই ভালো থাকুক ওই খারাপ জমিতে পরে ভালো উৎকৃষ্ট বীজটাও পচে যাবে। স্ত্রী হল মাটি, সেইজন্য বলছেন স্ত্রীকে সামলে রাখলে পুরুষের যা কিছু আছে, পুরুষ নিজে, তার যে আচরণ, তার বংশ, তার ধর্ম, অর্থ, কাম, সন্তান সব কিছু রক্ষা হয় ওই একটি জায়গা থেকে। আমাদের অনেক দুর্গতির কারণ হল, আমরা অনেকে ঠাকুরের বই পড়ে, নানান রকমের গল্প কাহিনী পড়ে কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি একটা তাকিল্যের ভাব এসে গেছে। ঠাকুরের ধর্ম হল সন্ন্যাসীর ধর্ম।

বেদের নিয়ম অনুযায়ী ধর্ম দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে আমাদের ভাষায় বলা হয় ধর্মাচরণ। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মই হল আধ্যাত্মিকতা। ধর্মাচরণ মানেই আচার আচরণ পালন করা, মন্দিরে যাওয়া, রোজ গঙ্গাস্নান করা, পূজা করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, জপ-ধ্যান করা ইত্যাদি। আর আধ্যাত্মিকতা মানে, মানুষ যখন ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন-প্রাণ নিবেদন করে দেয়। ধর্ম হল যখন আমি ঈশ্বরকে

ধরবার চেষ্টা করছি আর আধ্যাত্মিকতা মানে ঈশ্বর নিজে তাকে ধরে নিয়েছেন। ধর্মাচরণ করলে পুণ্য হয়, পুণ্য কর্মের জোরে মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লোকে যায় আর ইহলোকে সুখ শান্তি পায়। যাঁরা আধ্যাত্মিকতায় চলে যান তাদের ঈশ্বর লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। কিন্তু আচার্য শঙ্করের কাছে বা বেদে আধ্যাত্মিক বলে কোন শব্দ নেই। আধ্যাত্মিক শব্দ যখনই আসবে তখনই তার অর্থ হবে আমাদের অন্তর্জগৎ। তাঁদের কাছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এই দুটোই সমান। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে আমরা কিছু জিনিষকে ধরে রাখছি, এত জপ করতে হবে, এত সময় ধ্যান করতে হবে, এই সময় মন্দিরে যেতে হবে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হবে, বাবা-মাকে সেবা করতে হবে, সন্তান পরিবার পরিপালন করতে হবে, এগুলো সব প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হল, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন কুমার যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এই পন্থাতে সব কিছু ত্যাগ, ঈশ্বর ছাড়া যা কিছু আছে সব ত্যাগ। পরে এসে এরই নাম হয়ে গেল আধ্যাত্মিকতা।

যে কোন শাস্ত্রই যখন রচিত হয় প্রথমে কিন্তু তাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথাই আলোচনা করতে হয়, মানে আধ্যাত্মিকতার কথা, যা কিনা মুষ্টিমাত্র কয়েকজনের জন্য। এরপর ধীরে ধীরে এই শাস্ত্র ছড়িয়ে যায় জনসাধারণের মধ্যে, আর তখন তাতে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এসে যায়। যতক্ষণ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম না আসে ততক্ষণ ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম পুরোপুরি সন্ন্যাসীর ধর্ম, আর সন্ন্যাসীর ধর্ম মানেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। কিন্তু যতক্ষণ বৌদ্ধ ধর্ম সাধারণের জন্য তৈরী হয়নি ততক্ষণ বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ চেহারা পায়নি। ঠাকুরের ধর্মও পুরোপুরি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। উপনিষদের ও গীতার যে ধর্ম আমাদের ঠাকুরের কথামতও তাই। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থশ্রমের আদর্শ এই বিষয়ের উপর কত প্রবন্ধাদি, পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ এখনও গৃহস্থশ্রমের আদর্শ রূপে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। তার কারণ ঠাকুরের কথার উপর এখনও আনুষঙ্গিক সহায়ক শাস্ত্র তৈরী হয়নি। কথামত হল উপনিষদের মত, একে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে তোলার জন্য রীতিমত মনুস্মৃতির মত শাস্ত্র চাই, রামায়ণের মত গ্রন্থ চাই। ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত যে কথাগুলো আমরা পাই সেগুলো আসলে সন্ন্যাসীদের আদর্শ। কিন্তু কথামত আর লীলাপ্রসঙ্গেও গৃহস্থ আদর্শের প্রচুর কথা ছড়িয়ে আছে, কিন্তু যতক্ষণ ঠাকুরের জীবন বা শ্রীশ্রীমায়ের যে জীবন এবং তাঁদের অন্যান্য গৃহস্থ পার্শ্বদ যাঁরা ছিলেন তাঁদের জীবন চর্চাকে আধার করে সহায়ক শাস্ত্র না তৈরী হয় ততক্ষণ এই আদর্শ গৃহস্থদের কোন কাজেই লাগবে না। উপনিষদ আদর্শের কথা বলছে সেটা পালন করা কি সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব! ম্যাক্সমুলার এক জায়গায় বর্ণনা দিচ্ছেন, বেদের ঋষিরা পাহাড়ে চড়তে চড়তে এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে নিঃশ্বাস নিতে গেলে বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ঋষিরা কিন্তু তাও থেমে যাচ্ছেন না, সেই অবস্থাকেও ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন। ঋষিরা এমন এমন উচ্চ উপলব্ধির কথা বলছেন, এমন একটা উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন যেটা ধারণা করতে গেলে সাধারণ মানুষের বুকটা ফেটে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণও এমন এমন উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন যে অবস্থার ধারণা করতে গেলে আমাদের বুকটা ফেটে যাবে। কিন্তু তাঁরা যেটা দেখেছেন সেটাকে বলে গেছেন। এই জিনিষগুলো যখন সাধারণের মত করে পরিবেশন করা হবে তখনই তা সাধারণের ধর্ম হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম এখনও সুপ্ত অবস্থায় আছে, এটা খুলতেই হাজার না হোক কম করে পাঁচশ বছর তো লেগেই যাবে। স্বামীজী তাই বলছেন – পনেরশ বছরের মত চিন্তার খোরাক দিয়ে দিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মকে আধার করে একশ বছরের মধ্যে একটা নতুন স্মৃতি শাস্ত্রই এখনও লেখা হয়ে উঠল না। স্বামীজী যখন বলছেন তাদের ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকে গেছে, ঘটি, বাটি আর এক অপরকে ছুঁয়ে দিলে কে অশুদ্ধ হল এই নিয়েই তোরা বিচার করে যাচ্ছিস। কিন্তু এটা কি ধর্ম নয়? অবশ্যই ধর্ম, আর হিন্দু ধর্ম কোন দিন এর বাইরে যেতে পারবে না। স্বামীজী যে ধর্মের কথা বলছেন সেটাও পুরোপুরি সন্ন্যাসীর ধর্ম, সন্ন্যাসী এসবের বাইরে। কিন্তু দুটো আদর্শকে নতুন করে রাখতে হবে – এটা হল তোমার ভেতরের ব্যাপার অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আরে এটা হল তোমার প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। শ্রীশ্রীমাও বলছেন নিবৃত্তিই ভালো প্রবৃত্তি ভালো না। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ সবই করছে, দীক্ষা নিচ্ছে, জপ করছে, মন্দিরে যাচ্ছে, সাধুদের প্রণামী দিচ্ছে, শাস্ত্র কথা শুনছে কিন্তু ভেতটা একেবারে কামনা-বাসনাতে গিজ্ গিজ্ করছে। এদের যদি বলা হয় ভাই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে কিছুই হবে না, সেটা এরা নিতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে সব কিছুতে

লাইসেন্স দেওয়া যাবে না। প্রত্নিলক্ষণে এটাই করে, অবাধ ভোগের লাইসেন্সটা আটকে দিয়ে ভোগটাকে ধর্ম মতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিবৃত্তিলক্ষণে সব কিছুকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এই যে শ্লোকগুলো জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি, এগুলো প্রত্নিলক্ষণ ধর্ম। সেইজন্য ঠাকুরের কথার সাথে এই ধরনের কথা মিলবে না। কিন্তু এখান থেকেই ধর্ম শুরু হয়। এগুলো পালন না করা হলে কোন দিন ধরা যাবে না ঠাকুর কি বলছেন, গীতায় কি বলছে, উপনিষদ কি বলছে। এই যে শ্লোকটি জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি, নিজের স্ত্রীকে যদি ঠিক ভাবে ভরণ-পোষণ করে, অনুশাসনের দ্বারা যদি স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় তখন তার সব কিছু ঠিক থাকবে। আমরা অনেকেই জানিনা যে, ভারতে এমন অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যারা তাদের কোম্পানিতে কোন সিইও, ম্যানিজিং ডিরেক্টর পদে কাউকে নিয়োগ করার আগে প্রথমেই ভেতর থেকে খোঁজ নিয়ে দেখে স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কটা কি রকম। যদি ডিভোর্সড হয় তাহলে তাকে চাকরি দেবেই না, যদি দেখে বাড়িতে স্ত্রীর সাথে অশান্তি আছে তখনও চাকরি দেবে না। তার মানে, তুমি নিজের বাড়ি সামলাতে পারছো না, এত বড় কোম্পানীতে চার-পাঁচ হাজার লোককে কি করে সামলাবে! বিয়ে করে যাকে ঘরে নিয়ে এসেছ তাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছ না সেখানে বিভিন্ন মানসিকতার কর্মচারীকে কি করে নিয়ন্ত্রণে রাখবে!

‘জায়া’ শব্দের ব্যাখ্যা

মহাভারতে জায়া শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জায়তে মানে জন্ম নেওয়া। মহাভারতে বলছেন পতিভার্য্যং সম্প্রবিশ্য, যিনি পতি তিনি নিজের স্ত্রীর মধ্যে প্রবেশ করে। কি রূপে প্রবেশ করে? পুত্র রূপে। স্বামীই পুত্র রূপে স্ত্রীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। এই ভাবটা ব্যাসদেব প্রথম শকুন্তলার সংলাপে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা দুশ্মন্তকে গিয়ে শকুন্তলা বলছেন, স্বামী স্ত্রীর ভেতরে পুত্র রূপে প্রবেশ করে, স্বামীই পুত্র রূপে জন্ম নেয়, তাই এই সন্তান ভরতকে আপনি আপনার পুত্র রূপে অস্বীকার করবেন না, এটা আপনি নিজে। নীচের শ্লোকে মনু ঠিক একই কথা বলছেন –

পতিভার্য্যং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বহ জায়তে।

জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াতুং যদস্যং জায়তে পুনঃ।।৯/৮

স্বামী ভার্য্যার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে এই পৃথিবীতে তার গর্ভ থেকে পুনরায় পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে। স্ত্রীকে তাই বলা হয় জায়া। জায়ার জায়ত্ব কি? এটাই জায়ত্ব যে, পতি পুত্র রূপে আবার জন্ম নিচ্ছে। স্ত্রীকে জায়া কেন বলা হচ্ছে? স্বামী স্ত্রীর ভেতরে গিয়ে আবার পুত্র রূপে বেরিয়ে আসে। জায়তে মানে যেখান থেকে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তো হচ্ছে পুত্র, যদি এমনি পুত্রই উৎপন্ন হত তাহলে তো এর কোন দাম নেই, আর এত কথাও বলার প্রয়োজন ছিল না। আসলে স্বামীই পুত্র রূপে জন্ম নিচ্ছে। পুরো হিন্দু শাস্ত্রে এটি একটি বিশেষ ভাব, বাবাই পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে। স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করছে বলে স্ত্রীকে বলা হয় জায়া।

জাগ্রত ধর্মবুদ্ধিই নারীকে সুরক্ষা দেয়

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সূতং সূতে তথাবিধম্।

তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।।৯/৯

ন কশ্চিদযোষিতঃ শত্রুঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।

এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যান্তাঃ পরিরক্ষিতুম্।।৯/১০

যেমন তুমি স্ত্রীর প্রতিপালন করবে সন্তান তোমার তেমনই হবে। সেইজন্য স্ত্রীকে খুব যত্ন পূর্বক রক্ষা করবে। দশ নম্বর শ্লোকে এসে বলছেন, তুমি গায়ের জোরে কোন নারীর রক্ষা করতে পারো না। কেউ যদি মনে করে থাকে নারীকে আমি সম্ভুষ্ট করে মানিয়ে নিয়ে ঠিক রক্ষা করতে পারব, সে কিন্তু ভুল মনে করছে। প্রাচীরের ভেতরে রেখে রক্ষা করবে, তাও সম্ভব হবে না। আরব্য রজনীর কাহিনী শুরুই হয় এই রকম এক নারীকে নিয়ে। আরব্য রজনীর রাজা গেছে শিকার খেলতে। হঠাৎ কোন কারণে রাজা ফিরে এসে দেখে তার

রানীরা কালো কালো নিগ্রো গোলাম গুলোর সাথে রাসরঙ্গে মেতে আছে। রাজা দেখে খুব বিমর্ষ হয়ে বসে পড়েছে। মন খারাপ করে রাজা তার ভাইকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। একটা জায়গায় রাজা দেখে একটা জিন একটা গাছের তলায় বসে আছে। জিন দেখে দুজনে ভয়ে একটা গাছে উঠে গেছে। গাছে উঠে দেখে জিনটা একটা বিরাট দৈত্য। দৈত্যটা একটা বড় বাস্ক রাখল। তারপর চাবি নিয়ে বাস্কটাকে খুলল। সেই বাস্কটা থেকে আরেকটা বাস্ক বেরোল। সেই বাস্কটাকে চাবি নিয়ে খুলে আরেকটা বাস্ক বের করল, সেটা থেকে আরেকটা বাস্ক, সেটা থেকে আরেকটা বাস্ক, এইভাবে সাত খানা বাস্ক হল। তার ভেতর থেকে একটা মেয়েকে বার করল। জিন ওই মেয়েটার সাথে আমোদ আহ্লাদ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। জিন ঘুমিয়ে পড়তেই মেয়েটি গাছের উপরে এই দুজন যে বসেছিল, এদের ডেকে নীচে নেমে আসতে বলল। ওদের তো ভয়ে প্রাণ যায় যায়, ওদিকে নীচে জিন ভেঁস ভেঁস করে ঘুমোচ্ছে। মেয়েটি বলছে – নেমে এসো। এরাও নেমে এসেছে। মেয়েটি এদের দুজনকে বলল – এবার তোমরা দুজনে আমার সাথে আমোদ আহ্লাদ কর। ওরা দুজনে তো ভয়ে কাঁপছে। মেয়েটি বলছে – যেমনটি বলছি তেমনটি কর, না হলে এক্ষুণি এর ঘুম ভাঙিয়ে দেব আর তোমাদের দুজনের ঘাড় মটকে দেবে। শেষে দাদা আর ভাই দুজনে ওর সাথে মজা-টজা করল। মেয়েটি তখন বলল – তোমাদের আংটিটা আমাকে দিয়ে দাও। আংটিটা দিয়ে দিল। তখন দেখে মেয়েটি একটা বিরাট রুমাল বার করল। সেই রুমালে শুধু আংটি আর আংটি। মেয়েটি ওদের বলল – এই জিন বিয়ের রাতে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। আমাকে এই সাত কৌটার মধ্যে রাখে যাতে আমি অন্য কোন পুরুষের দিকে না তাকাই। তা আমার তো আর কোন পথ নেই। আমারও তো মানুষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, তাদের সাথে আমোদ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছে করে। তা মাঝে মাঝে আমি সুযোগও পেয়ে যাই। আমি যখনই কাউকে ভালোবাসার সুযোগ পেয়ে যাই তখন ভালোবাসার প্রতীক রূপে তার আংটিটা রেখে দিই। দেখা গেল ওই রুমালে সাতশর উপর আংটি বাঁধা আছে। তারপর দুই ভাই আবার তড়বড় করে গাছে উঠে গেল। ইতিমধ্যে জিনেরও ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভাঙতে সে আবার মেয়েটিকে সাত খানা বাস্কের মধ্যে বন্ধ করে কাঁধে নিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। এটাই বলছেন, আইন-কানুন বা কড়া শাসনের বাস্ক দিয়ে কোন দিন মেয়েকে রক্ষা করা যায় না।

আমাদের পরম্পরাতে এই রকম একটা কাহিনী আছে। এক রাজকুমার মেয়েদের চরিত্র ও বদমাইশি নিয়ে অনেক কাহিনী পড়ে মেয়েদের সম্বন্ধে এমন বিরূপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে ঠিকই করে নিয়েছিল জীবনে বিয়ে করবে না। কিন্তু রাজকুমার বিয়ে না করলে রাজবংশের খুব মুশকিল। সবাই খুব বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। শেষে রাজকুমার একটি শর্তে রাজী হল, তার বৃকের হাড় থেকে একটা মেয়ে যদি তৈরী করা যায় তাহলে তখন সে ওই মেয়েকে বিশ্বাস করবে এবং বিয়ে করবে। তাই করা হল। রাজকুমারের নিজের বৃকের হাড় থেকে একটি মেয়ে তৈরী করা হয়। মেয়েটি যুবতী হওয়ার পর রাজকুমারের সাথে বিয়ে দেওয়া হল। মেয়েটির জন্য আলাদা একটা মহল তৈরী করা হল। মহলের চারিদিকে বিরাট সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কড়া ব্যবস্থা যে একটা পোকাও সুরক্ষার নজর এড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু রাজকুমার আর রাজা যায়। কিছু দিন যাবার পর মেয়ের তো আর কোন কিছুতেই মন লাগছে না। এক জাদুকর এসেছে খেলা দেখাতে। মেয়েটি সামনে গিয়ে দেখতে পারবে না, জানলা দিয়ে জাদুখেলা দেখছে। ওই জানলা দিয়েই জাদুকরের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেছে, আর তাতেই দুজনের ভালোবাসা হয়ে গেছে। এরপরই রাজকুমার যখনই মহলের বাইরে যায় তখনই জাদুকর সাপ হয়ে নালি দিয়ে রাজমহলে মেয়েটির ঘরে পৌঁছে যায়, সেখানে গিয়ে সে আবার তার মানুষের রূপটা নিয়ে নেয়। সারা দিন মেয়েটির সঙ্গে থাকে। এই ভাবে সব কিছু বেশ ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু একদিন হঠাৎ রাজকুমার ওখানে পৌঁছে গেছে। রাজকুমারের পায়ের শব্দ শুনতেই জাদুকর আবার সাপের চেহারা নিয়ে ফেলেছে। একটা সাপকে পালাতে দেখে রাজকুমার চোঁচামেচি করতেই লোকজন এসে সাপটাকে মেরে ফেলেছে। ব্যস, মেয়েটি এবার একটা ধাঁধা তৈরী করেছে, রাজা এল সাপ পালাল এই নিয়ে একটা ধাঁধা। ধাঁধা তৈরী করে রাজকুমারকে বলছে, তুমি যদি এর উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমাকে পুড়ে মরতে হবে। কিন্তু ধাঁধার উত্তর দেবে কি করে! কিছু বুঝতেই পারছে না জিনিষটা কি। আর মেয়েটির নির্দেশে ওই সাপের মৃত শরীরটাকে রাজকীয় ভাবে দাহ করা হল। কারণ রাজকুমারকে মেয়েটি

যা আঙা করে সে তাই পালন করে। শেষে সাপটাকে পোড়ান হল আর রাজকুমারকেও মরতে হল। কারণ সে ধাঁধার উত্তর দিতে পারেনি। তারপর মেয়েটিও মরে গেল। এই হল মেয়েদের সুরক্ষার পরিণতি। আমরা যে ভাবছি মেয়েদের প্রাচীরের মধ্যে, প্রচুর অনুশাসনের মধ্যে রাখলে মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে, কিন্তু কোন ভাবেই মেয়েদের সুরক্ষা দিয়ে রক্ষা করা যায় না, একেবারেই অসম্ভব। আমাদের মুসলিম নবাব বাদশারাও তাদের বেগমদের জন্য এই রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করত। নিগ্রোদের নিয়ে এসে তাদের নপুংসক বানিয়ে হাতে তলোয়ার দিয়ে বেগমদের পাহার দেওয়ার ব্যবস্থা করত। কিন্তু তাতেও বেগমরা কত গোলমাল করত। এটাই মনু বলছেন মেয়েদের তোমরা আটকাতে পারবে না। তাহলে কিভাবে আটকাবে? তার জন্য মনু কয়েকটা উপায় বলছেন –

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।

শৌচে ধর্মেহ্নপজ্ঞ্যঞ্চ পরিণাহস্য বেক্ষণে।।৯/১১

প্রথমে বলছেন বাড়ির মেয়েদের টাকা-পয়সার হিসাব রাখার দায়িত্ব দেওয়া, যাতে টাকা-পয়সা ঠিকমত জমা রাখতে ও খরচ করতে পারে, বাড়ির বাসনপত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে গুছিয়ে রাখা, রান্নাবান্না করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যস্ত রাখা এবং বিছানাদির তত্ত্বাবধান করা – মোদ্দা কথা ঘরের কাজের দায়িত্বগুলো পুরোপুরি মেয়েদের উপর ছেড়ে দিয়ে তাদের ব্যস্ত রাখা। একদিকে তাদের বাইরের কোন কাজ না দেওয়া আর বাড়ির ভেতরের কাজে ব্যস্ত রাখা। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, কাজের মধ্যে থাকলে মন ভাল থাকে। তারপর বলছেন –

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাণ্ডকারিভিঃ।

আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষ্যেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।।৯/১২

যদি কোন পুরুষ জোর করে বাড়ির ভেতরে নারীকে আটক করে কড়া অনুশাসনের মধ্যে রাখে তাতে ওরা অরক্ষিতাই থাকে। কিন্তু নারী যদি ধর্মশীলা হয়, স্ত্রী যদি ধর্মপতি হয় তখন ওরা বাড়ির মধ্যে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করলেও সুরক্ষিতাই থাকে। সেইজন্য বলছেন প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত নিজের মেয়েদের প্রথম থেকেই ধর্মোপদেশ দিয়ে তাদের মনে ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করা।

এখানে বলতে চাইছেন যদি বাড়ির মেয়েদের কড়া অনুশাসনে রাখা হয় তাতেও মেয়েরা অরক্ষিতা থাকে। কিন্তু যদি মেয়েদের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি জেগে যায় তাহলে তারা বাড়ির মধ্যেই সুরক্ষিত। সেইজন্য উদ্দেশ্য কড়া অনুশাসন নয়, উদ্দেশ্য হল ধর্মবুদ্ধি জাগান। কামারপুকুরে সীতানাথ পাইন ও দুর্গাদাস পাইনরা খুব গোঁড়া সংরক্ষণশীল পরিবার ছিল। তারা খুব গর্ব করে বলত আমাদের বাড়িতে কোন দিন কোন পুরুষ ঢুকতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বালক গদাই। তিনি চ্যালেঞ্জ দিলেন আমি তোমাদের বাড়ির সব খবর বার করে আনব। মেছুনি বউ সেজে একদিন সন্ধ্যা বেলায় গদাই পাইনদের বাড়ি ঠিক ঢুকে গেল। অন্দরমহলে গিয়ে মেয়েদের সাথে গল্পগুজব শুরু করে দিয়েছে। এদিকে গদাইর দাদা সন্ধ্যা হয়ে গেছে গদাই ফিরছে না দেখে ‘গদাই’ ‘গদাই’ করে ডাকছে। দাদার ডাক শুনেই পাইনদের বাড়ির ভেতর থেকে গদাইও গলা উঁচিয়ে বলছে ‘আসি দাদা’। তখন ঠাকুর এই কথাই বলেছিলেন – অনুশাসন দিয়ে কখন মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না, ধর্মবুদ্ধি দিয়ে রাখা হয়। যতই কড়া অনুশাসনে রাখা হোক মেয়েরা ঠিক ফাঁকফোকর বার করে বেরিয়ে যাবে। ধর্মবুদ্ধি যদি না হয় তাহলে কোন দিন তার মধ্যে ধর্মভাব আসবে না। সেইজন্য মেয়েদের সব সময় কাজে ব্যস্ত রাখবে, দ্বিতীয় তার মধ্যে ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করবে।

নারীর চরিত্রহননে ছয়টি কারণ

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্।

স্বপ্নোহন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্।।৯/১৩

মেয়েদের চরিত্রহননের ছয়টি কারণ বলছেন। প্রথম পানং, নারীর যদি কোন ধরণের নেশা থাকে। মেয়েরা যদি মদ্যপান করে, ড্রাগস নেয়, ধূমপান করে তাহলে তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। আজকাল বড় বড় পার্টিতে মেয়েরা মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে সারা দেশ চৌঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজের মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। তখন বলবে আপনারা দেশটাকে তালিবান বানাতে চাইছেন! মেয়েদের প্রথম অবস্থায় যদি নিরাপত্তা না দেওয়া হয় তাহলে তাদের পরিপক্বতা আসবে কি করে! প্রথমে চারাগাছকে বেড়া দিয়ে গরু ছাগল থেকে রক্ষা করতে হয়। বেড়া কিভাবে দেবে? আগেকার দিনেও মেয়েরা মদ্যপান করত, মদ খাওয়া বা যে কোন নেশা করলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। আগে এই নেশা করাটা বন্ধ কর।

দ্বিতীয় দুর্জনসংসর্গঃ, দুষ্ট লোকের সঙ্গ করলে বা তাদের সাথে মেলামেশা করলে মেয়েদের চরিত্র নষ্ট হবে। রাজমহলে যেখানে রাজপরিবারের মেয়েরা থাকে সেখানেও বাইরে থেকে চুড়ি পড়বার জন্য, সিঁদুর বেচার জন্য, শাড়ি বেচার জন্য মেয়েরা আসবে। এরাই হল ‘গো বিটুইন্’, মানে যারা ভেতর বাইরের খবরাখবর আদান-প্রদান করে। এদের উপরে তখনকার দিনে প্রচণ্ড নজরদারি করা হত। কারণ এদের মধ্যে যাদের মন ছলচাতুরি আর কুমতলবে ভরা তারা সব সময় ফাঁক খুঁজবে কি করে কিছু কাজ হাসিল করা যায়। সেইজন্য বলছেন মেয়েদের সংসর্গ কারু না কারুর সঙ্গে হবেই, তাই সাবধান করে দিচ্ছেন দুর্জন সংসর্গ যেন না হয়।

তৃতীয় পত্যা চ বিরহ, স্বামী থেকে যদি অনেক দিন দূরে থাকে, স্বামী যদি বিরহী হয়, বিদেশী হয় তাহলে কিন্তু গোলমাল হবে। সেইজন্য বলছেন স্বামী থেকে বেশী দিন দূরে থাকতে নেই। চতুর্থ অটনম্, অটনম্ মানে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো। ঠাকুর বলছেন তুই বিরহীনি আমি বিদেশীনি। এখানে বিদেশীনি ঠিক না, ঘুরে বেড়ানো স্বভাব, একটু পার্কে ঘুরতে চলে গেল, নদীর ধারে চলে গেল, মেলাতে ঘুরতে গেল। এদের কোথাও না কোথাও কারুর সাথে দেখা হয়ে যাবে।

পঞ্চম স্বপ্নঃ, যারা অসময়ে নিদ্রা যায়। যারা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় আবার দুপুরেও ঘুমোয় তাদের রাত্রিতে ঘুম হবে না। রাত্রে ঘুম না হলে মনটা চঞ্চল হয়ে যাবে। শেষে বলছেন অন্যগেহবাস, অপরের গৃহে গিয়ে বাস করা। বলা হয়, বিয়ে হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামী ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। বাপের বাড়ি যাওয়া যায়, সেখানে কিছু দিন থাকতেও পারে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব বা অন্য আত্মীয়-সম্বন্ধীদের বাড়িতে স্বামী ছাড়া স্ত্রী কখনই যাবে না। আবার অবিবাহিতা মেয়েকে কোন অবস্থাতেই একা ছাড়া যাবে না। অন্যগেহবাস, এটা একেবারে বিষতুল্য, অবিবাহিতা হোক আর বিবাহিতাই হোক অন্য লোকের বাড়িতে গিয়ে থাকলে মেয়েদের ঝামেলায় ফেলবেই ফেলবে। অবিবাহিতা যারা তারা মায়ের সঙ্গে বা মাতৃস্থানীয় মহিলাদের সাথে থাকবে, বিবাহিতারা স্বামীর সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এখন দিনকাল পালেট গেছে। একটা অবস্থায় এসে মেয়েদের একা ছাড়তেই হয়, সব মেয়েকে তো চিরদিন ধরে রাখা যায় না। আরও দুরবস্থা হয়েছে এখন আর যৌথ পরিবার নেই। একটা ফ্ল্যাটে স্বামী আর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। স্বামী সেই সকালে কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে, স্ত্রী সারাদিন বাড়িতে বসে বসে করবেটা কি! কেনাকাটা থেকে শুরু করে, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস সব কাজ স্ত্রীকেই সামলাতে হচ্ছে। খুব জটিল সমস্যা হয়ে গেছে। তার কুফলটাও আমরা সমাজে দেখছি। যাই হোক বলছেন নারীসংদূষণানি ষ্ট্, এই ছয়টি জিনিষ স্ত্রীলোককে দুষিত করে। এই ছয়টি ব্যাপারে নারীকে যদি স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে বলছেন –

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।

সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।।৯/১৪

তখন কিন্তু স্ত্রী বাছ বিচার না করে যে কোন পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। সেই পুরুষের সৌন্দর্য আছে কিনা, গুণ আছে কিনা, বয়স বেশী হয়ে গেছে কিনা কিংবা তার থেকে ছোট কিনা এসব কোন বিচারই করবে

না। আমরা হয়তো ভাবছি মেয়েটাতো ওই বুড়ো লোকটার সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু কোথা থেকে যে ওই বুড়োর উপরই মেয়ের আসক্তি এসে যাবে কিছু বোঝা যাবে না। আরব্য রজনীতে একটা কাহিনীতেও এই রকম একটা ঘটনা পাওয়া যায়। একটা মেয়ে ওই রকম একটা কুৎসিৎ লোকের পাশে পড়ে গেছে। মেয়েটির আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে বলে মেয়েটাকে লোকটা বেদম মারছে। একজন লোক তো দেখে অবাক হয়ে ভাবছে এদের অদ্ভুত জুড়ি কি করে সম্ভব! এটা যে কি করে হয় বোঝা যায় না, কিন্তু হয়। যখন দেখবেন একটা মেয়ে কদর্য লোকের পাশে পড়েছে, আর সে যদি স্বামী না হয়ে প্রেমিক হয়, তখন এই ছয়টির মধ্যে কোন একটা দোষ ওই মেয়েটির মধ্যে পাওয়া যাবে।

নারীর তিনটি দোষ

পৌংচলাচলচিন্তাচ নৈঃস্নেহ্যচ্চ স্বভাবতঃ।

রক্ষিতা যত্নতোহপীত ভর্তৃশ্লেতা বিকূর্বতে।।৯/১৫

মেয়েদের তিনটে দোষের কথা বলছেন – ব্যভিচার, চিত্তের চঞ্চলতা আর স্বাভাবিক ভাবেই যদি স্নেহের অভাব থাকে। ব্যভিচার মানে একাধিক পুরুষের সঙ্গে যদি জড়িয়ে যায়। চিত্তের চঞ্চলতা থামান হয় একমাত্র ধর্মকর্ম দিয়ে। ইদানিং কালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক ভালোবাসা ও স্নেহের অভাব একটা বিরাট বড় সমস্যা। স্ত্রীদের স্বামীদের প্রতি অস্নেহটা বেশী দেখা যায়। বলছেন, এই তিনটে দোষ যদি কোন নারীর মধ্যে এসে যায় তাহলে তার স্বামী কোন ভাবেই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। মেয়েদের একটা ব্যাপারে পুরুষদের সাবধান করে দেওয়া হয় – কোন মেয়ে যদি আপনাকে একবার অপছন্দ করে নিয়েছে তাহলে আপনি ওই মেয়ের কাছ থেকে প্রাণ ছেড়ে পালান। কোন মেয়ে হয়তো একজন পুরুষকে পছন্দ করেছে, তারপর কোন কারণে যদি পরে অপছন্দ করে নেয় তাহলে আর দ্বিতীয়বার সেই মেয়ের পছন্দের তালিকায় কোন দিন সেই পুরুষ আসবে না। দ্বিতীয়বার যদি পছন্দের তালিকায় না ওঠে তার মানে সেই মেয়ের মধ্যে স্নেহের অভাব। স্নেহের অভাব যদি একবার হয়ে যায় তারপর আর সেই পুরুষকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এরপর যেটাই করুক সবটাই নাটক। আপনি যতই টাকা-পয়সা তার উপর খরচ করুন, আপনি নিজে প্রাণ দিয়ে দিন কোন দিন আর আপনি তার কাছে থেকে ভালোবাসা পাবেন না। এই তিনটে দোষ যদি কোন মেয়ের মধ্যে এসে যায় তাহলে আর কোন রকমেই তাকে রক্ষা করা যাবে না। ব্যভিচার স্ত্রীর মধ্যে কখন আসবে! যখন তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসাটা শেষ হয়ে যাবে। স্বাভাবিক স্নেহ যখন একবার শেষ হয়ে যাবে তখন আর দ্বিতীয়বার সেটা উঠবে না, দ্বিতীয় হল স্বামী এখন যাই করে দিক স্ত্রীর সুরক্ষা আর কোন ভাবেই করতে পারবে না।

সৃষ্টির শুরুতেই ব্রহ্মাই নারী মানসিক গঠন তৈরী করে দিয়েছেন

একং স্বভাবং জ্ঞাত্বা স্বাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।

পরমং যত্নমতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি।।৯/১৬

মনু বলছেন, ব্রহ্মা নারীদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এটা ভালো করে জেনে বুঝে নিয়ে আচরণটা সেইভাবে কর। মেয়েদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বলা হচ্ছে না, ওদের মানসিকতার গঠনটাই এই রকমের হয়, কারণ ব্রহ্মা এই ভাবেই তাদের সৃষ্টি করেছেন। আগের যে ছয়টি দোষের কথা বলা হয়েছে, ওই ছয়টি দোষ যদি কোন নারীর মধ্যে এসে যায় তবে সে মরেছে, আর পরের তিনটি দোষ যদি এসে যায় তাহলে আর সেই নারীকে ফিরিয়ে আনা যাবে না এবং নারীর যে মানসিক গঠন এগুলো ভালো করে বুঝে নাও আর বুঝে নিয়ে তোমার যে স্ত্রী, তোমার মেয়ে, তোমার পুত্রবধূ এবং তোমার ভগ্নি এদের সাথে সেই রকম আচরণ কর। যদি সেই রকম আচরণ না কর তাহলে ওই মেয়ে তোমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। বিশেষ করে স্বাভাবিক যে স্নেহ সেটা যদি চলে যায় আর কোনও মতে সেই স্নেহ ফিরে আসবে না। সে সব করবে, তোমার সন্তানের মা হবে, দেখাশোনা করবে, তুমি মরে গেলে শাঁখা ভাঙবে, সিঁদুর মুছে ফেলবে, সব করবে কিন্তু ওর মন কোন দিন আর তুমি পাবে না। যদি দ্বিতীয় বার এই ধরণের স্ত্রী বা তোমার প্রেমিকা ঘুরে আসে আর তুমি যদি তাকে বিশ্বাস করেছ তো তুমি মরেছ। যতই সে চোখের জল ফেলুক, একবার যার স্নেহ চলে গেছে দ্বিতীয়বার আর

ফিরে আসবে না। সেইজন্য প্রথমে চেষ্টা করতে হবে স্নেহটা যাতে না চলে যায়। সেইজন্য তাকে খুশী রাখতে হবে, অনুশাসনের মধ্যে রাখতে হবে, ধর্মমার্গে রাখা ইত্যাদি প্রচেষ্টা গুলো সব সময় চালিয়ে যেতে হবে। মনু বলছেন, এদের কোন দোষ নেই, এদের সৃষ্টিটাই এই ভাবেই করা হয়েছে। পরের শ্লোকে আবার বলছেন –

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।

দ্রোহভাবং কুচার্য্যং স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।।৯/১৭

ব্রহ্মা যখন নারীর সৃষ্টি করলেন তখন তার সাথে তিনি তাদের জন্য কতকগুলি জিনিষেরও সৃষ্টি করলেন। কি কি সৃষ্টি করলেন? শয্যা, ভালো বিছানা, আসন, আভূষণ, নারীদের জন্যই এই আভূষণের সৃষ্টি। এর সাথে কতকগুলো গুণও মেয়েদের দিয়ে দিলেন – কাম, ক্রোধ আর অনার্জবম্, অনার্জবম্ মানে কুটিল। মাথার মধ্যে সব সময় প্যাঁচ খেলছে। মেয়ে যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, সিইও হয় তাহলে আতঙ্ক লেগে যায়। ভারতে বড় বড় কোম্পানীতে যেখানে মেয়েরা সিইও আছে ওখানকার অধঃস্তন কর্মচারীরা রীতিমত ভয়ে কাঁপে। মনু সেই কবে বলে গেছেন মেয়েরা প্রচণ্ড কুটিল হয়। এর সাথে দ্রোহ ভাব, এক মেয়ে অপর মেয়েকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। কুচার্য্যং, মানে দুরাচারণ, মেয়েরা ডান দিক বাম দিক করবেই। মেয়েদের এগুলো স্বাভাবিক। সেইজন্য মেয়েদের এই ধরনের প্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মেয়েদের যদি কোন দামী অলঙ্কার বা দামী কোন জিনিষ কেউ দিয়ে দেয় তাহলে ওর মন তার দিকে চলে যাবে। সেইজন্য বলা হয় স্বামীই যেন এগুলো দিয়ে স্ত্রীকে সামলে রাখে। পরের শ্লোকে মনু আরও কড়া হয়ে বলছেন –

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মনৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।

নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।।৯/১৮

মেয়েদের জাতকর্মাদির করার কোন অধিকার নেই, তার মানে এর আগে যে ষোড়শ জাতকর্মের কথা বলা হয়েছিল সেগুলোর কোনটাই মেয়েরা করতে পারবে না। তার সাথে মেয়েদের মন্ত্র জপেরও কোন অধিকার নেই। যেহেতু ন ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ, অর্থাৎ যেহেতু স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে এদের অধিকার নেই সেই হেতু এরা স্বাভাবিক ভাবেই অপবিত্র। এটাই শাস্ত্রস্থিতি। আমাদের মহাভারতাদি গ্রন্থে যত নানান রকমের মত আছে সব মতগুলো সংস্কার হয়ে হয়ে মনুস্মৃতিতে এসে এইভাবে স্থান নিয়েছে। কিন্তু মনু এখানে এক রকম বলছেন আবার অন্য জায়গায় আরেক রকম বলবেন। কারণ এখানে ব্যাপারটা হল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাস্ত্র এবং পরস্পরাতে যে সব বিধি-নিষেধ পালিত হয়ে আসছিল সেগুলো যেভাবে সংগ্রহিত হয়েছে সেটাই স্মৃতিশাস্ত্র রূপে দাঁড়িয়েছে। এর কয়েকটা শ্লোক পরেই যেমন বলছেন –

যাদৃগুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।

তাদৃগুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিয়গা।।৯/২২

স্ত্রী যেমন তার সাধু বা অসাধু গুণযুক্ত স্বামীর সঙ্গে থাকে সে সেই প্রকার গুণযুক্ত হয়ে যায়। যেমন নদী যখন সমুদ্রে মিলে যায় তখন নদী সমুদ্রের ধর্মকেই নিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি কোন নারী যখন কোন পতির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তার স্বামী যেমন তেমনই সে হয়ে যায়। স্বামী যদি সৎগুণ সম্পন্ন হয় তাহলে স্ত্রীও সৎগুণ সম্পন্ন হয়ে যায়। আবার কিছু পরেই গৃহে স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলছেন –

নারী কেন প্রত্যেক গৃহে পূজ্যা

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।।৯/২৬

স্ত্রী হল প্রত্যেক গৃহে পূজার যোগ্য, কারণ স্ত্রীই গৃহের শোভা। স্ত্রীর একটা নাম শ্রী, মানে লক্ষ্মী। শ্রীহীন গৃহ মানে যেখানে লক্ষ্মী বাস করেন না, বাড়িতে যদি স্ত্রী না থাকে তাহলে সেই বাড়ি শ্রীহীন হয়ে যায়।

অন্য দিকে স্ত্রীর থেকে সন্তান উৎপত্তি হচ্ছে, সন্তানের পরিপালন হচ্ছে সেই কারণে তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। আর গৃহের দীপ্তি প্রকাশিত হয় স্ত্রীর দ্বারা তাই স্ত্রী পূজার্তা, পূজার যোগ্য। স্ত্রী পূজার যোগ্য মানে ঠাকুর যেভাবে শ্রীমার পূজা করেছিলেন সেইভাবে পূজা করার কথা বলা হচ্ছে না, স্ত্রীকে বস্ত্র, আভূষণাদির দ্বারা সম্মান ও সৎকার করতে হয়। গুরুকে যেভাবে সম্মান ও সৎকার করা হয় স্ত্রীকেও ঠিক সেইভাবে সম্মান, আদর দিয়ে সৎকার করতে হয়ে। এরপর নারীদের অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এর সব কিছু আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা জায়গায় বলছেন –

ন নিক্ষিয়বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।

এবং ধর্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্মিতম্।।৯/৪৬

স্ত্রীকে যদি দান করে দেওয়া হয় বা বিক্রী করে দেওয়া হয় বা ত্যাগ করে দেওয়া হয় তাতেও কিন্তু স্ত্রী স্বামী থেকে কখন সম্বন্ধচ্যুত হতে পারে না, স্ত্রী স্ত্রীই থাকে। অন্য এক জায়গায় মনু বলছেন একজন নারী যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তখনও লোকে বলবে এই নারী আগে অমুকের স্ত্রী ছিল। তাই এটা কখন মিটেবে না, তখন এনাদের এটাই মত ছিল। ক্ষেত আর বীজের অনেক আলোচনা করে মনু বলছেন ক্ষেতটা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত যদি ঠিক থাকে তাতে ভালো মন্দ যে বীজই দেওয়া হোক না কেন গাছ ঠিক তৈরী হয়ে যাবে। গমের বীজ দিলে গম হবে, ধানের বীজ দিলে ধান হবে। গমের বীজ যদি ভালো থাকে ভালো গম হবে। সেইজন্য যত্ন ও রক্ষা ক্ষেতেরই করতে হবে। যদি মনে করেন বীজটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মাটি খারাপ হলে ভালো উৎকৃষ্ট মানের বীজের শক্তিটাও নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষেত যদি ঠিক থাকে তাহলে বীজ ঠিক ঠিক ফল দেবে।

কোন কোন অবস্থায় স্ত্রী নিয়োগ বিধিতে সন্তানোৎপত্তি করতে পারে

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।

প্রজেক্সিতাধিগন্তব্য সন্তানস্য পরিক্ষয়ে।।৯/৫৯

বিধবায়ান্ নিযুক্তস্ত গৃহাত্তো বাগ্‌যতো নিশি।

একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন।।৯/৬০

যদি কোন কারণে কোন স্ত্রীর সন্তান না হয় বা সন্তান জন্মানোর পর মারা যায় তখন সেই স্ত্রী যদি স্বামীর আদেশ পায় বা গুরুর আদেশ পেয়ে দেবর অর্থাৎ স্বামীর ছোট ভাইয়ের সাহায্যে সন্তান উৎপত্তি করতে পারে। এমনকি যদি কেউ বিধবা হয়ে যাওয়ার পর সন্তান চাইছে সেই স্ত্রীও এইভাবে দেবর বা সপিণ্ডের সাহায্যে অভিলক্ষিত সন্তান লাভ করতে পারে। সপিণ্ড মানে নিজের জ্ঞাতি ভাই। কিন্তু বিধবা হয়ে যাওয়ার পর বেশী দেরী হলে তা হবে না, আর গুরুর আদেশ চাই, নিজের ইচ্ছানুযায়ী হবে না। এখানে গুরু মানে গুরুজন, শ্বশুর-শাশুরী, ভাসুর এরা। এইসব ক্ষেত্রে প্রথম নিয়মই হল সেই স্ত্রীকে সারা শরীরে ঘি বা তেল মেখে নিতে হবে। যতক্ষণ গর্ভধারণ না হচ্ছে ততক্ষণ সে দেবর বা যাকে বলা হয়েছে তার সঙ্গে থাকবে এবং সেই সময় পরস্পর কোন বাক্যালাপ বা কথা বলবে না। তার মানে, এই যে ক্রিয়া হচ্ছে এটি সম্পূর্ণ সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্যে, এখানে অন্য আর কোন ব্যাপার অর্থাৎ দুজনের মনের দিক থেকে দেহের দিক থেকে কোন রকম চাহিদা পূরণের ব্যাপার থাকবে না। এটাই আজকাল স্পার্ম ব্যাঙ্ক, কৃত্রিম প্রজনন রূপে এসেছে। এই জিনিসটা মনু অনেক আগেই প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে অনুমোদন দিয়ে রেখেছেন। স্পার্ম ব্যাঙ্কেও সব রেকর্ড রাখা হয়, এটা কে দিচ্ছে, তার স্বাস্থ্য কেমন, তার শিক্ষা কেমন, বংশ কেমন। মনু এত কিছু বামেলার মধ্যে না গিয়ে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন নিজের জ্ঞাতির মধ্যে যারা আছে তাদের কাউকে দিয়ে তুমি সন্তানোৎপত্তি করে নিতে পার। তার সাথে এই এই শর্ত দিয়ে দিচ্ছেন – যাতে কোন ধরনের দৈহিক সখ আত্মাদের ব্যাপার থাকবে না, মানসিক আত্মতা থাকবে না, কারণ তোমার মন কিন্তু তোমার স্বামীতেই থাকবে। শুধু একটি সন্তানের জন্য এই ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে।

এসব পড়লে শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় আমাদের পূর্বজরা কত উদার ও প্রগতিশীল ছিলেন। অন্য কোন ধর্মে এই জিনিষগুলো কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, অথচ অন্য ভাবে সবাই এটাকে কাজে লাগাচ্ছে। স্পার্ম ব্যাঙ্ক তো ভারত থেকে আসেনি এটা বিদেশ থেকেই এসেছে। যাই হোক এর উপর মনু অনেক কিছু বলে যাচ্ছেন। তারপর একটা শ্লোকে এসে বলছেন –

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যাঃ প্রসবেৎ কার্যবান্নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যাপি।।৯/৭৪

কোন পরিস্থিতিতে যদি স্বামীকে নিজের বাসস্থান ছেড়ে কিছু দিনের জন্য বিদেশে যেতে হয়, তাহলে স্বামী যেন নিজের স্ত্রীর ব্যবস্থা ঠিক মত করে যায়। কারণ দারিদ্রতার কারণে যদি জীবনধারণে উৎপীড়িত হতে হয় তাহলে কিন্তু অতি সুশীলা স্ত্রীও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যেতে হলে স্বামীকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, তার অবর্তমানে স্ত্রীর যেন কোন খাওয়া-পড়ার অভাব না হয়। এরপর মনু বলছেন স্বামী স্ত্রী এক অপরকে কোন অবস্থায় ত্যাগ করতে পারে।

স্বামী স্ত্রী একে অপরকে কোন অবস্থায় ত্যাগ করতে পারবে

অতিক্রামেৎ প্রমত্তং বা মত্তং রোগার্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণপরিচ্ছদা।।৯/৭৮
উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোহস্তি দ্বিস্ত্যশ্চ ন চ দায়াপবর্তনম্।।৯/৭৯

কোন স্বামী যদি উন্মত্ত অর্থাৎ পাগল হয়, ব্রহ্মহত্যা দোষে পতিত হয়, নপুংসক হয়, অবীজ অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা যদি না থাকে বা স্ত্রীকে তৃপ্তি দিতে না পারে, পাপ রোগগ্রস্ত হয় অর্থাৎ কুষ্ঠাদি ব্যাধি যদি থাকে, এই ধরনের স্বামীকে যদি তার স্ত্রী সেবা না করে তাহলে কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবে না এবং তার সঙ্গে স্ত্রীর ধন সম্পত্তি, অলঙ্কারাদিও নিতে পারবে না। খুব মজার শ্লোক। একটা জায়গায় স্ত্রীকে বলা হচ্ছে সব অবস্থায় তুমি স্বামীর সেবা করবে। স্বামীকে যদি স্ত্রী সেবা না করে তাহলে স্বামীর অধিকার আছে সেই স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে পারে – তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও, যেখানে খুশী যাও, আমি আরেকটা বিয়ে করছি ইত্যাদি। কিন্তু মনু কয়েকটি পরিস্থিতির কথা বলে দিচ্ছেন, যে যে পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে পারবে না। যেমন এর আগের শ্লোকটিতে বলছেন যে নারী জুয়া খেলাতে প্রচণ্ড আসক্ত বা মদ্যপানে মত্ত কিংবা রোগগ্রস্ত স্বামীর শুশ্রূষা না করে উপেক্ষা করে, এই ধরনের স্ত্রীর সব অলঙ্কার পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে তার সাথে তিন মাস কোন সম্পর্ক রাখবে না, তিন মাস পরে তাকে ফিরিয়ে আনবে। এখানে মনু তেমন কঠোর হচ্ছেন না। কিন্তু তারপরের শ্লোকেই অনেকগুলো শর্ত দিচ্ছেন, পাগল, পতিত, নপুংসক, অবীজ, পাপরোগে আক্রান্ত এই রকম স্বামীকে যদি স্ত্রী সেবা না করে সেই স্ত্রীকে কখনই ত্যাগ করা যাবে না। একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বিয়ের পর দেখছে তার স্বামীটা পাগল। বেচারী মেয়েটি ভয়েই হয়তো পাগল স্বামীর কাছে যেতে চাইবে না। স্বামীর কাছে যাচ্ছে না, স্বামীর সেবা করছে না, তাহলে মেয়েটিকে ত্যাগ করে দেওয়া যাক। না তা হবে না। এরপর দ্বিতীয় বিবাহ কখন করা যায় বলছেন –

কোন কোন অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে

মদ্যপাহসাধুর্ত্বা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্য হিংস্রার্থস্বী চ সর্বদা।।৯/৮০

স্ত্রী যদি মদ্যপানে আসক্ত হয়, অসাধুর্ত্বা অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা, প্রতিকূলা স্বামীর অবাধ্য, ব্যাধিতা, চিররোগিণী, অতিমাত্রায় হিংসাবৃত্তি আছে, মানে স্বামীকে খুব বকাবকি করে আর বাড়ির চাকর-বাকরদের সাথেও ঝগড়া করে, মানে খিচ্ খিচ্ করাই স্বভাব আর সব সময় টাকা-পয়সা বড্ড বেশী খরচ করে এই ধরনের স্ত্রী বর্তমান থাকতেই স্বামী অন্য একটি নারীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে। আবার বলছেন –

বক্ষ্যষ্টমেহধিবেদ্যাধে দশমে তু মৃতপ্রজা।

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্তপ্রিয়বাদিনী।।৯/৮১

স্ত্রী যদি সন্তানহীনা হয় কিংবা বক্ষ্যানারী হয় তাহলে বিয়ের আট বছর পর স্ত্রী থাকতেই দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়। আবার যদি তার সন্তান ছিল কিন্তু সন্তান মারা গেছে। এরপর আর স্ত্রীর থেকে সন্তান হচ্ছে না, এই ক্ষেত্রে তখন দশ বছর অপেক্ষা করে দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়। আর স্ত্রী যদি শুধু কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য স্বামীকে এগারো বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলে শেষ অংশে সদ্যস্তপ্রিয়বাদিনী, অপ্রিয়বাদিনী যদি হয়, মানে সব সময় ক্যাট ক্যাট করে স্বামীর প্রতি রক্ষ ও কটু বাক্য প্রয়োগ করে সেই ক্ষেত্রে তক্ষুণি আরেকটা বিয়ে করে নেওয়া যায়। অন্য দিকে আবার বলছেন –

যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।

সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্য নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ।।৯/৮২

শীলসম্পন্না এবং স্বামীর হিতকারিণী স্ত্রী যদি কোন কারণে রুগ্না হয়ে যায় বা কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন তাকে কোন মতেই ত্যাগ করা যাবে না। একমাত্র স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে, সে যদি রাজী হয় তখনই স্বামী সন্তানোৎপত্তির জন্য বা যে কোন কারণেই হোক দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রথমা স্ত্রীর অসম্মান যাতে না হয় সেই দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। মনু সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে যুক্তি সম্মত ভাবে বিধানগুলোকে দিচ্ছেন। যেমন স্বামী যদি বদমাইশ হয় সেই দিকেও মনুর খেয়াল আছে বলেই বলে দিচ্ছে সেই স্বামীর স্ত্রীর অধিকার আছে এই ধরনের স্বামীর সেবা না করার। অন্য দিকে স্ত্রী যদি এই এই রকমের গোলমালে হয়? তখন স্বামীকে বলছেন তুমি চাইলে দ্বিতীয় বিয়ে করে নিতে পার। কিন্তু মূল ব্যাপার যেটা হল স্ত্রীকে বিবাহ করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় সন্তানের জন্য, সেই সন্তানের জন্মই যদি স্ত্রী না দিতে পারে তাহলে কেন স্বামী অন্য ভাবে সন্তানের চেষ্টা করবে না!

এই অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে আমরা বলছিলাম মনু একদিকে বলছেন মেয়ের যদি একটা বয়স হয়ে যায় তাহলে যে করেই হোক তার যেন বিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আশি খানা শ্লোক পেরোতে না পেরোতেই মনু আবার উল্টো কথা বলছেন –

কামমমারণান্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।

ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।।৯/৮৯

কন্যা বিবাহযোগ্যা হওয়ার পর সারা জীবন পিতৃগৃহেই বাস করবে তাও ভালো কিন্তু গুণহীন অপাত্রের হাতে যেন কন্যাকে কখনই অর্পণ না করা হয়। এগুলোই মনুর সমস্যা। আসলে সমাজে তখন যা যা চলছিল, যা কিছু আগে থেকে হয়ে আসছিল সব কিছুকে একত্র করে একটা জায়গায় সংরক্ষণ করে দিলেন। কিন্তু পরের দিকে যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর স্মৃতি আদি যেগুলো এসেছে সেগুলো আরও বেশী সুসংগঠিত ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। যে কারণে এই শ্লোক আগেই আসা উচিত ছিল। একদিকে আপনি বলছেন মেয়ের একটা বয়স হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। বা এমনও হতে পারে তিনি বলতে চাইছেন পিতার প্রথম কর্তব্য হল মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর। তারপরে পিতার দ্বিতীয় কর্তব্য রূপে বলা উচিত ছিল, যদি গুণবান পাত্র না পাও তাহলে মেয়েকে বিয়ে দিও না। এরপরের শ্লোকটিও খুব মজার, এইসব শ্লোক দিয়ে বোঝা যায় মনু হিন্দু সমাজকে কিভাবে দেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিকোন থেকে তিনি সেইভাবে বিধান করে গেছেন –

মেয়ে কখন নিজে থেকে বিবাহ করতে পারবে

অদীয়মানা ভর্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।

নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যৎ সাধিগচ্ছতি।।৯/৯১

বলছেন, মেয়ের যদি একটা বয়স হয়ে যায়, তখনও যদি তাকে পাত্রস্থ করা না হয়, তাহলে মেয়ে তিন বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপরেও বাবা যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা না করে তখন সে যদি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেয় তাতে কোন দোষ হবে না। সে যদি নিজেই কোন ছেলেকে বিয়ে করে তাতে তো তার কোন দোষ হবে না বলছেন, সাথে সাথে এও বলছেন যাকে বিয়ে করল সেই ছেলেরও কোন দোষ হবে না।

আমরা যে এখন honour killing এর কথা শুনতে পাই, মনুর মতানুসারে কিন্তু এই honour killingকে অনুমতি দেওয়া যাবে না। মনু বলে দিচ্ছেন মেয়ে যখন সাবালিকা হয়ে গেল কিন্তু বিয়ে হল না, এবার সে তিন বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তার মানে একটা মেয়ে যদি তেরো বছর বয়সে সাবালিকা হয় তাহলে তার যে ষোল বছর বয়স হয়ে যাবে তারপর থেকে বাবার আর কোন মেয়ের উপর অধিকার থাকবে না। তারপর মেয়ে যদি নিজের পছন্দ মত ছেলে বেছে নেয় তাহলে মেয়েরও কোন দোষ হবে না আর ছেলের অর্থাৎ তার স্বামীরও কোন দোষ হবে না। তাহলে আর honour killing কোথা থেকে আসছে! অনেকে বলতে পারেন যে, সরকার তো এখন নিয়ম করে দিয়েছে আঠারো বছরের আগে কোন মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না। আসলে মনুর সময় যে সমাজ ছিল তখন সেই সমাজে নিয়ম ছিল মেয়ে ঋতুমতী হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এবার বাবা হয়ত চেষ্টা করল না। মেয়ে কিন্তু তিন বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এখন তার অধিকার হয়ে গেছে সে তার স্বামী রূপে বরণ করার জন্য ছেলে খুঁজতে পারে। এখন সরকার যদি বলে দেয় আঠারো বছর বয়সে বিয়েটাই আইন সম্মত, তাতে মনুর কোন আপত্তি হবে না। মনুর বক্তব্য হল মেয়ে যখন সাবালিকা হয়ে গেল এখন সে বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করবে তারপর সে নিজেই নিজের পাত্র খুঁজে নেবে। সরকার এখন বলছে, আমার জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, আর প্রাপ্ত বয়স্কের সীমারেখাটাও বেড়ে গেছে আমরা তাই বিয়ের বয়সটাকে আঠারো বয়সে নিয়ে যাচ্ছি। তাতে তো মনুর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের নতুন করে স্মৃতি লিখতে হবে। ভারতীয় সংবিধানই নতুন স্মৃতি। যদি সংবিধান বলে দেয় নয় বছর বয়সে মেয়েকে বাধ্যতামূলক ভাবে বিয়ে দিতে হবে, তখন কিন্তু ব্যাপারটা আপত্তিজনক হয়ে যাবে। সরকার সবার উপর জোর করতে পারে না। কিন্তু আবার ঠাকুরের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন শ্রীশ্রীমায়ের বয়স ছিল পাঁচ বছর। এই ব্যাপারে কি বলা হবে? আসলে মনু কিন্তু বলছেন না যে তুমি এক বছর বয়সে না দু বছর বয়সে বিয়ে দেবে, মনু বলছেন মেয়ে যদি ঋতুমতী হয়ে যায় তখন বিয়ে দিতেই হবে। ঋতুমতী হওয়ার আগে যদি কোন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয় তাতে মনুর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়ে যেই বুঝে গেল বিয়ে কি, সন্তান উৎপত্তি কি তখন সঙ্গে সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যদি না করে তিন বছর অপেক্ষা করবে তারপর নিজেই তার স্বামী ঠিক করে নেবে।

আসলে হিন্দুরা পবিত্রতার নামে শুচি শুচি করে এমন দূরবস্তুর মধ্যে সব কিছু নিয়ে গেছে যে অনেক কিছুকে আমরা সহজ ভাবে গ্রহণ করার সুবিধাটুকু পাইনা। যেহেতু সন্ন্যাসীদের অনেক কিছু আলোচনা করতে নেই বলে কিছু কিছু শ্লোক ছেড়ে ছেড়ে আসতে হয়েছে। যেমন বিবাহের পূর্বে গর্ভের সন্তান কার হবে, এই নিয়ে পর পর বেশ কিছু শ্লোকে মনু বলে গেছেন। বিধিপূর্বক সন্তানের ক্ষেত্রে আলোচনার তো কিছু নেই। যেমন কোন অবিবাহিত কন্যার গর্ভে একজনের সন্তান এসেছে, এই অবস্থায় তার বিয়ে হচ্ছে অন্য আরেকজনের সাথে। এখন এই সন্তান কার হবে? অথবা ডিভোর্স হয়ে গেছে, তারপর আরেকজনের সাথে বিয়ে হল। তখন কি হবে? এই রকম বিরাট লম্বা তালিকা আছে, আর সেখানে মনু পরিস্কার বলে দিচ্ছেন, এই এই ক্ষেত্রে সন্তান অমুকের হবে, ওই ওই ক্ষেত্রে সন্তান অমুকের হবে ইত্যাদি। কিন্তু ঘুরে ফিরে সব ক্ষেত্রে বলবেন শেষ পর্যন্ত যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে সন্তান তারই হবে। শুধু সন্তানের নামটা পাল্টে যাবে, একটা ক্ষেত্রে বলবে সে অমুকের ঔরসজাত সন্তান, অন্য ক্ষেত্রে বলবে গানীর পুত্র ইত্যাদি। কিন্তু যে ওই কন্যাকে বিয়ে করছে, এমনকি কোন গর্ভবতী স্ত্রী তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করল, এবার ওই সন্তান কিন্তু যাকে বিয়ে করল তার নামেই পরিচিত হবে। কিংবা অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে গর্ভাবস্থায় বিয়ের পর যে সন্তান হবে যাকে বিয়ে করল সন্তান তারই হবে। এরই উদাহরণ হল আমাদের মহাবীর হনুমান। হনুমান হলেন বায়ু দেবতার ঔরস পুত্র, কিন্তু তাঁর পরিচিতি বাবা কেশরীর নামেই হয়েছেন। এই ব্যাপারে মনু একেবারে স্পষ্ট। কিন্তু

আমাদের দেশ পবিত্রতা পবিত্রতা করে এগুলোকে একেবারে সামাজিক ঘৃণার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথমে গেল সন্তানের ব্যাপারে, দ্বিতীয় এসে গেল বিয়ের ব্যাপারে। কারণ সন্তানের যদি সমস্যা না থাকে তাহলে বিয়ের সমস্যাও থাকে না। কিন্তু পবিত্রতার নামে এগুলোকে এমন সামাজিক অমর্যাদায় ফেলে দেওয়া হয়েছে যে বাবা-মায়েরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, আমার মেয়ের বিয়ে হবে কিনা, আমার মেয়ে কারোর পাশায় পড়ে যাবে কিনা। পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে এই ভয়েই তারা গর্ভাবস্থাতেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। একটা জাতি যখন অনেক দিন ধরে গোলাম থাকে তখন এই দুরবস্থাই হয়। আমাদের দেশ দীর্ঘ দিন মুসলমানদের গোলামী করেছে, তারপর ইংরেজদের গোলামী করেছে। কিন্তু হঠাৎ সব ফাঁকা হয়ে যেতেই এই বাঁদরামো গুলো অনেক কমে গেছে। এরপর মেয়ের বিয়ের বয়স নিয়ে মনু বলছেন –

ত্রিশদ্বর্ষোদ্ধেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।

ত্র্যষ্টমবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।।৯/৯৪

বলছেন ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ বারো বৎসর বয়সের মনোমত কন্যাকে বিবাহ করবে। তার মানে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে আঠারো বছরের পার্থক্য রাখা হয়েছে। আমাদের ঠাকুরেরও তাই, ঠাকুরের বয়স যখন তেইশ বৎসর তখন শ্রীশ্রীমায়ের বয়স পাঁচ বৎসর। যদি পুরুষের বয়স চব্বিশ বৎসর হয় তাহলে মেয়ের বয়স আট হতে হবে। এখানে ষোল বছরের তফাৎ। এগুলো ওনাদের বিচিত্র ধারণা ছিল, ষোল বছরে মেয়ের বিয়ে মনু কাছে কল্পনাই করা যায় না। যা হবার বারো তের বা আট বছরের মধ্যে করে ফেলতে হবে। আরেকটি শ্লোকে বলছেন –

দেবতাদের কৃপাতেই নারী স্বামী লাভ করে

দেবদত্তাং পতিভার্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্ননঃ।

তাং সাধ্বীং বিভ্রায়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্।।৯/৯৫

যে কোন নারীই যখন তার স্বামীকে লাভ করে সেটা একমাত্র দেবতাদের কৃপাতেই সম্ভব হয়, শব্দটা হল দেবদত্তাং, দেবতারা দেন। এই দেবতা এখন প্রজাপতিরা হতে পারেন, ইন্দ্রাদি দেবতারা হতে পারেন বা সূর্যাদি দেবতারও হতে পারেন। মনু অত কিছু না বলে শুধু বলছেন দেবদত্তাং, দেবতাদের দেওয়া। মানুষ কখনই নিজের ইচ্ছাতে কাউকে বিবাহ করতে পারে না, বিবাহ সব সময় দেবতাদের ইচ্ছাতেই হয়। এর আগেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, মনুর কাছে ঈশ্বর বলে কোন ধারণাই ছিল না, ঈশ্বরের ব্যাপারে তিনি কিছু জানেনই না। ভাগবত ধর্মে ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান এবং তিনি ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন। মনুর কাছে এই ধরণের কোন ঈশ্বর বলে কিছু আছে বলে কোন ধারণাই নেই, তাই মানেনও না। মনু একদিকে মানছেন নির্গুণ ব্রহ্মকে আর অন্য দিকে মানছেন দেবতাদের। ব্রহ্মা হলেন মনুর কাছে আদিকর্তা, সেইজন্য তিনি দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মা ঈশ্বর নন। ঈশ্বরকে আমরা যে ভাবে বুঝি ও জানি, সেইভাবে ঈশ্বর ব্যাপারটা মনুর কাছে অজানা। সেইজন্য যখনই কোন উচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বের কথা আসে মনু সব সময়ই সেখানে দেবতা শব্দটা ব্যবহার করেন। আর যখন জ্ঞানের ব্যাপার আসে তখন শুদ্ধ চৈতন্য, যে চৈতন্য আপনার আমার সবার ভেতরে অন্তর্ধর্মী রূপে বিরাজ করে আছেন, তিনি আর সেই নির্গুণ ব্রহ্ম এক, এই ভাবটাকে নিয়েই মনু চলেন। কিন্তু তার সঙ্গে যোগীদের যে ভাব, যেখানে আত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্মের মিলনের কথা বলা হয়, বিন্দু যেমন সিন্দুর সঙ্গে মিলে যায়, যোগের এই ভাবটা মনুস্মৃতিতেও এসেছে। জীবনের উদ্দেশ্য হল, আমাদের ভেতরে যিনি অন্তর্ধর্মী আছেন তিনি কিভাবে সর্বাঙ্গক হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন, এই ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ ব্রহ্ম। যদিও মনু প্রথমেই দিকে স্থূল জগৎ, সগুণ ব্রহ্মের কথা বলছেন কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বলতে আমরা যা বুঝি সেই ভাব মনু কখন গ্রহণ করবেন না। মনুর কাছে দেবতাই সর্বোপরি। এটা আশ্চর্যের যে, যদিও উপনিষদে বিশেষ করে মুণ্ডকোপনিষদেও ঈশ্বরের ধারণা বা ঈশ্বরের অবতারণা এসেছে, কিন্তু তাও মনু ওই দিকে একেবারেই যাচ্ছেন না, আর সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে এই জিনিষটা মনুর চিন্তার বাইরে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সব কিছু হচ্ছে,

এই জিনিষটা তিনি জানেনও না আর মানেনও না। তিনি বলবেন – দেবতারা আছেন, এক একজন দেবতাদের উপর এক এক ধরনের কাজের দায়ীত্ব দেওয়া আছে, আর তাঁদের ইচ্ছাতেই সব হয়। সেইজন্য নিজের ইচ্ছা বলতে কিছু নেই, সব দেবতাদের ইচ্ছাতে হয়, সেখানে তখন সব কিছু আরও সহজ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয় এই ধারণাটাও এই চিন্তা-ভাবনা থেকেই এসেছে। একদিকে এই তত্ত্ব, যেখানে বলা হচ্ছে চৈতন্য ছাড়া কিছু হয় না, সেই চৈতন্য হলেন ব্রহ্ম, সেই চৈতন্যই ঈশ্বর, সেইজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। অন্য দিকে দেবতারা হলেন মানুষের থেকে বেশী ক্ষমতাসালী। রাজা যেমন তার প্রজার থেকে বেশী শক্তিশালী। আবার রাজায় রাজায় লড়াই হয়, ঠিক তেমনি দেবতাদের মধ্যেও লড়াই হয়। সেইজন্য যদিও দেবতারা মানুষের থেকে ক্ষমতা আর শক্তিতে বড় কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেক দুর্বলতা আছে। গ্রীক দেবতারাও ঠিক এই রকম। কিন্তু গ্রীক দেবতারা পরস্পরের মধ্যে অনেক বেশী লড়াই মারামারি ঝগড়া করে, তাদের মধ্যে হিংসা, লোভ এগুলো আছে। অন্য দিকে হিন্দু দেবতাদের মধ্যে সেইভাবে হিংসা মারামারি ঝগড়া হয় না। এখানে অসুরদের সাথে দেবতাদের লড়াই হয়। অসুরদের আবার মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এসব দিক দিয়ে গ্রীক দেবতা আর হিন্দু দেবতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, যদিও এই দুই সভ্যতার দেবতাদের ধারণার মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়।

মনু বলছেন, দেবতাদের ইচ্ছাতেই যখন সব কিছু হয়, আমাদের ইচ্ছাতে কিছুই হয় না সেইজন্য তুমি কি করবে? যদি তোমার সাধ্বী স্ত্রী হয় তাহলে ওই দেবতাকে খুশী রাখার জন্য, বস্ত্র, অঙ্গের আভূষণ, অঙ্গরাগ ইত্যাদি দিয়ে সব সময় সন্তুষ্ট রাখবে। কারণ এই সাধ্বী স্ত্রীর সাথে তোমার বিবাহ দেবতার ইচ্ছাতেই হয়েছে, বাবা-মা কিংবা তোমার ইচ্ছাতে হয়নি। দেবতারা চেয়েছেন সেইজন্য তার সাথে তোমার বিবাহ হয়েছে। এর আগেও মনু বলেছেন যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ, যে গৃহে নারীকে সম্মান ও পূজা করা হয় সেখানেই দেবতারা বাস করেন। কেন দেবতারা সেই গৃহে বাস করেন? কারণ দেবতাদের ইচ্ছাতেই বিয়ে হয়।

সংক্ষেপে দাম্পত্য ধর্ম

অন্যোন্য়স্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।

এষঃ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ।।৯/১০১

বিবাহ ধর্মটা কি? যেখানে নারী ও পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটা জীবনকে অতিবাহিত করার জন্য বেছে নিয়েছে, সেই জীবনের ধর্মটা খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় – আমৃত্যু ভাৰ্যা ও পতি পরস্পর পরস্পরের প্রতি ব্যভিচার করবে না। তার মানে, যত রকমের ধর্ম কার্য হচ্ছে সেখানে তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও পার্থক্য থাকবে না। আগেকার দিনে প্রত্যহ যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম হত তাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই অংশগ্রহণ করতে হত। ইদানিং বাড়িতে যে কোন ধর্ম কার্য হচ্ছে সেখানে যেন কোন ধরনের পার্থক্য না হয়, মানে কোন কাজই উভয়ের একজন আর একজনকে বাদ দিনে যেন না করে। অনেক শাস্ত্রেও তাই বলা হয় যে, ধর্ম, অর্থ এবং কাম কোন কাজেই পত্নীকে লঙ্ঘন করা অর্থাৎ তাকে বাদ দেওয়া চলবে না। স্বামী যে ধর্মকার্য করবে সেখানে স্ত্রীকেও তার পাশে রাখতে হবে, আবার অন্য দিকে স্ত্রী যা ধর্ম কার্য করবে সেখানে স্বামী এক সঙ্গে সেই কার্য করবে। এইখানে যেন কোন ধরনের ব্যভিচার না হয়। ব্যভিচার মানে ব্যতিরেক না হওয়া। স্বামী যদি বলে আমি তীর্থে যাব, স্ত্রীও স্বামীর সাথে যাবে। স্ত্রী যদি বলে আমি যাবো না, তখনই ব্যভিচার হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি বলে আমি তীর্থে যেতে চাই তখন স্বামীও সম্মত হয়ে স্ত্রীর অনুগামী হয়ে তীর্থে যাওয়া উচিত। স্বামীর একটা যজ্ঞ করার ইচ্ছে হয়েছে, একটা বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে পূজা করার ইচ্ছে হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই দুজনকে এক সঙ্গে করতে হবে। ঠাকুরও বলছেন স্বামী স্ত্রী দুজনে যদি সম মনোভাবাপন্ন হয় তাহলে দুজনেরই উন্নতি হয়। কিন্তু এই ধরনের সম মনোভাবাপন্ন স্বামী-স্ত্রী খুব কম দেখা যায়। স্বামী হয়তো খুব ধর্মপ্রাণ, কিন্তু স্ত্রীর এদিকে কোন মনই নেই, সারাদিন স্বামীকে গালগাল দিতে থাকে – বাবা-মা দেখেগুনে কেন যে এমন লোকের সাথে আমার বিয়ে দিল! আবার উল্টোটাও হয়, স্ত্রী খুব ভক্তিমতি কিন্তু স্বামী শুধু আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই থাকে। এদের দুজনের যন্ত্রণার আর শেষ নেই। এটা তো বিয়ের আগে জানার কোন

উপায় নেই। কিন্তু বিয়ের পর কি হবে? সেইটাকে এখানে আটকান হচ্ছে। আটকে দিয়ে আদেশ করে দিচ্ছেন, দেবতাদের ইচ্ছাতেই তোমাদের বিবাহ হয়েছে, তাই দেবতাদের খুশী রাখার জন্য ধর্মকর্ম দুজনে এক সঙ্গে করে। ধর্মকর্ম একসাথে করা, এটাই হল সংক্ষেপে দাম্পত্য ধর্ম। এরপর বলছেন পৈত্রিক সম্পত্তির বিভাজন কিভাবে হবে –

পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাজনের নিয়ম

উর্দ্ধং পিতৃশ্চ মাতৃশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।

ভজেরন্ পীতৃকং রক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ।।৯/১০৪

বাবা-মার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা সবাই মিলে পৈত্রিক সম্পত্তি সমান সমান ভাবে বিভাজন করে নেবে। বাবা-মা যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন ভাইদের এই সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকবে না আর পৈত্রিক সম্পত্তির বিভাজনও হবে না। ঠাকুর কথামতে বলছেন – কেউ যদি খুব চেষ্টামেচি করে, নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তখন বাবা তার হিস্যাটা আগেই দিয়ে দেয়। বাবার যা কিছু আছে তার হিস্যে তার সন্তানেরা পাবে, আর সেটা সমান সমান ভাগেই হয়। এরপর দ্বিতীয় একটা উপায় বলছেন, এই রকম জিনিষ না করে অন্য একটা জিনিষ করা যেতে পারে –

জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।

শেষান্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা।।৯/১০৫

যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই বাবার স্থান নিয়ে নেবে। তিনি আগের মতই দেখাশোনা করবেন। বাকী ছোটভাইদের সবাইকে বাবা যেমন প্রতিপালন করছিলেন সেইভাবে তাদের দেখাশোনা করবে, খাওয়া-পড়া দেবে। সম্পত্তির বিভাজন যে করতেই হবে তা নয়। তবে যেটা প্রায়ই দেখা যায়, একট প্রজন্ম, দুটো প্রজন্ম বা তিনটে প্রজন্ম এই রকম একসঙ্গে চলতে থাকল কিন্তু একটা প্রজন্মে এসে অনেক রকম সমস্যার উদ্ভব হয়, এমন সমস্যা সৃষ্টি হয় যে তখন ওই বিভাজনটা ভেঙে দেওয়াটা মঙ্গলই মনে করা হয়। আর বাবারও সমস্যা হয়, আমি বেঁচে থাকতে সম্পত্তি কি করে বিভাজন করি! কিন্তু এটাই পরে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করে। এখানে দুটো বিধান দিচ্ছেন – একটা হল সমান ভাগে সম্পত্তি বিভাজন করে দাও আর দ্বিতীয় বিধান দিচ্ছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতার স্থান নিয়ে সেই সব কিছু দেখাশোনা করবে। কিন্তু সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খুব ভালো না হলে, তার স্ত্রী খুব ভালো না হলে অনেক সমস্যার উদ্ভব হওয়াটা খুব বিচিত্র নয়।

আবার বলছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে থেকে যদি এই রকম করা হয়, দেখা যায় তখন এটাই সব দিক থেকে ভালো হয়। যেটা আমরা পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে দেখি, যুধিষ্ঠির হলেন রাজা আর তার অধীনে সবাই আছে। কিন্তু আবার বলছেন, যদি তারা আলাদা হয়েও ধর্মকর্ম করতে থাকে সেটাও ভালো এবং তাও ধর্ম সম্মত। তার মানে ভাইরা যদি আলাদাও হয়ে যায় তাতে কোন দোষ নেই। স্মৃতিকাররা চাইতেন বড় যিনি তাঁর অধীনেই সবাই এক হয়ে থাকুক আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই যেন সব কিছু সামলায়। কিন্তু কোন কারণে যদি বলে আমরা আলাদা হয়ে থেকে সৌহার্দ্য বজার রেখে চলব, তাতেও এনারা আপত্তি করছেন না। এসব বলার পর পৈতৃক সম্পত্তির বিভাজনের আরও অনেক কিছু নিয়মের কথা বলছেন। কিন্তু এগুলো এখন আর প্রচলিত নয় আর এখন নিয়মই হয়ে গেছে সবাইকে সমান অংশ দিতে হবে। তখনকার দিনে অবশ্য অন্য রকম নিয়ম ছিল, যেমন এই শ্লোকে বলছেন –

একাধিকং হরেজ্যেষ্ঠঃ পুত্রোহধ্যর্দ্ধং ততোহনুজঃ।

অংশমংশং যবীয়াংস ইতি ধর্মো ব্যবজিতঃ।।৯/১১৭

পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির দুই অংশ নেবে, তার মানে বড় ভাই সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে। আর অবশিষ্টাংশ থেকে দ্বিতীয় পুত্র অর্থাৎ মেজভাই দেড় ভাগ পাবে, তারপরের যে ভাই সে এক

ভাগ নেবে – দুই, দেড় আর এক। বলছেন এটাই ধর্ম। এই শ্লোকটি আমাদের কাছে এখন তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে জ্যেষ্ঠকে কেন বেশী দিতে বলছেন? আমাদের হিন্দু সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে খুব বেশী সম্মান দেওয়া হয়, এখানেও দাদাকে বেশী সম্পত্তি দিতে বলা হচ্ছে। আসলে পরিবারে যে নিয়মিত ধর্মকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সেগুলো বড়ভাইই দায়ীত্ব নিয়ে সম্পন্ন করেন। যেমন শ্রাদ্ধাদি কর্ম, এটা জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই দায়ীত্ব। ছোট ভাই শ্রাদ্ধাদি কর্ম করতে যদি পিছিয়ে যায়, যদি কোন সাহায্য না করে সেখানে দাদার কিছু করার নেই, ওটা দাদাকেই করতে হবে। সেই কারণে দাদাকে বেশী অংশ দেওয়া হচ্ছে। এখন অবশ্য এই বিধানকে কেউ মানে না।

স্বেভ্যোহংশেভ্যস্ত কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।

স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিগসবঃ।।৯/১১৮

বলছেন, প্রত্যেক ভাই যে যার অংশে যা পেয়েছে তার চতুর্থাংশ তার অবিবাহিত বোনকে দিয়ে দেবে। সহোদরাকে সরাসরি সম্পত্তির কোন অধিকার দেওয়া হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু অন্য দিকে ঘুরিয়ে তাকেও অধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমরা ধরে নিলাম তিন ভাই আছে, আর একটি বোন আছে। বড় ভাই দুই ভাগ, আর বাকি দুজন এক ভাগ করে পেল। এবার বড় ভাইকে, যে দুই ভাগ পেয়েছে, সেখান থেকে অবিবাহিত বোনকে চার ভাগের এক ভাগ দিতে হবে, আবার বাকি দুই ভাইয়ের অংশ থেকে চার ভাগের এক ভাগ করে বোনকে দিতে হবে। দেখা যাবে ছোট ভাইয়ের থেকে বোন বেশী অংশের অধিকার পেয়ে গেছে। বিবাহিতা বোনকে কিছু দিতে বলা হচ্ছে না, কারণ বিবাহিতা বোনকে বিয়ের সময় যা দেওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অজাবিকং সৈকশফং ন জাতু বিষমং ভজেৎ।

আজাবিকন্তু বিষমং জ্যেষ্ঠস্যৈব বিধীয়তে।।৯/১১৯

বলছেন পশুধন এইভাবে বিভাজন করা হবে না। বড় ভাইই সব পশুধন পাবে। তবে বড় ভাই ইচ্ছে করলে সেখান থেকে কিছু পশুর মূল্য ভাইদের দিতে পারে। এই নিয়মগুলো এখন আর চলে না। এছাড়া বলছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যদি সন্তান না থাকে, নিয়োগ বিধিতে যদি সন্তান এসে থাকে তখন কি করবে ইত্যাদি। এখানে আরেকটি শ্লোকে বলছেন –

শ্রাদ্ধাদি কর্মে দৌহিত্রের অধিকার

পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোহস্তি ধর্মতঃ।

তয়োহি মাতাপিতরৌ সন্তুতৌ তস্য দেহতঃ।।৯/১৩৩

সংসারে জাগতিক যে ক্রিয়াকর্মাদি হয় তাতে পুত্র আর দৌহিত্র মানে নাতির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মনু বলছেন পুত্র যেভাবে উৎপন্ন হয় দৌহিত্রও একই ভাবেই উৎপন্ন হয়। মহাভারতেও এই সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যার শুধু কন্যাই আছে, তার শ্রাদ্ধকর্মাদি কিভাবে হবে? তখনকার দিনে ওনাদের কাছে এটা এক বিরাট সমস্যা ছিল। সেইজন্য সবাই চাইত তার যেন পুত্র সন্তান হয়। মহাভারতেই পরে বিধান দিয়ে দেওয়া হল, মেয়ের পুত্র সন্তান পুত্রের সমান। সেই থেকে বিধান হল, দৌহিত্র সব কর্ম করতে পারবে, শ্রাদ্ধকর্ম, পিতৃকর্ম যা কিছু আছে সব করতে পারবে। হিন্দুদের কাছে পরিষ্কার – মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয় না, মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লোকে গতি হয়তো হবে কিন্তু তার আগে কিছু দিন তোমার পিতৃদের আত্মা ছটফট করবে, তাদের শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ পিতৃকর্মাদি করতে হবে। এই কর্ম সম্পন্ন করার দায়ীত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রের। পুত্র যদি না থাকে তাহলে কে করবে? দৌহিত্র করবে। ইদানিং তো মেয়েরাও এগিয়ে এসে ইচ্ছা প্রকাশ করছে আমরাও শ্রাদ্ধাদি কর্ম করব। অনেক জায়গায় এখন মেয়েদেরকেও শ্রাদ্ধাদি কর্মের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে এটা কতটা ভুল কতটা ঠিক কে বলবে? এগুলোর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। দৌহিত্রকে যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, এটা কে অনুমতি দিচ্ছেন? মহাভারতের কাহিনীতে যযাতির কন্যা মাধবীর কিছু

সমস্যা যখন হল তখন যথাতি বলে দিলেন আজ থেকে নিয়ম করে দেওয়া হল দৌহিত্রও শ্রাদ্ধাদি কর্ম করতে পারবে। সূতি মানেই তাই, সূতির কোন বিধানের কোন মূল্যই নেই যতক্ষণ না কোন ঋষি কিছু বলে দিচ্ছেন। ঋষি যেটা বলে দিলেন সেটাই বিধান হয়ে গেল। সেইজন্য এগুলোর খুব বেশী মূল্য নেই। আমরা যে বলছি মনুস্মৃতিতে স্ত্রীদের রক্ষার অধিকার নেই ইত্যাদি। ঠিকই বলছি, স্মৃতিতে এই রকম বিধান আছে। আমরা তো একটা কার্যের বৃক্ষ, তার যে শাখা, তার যে ফল এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু তার শেকড়ে যদি যাই তখন কি পাই? সেখানে বলছেন পিতৃগণের আত্মার একটা সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি চাই। ছেলে ও দৌহিত্র কেউই নেই তার। তাহলে কি করে চলবে? একটা কারুকে অধিকার দিয়ে দিলেই হল, আপত্তির কি আছে! শুধু এই বিধানকে একজন Man of Authority কেউ বলে দেবেন। তিনি বলে দিলেই হয়ে যাবে। সূতির বিধানগুলোর শেকড়ে গেলে বোঝা যায় এগুলো কিভাবে তৈরী হয়েছে। এগুলো হল ঋষি বাক্য। তবে এটাই জীবন-দর্শনের মৌলিক কিছু নয়। দ্বিতীয় কথা হল, ঋষি বাক্য কালে কালে পাল্টাতে থাকে। সেইজন্য কেউ যদি authority নিয়ে বলে দেন এটা করা যায়, তখন করে দিলেই হল। ছেলে আর মেয়ের সমান অধিকার বলে আমরা যেটা মনে করি সেই ভাবে এখানে দৌহিত্রকে শ্রাদ্ধাদি কর্মে অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। এটা কিছুটা এসেছে আপত্ধর্ম থেকে, দ্বিতীয় ঋষি যদি অনুমতি দিয়ে দেন তাহলে তো হয়েই গেল। ঠাকুর, স্বামীজীর মত যাঁরা বর্তমান যুগের ঋষি, তাঁরা এই ব্যাপারে কিছু বলেননি। কিন্তু স্বামীজী মেয়েদের সমান অধিকার দেওয়ার সব সময় পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজীকে আধার করে এখন যদি আমরা বলি হ্যাঁ মেয়েদের অধিকার আছে, তখন আর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যা নিযুক্তান্যতঃ পুত্রং দেবরাদ্বাপ্যাবাপুয়াৎ।

তং কামজমরিক্থীয়ং বৃথোৎপন্নং প্রচক্ষতে।।৯/১৪৭

মনু আবার বলছেন, কোন স্ত্রীর সন্তান আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কামবশাৎ বা লোভবশাৎ নিয়োগ বিধিতে সেই স্ত্রীর যদি কোন সন্তান উৎপন্ন হয় সেইক্ষেত্রে সেই সন্তানের কিন্তু সম্পত্তির অধিকার থাকবে না। মনে করুন একজনের স্বামী মারা গেছে। তার দুটি সন্তান আছে। এখন তার বিধবা স্ত্রী বলল নিয়োগ বিধিতে আমি আরেকটি সন্তান চাই। অনুমতিও তাকে দিয়ে দেওয়া হল। এখন যে সন্তান হবে সেই সন্তানের পৈত্রিক সম্পত্তির কোন অধিকার থাকবে না। কিন্তু যদি তার আগে কোন সন্তান না থাকে তখন নিয়োগ বিধিতে যে সন্তান হবে সেই সন্তান তখন পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার পাবে। এইসব ব্যাপারে মনু খুব পরিস্কার ছিলেন। আবার একটা শ্লোকে খুব মজার ব্যাপার বলছেন –

চার বর্ণের স্ত্রীদের সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্যেণ চতস্রস্ত যদি স্ত্রিয়ঃ।

তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগোহয়ং বিধিঃ সূতঃ।৯/১৪৯

যদি কখনও এমন হয় যেখানে কোন ব্রাহ্মণের চারজন স্ত্রী আছে এবং চারজনই চার বর্ণের, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই সমস্যা তখনকার দিনেও ছিল, আইন যখন আছে তার মানে সমস্যাও ছিল। এই চার বর্ণের স্ত্রীদের সবার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মালে তাদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি বিভাজন কিভাবে হবে সেটা পরের শ্লোকে বলে দিচ্ছেন –

চতুরোহংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।

বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ।।৯/১৫৩

সমস্ত সম্পত্তিকে দশ ভাগ করে সেখানে থেকে ব্রাহ্মণ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সমস্ত ধন-সম্পত্তির চার ভাগ পাবে, ক্ষত্রিয় স্ত্রীর পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর পুত্র দুই অংশ ভাগ এবং শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র এক ভাগ পাবে। কারণ যে ব্রাহ্মণ এই রকম পর পর চারজনকে বিয়ে করেছে সে কিন্তু লোভবশাৎ করেছে। একটা বিয়ে করলেই তার হয়ে যেত কিন্তু তারপরও এই ভাবে বিয়ে করাতে তার স্ত্রীরা পরবর্তি কালে কষ্ট পাবে। এখন তাদের যার

যত সন্তান আছে সম্পত্তির বিভাজন সেই ভাবে হবে। এরপর সন্তান কত রকম ভাবে হতে পারে সেই ব্যাপারে মনু আলোচনা করছেন, যদিও এর অনেক কিছু এখন উঠে গেছে –

কত ভাবে সন্তান লাভ করা যায়

স্বৈ ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।

তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্।।৯/১৬৬

বিধিপূর্বক সমান বর্ণের সাথে যখন বিবাহ হয় এবং তাদের থেকে যে ধর্ম ভাবে পুত্র উৎপন্ন হয় সেই পুত্রকেই ঔরসপুত্র বলে।

যন্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা

স্বধর্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ সূতঃ।।৯/১৬৭

সন্তানহীন মৃত স্বামীর স্ত্রী বা নপুংসকের স্ত্রী অথবা অসাধ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রী শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ও গুরুজনদের আদেশে সপিণ্ড নিয়োগ বিধিতে যে পুত্রের জন্ম দিচ্ছে সেই পুত্রকে বলা হয় ক্ষেত্রজ পুত্র। সম্পত্তি বিভাজনের সময় ঔরস আর ক্ষেত্রজ পুত্ররা সম্পত্তির অধিকার পায়।

মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমন্ডিঃ পুত্রমাপদি।

সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সূতঃ।।৯/১৬৮

কোন স্বামী-স্ত্রীর যদি সন্তান না থাকে বা অপুত্রক হয় তাহলে তাদের বংশের উপযুক্ত কোন পুত্রকে তার বাবা মা যদি প্রীতিপূর্বক ভাবে জলপ্রোক্ষণ করে সন্তানহীন বাবা-মাকে দান করে বলে দেয় এই পুত্রকে তোমাদের দিলাম, তখন সেই পুত্রকে বলা হয় দত্তক পুত্র।

সদৃশং তু প্রকুর্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণম্।

পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ।।৯/১৬৯

স্বামী-স্ত্রীর যদি সন্তান না থাকে, তাদের যদি ধর্মকার্য করার কেউ না থাকে তখন নিজের জাতির কোন গুণবান পুত্রকে ভালোবাসা বশতঃ জল হাতে করে একটা সঙ্কল্প করে, ‘তুমি আমার পুত্র’ এই বলে গ্রহণ করে নেয় তখন সেই পুত্রকে বলে কৃত্রিম পুত্র। কৃত্রিম ও দত্তক মোটামুটি একই রকম। ১৮৫৭ সালে এই নিয়ে ইংরেজরা অনেক ঝামেলা করেছিল, তারা বলে দিল দত্তক পুত্রকে পুত্র বলে মানা হবে না। কিন্তু ইংরেজরা জানে না যে আমাদের পরম্পরাতে এটাই নিয়ম হয়ে চলে আসছে।

উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।

স গৃহে গৃঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্ যস্য তল্পজঃ।।৯/১৭০

বাড়িতে কোন মহিলার একটা সন্তান প্রসব হয়েছে, কিন্তু এই সন্তান ঠিক ঠিক কার সন্তান এই ব্যাপারে বাড়ির লোকের জানা নেই। সেই সঙ্গে কোন জাতির জানা নেই, কারুর সাথে কোন অবৈধ সম্পর্কে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে বা নিয়োগ প্রথায় কাউকে দিয়ে সন্তান উৎপন্ন হওয়ার পর ঠিক ঠিক জানা নেই লোকটি সমান জাতির কিনা বা অন্য কোন জাতির লোক কিনা। এই ধরনের পুত্রকে বলা হয় গৃঢ় পুত্র।

মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।

যং পুত্রং পরিগৃহীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে।।৯/১৭১

কোন মা-বাবা দুজনে মিলে কিংবা তাদের যে কেউ কোন পুত্রকে যদি ত্যাগ করে দেয় এবং সেই ত্যাজ্য পুত্রকে যদি অন্য কেউ পুত্র রূপে গ্রহণ করে নেয় তখন সে পুত্রকে অপবিদ্ধ পুত্র বলবে। মহাভারতে

কর্ণকে আমরা অপবিত্র পুত্র বলতে পারি। কুন্তি প্রথমে সন্তানকে ত্যাগ করে দিয়েছিল, পরে অধিরথ কর্ণকে গ্রহণ করে নিজের পুত্র রূপে মানুষ করেছিল। অধিরথ জানতও না এটা কার সন্তান, কোন্ বর্ণের সন্তান।

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।

তং কানীনং বদেন্নান্না বোদুঃ কন্যাসমুদ্ববম্।।৯/১৭২

যদি কোন অবিবাহিতা মেয়ে সন্তান প্রসব করে, ওই পুত্রকে বলে কানীনপুত্র। এই মেয়ে পরে যাকে বিবাহ করেছে সন্তান তারই হবে। এখানে টাইপটা পাল্টে গেছে। বিবাহের আগেই তার জন্ম হয়ে গেছে। তার মানে, কর্ণকে যদি কুন্তি ত্যাগ না করে সঙ্গেই রেখে দিত, তারপর পাণ্ডুর সাথে যখন বিয়ে হত তখন কর্ণ হত কানীনপুত্র। কিন্তু যেহেতু কুন্তি ত্যাগ করে দেওয়ার পর রাধা কর্ণকে পালন করেছিল সেইজন্য কর্ণ হয়ে গেল অপবিত্র পুত্র।

যা গর্ভিণী সংক্ষিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।

বোদুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে।।৯/১৭৩

কানীনপুত্র মানে, বিয়ের আগে সন্তান হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের আগেই কোন অবিবাহিতা মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গেছে এবং ওই অবস্থাতেই কোন ছেলে জাতায় বা অজাতায় সেই মেয়েটিকে বিবাহ করেছে। এরপর যে সন্তান হবে তাকে বলবে সহোঢ় পুত্র।

ক্রীণীয়াদ যন্তুপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্মমন্তিকাৎ।

স ক্রীতকঃ সূতন্তস্য সদ্শোহসদ্শোহপি বা।।৯/১৭৪

কেউ যদি নিজের অপত্য সম্পাদন করার ইচ্ছায় কোনও বাবা-মার কাছ থেকে অর্থের বিনিময় তাদের কোনও পুত্রকে ক্রয় করে নেয় এবং সেই পুত্র ক্রেতার সর্বগর্হী হোক বা অসর্বগর্হী হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই, এমন পুত্রকে বলা হয় ক্রীতপুত্র।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।

উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।।৯/১৭৫

যদি কোন স্ত্রী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয় বা বিধবা হয়। এরা যদি নিজের ইচ্ছায় পুনরায় অন্য পুরুষের ভার্য্যা হয়ে তার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে তখন সেই পুত্রকে বলা হয় পৌনর্ভব পুত্র। পুনর্ভব থেকে পৌনর্ভব এসেছে। আসলে দ্বিতীয় বিবাহকে বলা হয় পুনর্ভূৎ, মানে আবার বিয়ে হয়েছে। পুনর্ভূৎর যে সন্তান তাকে বলছেন পৌনর্ভব। আমাদের একটা ধারণা হয়ে আছে যে বিধবা বিবাহ প্রথা আগে ছিল না, কিন্তু এটা ভুল ধারণা, তখনকার দিনে বিধবারাও বিয়ে করতে পারত। তা নাহলে এই ধরনের বিধি তৈরী করা হত না। তাছাড়া ডিভোর্সের পরে দ্বিতীয় বিবাহও তখনকার দিনে মেয়েরা করতে পারত।

মাতাপিতৃবিহীনো যন্তুজ্ঞো বা স্যাদকারণাৎ।

আত্মানং স্পর্শয়েদ্ যস্মৈ স্বয়ংদত্তস্ত স সূতঃ।।৯/১৭৬

অন্য দিকে কোন মাতাপিতাহীন পুত্র বা অকারণে বাবা-মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, কিংবা পুত্র যদি নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকজনকে ধরে বলল আমি আপনার সন্তান তখন সেই সন্তানকে বলে স্বয়ংদত্ত পুত্র। স্বয়ংদত্ত মানে আমি নিজেকে আপনার কাছে দিয়ে দিলাম। এখানে বাবা-মা ছেলেকে ধরেনি, ছেলে গিয়ে বাবা-মাকে ধরেছে। আমার কেউ নেই আপনারই আমার সর্বস্ব, এইভাবে যদি কেউ বলে তখন তাকে স্বয়ংদত্ত বলছেন। পরের শ্লোকে আবার অন্য ব্যাপারে বলছেন –

যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সূতম্।

স পারয়ন্নেব শবন্তস্মাৎ পারশবঃ সূতঃ।।৯/১৭৮

উচ্চবর্ণের পুরুষের শূদ্রা নারীর পাণিগ্রহণে মনুর যে কি প্রচণ্ড আপত্তি ছিল এইসব শ্লোকে বোঝা যায়, মহাভারতেও আমরা এই ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাই। বলছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি কেউ যদি শূদ্রা স্ত্রীকে বিয়ে করে, তারপর সেই শূদ্রা স্ত্রীর যে পুত্র হবে তার ধর্মকর্মে কোন অধিকার থাকবে না। বলছেন, এই ধরনের ছেলে মরার মত, সেইজন্য এই ধরনের শূদ্রাজাত পুত্রকে বলা হত পারশব।

এই যে এত ধরনের সন্তানের বর্ণনা করা হল, এরপর এদের নিয়ে অনেক আইন, বিধি তৈরী করা হয়েছে। এই ধরনের পুত্র এই এই করতে পারবে, এই পুত্র সেই করতে পারবে ইত্যাদি। এগুলো আমরা আলোচনা করলাম এই কারণে যে, আমাদের পূর্বজরা এই জিনিষগুলোকে কিভাবে দেখতেন, বিধবা নারীর বিবাহ, ডিভোর্স স্ত্রীর পুনর্বিবাহকে কিভাবে দেখতেন। আমরা অনেক সময় ভাবি তখন ডিভোর্স ছিল না, না পুরোদমেই ছিল তখন বলা হত পরিত্যক্তা। এখানে এটা বলা হচ্ছে না স্ত্রী স্বামীকে ছাড়তে পারে না, কিন্তু খুবই পারত, ছেড়ে দিলেই হল, ছেড়ে দিয়ে আবার আরেকজনকে বিয়েও করতে পারত। তার পরবর্তি সন্তানকেও শাস্ত্র স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছেন পৌনর্ভব নাম দিয়ে। এরপর বলছেন –

স্ত্রীধনে কার কার অধিকার ও তার বিভাজন

জনন্যাং সংস্থিতায়াস্তু সমং সর্বং সহোদরাঃ।

ভজেরন্মাতৃকং রিকৃথং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ।।৯/১৯২

মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের যা কিছু স্ত্রীধন থাকবে সেটা তার ছেলে ও মেয়ে যে কজন আছে সবাই সমান সমান পাবে। পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তির বিভাজন আলাদা নিয়মে হবে, যেটা আমরা আগেই আলোচনা করে নিয়েছি। কিন্তু মায়ের সম্পত্তি সবটাই নিজের সন্তানদের মধ্যে পুত্র ও কন্যা সে বিবাহিতাই হোক আর অবিবাহিতাই হোক, সমান ভাবে বিভাজন হবে। এতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমাদের পরম্পরাতে পিতার সম্পত্তি আর মাতার সম্পত্তিকে পুরো আলাদা ভাবে দেখা হত। আবার বলছেন –

যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্থতঃ।

মাতামহ্যা ধনাং কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্বকঃ।।৯/১৯৩

আরও মজার হল, যদি কোন অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে তাকেও দিদিমার ধন থেকে কিছু কিছু অংশ দিয়ে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এরপর স্ত্রীধন নিয়ে বলছেন –

স্ত্রীধন কিভাবে আসে

অধ্যগ্ন্যাধ্যবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।

ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্ভবিধং স্ত্রীধনং সূতম্।।৯/১৯৪

এই যে মায়ের সম্পত্তি বন্টনের কথা বলা হয়। স্ত্রী যদি মারা যায় তার সম্পত্তি স্বামী কোন দিন পাবে না, তার ছেলেরা পাবে, তার মেয়েরা পাবে আর অবিবাহিতা নাতনীরা পাবে। মায়ের এই সম্পত্তি কোথা থেকে আসে? অধ্যগ্নি, বিবাহের সময় অগ্নিকে সাক্ষী করে কন্যার বাবা যা কিছু কন্যাকে উপহার দেয়, তাকে অধ্যগ্নি বলা হয়, এটাই স্ত্রীধন। মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে যখন কিছু জিনিষ পাঠিয়ে বলে দেয় এটা আমার মেয়ের জন্য তখন সেটা স্ত্রীধন বলে গণ্য হবে। মেয়ের বাবা হয়তো জামাইকে কিছু টাকা-পয়সা কিংবা কিছু জমি-জায়গা দিলেন তারপর বললেন – এই জমি-জায়গা আর এই টাকা সব তোমাদের দুজনের জন্য। কিন্তু তার মধ্যে যদি নির্দিষ্ট করে বলে দেন জমির এই অংশটা বা এই হাজার টাকা আমার মেয়ের জন্য, বলে দেওয়া মানেই হল ওই জমি বা টাকা স্ত্রীধন হয়ে গেল, ওই জমি বা টাকার উপর স্বামীর আর কোন অধিকার থাকবে

না। যদি কোন শুভদিনে স্বামী কিছু জিনিষ স্ত্রীকে উপহার স্বরূপ দেয়, এটাও স্ত্রীধনের মধ্যে চলে আসবে। মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে যদি তার দাদা, ভাই, মা কিংবা বাবা বিভিন্ন উপলক্ষে বা বিভিন্ন সময়ে উপহার স্বরূপ বা ভালোবেসে তাকে যদি কিছু দিয়ে থাকে সেটাও স্ত্রীধন রূপে পরিগণিত হবে। তার মানে বিয়ের সময় যা কিছু পাবে, আর পরে যখন যখন বাপের বাড়ি থেকে যা কিছু পাবে সবটাই স্ত্রীধনের মধ্যে চলে আসবে। তার সাথে তার স্বামীও যদি বিভিন্ন সময় ভালোবেসে স্ত্রীকে কিছু কিছু উপহার দিয়ে থাকে সেটাও স্ত্রীধন।

অস্বাধেয়ঃ যদন্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ।

পতৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদনং ভবেৎ।।৯/১৯৫

বিয়ের পরে স্ত্রী তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি থেকে যা কিছু পাবে সেই ধনকে বলা অস্বাধেয়। স্বামীর কোন সময়েই অধিকার নেই এই স্ত্রীধনে হাত দেওয়ার। স্ত্রী যখন মারা যাবে তখন স্ত্রীধন তার ছেলে, মেয়েরা সমান ভাবে পাবে আর কিছু কিছু অংশ অবিবাহিতা দৌহিত্রী পাবে, এমনকি দৌহিত্রর কাছেও এই স্ত্রীধন যায় না, একমাত্র অবিবাহিতা নাতনীর কাছেই যেতে পারে।

ভারতে এখন স্ত্রীধনের আইনের অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। দহেজ অর্থাৎ পণ দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার বিয়ে যদি ভেঙে যায় তাহলে মেয়ের বাবা কিংবা মেয়ে পুরো টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবে। অনেক দিন আগে একটা মামলা হয়েছিল। একজন মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুর শাশুড়িরা তার উপর খুব অত্যাচার শুরু করে দিল। সেখান থেকে সে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। বাপের বাড়িতে এসে নিজে খেটেখুটে পড়াশোনা করে ভালো পাশ করে চাকরী জুটিয়ে ভালো টাকা জমিয়েছে। কপাল এমন সেই মহিলা এবার মারা গেল। এবার সেই মহিলা যা কিছু টাকা-পয়সা জমিয়েছিল, লকারে যা গয়না রেখেছিল সেগুলোর দাবিদার হয়ে ওর বাবা-মা কোর্টে গেল, মেয়ে আমার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে চাকরি পেয়েছে। অন্য দিকে শ্বশুর বাড়ির লোকরাও মামলা ঠুকে দিয়েছে। জজ সাহেব খুব দুঃখ করে বলছেন – মানবিকতার আবেগের খাতিরে আমরা যাই বলি না কেন, এই সম্পত্তি শ্বশুর শাশুড়ির কাছেই যাবে। শেষ পর্যন্ত মেয়ের পুরো সম্পত্তি তার শ্বশুর শাশুড়িকে দিয়ে দিতে হল। অথচ তারা দিনের পর দিন তার উপর অত্যাচার করেছে, তার সন্তান হয়নি, বেচারী স্বামীর ভিটে ছাড়তে হয়েছিল। এইসব অনেক জটিল নিয়ম-কানুন আছে। তবে আমাদের বর্তমান হিন্দু বিবাহ আইনে আগের থেকে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে।

যৎকিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠৌহধিগচ্ছতি।

ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ।।৯/২০৪

বাবার মৃত্যুর পর অবিভক্ত অবস্থায় দাদা যা কিছু উপার্জন করবে ছোট ভাই যদি ছাত্রাবস্থায় থাকে তাহলে সেই উপার্জনের একটা অংশ পাবে। তার মানে বলতে চাইছেন, মনে করুন বাবার সময় তাদের দশ লাখ টাকার সম্পত্তি ছিল, বাবা মারা যাবার পর যৌথ পরিবারেই থাকছে। এবার দাদা উপার্জন করে আরও পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি ওর মধ্যে যোগ করেছে, মানে মোট পনের লাখ টাকার সম্পত্তি এখন দাঁড়িয়েছে। এরপরে সম্পত্তির বিভাজন হচ্ছে। এখন যে বিভাজন হবে সেখানে এই পুরো পনের লাখ টাকার উপর বিভাজন হবে। দাদা এটা বলতে পারবে না এই পাঁচ লাখ টাকা আমি আয় করেছি বলে আমার হবে। যৌথ পরিবার ছিল বলে বাবার সম্পত্তিতেই জমা পড়বে। দাদা মরে যাওয়ার পর যে বিভাজন হবে সেটাও ওই ভাবেই হবে।

বিদ্যাধনস্তু যদ্ যস্য তত্তসৈব ধনং ভবেৎ।

মৈত্র্যমৌদ্ধাহিকৈশ্চৈব মধুপর্কিকমেব চ।।৯/২০৬

বলছেন বিদ্যার জন্য, বন্ধুর কাছ থেকে, নিজের বিবাহলব্ধ থেকে এবং মধুপর্কের সময় পূজ্যতার জন্য যে যা ধন সম্পত্তি পায় সেটা তারই সম্পত্তি রূপে গণ্য হবে। যেমন কোন পণ্ডিত সন্ন্যাসী কোথাও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়ে যদি কিছু প্রণামী পায় সেটা তারই হবে, কারণ এটা তিনি বিদ্যার জন্যই পাচ্ছেন। ঠিক তেমনি বিবাহের

সময় পাত্র বা পাত্রী যা পাবে সেটা তাদেরই হবে, তাদের বাবা সেটা দাবী করতে পারবে না। বন্ধু যদি কিছু উপহার দিয়ে থাকে সেটা তারই থাকবে, বাবা নিতে পারবে না। সেইজন্য আপনি যদি কোন বাচ্চা ছেলেকে দুটো টাকা দেন সেটা ওরই টাকা হবে, বাচ্চার মা কখনই নিতে পারেনা।

অনেকদিন আগেকার একটা খুব মজার ঘটনা। এক দাদা তার বোনকে চার আনা পয়সা দিয়েছে। চার পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে। চার আনাটা ওর কাছে বিরাটা সম্পত্তি, সেটা সবাই মেনেও নিয়েছে। বাচ্চাটা গিয়ে চার আনা দিয়ে চুরন্, হজমোলা জাতীয় কিছু হবে, কিনেছে। তখনকার দিনে চার আনায় অনেকটা চুরন্ পাওয়া যেত। অত গুলো হজমোলা কিনেছে বলে মা গিয়ে মেয়েকে এক চড় মেরে খুব বকছে ‘পুরো পয়সা দিয়ে শুধু চুরন্ই কিনে এনেছে, এত গুলো হজমোলা খেলে পেট খারাপ হবে’ ইত্যাদি। স্মৃতির বিধান অনুযায়ী মা কিন্তু বাচ্চাকে চড় মারতে পারে না, কারণ এটা ওর সম্পত্তি, সেটা দিয়ে সে যা ইচ্ছা করতে পারে। মেয়ের পেট খারাপ হবে বলে বকছে না, অতগুলো পয়সার অপচয় হওয়াটাই মেজাজ খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ।

রাজধর্মের কয়েকটি অন্যান্য দিক

যাই হোক, স্ত্রী ধর্মের কথা বলতে বলতে মনু আবার কিছু কিছু রাজধর্মে এসে জুয়া খেলা নিয়ে বলছেন। জুয়া খেলাতে রাজাদের প্রচুর অর্থ আমদানি হত বলে জুয়া খেলাতে খুব উৎসাহ দেওয়া হত। নানান ভাবে জুয়া খেলা হত, কড়ি নিয়ে খেলা, পাখি ধরা, ছাগল ভেড়া এই ধরনের জন্তু দিয়ে লড়াই করান। বলছেন, এগুলোতে রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি হয়। মুসলমান সংস্কৃতিতে এই জিনিষগুলো খুব বেশী ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ জাফর যখন দিল্লীর বাদশা ছিলেন তখন তার বেশ কয়েকটি ফরমান ছিল, যেমন গরুর, মোষের লড়াই নিষিদ্ধ ছিল। কারণ তখন চারিদিকে লড়াই, মারামারির পরিস্থিতি চলছিল, তার মধ্যেই লোকেরা আমোদ আহ্লাদে ডুবে থাকবে, তাই এই ধরনের অনেক কিছু নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কুকুরের দৌড়, ঘোড়া দৌড় সব এর মধ্যেই পড়ে। আবার একটা শ্লোকে বলছেন অবধ্যকে বধ করলে রাজার যা পাপ হয়, ঠিক তেমনি যে বধ্য তাকে যদি দণ্ড না দেওয়া হয় রাজার একই পাপ হয়। এই ধরনের কিছু রাজধর্ম নিয়ে আলোচনা করছেন। একটা শ্লোকে রাজার স্তুতি করতে গিয়ে বলছেন –

কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি স জাগ্রদ্বাপরং যুগম্
কর্মস্বভূদ্যতপ্ত্রেতা বিচরংস্ত কৃতং যুগম্।।৯/৩০২

রাজা যদি আলস্য করে দিন যাপন করে, বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটায় তাহলে রাজ্যে কলিযুগ চলে। রাজা যদি জেগে থাকে অর্থাৎ রাজ্যের সমস্ত কিছু রাজার অবগত থাকে তখন রাজ্যে দ্বাপর যুগ চলে। রাজা যদি কর্মোদ্যমে নিযুক্ত হয়ে কর্ম করতে থাকে তখন রাজ্যে ত্রেতা যুগ চলে আর তিনি যখন সব কাজ যথা নিয়মে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী করে তখন রাজ্যে সত্যযুগ চলে। রাজা কিভাবে চলছে তার উপর এই চারটে যুগ নির্ভর করে। রাজার কাজই হল সব প্রজার দেখাশোনা করা, সাধু মহাত্মাদের দেখাশোনা করা এই সব বলে খুব সুন্দর বলছেন –

ইন্দ্রাস্যর্কস্য বায়োশ্চ যমস্য বরুণস্য চ।
চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোর্বৃন্তং নৃপশ্চরেৎ।।৯/৩০৩

ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি এবং পৃথিবী এই সমস্ত দেবতাদের চরিত্রকে রাজাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হয়। প্রজাদের ভালোবাসা দিতে হবে, তাদের প্রার্থিত বিষয় সকল দিতে হবে আবার অল্প অল্প করে প্রজাদের থেকে কর আদায় করতেও হবে, রাজ্যের সব কিছুর খবরা-খবর নিতে হবে, শত্রু-মিত্র বিচার না করে সময় হলে প্রিয় এবং অপ্রিয় সকলের প্রতি সমান দণ্ড বিধান করতে হবে, এই বিধানগুলো যখন রাজা ঠিক মত পালন করে তখনই রাজ্যের সমৃদ্ধি আসে।

দশমোহধ্যায়ঃ

এরপর শুরু হচ্ছে দশমোধ্যায়। এই অধ্যায় কিছুটা আপত্ধর্ম নিয়ে। আপত্ধর্ম মানে, যখন এমন কোন পরিস্থিতি হয় যেখানে মানুষকে প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য বর্ণের ধর্মের আচরণ করতে বাধ্য হয়। আপত্ধর্ম ছাড়া চারটে বর্ণের মধ্যে যে ছোট ছোট উপজাতি ছিল তাদের নিয়ে আলোচনা করছেন। এর মধ্যে বিরাটা একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন একটা নমুনা দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে –

এত উপাধি তৈরী হওয়ার কারণ

ব্রাহ্মণাদৈশ্যকন্যায়াম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

নিষাদঃ শূদ্রকন্যয়াং যঃ পারশব উচ্যতে।।১০/৮

বাবা যদি ব্রাহ্মণ হয় আর ধর্ম মতে তার বিবাহিতা স্ত্রী যদি বৈশ্য বর্ণের হয় সেই স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে তাকে অম্বষ্ঠ বলা হয়। ঠিক সেই রকম ব্রাহ্মণ পুরুষের ঔরসে বিবাহিতা শূদ্রা নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেবে সেই সন্তানকে জাতিতে নিষাদ বা পারশব নামে পরিচিত হবে। এইভাবে একটা বিরাট লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে, ব্রাহ্মণের যদি অমুক বর্ণের নারীর সাথে বিয়ে হয়, ক্ষত্রিয়ের যদি অমুক বর্ণের নারীর সঙ্গে বিয়ে হয় তাদের সন্তান কোন জাতির হবে, সেই জাতির বর্ণের নারীর সাথে যদি আবার ব্রাহ্মণের বিয়ে হয় তার সন্তানের কি জাতি হবে। এই যে এত এত উপাধি দেখা যায়, এগুলো এই ভাবেই এসেছে। যদি শুধু সবর্ণে বিবাহ হতে থাকত তাহলে এত উপাধি আসত না। আমরা যেমন বলি অসবর্ণে বিবাহ করতে নেই, কিন্তু এই ধরনের বিবাহ চিরদিনই ছিল। আবার উল্টোটাও ছিল, নিচু বর্ণের ছেলের সাথে উচ্চ বর্ণের নারীর বিবাহও ছিল। কিন্তু এটাকে তাঁরা ভালো দৃষ্টিতে দেখতেন না। অসবর্ণের বিবাহ থেকে যে সন্তান হত তার আবার অন্য জাতি হয়ে যেত। সেই জাতির সাথে আবার অন্য একটা জাতির বিবাহ হত তখন আবার তার উপাধিটা পাল্টে যেত। জাতি পাল্টানোর ব্যাপারটা এখন উঠেই গেছে। যে শ্লোকগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন সেগুলোকে নিয়েই আমরা আলোচনা করছি। এরপর একটা শ্লোকে বলছেন –

বর্ণভ্রষ্ট বোঝা যাবে কি করে

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।

আর্য্যক্লপমিবানার্য্যং কর্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ।।১০/৫৭

এখানে বলছেন বর্ণভ্রষ্ট কি করে বুঝবে। বর্ণভ্রষ্ট মানে, একজন লোক ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু অন্য বর্ণের কাজকর্ম করে করে তার পতন হয়ে গেছে, অথচ তার গলায় পৈতে আছে, আর নামের পেছনে চট্রোপধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধি লাগান আছে। অন্য দিকে আবার অপ্রসিদ্ধ, মানে কিছু একটা গোলমাল আছে যেটা অবিজ্ঞাত, জানা নেই। ধরুন দক্ষিণ ভারত থেকে একজন এসেছে, সে তার একটা উপাধি বলছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন ভাই তুমি কোন জাতের। সে বলল আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু আপনি জানেন না দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের এই উপাধি আছে কিনা। সে হয়ত নীচ জাতিতে উৎপন্ন, মানে ব্রাহ্মণ বাবা কিন্তু তার মা হল বৈশ্য। আর দেখতে সজ্জন সুপুরুষ, কিন্তু বাস্তবিক সে নীচ জাতিতে উৎপন্ন। এদের বোঝা খুব সমস্যা। বলছেন কর্মভিঃ, সব সময় এর কর্ম ও আচরণ দেখবে। আচরণে এরা ধরা পড়ে যাবে। সেইজন্য একজন লোক নীচ জাতিতে উৎপন্ন কিনা এটা সব সময় ধরা পড়ে কর্মের মাধ্যমে।

এক নবাবের খুব জুয়ার নেশা ছিল। দাবাতে বাজী লাগিয়ে খেলত। একজন ধুরন্ধর লোক ঠিক করল নবাবের সাথে বাজীতে দাবা খেলে নবাবকে ঠিকিয়ে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নেবে। কিন্তু নবাব বলে কথা, সাধারণ অজানা অচেনা লোকের সাথে খেলবে কেন! সাধারণ লোক যারা জুয়াড়ী হয় তার মহা ধুরন্ধর আর বদ হয়। যাতে নবাব তাকে ধরতে না পারে সে একজন নবাবের মত পোশাকে সেজে নবাবের দরবারে পৌঁছে গেছে। নবাবও খেলতে রাজী হয়ে গেছে। জুয়া খেলা শুরু হয়েছে, শুরু হতেই নকল নবাব জিতেই চলেছে আর আসল

নবাব হেরেই চলেছে। একটা বাজী, দুটো বাজী, তিনটে বাজী আসল নবাব শুধু হেরেই চলেছে। একটা সময় নবাবের মনে একটু সন্দেহ হয়েছে – আমার তো এত বিচ্ছিন্ন ভাবে হারার কথা নয়, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল আছে। লোকটি যেভাবে খেলে যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে জুয়া খেলাটা তার পেশা, সখের নয়। কিন্তু নবাবদের জুয়া খেলাটা সব সময় সখের হত। সত্যিকারের নবাব হলে একবার না একবার একটা বাজীতে হারবে। এদিকে নবাব ও লোকটির জন্য পান নিয়ে আসা হয়েছে। নবাব ইশারা করে খানসামাকে বলে দিল যে পিকদানটা কাছে আনবে না, একটু দূরে রেখে দেবে। পান খাওয়া হয়েছে। এবার পিক ফেলার সময় লোকটি দেখছে পিকদানটা কাছে নেই। সে তখন উঠে গিয়ে পিকদানে পিক ফেলল। ব্যস, ওতেই নবাব সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছে লোকটা নকল। সত্যিকারের নবাব কখন উঠে গিয়ে পিক ফেলবে না, খানসামাকে আওয়াজ দিয়ে ডাকিয়ে পিকদানটা কাছে নিয়ে আসবে, তারপর পিক ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছে ব্যাটা নবাব নয়।

এখানে সন্দেহ হচ্ছে লোকটি কোন জাতের, নিজে বলছে ব্রাহ্মণ, দেখতেও সুপুরুষ আর সজ্জন। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা অনেক সময় ভিক্ষা করতে গিয়ে নিজের পৈতে বার করে দেখাত। মনু বলছেন, যখন সন্দেহ হবে তখন তার কর্ম দেখবে। খুব উচ্চ শিক্ষিত লোক, প্রচুর ডিগ্রী আছে কিন্তু জানা নেই সে কেমন জায়গাতে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু দুটো ইংরাজী বাক্য যদি বলে তাতেই ধরা পড়ে যাবে তার লেখাপড়া কেমন জায়গা থেকে হয়েছে। পড়াশোনা করা লোক যদি নিজের আচার আচরণ দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেয় যে আমি কিছু জানি, তাও কিন্তু ধরা পড়ে যাবে। কারণ সৎ আচরণ আর দুরাচরণ দুটো এমনই জিনিষ ভেতরে একটু খোঁচা দিলেই বেরিয়ে আসবে।

শিলং রামকৃষ্ণ মঠে একজন মহারাজ ছিলেন তিনি খুব ভালো পাখোয়াজ বাজাতেন। কিন্তু কেউ তাঁর এই গুণের কথা জানত না আর উনিও নিজের গুণটা কোথাও প্রকাশ না করে চেপে রেখেছিলেন। একবার কোন এক অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে একজন খুব নামকরা ওস্তাদ গায়ককে শিলং মঠে নিয়ে আসা হয়েছিল। গায়কের সঙ্গে যে পাখোয়াজ বাজাবে তার আসতে দেবী হচ্ছিল বলে ওই মহারাজকে বলা হয়েছে পাখোয়াজটা একটু বেঁধে দিতে। উনি তো প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না। যাই হোক অনেকে অনুরোধ করতে উনি রাজী হয়ে বসে গেলেন তানপুরার সাথে সুর মেলাতে। মহারাজ পাখোয়াজে প্রথম চাটিটা দিতেই গায়ক হতবাক হয়ে মহারাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাখোয়াজ বাজান সত্যিই খুব কঠিন ব্যাপার, তবলা, খোল যে কেউই বাজিয়ে দিতে পারবে। দেওঘরে একজন ব্রহ্মচারী পাখোয়াজ বাজাত। তাকে সেখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ বলতেন – হ্যাঁরে! তুমি পাখোয়াজ বাজাস, না পেটাস? যারা বাজায় তাদের বেশীর ভাগই পেটায়। তা নয়, পাখোয়াজে চাটির আওয়াজই আলাদা। গায়ক তো ওই একটা চাটিতেই থ হয়ে গেছেন, কারণ তিনি যাকে পাখোয়াজ বাজাবার জন্য সাথে নিয়ে এসেছেন সেও এনার ধারে কাছে দাঁড়াতে না। ওস্তাদজী তখন খুব বিনম্র হয়ে বলছেন – মহারাজ আপনি আজকের দিনটা দয়া করে আমার সঙ্গে বাজান। মহারাজ তো কিছুতেই রাজী নয় – আমি এখন বাজানো ছেড়ে দিয়েছি, অনেক দিন বাজাই না, ইত্যাদি বলে যাচ্ছেন। ওস্তাদজীও নাছোড়বান্দা, না আপনাকেই বাজাতে হবে, আপনি যতটুকু পারবেন বাজাবেন। তারপর মহারাজ বাজালেন। যারাই সেদিন ওখানে ছিলেন সবাই অবাক হয়ে শুধু শুনে গেলেন, মহারাজ যা বাজালেন গায়কের গানটাই যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। স্বামী প্রমোদানন্দজী মহারাজ এই ঘটনাটা বলেছিলেন। মজার ব্যাপার হল মঠ মিশনের কেউ জানতেনই না যে উনি এত সুন্দর পাখোয়াজ বাজান। সেই বছর থেকে ওই গায়ক প্রত্যেক বছর শিলংএ একটা করে প্রোগ্রাম রাখতে শুরু করলেন, তার জন্য কোন পারিশ্রমিকও নিতেন না। শুধু এইটুকুর জন্য, মহারাজ পাখোয়াজ বাজাবেন আর উনি গান গাইবেন। এটাই মনু বলছেন, যারই মধ্যে কিছু সার জিনিষ যদি থাকে সেটা চাপা দিয়ে রাখা যাবে না, যতই চাপা দিয়ে রাখুক না কেন, ও ঠিক বেরিয়ে আসবে আর ভেতরে যদি আবর্জনা থাকে সেটাও বেরিয়ে আসবে। ঠাকুরও একই কথা বলছেন – মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে।

কোন মানুষকে পাঁচ মিনিট যদি কথা বলতে দেওয়া হয় ওইটুকু সময়ের মধ্যে তার মধ্যে যতটুকু বিদ্যা আছে তার সবটাই বেরিয়ে আসবে, তার মধ্যে যদি অবিদ্যা থাকে সেটাও বেরিয়ে আসবে। সংস্কারের

এমনই প্রভাব যে ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইবে। সেইজন্য বলছেন যেখানে দেখবে কোন অজ্ঞাত কুলশীল, যেখানে আপনার সন্দেহ হচ্ছে তখন তার কর্ম, তার আচরণটা লক্ষ্য করলেই বুঝে যাবেন। হরিদ্বারের দিকে একটা জায়গায় পূজো হচ্ছিল। একজন মহারাজ পূজো করছিলেন। বাইরের একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ওখানকার একজন সন্ন্যাসীকে তিনি জিজ্ঞেস করছেন ‘এই মহারাজের কি ব্রাহ্মণ শরীর না’? ‘কেন বলুন তো’? ‘ওনার হাতের মুদ্রা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওনার ব্রাহ্মণ শরীর নয়’। মানুষকে বিচার করবে তার কর্ম দিয়ে। যে অর্থে আমরা কর্ম দিয়ে বলি এখানে সেই অর্থে বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে ভেতরের সংস্কার একটু খোঁচা দিলেই বেরিয়ে আসে। কথাবার্তা, হাঁটাচলাতেই বোঝা যায় লোকটা কি ধরনের। পরের শ্লোকেই আবার বলছেন –

নারীর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আর পুরুষের মধ্যে ক্রুরতা

অনার্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্বতা।

পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্।।১০/৫৮

অনার্যতা – মানে লোকটি সংস্কৃতি সম্পন্ন নয়, অসংস্কৃত, নিষ্ঠুরতা – মনটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির, ক্রুরতা – নিষ্ঠুরতা যখন দৈহিক ভাবে প্রকাশ করে তখন সেটাকেই ক্রুরতা বলে। ছেলেদের মধ্যে ক্রুরতা বেশী দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে সাধারণত ক্রুরতা থাকে না, কিন্তু তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতা বেশী থাকে। বাচ্চা ছেলে একটা ফড়িং বা প্রজাপতি ধরলে প্রথমে তার ঠ্যাং গুলো টেনে ছিঁড়বে তারপর ডানা ছিঁড়বে, বাচ্চা মেয়ে কখনই এই জিনিষ করবে না। ছেলেদের মধ্যে ক্রুরতার প্রকাশ বেশী থাকে, মেয়েদের মধ্যে নিষ্ঠুরতার প্রকাশ বেশী, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। মেয়েদের মধ্যে মমতা অবশ্যই থাকে। এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক আছে। কয়েকদিন পর স্ত্রী একটা কোন খারাপ কাজ করেছে। স্বামী স্ত্রীকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। স্ত্রী এসে স্বামীর পায়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছে। সারা বিশ্বে শতকরা একজন পুরুষও পাওয়া যাবে না যে, ওই অবস্থায় সে মেয়েটিকে ক্ষমা করবে না। ছেলেটি ক্ষমা করে দিল। তারপর মেয়েটি আবার তাকে ধোকা দিল। ছেলেটি আবার মেয়েটিকে মারধোর করবে, মেয়েটি আবার ক্ষমা চাইবে। এবারও শতকরা নিরানব্বুই জন পুরুষ ক্ষমা করে দেবে। এটাই নিষ্ঠুরতার অভাব। এবার উল্টোটা হচ্ছে। পুরুষ খারাপ কাজ করল, মেয়েটি লাথি মেরে ছেলেটিকে সরিয়ে দিল। এবার কি হবে? কোন দিন মেয়েটি ছেলেটিকে আর কাছে আসতে দেবে না। হাজারে একটি মেয়ে কাছে আসতে দেবে কিনা সন্দেহ। যদি দ্বিতীয়বার করে? কোন প্রশ্নই নেই, মেয়েটি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবে তবুও আর কাছে আসতে দেবে না। এটাই নিষ্ঠুরতা, মেয়েরা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হবে, পুরুষ নিষ্ঠুর হবে না। পুরুষ ক্রুরতা দেখাবে, শারীরিক অত্যাচার করবে। কিন্তু এরপর হাতজোড় করে ওর পেছন পেছন ঘুরতে থাকলে একটা সময়ের পর সে ক্ষমা করে দেবে। আমাদের ধারণা মেয়েদের মন নরম, একেবারেই ভুল ধারণা, মেয়ে মানেই একেবারে পাথর। মেয়েরা যখন মমতা দেখাবে, সে যেই হোক, মা হোক, বোন হোক, মেয়ে হোক, স্ত্রী হোক, প্রেয়সী হোক, যেই হোক সে যখন পুরুষকে মমতা দেখাবে তাকে সে আকাশে পৌঁছে দেবে। নিষ্ঠুর যেদিন হয়ে গেলে সেদিন সেই পুরুষের খেলা শেষ। কিন্তু সাধারণত মেয়েরা কোন দিন স্বভাবত ক্রুর হয় না। যেমন রানী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে লড়াই করছেন। তাঁর সামনে শত্রুপক্ষের কোন যোদ্ধা যদি একবার হাত তুলে দিয়ে বলে দেয়, আমি অসহায় আমার উপর তলোয়ার চালাবেন না। রানী লক্ষ্মীবাই কখনই আর তলোয়ার চালাবেন না, এমনকি কাউকেই আর তার উপর তলোয়ার চালাতে দেবেন না। যুদ্ধের সময় কোন পুরুষ যোদ্ধা কিন্তু এইভাবে ছেড়ে দেবে না। নিষ্ঠুরতা হল ভেতরের ব্যাপার আর ক্রুরতা হল বাইরের ব্যাপার। যদি আরও ব্যাপক ভাবে দেখি, গরীব লোক পয়সা চাইছে, কৃপণ লোক পয়সা দিচ্ছে না, এটাও নিষ্ঠুরতা। ঠাকুর বলছেন, নিজের বিয়েতে লাখ লাখ টাকা খরচ করছে অথচ নিজের পাশের বাড়িতে লোক না খেয়ে মরছে। এটাও নিষ্ঠুরতা। এই ধরনের নিষ্ঠুরতা পুরুষের মধ্যে প্রচুর থাকে। কিন্তু যারা সদ্বংশজাত, ওদের মধ্যে অনার্যতা থাকবে না, নিষ্ঠুরতাও থাকবে না। নিষ্ঠুরতা হল অনার্য বর্বরদের লক্ষণ।

আর ক্রুরতা বর্বরদের থেকেও যারা আরো নীচে তাদের মধ্যে থাকে। হিন্দু জাতি জানেই না ক্রুরতা কাকে বলে। খুব নামকরা সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে ডাচদের ক্রুরতা খুব বিখ্যাত। হল্যান্ডের সৈন্যরাও প্রচণ্ড ক্রুর হয়।

নিষ্ঠুরতা আর ক্রুরতার সাথে বলছেন *নিষ্ক্রিয়াত্বতা*। নিষ্ক্রিয়াত্বতা মানে অক্রিয়, অর্থাৎ যারা যজ্ঞাদি করে না, জপ-ধ্যান করে না, পূজা অর্চনাদি করে না এদের বলা হয় অক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়াত্বতা। এই কটি জিনিস দিয়ে ধরা পড়ে লোকটি উচ্চবর্ণের নাকি নিম্নবর্ণের – অনার্যতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা আর নিষ্ক্রিয়াত্বতা। পরের শ্লোকে আবার বলছেন –

বাবা-মার বর্ণ ও সংস্কারের উপরই সন্তান কেমন হবে নির্ভর করে

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্কোভয়মেব বা।

ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি।।১০/৫৯

মানুষ সব সময় বাবা ও মা দুজনেরই শীল পায়, জেনেটিক পদার্থ দুজনের থেকেই আসে। মজার ব্যাপার হল, একজনের বাবা ব্রাহ্মণ মা শূদ্রা, আরেকজনের বাবা ব্রাহ্মণ তার মা ব্রাহ্মণি, দুজনের সন্তানের শীল কিন্তু সব সময়ই আলাদা হবে। এটাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। এখানে বাবা মায়ের যেমন প্রভাব আছে, অন্য দিকে সংস্কারেরও প্রভাব থাকছে। পরের শ্লোকে আবার খুব মজার ব্যাপার বলছেন –

কুলে মুখ্যেহপি জাতস্য যস্য স্যাদ্যোনিসঙ্করঃ।

সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোহল্পমপি বা বহু।।১০/৬০

উচ্চবংশে জন্ম নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বংশে কোথাও যোনি সঙ্কর দোষ আছে, মা হয়তো ক্ষত্রিয় বংশের কিন্তু সেটা কারুর জানা নেই। একজন ব্রাহ্মণ কলকাতায় থাকত, পরে হিমালয়ে গিয়ে অনেক দিন বসবাস করতে শুরু করেছে। সেখানে একজন ক্ষত্রিয় সুন্দরী মেয়েকে দেখে বিয়ে করেছে। অন্য দিকে সবাইকে বলছে, এ হল কুমায়ূনের ব্রাহ্মণী। আচার আচরণ সবই ঠিক আছে, কিন্তু এটাই যোনি সঙ্কর। কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে যাবে। এই জিনিসগুলো মনু আড়াই হাজার বছর আগে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এখন জাত্যন্তরে বিবাহ এমন হয়ে গেছে যে আর ধরার উপায় নেই।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়স্য চেৎ প্রজায়তে।

অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাঙ্গমাদ্যুগাৎ।।১০/৬৪

বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণের যে সন্তান হবে যদিও সে পারশব, মরার মত, কিন্তু এরপর সেও যখন ব্রাহ্মণকে বিয়ে করবে, এই ভাবে সাতপুরুষ পার করবে তখন সেই সন্তান ব্রাহ্মণের সব গুণ পেয়ে যাবে। এই শ্লোকগুলোতে বোঝা যায় মনু সমাজকে রক্ষা করার জন্য কত চিন্তা ভাবনা করতেন আবার অন্য দিকে তিনি কত উদার ছিলেন, তুমি একবার পড়ে গেছ বলে আর কোন দিন উঠতে পারবে না, তা নয়। তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল শূদ্রকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিয়ে আসা।

সুবীজধৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।

তথার্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্বং সংস্কারমর্থতি।।১০/৬৯

বীজ যদি ভালো হয় আর ক্ষেতও যদি খুব ভালো হয়, তার যে ফসল উৎপন্ন হয় সেটা অত্যন্ত উন্নত মানের এবং উৎকৃষ্ট হয়। ভালো বংশের ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর যে সন্তান হবে, সে সত্যিকারের খুব ভালো হবে। এখানে মজার ব্যাপার হল, মনু এখানে সব কিছুকে পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন না। এটাকেই পতঞ্জলী যোগে এবং আমাদের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে সব কিছুকে নিজের কর্মের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি এমনটি কেন হয়েছে? পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের ফলে। কিন্তু মনু একবারও এই কথা বলছেন না,

তিনি বলছেন তোমার বাবা-মা যেমনটি, তোমার পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের আচার আচরণ যেমনটি হবে তুমিও সেই রকমটি হবে। সেই অনুসারে তোমার জীবন সংগ্রামও নির্ধারিত হবে।

ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব যট্ কৰ্মাণ্যগ্রজন্মনঃ।।১০/৭৫

ব্রাহ্মণকে অগ্রজন্মা বলা হয় কারণ ব্রাহ্মণের জন্ম আগে হয়েছে। ব্রাহ্মণের জন্য ছয়টি কর্ম, অধ্যাপনং অধ্যয়নং, ব্রাহ্মণ শিষ্যদের অধ্যয়ন করাবে এবং নিজেও অধ্যয়ন করবে। যজনং যাজনং ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করাবে এবং নিজেও যজ্ঞ করবে। দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব, ব্রাহ্মণ দান দেবে এবং দান নেবে। ব্রাহ্মণের এই ছয়টিই কাজ, এর বাইরে তার আর কোন কাজ নেই।

বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।

বার্তাকর্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্মসু।।১০/৮০

এই শ্লোকে তিন বর্ণের কি কাজ বলছেন, ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকরক্ষা আর পশুপালনাদি এবং কৃষিকাজ এগুলো বৈশ্যের কাজ। তারপরের শ্লোকে বলছেন –

স্বধর্ম পালনই শ্রেয়

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্তেন কর্মণা।

জীবৎ ক্ষত্রিয়ধর্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ।।১০/৮১

যদি দেখা যায় কোন ব্রাহ্মণ নিজের ধর্মকে আধার করে তাঁর জীবিকা চালাতে পারছেন না, নিজের ধর্মকে আধার করে মানে বেদাভ্যাস, বেদপাঠ করে পোষ্যবর্ণের প্রতিপালন করে জীবন নির্বাহ করতে পারছেন না, তখন কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কর্ম ধারণ করে নিতে পারবেন। কারণ ওই কর্মই ব্রাহ্মণের নিকটতম ধর্ম। যদি তাতেও না হয় –

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।

কৃষিগোরক্ষমাষ্ট্রায় জীবৈদৈশ্যস্য জীবিকাম্।।১০/৮২

বেদ অধ্যয়ন করে, বেদ অধ্যাপনা করে তার সাথে ক্ষত্রিয়বৃত্তি করেও যদি ব্রাহ্মণ পেট চালাতে না পারে তখন সে বৈশ্যের কর্ম, মানে চাষ-বাস, পশুপাখী সংরক্ষণের কাজ নিয়ে নিতে পারবে। আসলে প্রাণ রক্ষাটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।

পরধর্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।।১০/৯৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বলছেন নিজের ধর্মে যদি কিছু গোলমালও থাকে তাও অপরের ধর্ম থেকে স্বধর্ম পালন করাটাই শ্রেয়ঃ। কারণ সবাই নিজের নিজের পরিবেশে বড় হয়েছে, চেনা পরিবেশে নিজের ধর্ম পালন করে এগিয়ে যাওয়াটা সহজ। কিন্তু যারা খুব প্রতিভাবান এবং যাদের accidental birth হয়ে গেছে, মানে ভুল বশাৎ অন্য জাতিতে জন্ম হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে সব সময় ব্যতিক্রম হবে, চেষ্টা করলেও কেউ তাদের স্বধর্মে আটকে রাখতে পারবে না, ছিটকে অন্য দিকে চলে যাবে।

নাধ্যাপনাদ্যাজনা দ্বা গর্হিতা দ্বা প্রতিগ্রহাৎ।

দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্মুসমা হি তে।।১০/১০৩

খুব নিন্দিত ব্যক্তিকে যদি কোন ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করায়, তাদের দানও যদি নেয়, এখানে ভাষ্যকাররা যোগ করছেন আপৎ কালে, মানে ব্রাহ্মণের যখন খুব অভাব হয়ে গেছে তখন তাদের এই কাজে কোন দোষ হবে না। কারণ ব্রাহ্মণ অগ্নি ও জলের মত শুদ্ধ পবিত্র। অথচ মনু এর আগে বলেছিলেন ব্রাহ্মণ মরে যায় তো মরে যাবে কিন্তু অপাত্রে যেন বিদ্যা দান না করে। কিন্তু এখানে বলছেন যদি ব্রাহ্মণের বিপদ হয়ে যায় তখন নিন্দিত যারা তাদেরও অধ্যাপনা করতে পার। আবার পরের শ্লোকে বলছেন –

জীবিতাত্যয়মাপনো যোহন্নমত্তি যতন্ততঃ।

আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে।।১০/১০৪

ব্রাহ্মণের আপৎকালীন ধর্মের বিধান

ব্রাহ্মণের যদি আপদ-বিপদ এসে যায়, যদি অন্নাভাবে জীবন সংশয় উপস্থিত হয় তখন সে যেখান সেখান থেকে খুশী অন্ন ভোজন করে নিতে পারে তাতে কোন দোষ হয় না। পরের দুটো শ্লোকে মনু মহাভারতের কাহিনী তুলে পরস্পরার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন –

অজীগর্তঃ সূতং হস্তমুপাসর্পদবুভুক্ষিতঃ।

ব চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্।।১০/১০৫

ক্ষুধার্তশ্চাত্তুমভ্যাগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্।

চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্মাধর্মবিচক্ষণঃ।।১০/১০৬

পুরাকালে অজীগর্ত নামে এক ঋষি ক্ষুধায় কাতর হয়ে অন্য কোন উপায় না দেখে নিজের ছেলেকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি কোন রকম পাপগ্রস্ত হননি। একবার এমন খরা হয়েছিল কোথাও কোন অন্ন পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই সময় বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধার্ত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য চণ্ডালের বাড়ি থেকে কুকুরের মাংস চুরি করে খেতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি পাপে লিপ্ত হননি। এটাই এখানে বলছেন, যখন এই রকম কোন আপদ-বিপদ হয় তখন আর কোন বাছ-বিচার করতে হবে না, যেটা খেয়ে তুমি মনে করছ আমার প্রাণ রক্ষা হবে সেটাই খাবে। আসলে আমাদের জীবনে এত রকম সমস্যা যে, প্রায়ই আমাদের আপৎধর্মকে গ্রহণ করতে হয়। যেখানে প্রাণ সংশয় হয়ে গেছে, সেখানে আগে প্রাণ বাঁচাও। বিশ্বামিত্র এটাই বলছেন, পরে আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেব কিন্তু তার আগে আমার প্রাণকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। প্রাণই যদি চলে যায় তাহলে আমি তো কিছুই করতে পারবো না। এমন কি বলছেন মৃত্যুর পর স্বর্গাদি বলে কিছু আছে কিনা জানা নেই! এই জীবনটা আমার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, আমি যেন না মারা যাই, তার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্তও করে নেব। এরপর থেকে আস্তে আস্তে মনু প্রায়শ্চিত্ত কত ভাবে করা যায় শুরু করছেন।

বিভিন্ন দোষযুক্ত কর্মে প্রায়শ্চিত্তের বিধান

জপহোমৈরপৈতেত্যনো যাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতম্।

প্রতিগ্রহনিমিত্তং তু ত্যাগেন তপসৈব চ।।১০/১১১

শূদ্রাদি নীচ জাতির যাজন ও অধ্যাপনার দ্বারা ব্রাহ্মণের যে পাপ জন্মায়, জপাদি ও হোম করলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। নীচ জাতির কাছ থেকে দান নিলে যে পাপ হয়, সেই জিনিষটাকে ফেলে দিলে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। নীচ জাতিকে বেদাদি অধ্যয়ন করলে তার কাছ থেকে তো আর ফেরত নেওয়া যাবে না, তখন জপ ও তপস্যাদি করলে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। কিন্তু নীচ লোক থেকে দান নিলে ওটা ফেলে দিলে দোষটা কেটে যায়। এমনিতেও কারুর কাছ থেকে দান, উপহার নিতে নেই। অন্য একটি শ্লোকে বলছেন কি কি ভাবে ন্যায্যোপার্জিত ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করা হয়। এই এই ভাবে সঞ্চয় করলে কোন পাপ লাগবে না –

ন্যায়োপার্জিত সম্পদ

সপ্ত বিভাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।

প্রয়োগঃ কর্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ।।১০/১১৫

ধর্ম সম্মত পথে এই সাত ভাবে যদি অর্থ উপার্জিত হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পত্তিকে ন্যায়োপার্জিত বলা যাবে। প্রথমটা হল দায়ঃ, পৈত্রিক সূত্রে পূর্বপুরুষদের যে সম্পত্তি লাভ হয় সেটাকে বলছেন দায়। এই সম্পত্তিতে পাপ লাগে না, এই সম্পত্তি পাওয়াটা তার অধিকার। দ্বিতীয় লাভঃ, আপনার কিছু মূলধন ছিল, সেটাকে ব্যবসা বা সুদে খাটিয়ে যে লাভ হয় বা বন্ধুর কাছ থেকে বা শ্বশুর বাড়িতে লব্ধ ধন অথবা হঠাৎ করে কোন ভাবে কিছু গুপ্তধন পেয়ে গেছে, এগুলোকে বলছেন লাভ। তৃতীয় ক্রয়ঃ, যদি আপনি নিজের অর্থ খরচ করে কিছু কিনে থাকেন তাতে কোন দোষ বা পাপ হয় না। সন্ন্যাসী গৃহস্থের বাড়িতে যে অন্ন ভোজন করেন সেটা সন্ন্যাসীর পক্ষে সব সময় অশুদ্ধ হবে, কিন্তু সন্ন্যাসী যদি নিজের প্রণামীলব্ধ অর্থ দিয়ে কোন হোটেল থেকে অন্ন কিনে ভোজন করেন সেই অন্ন সব সময় শুদ্ধ হবে। এখানে তন্মাত্রার ব্যাপারও এসে যায়। স্বপোজিত অর্থে কিনে খাওয়া মানেই শুদ্ধ, কারণ ওই অন্নের জন্য টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন সেই অন্নের বাহ্যিক শুদ্ধতা আছে কি নেই সেটা দেখে নিতে হবে। এখানে সংক্রামক নিয়ে কথা হচ্ছে না, মস্তিষ্ক নিয়ে কথা চলছে। সন্ন্যাসী যদি রাষ্ট্রা থেকে সিঙ্গাড়া কিনে খান তাতে কোন দিন তার তন্মাত্রা খারাপ হবে না। ওইটাই যদি কোন গৃহস্থ কিনে সন্ন্যাসীকে খাওয়ায় তখন সিঙ্গাড়ার তন্মাত্রা খারাপ হতে বাধ্য। এগুলো সাধারণ মানুষকে কিছুতেই বোঝান যায় না। যাঁরা নিজেদের শরীর, মন ও চিন্তকে শুদ্ধ পবিত্র রাখতে চান তাঁদের পক্ষে কারুর কাছ থেকে উপহার নেওয়াটাও বিষতুল্য। গুরুজনরা কিছু দিলেন, বন্ধুরা ভালোবেসে কিছু দিল সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু যে যা উপহার দিচ্ছে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিয়ে নেওয়া মানে শুদ্ধ পবিত্রতার স্তর থেকে দুম্ব করে একেবারে নীচে পতন হয়ে যাওয়া।

চতুর্থ হল জয়ঃ, যুদ্ধে কিছু জয় করেছে, এখানে কিন্তু ধর্মযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, তখন সেই সম্পত্তিতে কোন দোষ হবে না। মহাভারতে দুটো খুব নামকরা ঘটনা আছে। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন তখন তাঁর ভাইরা বিভিন্ন দিশায় বেরিয়ে গেল রাজ্য জয় করতে। তারা সব রাজ্যে গিয়ে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে – আমরা রাজসূয় যজ্ঞ করতে যাচ্ছি তার জন্য আপনারা কিছু অর্থ দিন। যেসব রাজার অর্থ দিতে রাজী হল না, তাদেরকে যুদ্ধে জয় করে পাণ্ডবরা অর্থ নিয়ে এল। আবার কর্ণও একবার বেরিয়েছিল রাজ্য জয় করতে। এখান থেকে তারা যে অর্থ পাচ্ছে এটাও শুদ্ধ। কিন্তু লোভে পরে যুদ্ধ জয় করে অর্থ নিয়ে এলে সেই অর্থকে শুদ্ধ বলা যাবে না। কোন রাজা যজ্ঞ করবে বলে বেরিয়েছে বা যেখানে ধর্মযুদ্ধ হবে সেখান থেকে যে অর্থ জয় করা হয়েছে সেই অর্থ সব সময় শুদ্ধ হবে।

পঞ্চম প্রয়োগঃ, নিজের অর্থকে সুদে খাটিয়ে যে ধনবৃদ্ধি হবে সেই ধনে কোন পাপ লাগবে না। লাভ আর প্রয়োগে পার্থক্য হল, লাভে কোন বন্ধু কিছু দিয়ে দিল বা কাউকে কোন জমি দিয়েছিল বা ব্যবসাতে কিছু টাকা খাটিয়ে লাভ হয়ে গেল। প্রয়োগ হল পুরোপুরি সুদের ক্ষেত্রে। ইসলাম ধর্মে সুদে টাকা খাটানো বা সুদ দেওয়া বা নেওয়া দুটোই নিষিদ্ধ। অথচ যত কাবুলিওয়ালা আছে সবাই সুদের ব্যবসাই করে। ইসলাম ধর্মে সুদের কারবার নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে কারণ আছে। যেখান থেকে ইসলাম ধর্ম জন্ম নিয়েছিল সেখানে মুসলমানরাও থাকত আবার জুহুদিরাও থাকত এবং খ্রীস্টানরাও ছিল। মুসলমানদের সব ক্ষেত্রে দেখাতে হবে ওরা সবার থেকে পুরো আলাদা। সেই সময় জুহুদিরা সুদের ব্যবসা করত। যারা সুদখোর হয় তারা এমনিতেই খুব কঠোর প্রকৃতির হয়, আর ওরা কড়া হারে সুদ নিত। মুসলমানরা এই জুহুদিদের থেকে অতিষ্ঠ ছিল। কারণ গরীব লোককে অভাবের তাড়নায় টাকা ধার নিতেই হয়, টাকা ধার নিলে আবার মোটা হারে সুদ দিতে হয়। মহম্মদ দেখাতে চাইলেন আমরা জুহুদিদের থাকে আলাদা আর দ্বিতীয় কথা জুহুদিদের এই সুদের ব্যবসাতে ওনার প্রচণ্ড ঘেন্না ছিল বলে মুসলমানদের সুদ নেওয়াটা একেবারে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু হিন্দুদের এই

ব্যাপারে পুরো অনুমতি দেওয়া আছে। হিন্দুদের মধ্যে আবার সুদের হার আবার একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, বছরে শতকরা আড়াই টাকা করে।

ষষ্ঠ হল কর্মযোগঃ, ক্ষেত্রে কাজ করা হচ্ছে, পশুপালন করছে, ব্যবসা করছে ইত্যাদি এগুলো কর্মযোগ আর এইসব কর্মের দ্বারা যে অর্থ উপার্জিত হবে সেটা সব সময় শুদ্ধ। আর সপ্তম হল সৎপ্রতিগ্রহ, সৎ উপায়ে যদি কোন দান গ্রহণ করা হয় সেটাকে বলছেন সৎপ্রতিগ্রহ। কোন যজ্ঞাদি হচ্ছে, সেখানে যজ্ঞমান কোন দান দিলেন। ইদানিং কালে বিয়ে বাড়িতে সম্বন্ধিদের কিছু উপহার দেওয়া হল। ওই উপহার সব সময় শুদ্ধ। এই সাত রকম ভাবে যেটা উপার্জিত হবে সেটাই ধর্মসঙ্গত। এইগুলোই ঠিক ঠিক সম্পত্তি। এই সাতটার বাইরে উপার্জন করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আরেকটি শ্লোকে জীবন নির্বাহের জন্য দশটি উপায় বলছেন –

জীবন নির্বাহের দশটি উপায়

বিদ্যা শিল্পং ভূতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।

ধৃতিভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।।১০/১১৬

কিভাবে টাকা সঞ্চয় করবে বলা হল। কিন্তু আজীবিকার দ্বারা উপার্জন না করলে টাকা সঞ্চয় হবে কিভাবে! টাকা উপার্জন করার জন্য এনারা দশটি জীবিকার কথা বলছেন অর্থাৎ কিনা এইভাবে উপার্জন করলে তোমার কোন পাপ হবে না।

প্রথম হল বিদ্যা, যদি কারুর মধ্যে যে কোন ধরনের বিদ্যা থাকে সে সেই বিদ্যার অভ্যাস করছে বা কাউকে শেখাচ্ছে। যেমন কেউ অস্ত্রবিদ্যার জ্ঞান আছে, সে একজনকে অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দিচ্ছে তার বিনিময় সে অর্থ উপার্জন করছে, এটাই আজীবিকা সাধন। যে কোন বিদ্যা, বেদবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, খেলাধুলার বিদ্যা যে বিদ্যাই হোক না কেন, সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বা কাউকে শিক্ষা দিয়ে কেউ জীবননির্বাহের জন্য যখন কোন অর্থ উপার্জন করছে।

দ্বিতীয় শিল্পং, যে কোন শিল্প – কেউ মূর্তি তৈরী করতে পারে, কেউ ছবি আঁকতে পারে, আবার আগেকার দিনে অনেকে মালা বানাত, তেল তৈরী করত, এই রকম যে কোন শিল্প দিয়ে যখন সে অর্থ উপার্জন করে সেটা ন্যায়সঙ্গত।

তৃতীয় ভূতিঃ, ভূতি শব্দের অর্থ সাধারণতঃ ভূত থেকে এসেছে, কিন্তু মূলতঃ এখানে এর অর্থ হবে দূত হিসাবে অন্যের হয়ে কোথাও দৌত্য করতে গেছে এইভাবেও অর্থ উপার্জন হতে পারে। চতুর্থ এই ভূতির সাথেই আরেকটা শব্দ আসে সেবা। হোটেল, হাসপাতাল, রেলওয়ের ক্যাটারিংএর কাজ যারা করছে তাদের এই কাজকে বলা হয় সেবাকার্য। পঞ্চম গোরক্ষ্যং, পশুপালন করে যে জীবিকা নির্বাহ করা হয় তাকে গোরক্ষ্যং বলা হচ্ছে। ষষ্ঠ বিপণিঃ, যে কোন ধরনের ব্যবসা। সপ্তম কৃষিঃ, চাষবাসের জীবিকা।

অষ্টম ধৃতি আবার খুব মজার। ধৃতি মানে বলছেন, একটুতেই যে সন্তোষ হয়ে যায়, এটাও জীবিকার একটা সাধন। নবম ভৈক্ষ্যং, ভিক্ষা করে জীবন চালান। ভিক্ষার দ্বারাও জীবন চালান অনুমোদন করা হয়েছে। দশম কুসীদ, সুদ নেওয়া। এই দশটি হল জীবননির্বাহের উপায়। এরপর এনারা ঠিক করে দেবেন ব্রাহ্মণ কি জীবিকা নেবে, ক্ষত্রিয় কোন জীবিকা নেবে। এই দশটির বাইরে যত রকম ভাবে অর্থ উপার্জনের উপায় আছে এগুলো অনুমোদিত নয়। তবে হয় কি এখানে যেমন সাধারণ একটা শব্দ বলে দিলেন ‘বাণিজ্য’, আমি এখন যেটাই করব সেটাই বাণিজ্য বলতে পারি। যদি আমি মাংস বিক্রী করে সেটাও বাণিজ্যের মধ্যে পড়ে যায়, আমি মদ বিক্রী করছি সেটাও বাণিজ্যের মধ্যে পড়ে যাবে, ড্রাগ সাপ্লাই করছি, মেয়ে সাপ্লাই করছি এগুলোও বাণিজ্যের মধ্যে পড়ে যাবে। এখানেই হয়ে যায় মুশকিল। এখানে বাণিজ্য একটা শব্দতে বলে দিলেও অন্য কোন জায়গায় আবার বলে দেবেন এই এই কাজ যেন না করা হয়। শূদ্রের অধিকার নিয়ে বলছেন –

শূদ্রের অধিকার

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ চ সংস্কারমহীতি।

নাস্যাদিকারো ধর্মেহস্তি ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্।।১০/১২৬

শূদ্র যা কিছুই করুক কোনটাতেই সে পাতক হয় না। তার মানে তখনকার দিনে যে খাদ্য খাওয়া নিষেধ ছিল যেমন পেঁয়াজ, রসুন খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু শূদ্র যদি এগুলো খায়, এমনকি যদি সে গরুও খায় তাতেও সে পাতক হবে না। যেখানে দ্বিজদের যে ষোড়শ সংস্কার বা পরবর্তি কালে দশটি সংস্কার করার বিধান আছে সেখানে শূদ্রের জন্য কোন সংস্কার হয় না। সেইজন্য শূদ্রের কোন ধর্মকার্যে অধিকার নেই। তার জন্য কি হবে? ন ধর্মাৎ প্রতিষেধনম্। এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। একজনকে সহজ ও পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞেস করা হল তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, তুমি জীবনে কি চাও? সে বলল আমি একজন ভালো লোক হতে চাই। তখন বলবে তুমি যদি ভালো লোক হতে চাও ধর্ম ছাড়া হবে না। তাই ভালো লোক হতে চাইলে তুমি এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজনের কোন একটা বর্ণের মধ্যে চলে এস। আর তোমাকে ধর্ম উপার্জনের সাত বিধি আর ধর্মসম্মত দশটি আজীবিকার মধ্যে থাকতে হবে এবং বিধি প্রতিষেধনে, এটা করবে, এটা করবে না বলে যা বলা হয়েছে এগুলোও তোমার উপর প্রযোজ্য হয়ে যাবে। আরেকজনকে জীবনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতেই বলছে, আমার এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই, আমি জীবনকে ভোগ করতে চাই। খুব ভালো কথা, যাও জীবনকে খুব করে ভোগ করে যাও। তোমার উপর আমাদের কোন নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ খাটবে না আর তোমার কোন কিছুতে আমরা বাধাও দেব না, তোমার যা খুশী করে যাও। কিন্তু তুমি শূদ্র। তোমার কাছ থেকে আমরা যেমন কোন কিছু প্রত্যাশা করছি না, ঠিক তেমনি তোমাকে আমাদের কোন কিছুর মধ্যে ঢুকতেও দেব না। এরাই শূদ্র।

যার জীবনের উদ্দেশ্য ও জীবনে কি চাইছে তার মধ্যে যদি ধর্ম না থাকে তাহলে ধর্মের কোন নিয়ম তার উপর খাটবে না। এটা খুব সহজ সরল নিয়ম। আপনি একজন হিন্দু, মুসলমানের কোন বাচ্চা ছেলে যদি আপনাকে বলে – কাকু! আমাদের এখন রমজান চলছে কিন্তু আপনি রোজার সময় দুপুরে কেন খেলেন? তখন আপনি কি উত্তর দেবেন? আপনার একটাই উত্তর – আমি মুসলমান নই তাই আমি খাচ্ছি। আপনি আগে ঠিক করে নিন আপনি মুসলমান কিনা, আপনি যদি মুসলমান হন তাহলে আপনাকে রোজা রাখতে হবে। ঠিক সেই রকম আপনি আগে ঠিক করুন ধর্মজীবন পালন করে নিজেকে উন্নত করতে চান কিনা। যদি না উন্নত করতে চান তাহলে আপনি শূদ্র, আর আপনার সব রকমের স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আছে। মনুস্মৃতি যত রকম বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত বিধি-নিষিধ থেকে আপনি মুক্ত, সব রকম নিয়ম-কানুনের বাইরে। আপনি এখন যা খুশী করতে পারেন, আর যা খুশী করলে আপনার তাতে পাপও লাগবে না, শুধু দেশের আইনটা ভাঙবেন না। দেশের আইন ভাঙলে রাজা আপনাকে সাজা দেবে। ধর্মে আপনার কোন অধিকার থাকল না আর ধর্মের দিক থেকেও আপনার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকল না। এটা হল একেবার মূল সিদ্ধান্ত। তুমি যদি জীবনে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে এগুলো সব পালন করতে হবে, আর তুমি যদি উঠতে না চাও তাহলে এগুলো কিছুই তোমাকে পালন করতে হবে না।

ভাগবতের এক জায়গায় বলা হচ্ছে, যারা অত্যন্ত মূঢ় তাদের কোন সমস্যা হয় না, যে কোন পাপ কর্ম করতে তাদের কোন ভয়ডর হয় না। আবার যাঁরা পূর্ণজ্ঞানী তাঁদেরও কোন সমস্যা হয় না, তাঁদের কাছে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই। সমস্যা হয় যারা মাঝা মাঝারি তাদের, আমাদের মত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাণ যায়। যারা মাঝা মাঝারি আছে তাদের জন্যই এত কিছু নিয়ম তৈরী করা হয়েছে। নিয়ম করে দিয়ে মনু বলছেন তুমি যদি ভাই ধর্মজীবন নাই চাও, তাহলে তুমি যা খুশী কর, তোমার কোন পাপ লাগবে না, কিন্তু যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই পড়ে থাকবে। এরপর একজন এসে বলছে, আমি সবই পালন করে যাচ্ছি কিন্তু এখনও মদ ছাড়তে পারছি না, মাংস খাওয়া ছাড়তে পারছি না, কিন্তু আমি এগুলোর উপরে উঠতে চাইছি। তখন মনু বলবেন, কি

আর করবে! ঠিক আছে তোমার থেকে যাঁরা উচ্চবর্ণের আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আছে এদের সেবা কর। এদের সেবা করতে করতে ধীরে ধীরে তোমার সংস্কার তৈরী হবে।

আসলে আমরা এখন এই জাতিপ্রথাকে জন্মসূত্র দিয়ে ঠিক করছি। কিন্তু তখনকার সময় বর্ণপ্রথা বা জাতিপ্রথা জন্মসূত্র দিয়ে ঠিক হত না। বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা তিনি হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ, দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করে ক্ষত্রিয় ধর্ম নিয়ে নিলেন। এসবও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু কম।

এক একটা সমাজে এক একটা সময় এক এক ধরনের বিধান চলে। এই বিধানে কখন বর্বরতা থাকে আবার কখন ভদ্রতা থাকে। সেইজন্য আজকের সমাজের নিয়ম প্রথা দিয়ে গতকালের নিয়ম প্রথাকে বিচার করা যায় না। তখন যা ছিল সেটাই তখনকার দিনের জন্য উপযোগী ছিল। এখন তপশীলি উপজাতিদের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে এটা আসলে কি? একটা লোকের ক্ষমতায় নেই ওই জায়গায় পৌঁছান, তাকে আমরা সংরক্ষণ প্রথার মাধ্যমে সেই জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু এর যে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হতে পারে আমরা কি কেউ ভেবে দেখছি? ভারত সরকার রেল চালাচ্ছে, রেল চালাতে ড্রাইভার লাগে। সরকার বলে দিল রেল ড্রাইভাররা কোটা থেকে আসবে। এবার এতগুলো মানুষের জীবন কার হাতের উপর চলছে? যে লোকটা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর কিছু জানে না, ইঞ্জিনের মেকানিজম জানেনা সে চালাতে এসেছে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন। বলছে, এছাড়া আমাদের আর গতি নেই। সমাজের সবার যদি সমান অধিকার দিতে হয়, সবাইকে যদি বড়লোক করতে হয়, সবাইকে যদি বিদ্বান করতে হয় তখন দুটো চারটে প্রজন্মে এই রকম গুণগোল হবে, তারপরে সব ঠিক হয়ে আসবে। কোথাও তো শুরু করতে হবে। আবার স্বামীজী বলছেন, একজন ব্রাহ্মণের যদি একজন শিক্ষক দরকার তাহলে একজন শূত্রের জন্য তিনজন শিক্ষক রাখতে হবে। এরপর কয়েক প্রজন্মের পর যখন দেখা যাবে একজন ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়ায় খুব দুর্বল তখন সেও বলতে পারে আমার জন্য তিনজন শিক্ষক দেওয়া হোক। এই সমস্যার শেষ কোন দিন হবে না। সামাজিক সমস্যার কোন চিরন্তন সমাধান নেই। যারা নেতা তারা একটা পথ বেছে নেন, তারপর ঠিক করে নেন আমরা এই পথেই যাব। এখানে ভালো মন্দ বলে কোনটাই নেই, যেটা দেশ ও সমাজের কর্তৃপক্ষরা বেছে নেবেন সেটাই তখন চলবে। এতে কয়েকজনের ভালো হবে আবার কিছু লোকের জন্য মন্দ হবে। অন্যথা করলে তাতেও কিছু লোকের ভালো হবে কিছু লোকের খারাপ হবে, এর কোন সার্বজনীন সমাধান কখনই হয় না। আমরা যদি জন্ম থেকে বর্ণ ঠিক করি তাতে কিছু গোলমাল দেখা যাবে, আবার যদি কর্ম দিয়ে জাতি বিচার করি তারও নিজস্ব অনেক দোষ আছে। সংরক্ষণ প্রথা চালু করলে সমস্যা, সংরক্ষণ প্রথা যদি না করা হয় তাহলে তারও সমস্যা। আমরা যাতেই যাব তাতেই সমস্যা লেগে থাকবে। সেইজন্য এক একটা সময়ে এক একটা জিনিসকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। এখন সরকারের বক্তব্য হল, ভারতের শতকরা আশি জন লোক দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রতার মধ্যে আছে, এদের শিক্ষার অভাব আছে, এদের চাকরি-বাকরি করার যোগ্যতা নেই। এদেরকে উপরে ওঠাবার জন্য আমাদের এই সংরক্ষণ প্রথাকে নিয়েই চলতে হবে।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমি জাতিপ্রথাকে খুব খুঁটিয়ে দেখেছি, কিন্তু জাতিপ্রথা ভালো না মন্দ এক কথায় বলা যায় না। তাই অনেক জায়গায় স্বামীজী জাতিপ্রথাকে প্রচণ্ড গালাগাল দিচ্ছেন আবার অন্য অনেক জায়গায় বলছেন এই জাতিপ্রথাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তা নাহলে কবে সারা দেশ হিন্দু থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু ধর্মটাই উড়ে যেত। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্য হল এখন ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতে চলে এসেছে তাই এখন আবার স্বাধীনতা দেওয়া যায়। সেইজন্য এক তরফা বলা যায় না যে এটাই ঠিক। আবেগের ঠেলায় একজন কি বলছে না বলছে সেটাকে অত গুরুত্ব দিলে চলে না। তিন চার হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণরা বলে গেছে চণ্ডাল দূরে সর, এখন চণ্ডাল যদি বলে ব্রাহ্মণ দূরে সর তাতে আপত্তির কি আছে! যাই হোক আমরা মনুষ্যত্ব ফিরে যাই, এরপর বলছেন –

যথা যথা হি সদ্ভূতমতিষ্ঠত্যানসূয়কঃ।

তথা তথেমধ্গামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ।।১০/১২৮

যে শূদ্র অপরের নিন্দা করে না, যেমন ব্রাহ্মণের কোন নিন্দা করে না আর দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যে রকমটি আচরণ করে ঠিক সেই রকমটি শূদ্র আচরণ করে, সেই শূদ্র ধীরে ধীরে সমাজে প্রশংসিত হয়ে স্বর্গপ্রাপ্তি করে। এই শ্লোকে শূদ্রদের উপরে নিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দেখো ভাই তুমি ভোগ করতে চাইছ কর, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ঠিক করে নেয়, আমি কিন্তু শাস্ত্র মত আচরণ করব, দ্বিজরা যে রকম আচরণ করে আমিও সেই রকম আচরণ করব। তখন কিন্তু সে প্রশংসিত হবে। এটা বলছেন না যে তুমি এই রকম আচরণটা করো না, কারণ এগুলো হল সার্বজনীন মূল্যবোধ।

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।

শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেষ বাধতে।।১০/১২৯

আবার বলছেন শূদ্র যদি চাষবাস করে অর্থ সঞ্চয় করার ক্ষমতা রাখে তাও যেন সে অর্থ সঞ্চয় না করে, কারণ অর্থ সঞ্চয় করলে অহঙ্কার আসবে, সেই অহঙ্কার হলেই সে আর ব্রাহ্মণকে মান্য করবে না, তাতে আবার তার পাপ হবে ইত্যাদি। এরপর আমরা একাদশ অধ্যায় আলোচনা করব। একাদশ অধ্যায় মূলতঃ প্রায়শ্চিত্তকে নিয়ে।

একাদশোহধ্যায়ঃ

দান সম্বন্ধীয় কিছু বিধান

এই অধ্যায়ে শুধু যে প্রায়শ্চিত্তের উপরই বলছেন তা নয়, আরও অন্যান্য বিষয়ে যেমন দান প্রথা নিয়ে, দান কোথায় দেবে, দান কিভাবে নেবে এগুলো নিয়েও আলোচনা করছেন। প্রথমেই বলছেন –

সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ববেদসম্।

গুৰ্বর্থং পিতৃমাত্রার্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ।।১১/১

নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণান্ ধর্মভিক্ষুকান্।

নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ।।১১/২

এখানে নয় প্রকার ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করে বলছেন, এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে সব সময় দান দেবে। কোন ব্রাহ্মণ সন্তানার্থে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। প্রেমে পড়ে সে বিবাহ করতে চাইছে না, সেই ব্রাহ্মণ নিজের বংশ রক্ষার্থে সন্তানের কামনা করে বিবাহ করতে চাইছে। বিবাহ সব সময় হয় সন্তানের জন্য, কেউ যদি বলে আমি বিবাহ করতে চাই কিন্তু কোন সন্তান চাই না, এই বিবাহের কোন অর্থ হয় না এবং আমাদের শাস্ত্রকাররা এই ধরনের বিবাহের অনুমতিও দেবেন না। কিন্তু যদি কেউ সন্তানের জন্য বিবাহ করতে চাইছে কিন্তু তার অর্থের সামর্থ নেই তখন তাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে। কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করতে চাইছে তখন তাকে দান দেবে। কোন ব্রাহ্মণ তীর্থ করতে চাইছে বা তীর্থ যাত্রায় সে বেরিয়ে পড়েছে, এখন সে পথিক তখন তাকে দান দেবে। যিনি সর্বস্ব দান করে যজ্ঞ করেছেন তাঁকে দান করবে। কোন ব্রাহ্মণ নিজের গুরুকে গুরু-দক্ষিণা দিতে চাইছেন, মা-বাবার ভরণপোষণের জন্য কিছু অর্থালিখী তাকে দান করবে। কেউ বেদ অধ্যয়ন করতে চাইছে, লেখাপড়া করতে চাইছে, তারজন্য তার খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য অবশ্যই তাকে কিছু দান করবে। আর কোন ব্রাহ্মণ যদি রোগগ্রস্ত হয় তখন তার চিকিৎসার জন্য দান দেবে। এই নয়টি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে সামর্থ অনুযায়ী অর্থ দান অবশ্যই করবে। এই কয়টির জন্য দান করা হয়। আবার বলছেন –

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।

মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্মপ্রতিরূপকঃ।।১১/৯

অনেক সময় বাড়ির লোকেরা চাইছে না কাউকে দান দেওয়া হোক, কারণ এতে তাদের অনেক অসুবিধা হয়ে যেতে পারে, হয়তো গ্রাসাচ্ছদনের জন্য কিছুই থাকবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বাড়ির লোকের

অসুবিধা হবে জেনেও নাম-যশ পাওয়ার জন্য সব দান করে দিচ্ছে। মনু বলছেন এদের দান সব সময় নিষ্ফল হয়। নিষ্ফল এই অর্থে বলা হচ্ছে, তোমার নিজেরই খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, তোমার বাড়ির লোকদের ঠিকমত গ্রাসাচ্ছদন করার ব্যবস্থা করতে পারছ না, কিন্তু সব কিছু দান করে দিচ্ছে। অন্য দিকে আবার এই দানের একটাই উদ্দেশ্য, আমার খুব নাম-যশ হবে। মহাভারতে সুবর্ণ নেউলের যে কাহিনী আছে তাতে এক ব্রাহ্মণ অনেক দিন অভুক্ত থাকার পর ভিক্ষায় সামান্য কিছু আটা পেয়েছে, সেটা দিয়ে কটি রুটি বানিয়েছে পরিবারের লোকেরা খাবে বলে। সেই সময় অতিথি এসে গেছে। অতিথি হল নারায়ণ, তার সেবা করতেই তাদের সেই রুটি কটি খরচ হয়ে গেছে। এরপর তারা সবাই অভুক্ত থেকেই মারা গেলে। এই দানকে নিষেধ করা হচ্ছে না। এখানে কোন নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা নেই, অতিথি নারায়ণকে আমার সর্বস্ব দিয়ে সেবা করছি। কিন্তু নাম-যশের জন্য কেউ সর্বস্ব দান করে দিচ্ছে যেখানে তার বাড়ির সবাই নিষেধ করছে, এই রকম দান করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

ভূত্যানামুপরোধেন যৎ করোতৌর্দ্ধদেহিকং।

তদ্ভাবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ।।১১/১০

যে লোক নিজের স্ত্রী-পুত্রাদি, যারা তার উপর নির্ভর করে আছে, তাদের ঠিক মত খেতে দিতে পারছে না, কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু পারলৌকিক সুখের জন্য, আমি স্বর্গে যাব তাই আমি যজ্ঞ করছি, তাই ধর্মবুদ্ধিতে আমি দান করছি, এই ভাব নিয়ে তারা যে ধর্মকার্য করে তাতে তারা বাড়ির লোকদের অভুক্ত রেখে জীবিত অবস্থায় তাদের দুঃখ দিচ্ছে আর পরলোকে গিয়ে এরা নিজেরাও দুঃখ পায়। অনেক সময় আমরা ভাবি ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এইসব বিধি-নিষেধ তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এগুলো ভুল ধারণা, মনু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, নিজের পরিবারকে অভুক্ত রেখে নাম-যশের জন্য সর্বস্ব দান করা, স্বর্গাদি লাভের আশায় বাড়ির লোকদের কষ্ট দিয়ে প্রচুর দান, যজ্ঞ ইত্যাদি ধর্মকার্য করলে এই ধরণের কর্মে তারা তো ইহজীবনেই কষ্ট পাবে আর মরার পরেও কষ্ট পাবে।

মনুর কাছে জীবনের মূল্য সব থেকে বেশী

তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি ষড়নশ্নতা।

অশ্বস্তনবিধানেন হর্তব্যং হীনকর্মণঃ।।১১/১৬

এই বিধিগুলো এখন আর চলে না, তবে আমাদের জেনে রাখা ভালো আমাদের পূর্বজন্মের চিন্তাধারা কেমন ছিল। বলছেন কেউ যদি তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ ছয় বেলা খাওয়া-দাওয়া না জোটাতে পারে, খাওয়ার কোন উপায় করতে পারছে না, তখন চতুর্থ দিনও যদি দেখে কিছু খাওয়ার জুটছে না তখন ধর্মকর্মহীন ব্যক্তি অর্থাৎ শূদ্রদের গৃহে গিয়েও অন্ন গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই নয়, দরকার হলে সে তার বাড়ি থেকে চুরি করে নিতে পারে, কিংবা ছিনিয়ে আনতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু তার আগে তিন দিন তিন রাত তাকে অভুক্ত থাকতে হবে। মনু খুব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আপনার গ্রামে বন্যা হয়ে গেছে। তিন দিন তিন রাত কোথাও কোন খাবার-দাবার পাওয়া যাচ্ছে না। এবার আপনি দেখলেন অন্য গ্রামের জন্য রিলিফের খাবার-দাবার যাচ্ছে। এখন আপনি ওই রিলিফের জিনিষ লুট পারতে পারেন কিনা? নিশ্চয়ই পারবেন, পরিষ্কার লুট করতে পারেন, মনু কক্ষণ না করবেন না, আগে নিজের শরীরকে বাঁচাতে হবে।

পাপ বা দোষ জিনিষটা খুব বিচিত্র। কিছু পাপ কর্ম আছে যেগুলো আমরা প্রায়ই করে থাকি অথচ পাপ করছি বলে মনেও হয় না। আবার যখন মনে হয় পাপ কাজ করে ফেলেছি তখন এর থেকে আমাকে বাঁচতে হবে, তখন আবার এমন লোকের কাছে যাবার জন্য হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করি যে কিনা আমাকে বলে দিতে পারবে এই পাপ কাজ থেকে কি প্রায়শ্চিত্ত করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। আবার কিছু পাপ আছে যার আবার কোন প্রায়শ্চিত্তই নেই, যেমন মিত্রদ্রোহ, বন্ধুকে পেছন থেকে ছুরি মারা। কিন্তু এর বাইরে পাপ বোধটা আবার

একটা ব্যাধির মত অনেকের মাথার মধ্যে বসে যায়। আমরা হলাম সাধারণ লোক, আর সাধারণ লোকের সাধারণ বুদ্ধি। পাপের ব্যাধির উপর একটা মজার কাহিনী আছে।

এক ফাদার ছিলেন যিনি সবার পাপের স্বীকারোক্তি শুনতেন। একদিন একটি যুবতী মেয়ে ফাদারের কাছে এসে খুব কাঁদছে আর বলছে ‘ফাদার! রোজ আমি যে কত বড় পাপ করি, আমার যে কি হবে’! ‘কি পাপ কর’? ‘না, আমি যখন রাত্রিতে...’। কথা শেষ না করতেই ফাদার একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন ‘রাতিরে! রাতিরে তুমি কি কর’? আঠারো বছরের মেয়ে পাপ কাজ করছে তাও আবার রাত্রিতে, ফাদার তো খুব উত্তেজিত হয়ে ভেতরে ভেতরে ফুটছেন। ‘কি কর রাতিরে আমাকে খুলে বল, আমি তো ফাদার’। ‘আমি যখন বিছানায় শুতে যাই...’। ফাদারের নিজেরই মাথা ঘুরতে শুরু হয়ে গেছে। ‘শুতে যাওয়ার সময় আমার শরীরের পোশাকগুলো খুলতে থাকি...’। মেয়েটি এইভাবে একটা একটা করে বলেই যাচ্ছে, যখন একটা একটা করে খুলে শরীরটাকে হাঙ্কা করে দিই, যখন বিছানায় এসে বসি, যখন বালিশে মাথা রাখতে যাব – পর পর বলেই যাচ্ছে মেয়েটি, আর ততই ফাদার ভেতরে ফুটছেন, এবার হয়তো আসল পাপটা জানা যাবে। ‘তারপর কি কর বল’। ‘ফাদার! আমি আর বলতে পারছি না’। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ‘আমি আর বলতে পারছি না’। এই গল্পটা যে পড়বে সেও ভাববে মেয়েটি কি না কি পাপ করছে, রাতিরে বিছানায়...শুতে গেছে...পোশাক খুলছে... এইভাবে দু পাতা ধরে রহস্য তৈরী করে শেষে বলছে ‘তখন না আমি আমার আংটার নখ থেকে ময়লা বার করে নাক দিয়ে ঝুঁকি, আমি কত বড় পাপ করি’। ফাদার তো শুনেই চোপসানো বেলুনের মত ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ফাদার ভাবছে নারী-পুরুষ জড়িত কোন ব্যাপার স্যাপার হবে। যেটা বলার কথা তা হল, মেয়েটি এমন এক পরিবেশ ও সংস্কারের মধ্যে বড় হয়েছে, যেখানে যে জিনিষটা ধর্তব্যের মধ্যে নয় সেটাই সেখানে কত বড় পাপ। বেশীর ভাগ লোক মাথায় যেগুলো নিয়ে ঘোরে সেগুলো আসলে কোন ব্যাপারই নয়। লোকটা তিন দিন তিন রাত খায়নি। চতুর্থ দিনও যদি খাবার না জোটে তাহলে যেখান থেকে খুশী তুমি চুরি করে নাও। এটা আবার শাস্ত্রের আদেশ। খুব সাধারণ ব্যাপার – আমি বাঁচবো কি বাঁচবো না। এটা না করলে আমি বাঁচবো না, সঙ্গে সঙ্গে করে দাও, আগে নিজের জীবন বাঁচাও, প্রায়শ্চিত্ত পরে করে নেওয়া যাবে।

একবার এক ভদ্রলোক একটা ভূয়ো তফশীলি জাতির সার্টিফিকেটের সাহায্যে চাকরি পেয়েছিল। পরের দিকে তার মনে কুণ্ঠা বোধ হতে লাগল, আমি কত বড় পাপ করেছি। সেই ভদ্রলোক এক সন্ন্যাসীর কাছে এসে সব খুলে বলেছে, আমার এখন খুব পশ্চাত্তাপ হচ্ছে। তখন সেই সন্ন্যাসী তাকে বললেন – দেখো! তুমি তখন খুব অভাবে ছিলে, চাকরি না পেলে তুমি বাঁচতে পারতে না। এখন তুমি স্বাভাবিক ভাবে একটা চাকরির চেষ্টা কর। তার কপাল এমন, মনের মধ্যে একটা পাপ বোধ জাগল, সন্ন্যাসীর কাছে পরামর্শ করল, চাকরির চেষ্টা করল, আর পেয়েও গেল। তার মনটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে সুস্থ জীবন চালাতে লাগল। কুণ্ঠা জিনিষটা অত্যন্ত বাজে। আমরা অনেক কিছুই করে এসে কুণ্ঠাগ্রস্ত হয়ে সব কিছুতে হতোদ্যম হয়ে জীবনে বেঁচে থাকার উৎসাহটাই হারিয়ে ফেলি। একবার ভেবে দেখো কেন করেছি! উপায় ছিল না, না করলে আমি মারা যেতাম। যেটা না করলে তুমি মারা যাবে, তাহলে করে নাও না বাপু, করে ওখান থেকে বেরিয়ে এস।

আমেরিকার কোন আশ্রমের এক সন্ন্যাসী একদিন তার আশ্রম থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই সন্ন্যাসী একদিন এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আশ্রমে হাজির হয়েছেন। আশ্রমের মহন্তকে বলছেন ‘আমি একে বিয়ে করেছি’। মহন্ত দেখে শুনে খুব হতাশার সুরে সেই সন্ন্যাসীকে বললেন ‘দুদিনের জন্য একটা ভাবনা উঠল আর তার জন্য তুমি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলে! তুমি আমাকে বলতে পারতে, আমি তোমাকে কদিনের জন্য কোন রেড লাইট এরিয়াতে পাঠিয়ে দিতাম। সেখানে কোন মেয়েকে নিয়ে কদিন আমোদ আহ্লাদ করে মনটাকে পরিষ্কার করে দিতে পারতে। তারপর আবার সন্ন্যাস জীবন চালাতে। এখন তো সারা জীবনের মত ফেঁসে গেলে’! একজন সন্ন্যাসী যে আঠারো বছর কুড়ি বছর সন্ন্যাস জীবনে রয়েছে তার মনে তো কখন বিবাহের কল্পনা আসতেই পারে না। যদি তার মনে বিবাহের সুপ্ত ইচ্ছা কখন থাকত, তার

মানে সে সন্ন্যাস জীবনের উপযুক্ত কখনই ছিল না। কিন্তু এখানে তা তো হয়নি, তার মনে হঠাৎ একটা ভাবনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে, ওই ঢেউটা পেরিয়ে গেলেই তার তো আর কোন আগ্রহই থাকবে না, আর তা নাহলে সারা জীবন হা হতাশ করে মরবে, মাগো! আমি কার পাল্লায় পড়লাম! যে কোন সন্ন্যাসীর মনে এই ধরনের দুর্বলতা আসতেই পারে। তখন সে কি করবে! কোথায় যাবে! যে কোন ধর্মের এগুলো বিরাট বড় সমস্যা। আবার লোকসমাজ বলবে পতিত সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়ে মেয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে। আরে মশাই! আপনারা দেখুন, যে সন্ন্যাসী হয়েছে সেতো বিয়ে করে সংসারে থাকতেই পারবে না, মরে যাবে। তখন বলবে গলায় দড়ি দিয়ে দিক। গলায় তো দড়ি দিয়ে দেবে কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন একটা সামান্য জিনিষের জন্য সে গলায় দড়ি দিয়ে দেবে! এই জন্য মনু মানবজীবনকে দিচ্ছেন সর্বোপরি স্থান। তোমার যে সমস্যাই থাকুক, তোমার জীবন সংশয় যদি হয়ে যায় তাহলে যে কোন কিছু একটা করে আগে নিজেকে জীবন সঙ্কট থেকে বার করে নিয়ে আস। ঠাকুর যেখানে বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, সেখানে তিনি পরিশ্কার। আত্মজ্ঞান লাভের পথে যদি তুমি আস তাহলে কামিনী-কাঞ্চন হল সব থেকে বড় বাধা, জেনে শুনে এগুলোর মধ্যে জড়াতে যেও না, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাও। এখন যার হচ্ছে না সে কি করবে! রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) তিনি বিয়ে থা করলেন, তাঁর সন্তান হল। ঠাকুর বলছেন – রাখালের অতটুকু বাকি ছিল মিটে গেল। এখন হাজার হাজার যে সন্ন্যাসীরা আছেন তাঁদের যে কত কি বাকি আছে তার খবর আমরা কি করে জানব! সেইজন্যই মনু এখানে বলছেন যদি তিন দিন তিন রাত অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয় তারপর চতুর্থ দিন সে চুরি করে নিতে পারে, লুট করে নিতে পারে তাতে তার কোন পাপ লাগবে না। এমন কি পরের শ্লোকে মনু বলে দিচ্ছেন –

খলাৎ ক্ষেত্রাদ্গারদ্বা যতো বাপ্যপলভ্যতে।

আখ্যাতব্যং তু তৎ তস্মৈ পৃচ্ছয়ে যদি পৃচ্ছতি।।১১/১৭

যদি ব্রাহ্মণ তিন দিন এইভাবে অভুক্ত থাকে তাহলে সে কারুর ক্ষেত্র থেকে, দোকান থেকে, খামার থেকে বলপূর্বক নিয়ে নিতে পারবে। মালিক যদি জিজ্ঞেস করে ‘কেন নিলে?’ তখন সে বলবে ‘তিন দিন আমি খাইনি, খাবার জন্য নিয়েছি’। তখন কিন্তু তাকে কোন দোষ দেওয়া যাবে না আর কোন পাপও তার হবে না। আসলে মনুস্মৃতি হল অত্যন্ত উন্নত সমাজের জন্য। আমাদের ঋষিরা জীবনকে কত মূল্য দেন আর জীবনের সমস্যাগুলোকে কিভাবে মূল্য দিতেন এই শ্লোকগুলো হল তার প্রমাণ। মনু আবার খুব সুন্দর বলছেন –

যোহসাধুভ্যোহর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি।

স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সন্তরয়তি তাবুভৌ।।১১/১৯

এমনকি কেউ একটা যজ্ঞ করতে যাচ্ছে, ভালো একটা কাজ করতে যাচ্ছে তখন যদি কেউ ছিনতাই বা ডাকাতি করেও টাকা নিয়ে এসে ঋত্বিককে, যিনি যজ্ঞ করছেন, তাঁকে যদি দিয়ে দেয় তখন সে নিজে হয়ে যাচ্ছে যেন নৌকা। নৌকা হয়ে সে দুজনকেই উদ্ধার করে দিচ্ছে, যার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে আসা হয়েছে তাকেও উদ্ধার করেছে আর যার যজ্ঞ হচ্ছে তাকেও উদ্ধার করে দিচ্ছে। সৎ কার্যের জন্য, ভালো কাজের জন্য যদি কেউ এগুলো করে তাতে কোন দোষ হবে না। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় দণ্ডবিধির যে আইন আছে তাতে কিন্তু এই ধরনের কাজের অনুমতি দেবে না। কিন্তু মনু একেবারে পরিশ্কার বলে দিচ্ছেন, সৎ কাজের জন্য দরকার হলে অবশ্যই ছিনতাই করবে, তাতে দুজনেরই উদ্ধার হবে, যার টাকা ছিনতাই হয়েছে তারও ভালো হবে আর যাকে দান করেছে তারও ভালো হবে।

যদধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্ বিদুর্বুধাঃ।

অযজ্ঞনাং তু যদ্ বিত্তমাসুরস্বং তদুচ্যতে।।১১/২০

যাঁরা নিত্য যাগ-যজ্ঞাদি করেন তাঁদের সম্পত্তি কে বলে দেবস্ব, দেবতার ধন। আর যারা যজ্ঞবিমুখ তাদের ধনকে বলে অসুরস্ব, অসুরের ধন। যারা নিত্য যজ্ঞ করে না তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করে নেওয়ার

অধিকার আছে। কিন্তু তার সাথে বলে দিচ্ছেন যজ্ঞাদি করার সময় অর্থের ঘাটতি হলে তবেই যারা যজ্ঞাদি করে না তাদের ধন লুট করা যাবে।

ব্রাহ্মণ কখন কাক শকুন হয়ে জন্মাতে থাকবে

যজ্ঞার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রযচ্ছতি।

স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।।১১/২৫

কিছু ব্রাহ্মণ আছে যারা যজ্ঞ করার জন্য লোকের কাছ অর্থ ভিক্ষা করে যে পরিমাণ অর্থ পায় তার পুরোটা যজ্ঞের কাজে ব্যয় না করে কিছু অর্থ সরিয়ে রাখে। বলছেন এই ধরনের ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর একশ বছর পর্যন্ত কাক, শকুন হয়ে জন্মায়। এই সমস্যা ইদানিং কালেও হয় বিশেষ করে যেসব আশ্রম সেবামূলক কাজকর্মের সাথে জড়িত। রিলিফের জন্য টাকা সংগ্রহ হওয়ার পর পুরো টাকাটা রিলিফে খরচ না হলে তখন একটা সমস্যা হয়ে যায়। যার জন্য পরে রামকৃষ্ণ আশ্রমে আলাদা করে একটা ফাণ্ড গঠন করা হয়েছে যার নাম প্রতিভেদেও রিলিফ ফাণ্ড, একটা স্থায়ী ফাণ্ড করে রিলিফের যা টাকা বাঁচবে সেটা ওই ফাণ্ডে থাকবে। আবার একটা মন্দির বানাবার জন্য বলা হল দু কোটি টাকা খরচ হবে, চাঁদা তোলার পর দেখা গেলে তিন কোটি টাকা সংগ্রহ হয়ে গেছে। এখন এই এক কোটি টাকাটা কি করবে! যার জন্য অনেক আশ্রম থেকে বলে দেওয়া হয় আমাদের আর টাকা লাগবে না। তবে অনেক রকম ঘটনাও শোনা যায়। আশ্রমে কোন ভক্ত এসে টাকা দিয়ে মহন্তকে বলল এই টাকা দিয়ে আপনার আশ্রমের সব সাধুদের একদিন ঘিয়ের পুরি-তরকারি খাওয়াবেন। দেখা গেল সেই মহন্ত পরে ঘিয়ের না খাইয়ে সাধুদের ডালডার পুরি খাইয়ে দিয়েছে। বাকি টাকাটা সে নিজের কাছে রেখে দিল। এই ধরনের ঘটনা যে হয় না তা নয়, প্রচুর হয়। কিন্তু মনু বলে দিচ্ছেন এরা মরে একশ বছর ধরে কাক আর শকুন হয়ে জন্মাতে থাকবে।

দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভেনোপহিনস্তি যঃ।

স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি।।১১/২৬

যে লোক লোভ বশতঃ মন্দিরের দেবতার বিগ্রহ থেকে টাকা চুরি করে এবং ব্রাহ্মণদের থেকে ধন সম্পদ অপহরণ করে, এই ধরনের পাপীদের মৃত্যুর পর পরলোকে শকুনির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে জীবন ধারণ করতে হয়। এগুলো কি হয় আমরা জানিনা, কিন্তু লোকেদের ভয় দেখিয়ে যাতে একটু সুপথে নিয়ে আসা যায়। মানুষ যখন যৌবন অবস্থায় থাকে তখন যৌবনের তেজ ও ঔদ্ধতের জন্য অনেক কিছু মানতে বা শুনতে চায় না। কিন্তু সেই মানুষই যখন একটা বয়সকে অতিক্রম করে নেয় তখন কোথাও তার মনে একটা ভয় ঢুকতে শুরু করে, ওই ভয় থেকেই মানুষ ধর্মকর্ম করতে শুরু করে, তখন এগুলো শুনলে মনে ভয় হয়, পাপকাজ করে কেন শকুনের উচ্ছিষ্ট খেয়ে মরতে যাব। তার থেকে বরং কিছু পুণ্য কার্য করা যাক। মানুষের যত বয়স হতে থাকে ততই তাকে মৃত্যু ভয় এসে গ্রাস করতে থাকে। মৃত্যু ভয়ের সাথে যোগ হয় মরে গিয়ে আমার কি গতি হবে। তখন নানা রকমের দান, পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত এগুলোর আলোচনা করা হয় যাতে মানুষের স্বার্থপরতাটা কমে। এই ভাবে মনু লম্বা একটা তালিকা দিয়ে বলে যাচ্ছেন এটা করলে ওটা হয়, ওটা করলে এটা হয়। বিস্তারিত আলোচনায় গিয়ে আমাদের কাজ নেই। মূল কথা হল যেখানেই স্বার্থপরতা, লোভ এই বৃত্তিগুলো থাকবে সেখানেই পাপের বৃদ্ধি হবে। মনু এখানে একটা শ্লোকে ব্রাহ্মণকে বলছেন –

ব্রাহ্মণ কেন রাজার কাছে নালিশ করবে না

ন ব্রাহ্মণো বেদয়েত কিঞ্চিদ্ রাজানি ধর্মবিৎ।

স্ববীর্যেণৈব তান্ শিষ্যান্মানবানপকারিণঃ।।১১/৩১

ব্রাহ্মণের প্রতি কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করে, অনিষ্ট করে তাহলে ব্রাহ্মণ যেন রাজার কাছে গিয়ে ওই ব্যক্তির নামে কোন নালিশ না করে। কিন্তু রাজার কাছে নালিশ না করলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে অন্যায় হল তার প্রতিবিধান কি ভাবে হবে? সেটা বলছেন তেত্রিশ নং শ্লোকে –

শ্রুতীরথব্রাহ্মণসীঃ কুর্যাদিত্যবিচারয়ন।

বাকশস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ।।১১/৩৩

বলছেন, ব্রাহ্মণ যে এতদিন বেদ অধ্যয়ন করেছে, তপস্যা করেছে এবং তার ফলে তার মধ্যে যে শক্তি এসেছে, সেই শক্তিটা সে বিনা বিচারে তার উপর চালিয়ে দেবে। তখন সেই দুষ্ট লোক নিজেই নষ্ট হয়ে যাবে। রাজার কাছে না গেলে দুটো জিনিষ হবে, এক ব্রাহ্মণের মধ্যে শক্তি এসেছে কিনা তার পরীক্ষা হয়ে যাবে আর শক্তি থাকলে দুষ্ট বদমাইশ লোকগুলোর বারোটা বেজে যাবে। মনু কিন্তু এটা একটুও ভুল কিছু বলছেন না। কোন সৎ ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীর প্রতি কেউ যদি অন্যায় করে, সেই ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী যদি তাকে দুটো কথা শুনিye দেয়, কি দুটো চড় মেরে দিল বা কোথাও নালিশ করে দিল, তাহলে বুঝে নিন ওই লোকটি খুব জোর বেঁচে গেল। সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ যদি এর কোন কিছুই না করে তাহলে ওই লোকটি শেষ হতে সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

হাষিকেশের দিকে একটা ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। কোন আশ্রমের এক অল্প বয়সী সাধুবাবা সকালবেলা ভিক্ষা করতে করতে এক মিষ্টির দোকানে পৌঁছে গেছে। দোকানের লোকটি সব দোকান খুলেছে আর সেই সময় সাধুবাবাটি ভিক্ষা চাইতেই লোকটি রেগে গিয়ে সাধুকে এক চড় মেরে বলছে – সকাল সকাল কাঙালীগুলো এসে জুটে গেছে। সাধুবাবা মনে দুঃখ পেয়ে আশ্রমে ফিরে এসে আশ্রমের মহন্তকে সব বলেছে। মহন্ত বললেন, তোমাকে একটা চড় মারলো আর তুমি কিছু না বলে চলে এলে! এক্ষুণি তুমি ওখানে ফিরে গিয়ে ওকে পাঁচটা একটা চড় মেরে এস। গুরু আদেশ দিতেই সেই সাধু ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল। মিষ্টির দোকানের দিকে এগোতেই দূর থেকে দেখছে দোকানের সামনে বিরাট লোকের ভিড় জমে গেছে। দৌড়ে ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে শুনল – সকালবেল লোকটি উনুনে বিরাট কড়াইতে রস গরম করছিল, তার দু-আড়াই বছরের বাচ্চা ছেলেটা তার কোলেই ছিল। কিন্তু কি করে কোল থেকে স্লিপ করে ওই গরম ফুটন্ত রসের কড়াইতে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। সাধুবাবা লোকটিকে আর কি মারবে। চুপচাপ আশ্রমে ফিরে এসেছে। গুরুকে সব বলল। গুরু বললেন – এই জন্যই তো বললাম তোমাকে, তুমি যদি তখনই একটা চড় মেরে দিতে তাহলে লোকটা বেঁচে যেত। এটা সত্যি মিথ্যা কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠানে সবাই চোখের সামনেই যে ঘটনা দেখেছেন সেটাকে তো কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না।

১৯৮৮-৮৯ সালে সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের সংগঠনের নেতাদের উস্কানিতে কি অরাজকতাই না তৈরী করেছিল তাদের কর্মচারীরা। ঠিক এই ব্যবহারই তখন তারা মহারাজদের সাথে করত। অফিসে ঢুকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা মহারাজদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলত ‘কিরে! সাধুবাবা হয়েছিস! দেনা আমাদের ভস্ম করে’। কতটা ঔদ্ধত হলে সন্ন্যাসীকে এইভাবে বলতে পারে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তারপর এদের পরিণতিও সবাই চোখের সামনেই দেখলেন। একজন খুব কড়া মহারাজকে ওখানে পাঠানো হল, উনি সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। দেড় মাস সেবা প্রতিষ্ঠানে স্ট্রাইক হয়ে বন্ধ হয়ে রইল। রোগীদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল, স্থায়ী কর্মচারীদের বেলুড়ে পাঠান হল। বেলুড় মঠ বলে দিল আমরা আমাদের হাসপাতাল বন্ধ করে দিচ্ছি, আপনারা যা খুশী তাই করুন, এটা তো আর প্রাইভেট কোম্পানি নয়! কেউ কিছু করতে পারলো না, কদিনের মধ্যে সব কটা শেষ হয়ে গেল। ইউনিয়নের নেতাদের কারুর আর টিকি দেখা গেল না, সব কর্মচারীদের চাকরী চলে গেল। সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা বরখাস্ত হয়েছে তাদের তো কোথাও চাকরিও হবে না, প্রথমত তোমার কোন যোগ্যতা ছিল না বলেই রামকৃষ্ণ মিশন দয়া করে তোমাকে চাকরি দিয়েছে আর দ্বিতীয়ত সেই মিশনই তোমাকে যখন রাখতে পারল না তাহলে আমরা কি করে রাখব। কেউ আর এদের চাকরিই দিতে চাইল না, সব কটা ভস্ম হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণদের মনু তাই বলে দিচ্ছেন তোমাকে যদি কেউ অনিষ্ট করে তুমি তার জন্য রাজার কাছে নালিশ করতে যেও না, তোমার নিজের শক্তি দিয়েই নির্বিচারে ভস্ম করে দাও। এর মধ্যে দুটো ব্যাপার আছে, প্রথম তাতে বোঝা যাবে তুমি কেমন বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা করেছ। সত্যিই শক্তি থাকলে দুষ্ট লোকগুলোর শাস্তি হয়ে

যাবে। ব্রাহ্মণকে কেউ অনিষ্ট করতে সাহস পাবে না। ব্রাহ্মণকে তাই বলছেন, অথর্ববেদাদিতে যে আভিচারিক কর্মগুলো শিখেছ সেগুলো প্রয়োগ করবে, এগুলোই তোমার অস্ত্র। রাজার কাছে নালিশ করলে রাজা হয়ত তাকে ক্ষমা করেও দিতে পারে কিন্তু তোমার যে ক্ষমতা সেটা যদি ছেড়ে দাও কোন অস্ত্র-শস্ত্রই তাকে বাঁচাতে পারবে না। পরের শ্লোকে ক্ষত্রিয়দের উদ্দেশ্যে বলছেন –

ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।

ধনে বৈশ্যশূদ্রৌ তু জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমঃ।।১১/৩৪

ক্ষত্রিয়কে বলছেন তোমার যে শক্তি, সেই বাহুবল দিয়ে তোমার শত্রুকে পরাভব কর, রাজা-টাজার উপর বিশ্বাস করার তোমার দরকার নেই। বৈশ্য আর শূদ্রদের বলছে তাদের কোন আপদ-বিপদ হলে তারা টাকা দিয়ে সেই বিপদ থেকে নিজেদের উদ্ধার করবে। তার মানে যারা টাকা দিয়ে ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করে তারা বৈশ্য আর শূদ্র। যারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে চেষ্টামেচি করে কাজ আদায় করছে এরা ক্ষত্রিয়। আর যারা বলে ‘ঠিক আছে ভাই করতে হবে না’ বলে বেরিয়ে এল, এরা ব্রাহ্মণের মত। ঘুষ দেওয়া যে নিষেধ এটা কিন্তু কোথাও বলছেন না। আপদ-বিপদ যখন আসে তখন কিছু টাকা দিয়ে সেই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসতে বলছেন। আমরা তাই এর আগেও বলেছি যে, মনু জীবন দর্শনটা খুব ভালো করে দেখেছেন, জীবনকে খুব ভালো করে দেখেছেন বলে ঘুষ নেওয়া পাপ বা ঘুষ দেওয়াটা পাপ কোথাও বলছেন না। যে নেবে সে মরুক, কিন্তু আপনার উপর বিপদ এসে গেছে আপনাকে তো আগে বাঁচতে হবে। এটা সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে মনুর কাছে এই জীবনটা প্রচণ্ড মূল্যবান, মনুর কাছে অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, পরলোক, ব্রহ্মজ্ঞান এগুলো এখন থাক আগে তোমার জীবনটা বাঁচাও। এই একটা জিনিষকে কেন্দ্র করে বাকি সব কিছু ঠিক হচ্ছে। ব্রাহ্মণকে বলছেন, আপদ-বিপদ এসে গেলে জপ ও হোম করে নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাবে। শ্রীশ্রীমাও বলছেন ‘যার আছে মাপো, যার নেই জাপো’। সমস্যায় পড়ে গেছেন, হাতে কিছু নেই তাহলে জপ করুন। কিন্তু হাতে টাকা-পয়সা আছে তাহলে জপে কাজ হবে না। ছেলেকে ভর্তি করতে গিয়ে কিছু ঘুষ দিয়ে দিন ভর্তি হয়ে যাবে। নিজের আশেপাশের জীবনকে সব সময় মসৃণ রাখতে হয়। তাই যখন হাতে কিছু থাকে খরচাপাতি করে তখনকার মত কাজ উদ্ধার করে নাও, যখন কিছু নেই তখন ঠাকুরের নাম কর, হে ঠাকুর আমাকে উদ্ধার করে দাও।

বিধাতা শাসিতা বক্তা মৈত্রী ব্রাহ্মণ উচ্যতে।

তস্মৈ নাকুশলং ক্রয়ান্ন শৃঙ্খাং গিরিমীরয়েৎ।।১১/৩৫

ব্রাহ্মণ হলেন বিধাতা, যেহেতু তিনি একদিকে যজ্ঞাদি করছেন আবার যজ্ঞ পরিচালনাও করেন। ব্রাহ্মণ হলেন শাসিতা, তিনি সবাইকে শাসন করেন, কারণ তিনি সবাইকে কোনটা করবে কোনটা করবে না বলে দেন। ব্রাহ্মণ হলেন বক্তা, সবাইকে তিনি হিতাহিতের উপদেশ দেন। আর ব্রাহ্মণ হলেন মিত্র, সবারই তিনি বন্ধু। ব্রাহ্মণকে বলা হচ্ছে মৈত্রী, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বন্ধুর কাছে যেমন সবাই নির্ভয়ে থাকে ঠিক তেমন ব্রাহ্মণ থেকেও সবাই নির্ভয় থাকে। ব্রাহ্মণ যদি কারুর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তাহলে বুঝতে হবে সে ব্রাহ্মণ নয়। যদি দেখা যায় ব্রাহ্মণ কোন দোষ করেছে তখনও ব্রাহ্মণকে অপমান করতে নেই বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করতে নেই। সন্ন্যাসীর যদি একটু ডান দিক বাম দিক হয়ে যায় তাঁকে কখন কটু কথা বলতে নেই, কারণ এঁরা হলেন সমাজের অগ্রণী, সমাজকে তাঁরা পথ দেখিয়ে সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা করেন। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের এটাই কাজ। পরের শ্লোকে আবার অন্য বিষয়ে বলছেন –

কারা কারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করতে পারবে না

ন বৈ কন্যা ন যুবতির্নাল্পবিদ্যো ন বালিশঃ।

হোতা স্যাদগ্নিহোত্রস্য নার্তো নাসংস্কৃতস্তথা।।১১/৩৬

ব্রাহ্মণের দৈনন্দীন কাজের মধ্যে একটা প্রধান কর্ম হল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, এখন অবশ্য অগ্নিহোত্র কর্ম উঠেই গেছে। এখানে একটা তালিকা দিয়ে বলছেন কারা কার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করবে না – যারা কন্যা, যারা বিবাহিতা কিন্তু যুবতী অর্থাৎ সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী এরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করবে না। যারা এখনও পড়াশোনা শেষ করেনি অর্থাৎ অল্পবিদ্যা বা মুর্থ, রোগী আর যাদের এখনও যজ্ঞ উপবীৎ হয়নি এই কজন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করবে না। এর বাইরে পুরুষ নারী সবাই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করবে। তবে মজার ব্যাপার হল এখানে বলছেন না যে বিধবারা করবে কি করবে না। তবে অগ্নিহোত্র স্বামী স্ত্রী দুজন মিলেই করে। এখন অগ্নিহোত্রাদির জায়গায় জপ ধ্যান এসে গেছে। অনেকে যে বলে থাকেন হিন্দু ধর্মে নারীদের যজ্ঞ করার অধিকার নেই, এটা ভুল কথা। কারণ এখানে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে বলছেন না যে স্ত্রীরা যজ্ঞ করবে না। আমাদের পরম্পরাত্রে উপনয়নের প্রথাটা অনেক পড়ে এসেছে, উপনয়নের বদলে আগে কোমরে মুঞ্জ ধারণের প্রথা ছিল, মুঞ্জ ছেলে ও মেয়ে দুজনেই ধারণ করত আর যজ্ঞ দুজনই করত। ধীরে ধীরে এই প্রথাটা বিভিন্ন কারণে উঠে গিয়ে উপনয়ন প্রথা এসেছে। আমরা যদি হিন্দু ধর্মকেও পুরোপুরি আগের মত আনতে চাই, বেদান্তের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়, তাহলেও আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। আগে যেটা আমরা করতাম সেখান থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে এসেছি। আসলে হিন্দু ধর্মে নারী পুরুষকে কখন আলাদা করে দেখা হত না। মানুষে মানুষে তফাৎ থাকবেই, পুরুষ নারীতেও কিছু তো তফাৎ থাকবেই। কিন্তু তাই বলে একেবারে লাইন টেনে দিয়ে বলে দেবে মেয়েরা যজ্ঞ করবেই না, মেয়েরা পুরোহিত হবেই না, এই রকম কথা মনু কিন্তু কোথাও বলছেন না। মনু হলেন হিন্দু ধর্মের সব কিছুর মাপকাঠি, মনুস্মৃতিকে যদি শেষ কথা না মানা হয় তাহলে মহাভারতে যেতে হয়, কারণ মহাভারত আরও একটু পেছনের দিকের। তারপর থেকে যেমন যেমন প্রথা এসেছে সেগুলো সমাজে বসে গেছে, কিন্তু সেগুলোকে আবার পুরোপুরি বিশ্বাসও করা যায় না। কারণ আপদ-বিপদ গুলো তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু ধর্মে কোথাও বলে না যে মেয়েরা ছোট। কোথায় একটা চটি বইতে বলেছে মেয়েরা যজ্ঞ করবে না, সেটাকে আধার করে সব কিছু বিশ্বাস করা যায় না। সেইজন্য এই শ্লোকটি একটি দৃষ্টান্ত, এখানে সব কিছু স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন মেয়েদের মধ্যে কারা যজ্ঞ করবে না – অবিবাহিতা যারা তারা করবে না, অবিবাহিত মানে যারা বয়স্ক তাদের কথা বলছেন না, যারা কন্যা অর্থাৎ বাচ্চা মেয়ে আর যুবতী, যুবতী মানে সদ্য বিবাহিতা কিন্তু বয়স কম, এরা যজ্ঞ করবে না। এরপর প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে বলছেন –

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম

প্রায়শ্চিত্ত দুটো শব্দ থেকে এসেছে ‘প্রায়ঃ’ আর ‘চিত্ত’ প্রায়ঃ মানে হয় তপস্যা, আর চিত্ত মানে মন। যখন কোন একটা নিশ্চিত উদ্দেশ্য করে তপস্যা করা হয় তখন তাকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়ঃ মানে তপস্যা আর চিত্ত মানে এখানে নিশ্চয় করা। আমি একটা দোষ করেছি, এখন আমি বলছি আমি এই নিমিত্তে একটা তপস্যা করবো, এটাকে বলছেন প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত কারা করবে?

অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম নিদিতঞ্চ সমাচরন্।

প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।।১১/৪৪

প্রথম যারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম করছে না, এরা প্রায়শ্চিত্ত করবে। দ্বিতীয় যারা নিষিদ্ধ কর্ম করছে আর তৃতীয় যারা ইন্দ্রিয়ে অত্যন্ত আসক্ত। এই তিনজনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমরা জানি কর্ম পাঁচ প্রকার – নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম। এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে নৈমিত্তিক কর্ম হল কোন নিমিত্তের জন্য যেমন শ্রাদ্ধাদি কর্ম, বিশেষ দিনে কোন পূজা করা আর কাম্য কর্ম হল কিছু কামনা করে যখন কোন কর্ম করা হয় যেমন আমি সন্তান চাই কিংবা টাকা চাই। নিমিত্ত কর্ম আমি ইচ্ছে করলে নাও করতে পারি আর সন্তান বা টাকা চাইতে গিয়ে আমি যজ্ঞ করতেও পারি আবার নাও করতে পারি, এই দুটো কর্ম না করলে কিছু হবে না। তাহলে রইল নিত্য কর্ম আর নিষিদ্ধ কর্ম। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম এই দুই ধরনের কর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নিত্য কর্ম না করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আবার নিষিদ্ধ কর্ম করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

প্রায়শ্চিত্ত কর্মের ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক কর্ম আর কাম্য কর্মের কোন ভূমিকা নেই। নিষিদ্ধ কর্ম আবার দুই ধরনের হয় – একটা হল শাস্ত্র যে কর্ম করতে নিষেধ করছে যেমন মদ খাবে না, জুয়া খেলবে না আর দ্বিতীয় এখানে যেটা বলছেন যে কর্মগুলো অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ের আসক্তি নিয়ে করা হয়। এমন অনেক কর্ম আছে যেগুলো শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়ের আসক্তি বশতঃ কিছু কাজ করা হয়। পরে পরে অবশ্য স্মৃতি আদি গ্রন্থে এই ধরনের কর্মগুলোকে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন সময়ের সাথে সাথে কিছু আচার ব্যবহার পাণ্টে যাচ্ছে। তাহলে আমরা কি করে বুঝবো এটা পাপ কর্ম কিনা। তখন ধরা পড়বে এই একটা দিয়ে, যদিও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্মের তালিকার মধ্যে নেই কিন্তু ওই কর্মটা ইন্দ্রিয়ে অত্যন্ত আসক্তি থাকার জন্য করা হচ্ছে কিনা। তাহলে তিন ধরনের কর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হচ্ছে – প্রথম নিত্য কর্ম মানে বিধি পালন করছে না, নিষিদ্ধ কর্ম করছে আর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ের আসক্তি বশতঃ কোন কর্ম করছে।

অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ।

কামকারকৃতেহপ্যাছরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ।।১১/৪৫

অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।

কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।।১১/৪৬

মনু বলছেন – কোন কোন পণ্ডিতরা বলেন কেউ যদি অনিচ্ছাপূর্ব ও অজ্ঞানবশতঃ কোন পাপকর্ম করে তাহলে তার জন্যও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আবার কিছু পণ্ডিতরা বলেন জেনেশুনে পাপকর্ম করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অজানতায় বা অনিচ্ছাপূর্বক পাপকর্ম করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। আবার বলা হয় অনিচ্ছায় যে পাপ করা হয় বেদাভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ জপ করলে সেই পাপ কেটে যায়। কিন্তু মোহ বশতঃ রাগদ্বেষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক যে পাপ করা হয় সেই পাপের জন্য যেমনটি বিধান দেওয়া হয়েছে সেই বিধান অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই শুদ্ধ হতে পারবে। তাহলে পাপ দুই রকমের – ইচ্ছাকৃত আর অনিচ্ছাকৃত। একটা জিনিষ আমি করতে চাইনি কিন্তু করে ফেলেছি এটা হল অনিচ্ছাকৃত। যেমন ঘরের মধ্যে কারা আছে আমি জানি না আমি চেষ্টা করে বল উঠলাম ‘এই কে আছিস ঘরের ভেতর’। তারপর আমি দেখলাম ঘরের মধ্যে একজন গুরুজন বা সম্মানীয় ব্যক্তি আছেন। আমি অজানতায় গুরুজনকে অসম্মান করে ফেলেছি। বলছেন গুরুজনের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটু ঠাকুরের নাম করে নিলেই এই পাপটা কেটে যাবে। আর ইচ্ছাকৃত কর্ম হল, যখন কেউ রাগ ও দ্বেষের মোহে পড়ে, একটা জিনিষের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ এসে গেছে, আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না, ওই অবস্থায় যদি কোন নিষিদ্ধ কর্ম করে ফেলি সেটা পাপকর্ম, এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু যারা বদমাইশি করছে, ডাকাতি করছে এদের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। এরপর বলছেন –

ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্বকৃতৈস্তথা।

প্রাপ্তবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্যয়ম্।।১১/৪৮

হিন্দুরা এই সব ব্যাপারে খুব গোঁড়া ছিল। আলবেরুনি এগুলো আবার তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। সব মানুষ কেন রূপবান হয় না, কেন কিছু মানুষ কুরূপ নিয়ে জন্মায়? এই শ্লোকে বলছেন, কিছু মানুষ কুরূপ হয় এই জন্মের পাপের জন্য, কিছু হয় গত জন্মের পাপের জন্য। মনু এখানে একটা লম্বা তালিকা দিয়ে বলছেন আগের আগের জন্মে কি কি পাপ করলে পরের জন্মে শরীরে তার কি রকম প্রভাব পড়ে। যেমন বলছেন, গত জন্মে কেউ যদি সোনা চুরি করে তাহলে পরের জন্মে তার নখ খুব বাজে হয়। গত জন্মে যদি কেউ প্রচুর মদ্যপান করে থাকে পরের জন্মে তার দাঁত কালো হয়। ব্রাহ্মণকে হত্যা করে থাকলে পরের জন্মে তার যক্ষ্মা হয়। কেউ যদি গত জন্মে গুরুপত্নীর সাথে সঙ্গম করে থাকে পরের জন্মে তার খুব খারাপ চর্ম রোগ হয়। যদি কেউ বিদ্যার দোষ দেখে তাহলে তার নাকে দুর্গন্ধ থাকে। যারা পরনিন্দা পরচর্চা করে তাদের পরের জন্মে মুখে দুর্গন্ধ হয়। যারা ভেজাল মেশায় তারা ছটি আঙুল নিয়ে জন্মায়। শ্রীশ্রীমাও বলছেন কোন পাপ করে প্রায়শ্চিত্ত না করে নিলে আগামী জন্মে কোন রোগ নিয়ে জন্মায়। হিন্দুরা মনে করে, কারুর যখন কোন রোগ

হয় তার মানে পেছনে তার একটা পাপকর্ম আছে। আলবেরুনিও তার বইতে একটা বিরাট লম্বা তালিকা দিয়েছেন, এই পাপ করলে এই রোগ হয়, সেই পাপ করলে এই রোগ হয় ইত্যাদি।

আবার বলছেন কেউ যদি পূর্বজন্মে অন্ন চুরি করে থাকে তাহলে তার মন্দাঙ্গি রোগ অর্থাৎ পেটের রোগ হবে। গুরুর বিনা অনুমতিতে যদি কেউ বেদাভ্যাস করে তাহলে সে বোবা হয়ে জন্মাবে। যে ঘোড়া চুরি করে সে খোড়া হয়ে জন্মায়, এখান থেকেই হয়ত প্রবাদ এসেছে ঘোড়া দেখলে খোড়া হয়। প্রদীপ চুরি করলে পরের জন্মে অন্ধ হয়, প্রাণী হিংসা করলে বহু রোগগ্রস্ত হয়। এইভাবে বিরাট লম্বা বলে যাচ্ছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের যত রকম দিক আছে তার সব কটাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এত কিছু আলোচনা না করে আমরা সোজা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি রকম ব্যবহার করতে হবে চলে যাচ্ছি –

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপমা চ মলমুচ্যতে।

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যো বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।।১১/৯৩

মদ হল অন্নের মল, অন্নকে পচিয়ে মদ তৈরী করা হয় বলে অন্নের মল বলা হয় আর পাপী হল মানুষের মধ্যে মল। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এরা যেন কখন মদ পান না করে। কারণ মদ পান আর পাপ এই দুটো এক সঙ্গে চলে।

এনস্বিভিরনির্গিতৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সহাচরেৎ।

কৃতনির্গেজনাংশ্চৈব ন জুগুপ্সেতে কহিচিৎ।।১১/১৯০

বলছেন যে পাপ করেছে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হয়নি, তার সাথে কথা বলবে না, কোন ব্যবহার করবে না বা একত্র বাস করবে না। আর যে পাপ করার পরে প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছে তার নিন্দা কখন করবে না, যদি তার নিন্দা করে ফেল তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তারপরেই আবার বলছেন –

বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্মতঃ।

শরণাগতহস্তাংশ্চ স্ত্রীহস্তাংশ্চ ন সংবসেৎ।।১১/১৯১

বালক হত্যাকারী, কৃতঘ্ন অর্থাৎ যার ভালো করেছে সেই আবার তাকে ধোকা দিয়েছে, শরণাগতকে যে হত্যা করেছে আর স্ত্রী হত্যাকারী – এই চারজন যদি প্রায়শ্চিত্ত করেও নেয় তাহলেও কিন্তু এদের সংসর্গ করবে না। এর মধ্যে বালকের হত্যা শোনা যায় না, এখন কেউ কারুর শরণাগতও হয় না, আর পণপ্রথার কারণে স্ত্রীর হত্যা যদিও বা কিছু হয় কিন্তু থেকে যাচ্ছে কৃতঘ্ন। কৃতঘ্ন সমাজে এখন প্রচুর পাওয়া যাবে, আপনি কারুর ভালো করেছেন, সেটা সে মানেও না আবার উল্টে আপনার ক্ষতি করে দিয়েছে। এর সঙ্গ কখনই করা যাবে না। এরা এমনই পাপী যে এদের সঙ্গ করলে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর অনেক রকম ব্রত ও তপস্যাদি নিয়ে বলছেন –

ব্রত ও তপস্যাদি

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়াং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।

ত্র্যহং পরঞ্চ নানীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ।।১১/২১২

প্রাজাপত্য ব্রত যারা করে তারা প্রথমে তিন দিন সকালবেলাতেই খায়, তারপরের তিন দিন সন্ধ্যাবেলায় খায়, তারপরের তিন দিন অযাচিত ভাবে যা এসে যাবে তাই খাবে, কারুর কাছে চাইবে না যা কিছু নিজে থেকে আসবে সেটাই খাবে, যদি না আসে সেদিন খাবে না। তারপরের তিন দিন উপোস করে থাকবে। এই ব্রত বারো দিন ধরে করতে হবে। প্রাজাপত্য ব্রত একটা কঠিন তপস্যা। বিভিন্ন পাপে বিধান করা হয় এই রকম পাপ হলে এই এই ব্রতের তপস্যা করবে। এরপরের ব্রত আরও কঠোরতা অবলম্বন করছে –

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।

একবাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছং সান্তপনং সূতম্।।১১/২১৩

এই ব্রতের নাম কৃচ্ছ সান্তপন তপস্যা। ছয় দিনের এই ব্রতে প্রথম দিন শুধু গোমূত্র খেয়ে থাকতে হবে, দ্বিতীয় দিন শুধু গোবর খাবে, তারপরের দিন শুধু দুধ খাবে, তারপরের দিন শুধু দই খাবে, তারপরের দিন শুধু ঘি খাবে আর শেষ দিনে জলের মধ্য কুশ দিয়ে নাড়িয়ে সেই জল খাবে। ছয় দিন এই ছয়টা জিনিস খেয়ে থাকা, একে বলে কৃচ্ছ সান্তপন, অর্থাৎ কৃচ্ছ সাধন যাকে বলা হয়।

একৈকং গ্রাসমশীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ববৎ।

ত্র্যহ্ষেগপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছং চরন্ দ্বিজঃ।।১১/২১৪

এটা আরও কঠোর তপসায়, এর নামই হল অতিকৃচ্ছ ব্রত। প্রথম তিন দিন সকালে, তারপরের তিন দিন বিকেলে, তারপরের তিন দিন অষাচিত ভাবে যা পাবে আর শেষের তিন দিন উপোস করে থাকতে হবে। তাহলে প্রাজাপত্য ব্রতের সাথে তফাৎ কোথায় রইল? না, প্রাজাপত্যে তুমি একবেলাই পেটভরে খেয়ে নিতে পারবে কিন্তু এখানে মাত্র এক গ্রাস করে খেতে হবে।

তপ্তকৃচ্ছং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।

প্রতিত্র্যহং পবেদুক্ষান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ।।১১/২১৫

এই ব্রতের নাম তপ্তকৃচ্ছ সাধন। প্রত্যেক দিন দিনে একবার স্নান করে সংযত হয়ে প্রথম তিন দিন গরম জল পান করবে, তারপরের তিন দিন গরম দুধ পান করবে, তারপরের তিন দিন গরম ঘি খাবে এবং পরের তিন দিন শুধু গরম বাতাস খেয়ে থাকবে। এরপরের ব্রত এখনও লোকেরা করে –

একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্ৰায়ণং সূতম্।।১১/২১৭

এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ ব্রত। এই ব্রতে দিনে তিনবার স্নান করবে, সকাল, দুপুর ও বিকেল। পূর্ণিমার দিনে পনেরো গ্রাস খাবে, তারপর থেকে এক গ্রাস এক গ্রাস করে কমাতে কমাতে অমবস্যাতে পুরো উপবাসে থাকবে। আবার পরের দিন থেকে এক গ্রাস এক গ্রাস করে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমার দিন পনেরো গ্রাস খাবে। এইভাবে এক মাস করলে আর রোজ তিন বার স্নান করলে এটাকে বলা হয় চান্দ্রায়ণ ব্রত। বলা হয় যে, যদি দুটো তিনটে চান্দ্রায়ণ ব্রত কেউ করে নেবে তার যত রকমের পাপ আছে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাহধ্যয়নেন চ।

পাপক্ণুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি।।১১/২২৮

যদি নিজের ভুল বা পাপকে সর্ব সাধারণকে পশ্চাত্তাপ করে বলে দেয় আমি কত পাপ করেছি, আমি ধিক্, আর এর সাথে যদি কঠিন তপস্যা, যে তপস্যাগুলো এর আগে বলা হয়ে, সেই রকম কোন তপস্যা করে, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন যদি করে, জপ-ধ্যান যদি করে আর দান যদি করতে থাকে তাহলে মানুষ ওই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। প্রথমে তাকে স্বীকার করতে হবে আমি দোষ করেছি, দোষ স্বীকারের মধ্যে সত্যিকারের অনুশোচনা থাকতে হবে আর তপস্যা করতে হবে তার সঙ্গে জপ, ধ্যান, দান এগুলো করলে মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পায়।

ধর্ম আর পাপ গোপনে করলে বৃদ্ধি পায়

কিছু জিনিস আছে যেগুলো আড়ালে করলে বাড়ে। যেমন ধর্ম, ধর্ম যত গোপনে করা হবে ধর্ম তত বাড়বে। আধ্যাত্মিক তপস্যা, জপ, ধ্যান এগুলো যত গোপনে করবে তত বাড়বে। অন্য দিকে পাপ লুকোলে

বাড়ে। বীজ মাটিতে রোপণ করে দিলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বাড়তে থাকে। আবার কিছু কিছু জিনিষ আছে যেগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসলে বাড়ে। যেমন জ্ঞান, বিচার, চিন্তা-ধারা এগুলো প্রকাশ্যে পরস্পর আলোচনা করলে বাড়ে। কিন্তু যখন জ্ঞান অর্জন করতে হচ্ছে তখন সেটা লুকিয়ে করতে হয়। বেশীর ভাগই জিনিষ লুকিয়ে রাখলে বাড়ে। মীরাবাইয়ের ভজনে বলছেন দিন দিন বাড়তো সওয়ারি, যত ঈশ্বরের নাম করা যাবে তত তাঁর প্রতি ভক্তি বাড়ে। কিন্তু প্রথমে দিকে এগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে করতে হয়। যে পাপকর্ম করেছে সে যেমন যেমন সবাইকে বলতে থাকবে যে, আমি দোষ করেছি, তেমন তেমন সাপ যেমন পুরনো খোলসকে ছেড়ে নতুন শরীর পায় তেমনি মানুষও পাপের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে মর্যাদাপূর্ণ জীবন পেয়ে যায়। সেইজন্য খ্রীষ্টানদের মধ্যে কনফেসের প্রচণ্ড মূল্য দেওয়া হয়। আবার বলছেন যেমন যেমন সে দুষিত কর্মের নিন্দা করবে তেমন তেমন সে সেই পাপকর্ম থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় পাপ কাজ করে লোককে বলে বেড়াচ্ছে তাতে তার কোন গ্লানি নেই, এমনিই সে বলে বেড়াচ্ছে, এতে কোন কিছুই হয় না। যদি এই বোধ থাকে যে আমি দোষ করেছি, তবেই সে পাপ থেকে ছাড়া পাবে। যদি আরেক ধাপ এগিয়ে বেদান্তে আসে সেখানে আবার এগুলোর কোন কিছুই মানবে না। ঠাকুর গান করছেন যার ভাবার্থ হল আমি মার নাম করেছি আমার আবার পাপ কিসের। কিন্তু তার জন্য আবার সাজাতিক তেজ দরকার, ওই তেজের সামনে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই শাস্ত্রগুলো সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের আবার পাপবোধ, পুণ্যবোধ খুব শক্তিশালী। তারপরের শ্লোকে বলছেন –

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।

নৈবং কুর্যাৎ পুনরিত্তি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।১১/২৩১

পাপ কর্ম করে সন্তাপিত হয়ে যেমন যেমন বলে ‘আমি পাপকর্ম করে ফেলেছি আর এই রকমটি করবো না’ তখন সে পবিত্র হয়ে যায়। ঠাকুরও বলছেন, খারাপ কাজ করার পর ঈশ্বরের কাছে যদি প্রার্থনা করে বলে আর অমনটি করবো না, তখন তার সেই পাপ থেকে মুক্তি হয়ে যায়।

পাপের পরিভাষা

পাপ ব্যাপারটাই খুব জটিল বিষয়। কোনটাকে যে পাপ বলা হবে আর কোনটাকে যে পাপ বলা যাবে না এটাকে একেবারে লাইন টেনে ঠিক করে দেওয়া খুব কঠিন। আমরা জানি দুর্বলতাই পাপ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় অপরের নারীর দিকে কুদৃষ্টি নিয়ে তাকাতে কি দুর্বলতার দরকার হয়, না সবলতার দরকার পড়ে? তার স্বামী যদি জানতে পারে তো মেরে সব কটা দাঁত খুলে রেখে দেবে। স্বামীজীর কাছে একটি যুবক এসেছে সাধু হতে। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করছেন – তুমি চুরি করতে পার? মিথ্যে কথা বলতে পার? না পারি। তোমার দ্বারা সাধু হওয়া হবে না। যে জানে এটা করলে পাপ, পাপের শাস্তি কি হবে তাও জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সে সেই পাপে লিপ্ত হয় তাহলে বুঝতে হবে তার সাহস আছে। পাপের সংজ্ঞা নির্ধারণে আমাদের কোথাও বোঝার ভুল আছে। ভুলটা ভেঙে স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমাদের নিজস্ব বিচারধারা, চিন্তাকে কাজে লাগাতে হবে। স্বামীজী বলছেন দুর্বলতাই পাপ। কোন ভুল কথা বলছেন না, কিন্তু আমরা যেভাবে স্বামীজীর কথা বুঝছি জিনিষটা সেভাবে নয়। আমরা যেভাবেই পাপকে বিশ্লেষণ করতে যাই না কেন কখনই পাপের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা আমরা দিতে পারবো না। এক কথায় যদি পাপের সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাহলে বলতে হয় শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজই হল পাপ। শাস্ত্র যদি পঞ্চাশটা হয় তাহলে পাপের তালিকা পঞ্চাশটা আলাদা হয়ে যাবে। হিন্দু শাস্ত্র মতে যদি চলি তাহলে গরু খেলে পাপ, আবার মুসলমানদের শাস্ত্র মত চললে গরু খেলে পাপ হবে না। হিন্দুরা যদি শূয়োর খায় তাহলে পাপ হবে না, মুসলমানদের কাছে শূয়োর খাওয়া পাপ। শাস্ত্র যেটাকে পাপ বলে দিয়েছে সেটাই পাপ। কিন্তু শাস্ত্র কখনই চিরন্তন হতে পারে না আর সার্বজনীন তো হতেই পারে না। ভগবান ছাড়া কোন কিছুই চিরন্তন নয়। তাই পাপের পরিভাষা যুগে যুগে পাল্টায়। কিন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি? আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণের জন্য যা কিছু করা হচ্ছে সেই কাজ ছাড়া বাকি সব কাজ পাপ। যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেছেন বা করছেন তাঁরা মনে করেন

মানুষ যদি এগুলো অনুসরণ করে তাহলে সে ধর্ম পথে আস্তে আস্তে এগোবে। একটা শিশু জানেনা যে দুধ খেলে তার শরীর পুষ্টি লাভ করবে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু তাকে জোর করে দুধ খাওয়াতে হয়। কারণ বড়রা জানেন দুধ খাওয়ালে বাচ্চার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক পুরুষরা জোর করে আমাদের ভেতরে শাস্ত্রের মর্ম ঢোকাতে চাইছেন, কারণ পরে ধীরে ধীরে আমাদের এটা কাজে লাগবে।

একবার যখন জেনে গেলাম আমাকে যা বলা হয়েছে করতে হবে, তারপরে আমি যে করতে চাইছি না তার মানে আমার মধ্যে দুর্বলতা আছে। তারপর সেখান থেকেই সব পাপের জন্ম হবে। আর দুর্বলতা হল সব থেকে বড় পাপ। যে কোন ধরনের দুর্বলতাই পাপ। মানুষের মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকে তাহলে তার কেন শোক মোহ হতে যাবে! মানুষের মনে যখন কোন মোহ থাকে তখনই সে পাপ করে। একটা ছেলে একটা মেয়েকে দেখে আকর্ষিত হচ্ছে, তার মধ্যে মোহ আছে বলেই সে আকর্ষিত হচ্ছে। মোহ কেন? সে দুর্বল। দুর্বলতা কেন? সে জানে না আমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বা আমি অমুক বংশের ছেলে। ঘুরে ফিরে পাপের সংজ্ঞা ওই একটা জায়গাতেই থাকবে – যেটা শাস্ত্র বলে দিচ্ছে সেটা না করাই পাপ। শাস্ত্র যদি কাছে না থাকে তাহলে কি করে জানব? কেন, আমরা ছোটবেলা থেকে বাড়ির গুরুজনদের কাছ থেকে কত কথা শুনে এসেছি, তাঁদের আচরণ দেখেছি। এখন যদি কোন ভুল করতে যাই তখন মনটা খুঁত খুঁত করতে শুরু করবে। কিন্তু সেটাও শাস্ত্র থেকেই আসে।

মা সীতার অন্বেষণে হনুমান লঙ্কায় গেলেন। মাঝ রাত্রে সোজা রাজমহলে হনুমান ঢুকে পড়লেন। সেখানে রাবণের কামাসক্তা সুন্দরী রানীরা নিদ্রা যাচ্ছে। দেখছেন এদের মধ্যে মা সীতাকে পাওয়া যায় কিনা। মেয়েরা ঘুমের অচেতনে বেআক্ৰ অবস্থায় দুগ্ধশয্যায় শায়িত। হঠাৎ হনুমানের মনে হল – আমি একি করছি, আমি ব্রহ্মচারী হয়ে নারী দর্শন করছি তাও তাদের নিদ্রিত বেসামাল অবস্থায়। তখন তিনি বলছেন – কিন্তু এদের দেখে আমার মনে তো কোন কাম বিকারের উদ্বেক হয়নি, তাহলে আমি শুদ্ধ পবিত্রই আছি। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে অপরের স্ত্রী, যারা কিনা ঘুমের মধ্যে অর্দ্ধ নগ্না অবস্থায় রয়েছে, তাদের দেখে হনুমান পাপ করেছেন কি, করেননি? অবশ্যই হনুমান পাপ করেছেন, কোন শাস্ত্রই এই কাজকে অনুমতি দেবে না, অপরের স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে, তার কাপড়ের ঠিক নেই, তারপরেও মুখ ঘুরে ঘুরে দেখছেন, কেন পাপ হবে না! প্রত্যেক শাস্ত্রই এটাকে পাপ বলবে। অবশ্যই পাপ হয়েছে কিন্তু হনুমানের যে তেজ, সেই তেজে ওই পাপটা পুড়ে গেছে। ঠাকুর বলছেন – নরেনকে পাপ ছুঁতে পারবে না। তার মানে? পাপ তো পাপই। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে জ্ঞানগ্নি এমন দাউ দাউ করে জ্বলছে যে কাঁচা কলাগাছও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। স্বামীজী যাই করুন না কেন কোন পাপই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। এখন যদি পরে হনুমানকে কেউ বলে – ‘হনুমান! তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় অর্দ্ধ নগ্না মেয়েদের দিকে তাকিয়েছ তোমার তো পাপ হয়েছে’। হনুমান বলবে – ‘পাপ! হতে পারে পাপ, কিন্তু ওটা আমার গায়ে লাগেইনি’। ‘না তুমি শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করেছ, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে’। ‘বলে দিন কি করতে হবে’। ‘তুমি শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তিন দিন উপোস করবে’। হনুমান তিন দিন উপোস করে দেবেন। কিসের জন্য করবেন? শাস্ত্র মর্যাদার জন্য, নিজের জন্য তিনি কখনই করতে যাবেন না। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর চারিদিকে তাঁর অত নামডাক। স্বামীজীকে তাঁর মা বলছেন – তোর জন্য মানত করা ছিল, কালীঘাটে তোকে গড়াগড়ি খেতে হবে। স্বামীজী বললেন চলো গড়াগড়ি দিয়ে আসি। স্বামীজীর মত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ তাঁর কাছে কালীঘাটে গড়াগড়ি খাওয়ার কি দরকার! মায়ের মন রক্ষার জন্য, তা নাহলে শাস্ত্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করে পাপ করলে আমাদের পাপ স্পর্শ করবে কিন্তু হনুমান, স্বামীজী এনাদের পাপ স্পর্শই করতে পারবে না, তাঁদের তেজের আগুনে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। আমরা দুর্বল তাই পাপ আমাদের স্পর্শ করেছে। তাই বলছেন দুর্বলতাই পাপ। কারণ যাঁর তেজ আছে তার দুর্বলতাই আসবে না। উদ্দেশ্য তাই ব্রহ্মতেজ জাগানো। ব্রহ্মতেজ জাগলে শাস্ত্র যেটা পাপ বলছে সেটা স্পর্শ করতে পারেনা। স্পর্শ করে না মানে? পাপ তো তাঁর হবেই, পাপ তাঁর ভেতরেও ঢুকবে কিন্তু মরে পড়ে থাকবে।

আমরা যে পাপ নিয়ে এত আলোচনা করছি এটা শাস্ত্র পরিভাষিত। এক একটা পথে এক একজন আচার্য এসে বলবেন পাপের এই পরিভাষা। এই পরিভাষা কেন বলছেন? কারণ তুমি যদি এই রকমটি কর তাহলে আধ্যাত্মিক পথে তুমি এগোতে পারবে না। যদি করে ফেল তাহলে কি হবে? করে ফেলেছ তো কি হয়েছে, বুঝে নিয়েছ যে খারাপ হয়ে গেছে তখন ওগুলো মাথা থেকে নেমে এবার এগোয়। পাপ না করাটা কখনই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য একটাই আত্মজ্ঞান লাভ। আমি কলকাতা থেকে ট্রেনে দিল্লী যাচ্ছি। মাঝখানে পাটনা স্টেশন এসেছে, আমি ঠিক করলাম পাটনায় নেমে একটু রাজগীর নালন্দাটা ঘুরে আসি। রাজগীর-নালন্দা যতক্ষণ ঘুরতে যাব ততক্ষণে ট্রেন বেরিয়ে যাবে। এবার আমাকে বসে থাকতে হবে আবার কখন দিল্লীর ট্রেন আসবে। ট্রেন এল। এরপর মোগলসরাই এল। আচ্ছা চল একবার বেনারসটা ঘুরে আসি। এইভাবে আমি কত দিনে দিল্লী পৌঁছাব? এরপর তো এলাহাবাদ আসবে, কানপুর আসবে, মথুরা আসবে। পাপের এটাই কাজ, আমার যাত্রাপথকে বিলম্ব করে কোথায় যে ঘুরিয়ে দেবে জানা নেই। আমাদের লক্ষ্য আত্মস্বরূপের জ্ঞান। এই পথে প্রথমে আসবে কামিনী। কামিনী এলেই বলব যাই একটু মেয়েদের সঙ্গ করা যাক। মেয়ের সঙ্গ করতে গেলে টাকা-পয়সার দরকার। টাকা-পয়সা আসতে থাকলে চেষ্টা করবে একটু নাম-যশ কি করে পাওয়া যায়। দিল্লী যাওয়াটা যে উদ্দেশ্য সেটা ভুলেই যাবে। এটাকেই পাপ বলে, যে জিনিষটা আমাদের অন্য দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে ছিটকে দেবে।

কিন্তু যারা স্বভাবতই দুর্বল মনের অধিকারী তারা কোন দিন আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারবে না। আধ্যাত্মিক পথে কারা এগোতে পারবে? যারা বলবে – আমাকে কি করতে হবে বলুন? ডাকাতি করতে হবে? করে দেখিয়ে দিচ্ছি। চারটে মেয়েকে হাতে করতে হবে? এই দেখুন আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠাকুরেরও এই ক্ষমতা ছিল, স্বামীজীরও এই ক্ষমতা ছিল, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ সবারই এই ক্ষমতা ছিল। চারটে মেয়েকে বশ করার ক্ষমতা আমাদের নেই আপনি চাইছেন আধ্যাত্মিক পথে এগোতে! কার এই ক্ষমতা ছিল না বলুন! গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানতই না, শ্রীকৃষ্ণের আবার ষোল হাজার স্ত্রী ছিল, যিশুর পেছনে মেয়েরা দৌড়াত, মহম্মদ চৌদ্দটা বিয়ে করে ফেললেন, স্বামীজীর পেছনে মেয়েরা দৌড়াত। যে মহাপুরুষের নাম নেবেন সবারই একই জিনিষ। কারণ আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া মানে ভেতরে দৈবী শক্তির স্ফুরণ হওয়া। দৈবী শক্তি মানে, যে শক্তির পেছনে মানুষ সব থেকে বেশী আকর্ষিত হয়। মেয়েদের আবার দৈবী শক্তি বেশী আকর্ষিত করে। দুর্বল পুরুষের দিকে মেয়েরা কখন তাকাবেই না। এগুলো সাধারণ লোকের কাছে এনারা আলোচনা করেন না, কারণ মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। সেইজন্য গোপীলীলা সবার সামনে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়। লোকেরা বুঝতে পারবে না, ভুলভাল বুঝে উল্টোপাল্টা কাজ করবে। যতক্ষণ ভেতরে শক্তি না আসছে, যতক্ষণ আকর্ষণী শক্তির স্ফুরণ না হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ তোমার পেছনে দৌড়াবে না। যদি মানুষ তোমার পেছনে না দৌড়ায় তাহলে বুঝতে হবে তোমার মধ্যে শক্তি নেই। শক্তিহীন লোকের এখানেতো কিছুই হয় না, ওখানেও তাদের কিছু হবে না। ঠাকুর বলছেন – যার আছে হেথা তার আছে সেথা। তোমার এখানে কিছু নেই, সব ফাঁক্যা আর তুমি মনে করছ ওখানে কেবলা ফতে করে দেবে, তা কখন সম্ভব! তাহলে তো সব শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে। এটাই কঠোপনিষদে নচিকেতা বলছেন – *বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ* আমি অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবার অনেকের মধ্যে মধ্যম কিন্তু অধম কোথাও নেই। সেইজন্য স্বামীজী বার বার আত্মশক্তির জাগরণের কথা বলছেন। আত্মশক্তির সামনে অন্য সব শক্তি খড়কুটোর মত উড়ে যায়। আত্মশক্তিই শেষ শক্তি, কিন্তু অন্যান্য শক্তি সেই আত্মশক্তিরই manifestation, কিন্তু অনেক lower manifestation। ঠাকুর বলছেন, একবার পাপ করে ফেললে ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক ভাবে বলে দাও ঠাকুর ভুল হয়ে গেছে আর এই কাজ করবো না, বলাও যা তৎক্ষণাৎ সে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কিন্তু কে বলবে এই কথা? যে আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছে। জীবনের উদ্দেশ্য পাপ না করে পূণ্যবান হওয়া নয়, জীবনের উদ্দেশ্য হল শক্তি সঞ্চয়, আত্মশক্তির বিকাশ। মনুও এই কথা বলছেন –

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রেত্য কর্মফলোদয়ম্।

মনোবাঙ্ মূর্তিভিনিত্যং শুভং কর্ম সমাচরেৎ।।১১/২৩২

এই সব জিনিষকে সব সময় মনে মনে চিন্তা করতে হয়, আমি যদি শুভকর্ম করি তাহলে আমি স্বর্গের দিকে যাব, অশুভ কর্ম যদি করি তাহলে নরকের দিকে যাব। এইভাবে চিন্তা করে করে সব সময় শুভ কাজে, শাস্ত্র বিহিত কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখবে। কারণ অশুভ কাজ করলে পরলোকে যেতে হবে, পরলোক মানে নিম্নলোকে। সেখানে গেলে অনেক দিনের জন্য আটকা পরে যেতে হবে। এর পরের শ্লোকে মনু যেটা বলছেন সেটা ঠাকুরও বলছেন –

পাপ-পুণ্য বোধ ও মূল্যবোধ

অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম বিগর্হিতম্।

তস্মাদ্বিমুক্তিমশিচ্ছন দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ।।১১/২৩৩

যে কর্মটা আমি জানি গর্হিত কর্ম, এই কাজটা করা ঠিক নয়। সেটা অজ্ঞানেই হোক আর জ্ঞানেই হোক, একবার যখন বুঝে নিলাম এটা গর্হিত কর্ম তখন আর ওই কর্মটা করতে নেই, বলতে হয় আর ওই কর্মটা কখন করবো না। পাপ-পুণ্যের বোধ থেকে যে মূল্যবোধ তৈরী হয় সেটা শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই ঠিক করে। কারণ শাস্ত্রে পাঁচ রকমের কথা আছে, শাস্ত্র বলছে হিংসা করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না। কিন্তু যারা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করছে, যারা গুপ্তচরের কাজ করছে তারা মিথ্যা কথাই বলছে। তারা মিথ্যা কথা বলছে বলে আমরা দেশবাসী শান্তিতে বাস করছি। সৈন্যবাহিনী হিংসা করছে, গুলী করে শত্রুদের উড়িয়ে দিচ্ছে বলে আমরা নিরাপদে রয়েছি। আমি তো মনে করছি আমি খুব ভালো আমি মিথ্যা কথা বলিনা, আমি হিংসা করি না। আরে ভাই তোমার বদলে অন্য একজন মিথ্যা কথা বলছে, হিংসা করছে বলে তুমি আজকে ভালো আছ। সেই কারণে মূল্যবোধ সব সময় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ হবে, সার্বজনীন মূল্যবোধ বলে কিছু হয় না। এই যে বিরাট শক্তি রয়েছে সেখানে নিজের শক্তির এলাকাটা ঠিক করে নিতে হয়, এই জিনিষগুলোকে আমি ধরে রাখব, এগুলোর ক্ষেত্রে আমি কখনই আপোশ করবো না। আমার এই জায়গাগুলোতে দুর্বলতা আছে, দুর্বলতা মানে যেটাকে পাপ বলা হচ্ছে। আছে তো থাকুক। মূল্যবোধ সাধারণতঃ ঠিক হয় বিধি আর নিষেধ দিয়ে। কোন মানুষ কখনই কোন দিন, কারুর পক্ষে এমনকি অবতারের পক্ষেও সম্ভব নয় সব বিধিকে পালন করবে আর সব নিষেধ থেকে দূরে থাকবে। ঠাকুর যখন গালাগাল দিতেন এমন নোংরা ভাষায় গালাগাল দিতেন যে কানে আঙুল দিতে হত। স্বামীজী একবার রেগে গিয়ে এক মহিলাকে এমন নোংরা নোংরা গালাগাল দিলেন যে সেই মহিলা কাঁদতে কাঁদতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছিল। শ্রীমা বলছেন – ‘জান তো কোলকাতার ছেলে, ওকে রাগালে কেন’! তাহলে কোথায় গেল মূল্যবোধ! এগুলো কিছুই নয়, আমি আর ঈশ্বর এই দুটোকে ঠিক রেখে বাকি সব কিছুকে উড়িয়ে ফেলে দাও। সেখানে দেখতে হবে আমার শক্তিটা কোন কোন ক্ষেত্রে আছে, ওই জায়গাতে কখন আপোশ করতে নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন একজনকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, যে কিনা বলতে পারবে সত্য, অহিংস, অস্ত্রের, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই রকম যত মূল্যবোধের কথা বলা হয় এগুলোর যে কোন একটির মূল্যবোধে আমি প্রতিষ্ঠিত। খুব হলে অনেকে বলতে পারবে যে আমি চুরি করি না, কিন্তু চুরি করি না মানে, দরকার পড়ে না বলে চুরি করছে না। অসম্ভব, যারা বলে তারা নিজেকে ঠকাচ্ছে অপরকেও ঠকাচ্ছে।

দৈনন্দীনে জীবনে মূল্যবোধের সহজ অনুশীলন

মূল্যবোধের অনুশীলন আমরা কি ভাবে করতে পারি ভাবা দরকার। কারণ সত্যতে প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব, অহিংসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, অপরিগ্রহ অনুশীলন করাও অসম্ভব। কিন্তু কিছু কিছু সহজ জিনিষ আছে যেগুলো আমরা প্রতিদিনের জীবনচর্যায় অনুশীলন করতে পারি। যেমন অপরের প্রতি একটা করুণার ভাব নিয়ে আসা, নিঃস্বার্থ সেবার ভাব, ট্রেনে বাসে কোন বয়স্ক ব্যক্তি বা মহিলাকে দেখে নিজের বসার জায়গাটা ছেড়ে দিলাম। তার মানে সব কিছু আমারই চাই, সব কিছু আমারই হোক এই স্বার্থপরতার ভাবটাকে কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে, এই মূল্যবোধটা সবাই সহজেই অনুশীলন করতে পারেন। এর পরের ধাপে অপরের কোন ক্ষতি না করা, কারুর দোষ না দেখা এগুলোও অনুশীলন করা যায়, অর্থাৎ যেখানে বাণী ও ক্রিয়া দুটো

যুক্ত আছে। যার সঙ্গেই কথা বলি না কেন দুটো মিষ্টি কথা দিয়ে সন্তোষ করছি, ব্যবহারটাও সেই রকম ভদ্র নম্রতার সাথে করছি। এতে অপরকেও কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা এসেছে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ কিন্তু আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে রোজ অনুশীলন করতে পারি। মূল্যবোধ এমনই জিনিষ, একটা জিনিষকে যদি ঠিক ভাবে অনুশীলন করে যাওয়া যায় তাহলে অন্য মূল্যবোধ গুলোও মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। যখন মুঠোর মধ্যে চলে আসবে তখন সেটাই নিয়ে যাবে আত্মজ্ঞানের দিকে। একবার যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে, তারপর যে দুর্বলতা গুলো থেকে গেল সেটা ওই আত্মজ্ঞানের তেজে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এরপর মনু তপস্যা নিয়ে বলছেন –

তপস্যার দ্বারাই সব কিছু সম্ভব আর তপস্যাই সুখের মূল

তপোমূলমিদং সর্বং দৈবমানুষকং সুখম্।

তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোহন্তং বেদদর্শিভিঃ।।১১/২৩৫

এই শ্লোকটিও মহাভারত থেকেই এসেছে। বলছেন, মানুষ, দেবতা এরা সবাই যে সুখ পায় তার মূলে হল তপস্যা। তপস্যা থেকেই সুখ আসে, তপস্যা না থাকলে কখন সুখ আসবে না। যখন অপরকে কিছু জায়গা ছেড়ে দিতে শুরু করল তখন এটাই তপস্যা। আমার কি তপস্যা? অপরকে সুখ দেওয়া, অপরকে একটু সেবা করা। এই কথা আমার আপনার কথা নয়, যাঁরা বেদজ্ঞ তাঁরা এক কথা বলেছেন।

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।

বৈশ্যস্য তু তপো বার্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্।।১১/২৩৬

যখন জ্ঞানের লাভের জন্য তপস্যা করা হয়, জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, এটাই ব্রাহ্মণের তপস্যা। ক্ষত্রিয়ের তপস্যা হল দুর্বলের রক্ষা করা আর ব্যবসা, চাষাবাস, পশুপালন করা এই কাজগুলোই বৈশ্যদের তপস্যা। শূদ্রের তপস্যা হয় অপরকে সেবার দ্বারা। আবার পরের শ্লোকেই বলছেন –

ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।

তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।।১১/২৩৭

ঋষিরা সংযতাত্মা হয়ে মন, বচন ও কায় দিয়ে শুধু ফল, মূল ও বায়ু ভক্ষণ করে তপস্যা করতেন, ওই তপস্যার প্রভাবে তাঁরা চরাচর ত্রিলোকের সব কিছু অবগত হতেন। আমরা শুধু কেন পৃথিবীকেই দেখতে পাই, কেন পৃথিবীর বাইরে কোন কিছুই দেখতে পাই না? আমরা আকাশের তারামণ্ডলই দেখতে পারছি, কিন্তু স্বর্গলোক, পাতাললোক এই লোকগুলো দেখতে পাই না। কারণ আমাদের তপস্যা নেই। ঋষিদের মত যাঁদের তপস্যা আছে তারা ত্রিলোকের সমস্তই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।

তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্।।১১/২৩৮

নানান রকমের ঔষধ, ব্যাধি নিরাময়ের ভেষজ, বিশেষ বিশেষ বিদ্যা, বিদ্যা বলতে বেদ আদি বিদ্যা ছাড়াও অন্যান্য যত বিদ্যা আছে যেমন ভূতবিদ্যা, বিষবিদ্যা ইত্যাদি এবং নানান রকমের অগ্নিমা-লঘিমা দৈবী-স্থিতি, স্বর্গে স্থিতি এই সব কিছুই আসে তপস্যা দিয়ে। যাদেরই দেখা যায় শরীরে নানান রকমের ব্যাধি লেগে আছে বুঝতে হবে তার তপস্যা নেই। তপস্যা করলেই কিন্তু ব্যাধি সেরে যাবে। মনুও এক জায়গায় বলেছেন প্রাণায়াম করলে শরীরের সব দোষ কেটে যায়। তপস্যা করলেই সব সিদ্ধি চলে আসবে। ঠাকুর বলছেন কেশব সেনের ধ্যানটুকু ছিল বলে এত মান-যশ পেল। ধ্যান করাও একটা বিরাট তপস্যা।

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।

সর্বং তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্।।১১/২৩৯

যেটা পার করা দুস্তর, মানে খুব কষ্টকর, যেটা লাভ করা একেবারেই দুঃসাধ্য অর্থাৎ দুর্লভ, যেমন উপমাতে বলে ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া কখনই যায় না কিন্তু বিশ্বামিত্র তপস্যা করে দেখিয়ে দিলেন তাও হওয়া যায়, যেখানে কেউ যেতে পারে না এই রকম দুর্গম জায়গা, যেমন গহন জঙ্গল, পাহাড় এবং যে কাজ সম্পন্ন করা কখনই সম্ভব নয় অর্থাৎ কর্ম দিয়ে যে জিনিষকে অর্জন করা যায় না, এই সব কিছুই তপস্যা দিয়ে পাওয়া যায়। যারা পাপকর্ম করে তারা কি করে তপস্যা করবে! পাপকর্ম করা মানে, মনটা ধর্মকর্ম থেকে সরে গেছে। এমন কি –

কীটাস্চাহিপতাস্চ পশবশ্চ বয়াংসি চ।

স্থাবরাণি চ ভূতানি দিবং যান্তি তপোবলাৎ।।১১/২৪১

কীট, পোকামাকড়, সর্পাদি তির্যক প্রাণী এরাও তপস্যা জোরে স্বর্গে চলে যেতে পারে। এমন কেউ নেই যে তপস্যা দিয়ে স্বর্গে যেতে পারবে না। আর বলছেন –

যৎকিঞ্চিদেনঃ কুবন্তি মনোবাজুর্ভিত্তির্জনাঃ।

তৎ সর্বং নির্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ।।১১/২৪২

মানুষ শরীর, মন ও বচন দিয়ে যা কিছু পাপ করে সব পাপকে তপস্যা দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া যায়। পাপকে কি ছাই করবে, তার কর্মকেই ভস্ম করে দেয়। গীতায় ভগবান বলছেন যথৈধাংসি সমিদ্বোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।। অগ্নি যেমন স্তপিকৃত কাঠরাশিকে মুহূর্তে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, ঠিক তেমনি জ্ঞানাগ্নি সব কর্মকেই পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে সেখানে পাপ আর কি করে থাকবে! যে তপস্যাতে নেমে পড়েছে, তা যে কোন ভাবেই তপস্যা হোক না কেন, সেখানে পাপটা পালিয়ে গেছে বলে কিছু থাকবে না।

তপসৈব বিশুদ্ধস্য ব্রাহ্মণস্য দিবৌকসঃ।

ইজ্যাস্চ প্রতিগৃহন্তি কামান্ সম্বর্দ্ধয়ন্তি চ।।১১/২৪৩

বলছেন ব্রাহ্মণরা যে এত শুদ্ধ পবিত্র হন সেটা তপস্যার জন্যই, আর তাঁরা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যজ্ঞ করছেন বলেই দেবতারা তাঁদের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের হবি গ্রহণ করেন এবং যজমানদের কামনা পূর্ণ করেন। ব্যাখ্যাকাররা আবার বলছেন যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি কর্ম করবার পূর্বে উপবাসাদি রূপ তপস্যা করে শুদ্ধ পবিত্র হয়নি দেবতারা তাদের যজ্ঞের হবি গ্রহণ করেন না। বলছেন –

প্রজাপতিরিদং শাস্ত্রং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ।

তথৈব বেদানুষয়ন্তপসা প্রতিপেদিরে।।১১/২৪৪

ব্রহ্মা যে সৃষ্টি কার্য করেছেন তিনি তপস্যা দিয়েই এই সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করেছেন। ঋষিরা যে বেদমন্ত্র আবিষ্কার করেছেন সেটাও তপস্যা দিয়েই করেছেন। তপস্যা যদি না থাকে তাহলে কিছুই হবে না।

ইত্যেতৎ তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।

সর্বস্যাস্য প্রপশ্যন্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্।।১১/২৪৫

এই নিখিল ভূমণ্ডলের সমস্ত রকমের কল্যাণ তপস্যা দিয়েই সাধিত হয় বলেই দেবতারা এই তপস্যার শক্তিকে, তপস্যার ফলকে বলছেন মহাভাগ্যং। আমরা এই জীবনে অন্য অনেক কিছু করে নিতে পারি কিন্তু তপস্যার মত এত উচ্চ জিনিষ আর কিছু হতে পারে না। পরের শ্লোকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্লোকটির ভাবার্থ বুঝে নিতে পারলে আমাদের অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে –

বেদাভ্যাসোহম্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়া ক্ষমাঃ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজন্যপি।।১১/২৪৬

অম্বহং মানে নিত্য। বলছেন জপ-ধ্যান শাস্ত্র অধ্যয়ন যথা শক্তি নিত্য করবে। এর সাথে রোজ মহাযজ্ঞ মানে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে এবং সবাইকে ক্ষমা করবে। একটু আগে যেটা বলা হল, অপরকে একটু জায়গা দিন, অকারণে কারুর উপর বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে বাড়ির লোক কেউ যদি দোষ করে ক্ষমা করে দিন। এই তিনটে জিনিষ সব পাপকে নাশ করে দেয় – নিয়মিত বেদাভ্যাস, পঞ্চ মহাযজ্ঞ আর ক্ষমা। শুধু পাপ কেন, যেগুলো মহাপাপ, মহাপাপ করে যে মহাপাতক হয়ে গেছে তাকেও এই তিনটে জিনিষ শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়।

যথৈদন্তেজসা বহিঃ প্রাপ্তং নির্দহতি ক্ষণাৎ।
তথা জ্ঞানাগ্নিনা পাপং সর্বং দহতি বেদবিৎ।।১১/২৪৭

আগুন যেমন তার সামনের সব স্তম্ভিকৃত কাঠকে নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত করে দেয়, ঠিক তেমনি তপস্যালব্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বেদজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত পাপকে পুড়িয়ে ছাই করে দেন। আবার একটা বলছেন –

সব্যাহতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি জ্জহৎ মাসাৎ পুনস্ত্যহরহঃ কৃতাঃ।।১১/২৪৯

যদি প্রণবযুক্ত সহ ষোলটি প্রাণায়াম প্রতিদিন এক মাস অবধি করা হয় তা হলেও মানুষ সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়। মূল কথা হল নিত্য যদি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করা হয়, মোটামুটি সকালে পাঁচ হাজার আর সন্ধ্যায় পাঁচ হাজার জপ করা হয় আর তার সঙ্গে যদি প্রাণায়াম করা হয় তাতেই সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এটা ভাবকেই টেনে নিয়ে অন্য প্লোকে আবার বলছেন –

হত্বা লোকানপীমাংস্ত্রীনশ্লপ্তি যতন্ততঃ।
ঋগ্বেদং ধারয়ন্ বিপ্রো নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন।।১১/২৬২

বলছেন যিনি এই ত্রিলোকের সবাইকে বধ করে দেন এবং যেখানে সেখানে যা খুশী ভোজন করেন কিন্তু তিনি যদি ঋগ্বেদকে ধারণ করে থাকেন অর্থাৎ ঋগ্বেদাদির অভ্যাস নিয়মিত করছেন তাঁর কোন পাপ হয় না। এগুলো আসলে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে, জ্ঞানযজ্ঞের জ্ঞানাগ্নি সব কর্মকে ভস্ম করে দেয়। যখন মানুষ বেদাভ্যাস করে, আমাদের কাছে বেদাভ্যাস হল নিয়মিত চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, কথামৃত পাঠ আর জপ-ধ্যান ও তার সাথে প্রাণায়াম করা। প্রাণায়ামও নিয়মিত করতে হয়। মূল হল জ্ঞান, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি ঠাকুরের সন্তান এই উপলব্ধিটাই সব কিছুকে নাশ করে। যেহেতু এখানে সাধারণ লোককে বোঝাতে হচ্ছে তাই একই কথাকে ঘুরিয়ে সাধারণ লোকের মত করে বলছেন।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

মনুস্মৃতির শেষ অধ্যায় অর্থাৎ দ্বাদশোহধ্যায় ধর্ম ও কর্মকে নিয়ে। এতক্ষণ যাবৎ যা কিছু আলোচনা হয়েছে এই অধ্যায়ে সব কিছুকে গুটিয়ে আনা হয়েছে। মানুষ যা কিছু করে, চিন্তা-ভাবনা, কথাবার্তা এবং শরীর দিয়ে যা কর্ম করে সেই কর্ম তাকে শুভ ও অশুভ ফল দেয়। এই কর্মানুসারেই তার পরবর্তি জন্ম নির্ধারিত হয়। প্রথমেই মানসিক ভাবে কি কি অশুভ কর্ম করা হয় –

মানসিক, বাচসিক ও শারীরিক পাপ

পরদ্রব্যোন্নিভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশচ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্।।১২/৫

পরের দ্রব্য ও টাকা-পয়সা নিয়ে মনে মনে চিন্তা করা, ওর টাকাটা চুরি করলে হয়, ওর সব নষ্ট হয়ে গেলে খুব আনন্দ হবে। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কর্ম, যে কর্মগুলো করতে নেই, সেই কর্মগুলো নিয়ে মনে মনে চিন্তা করা। তার মানে পরস্পরী সঙ্গ এটা যদি মনে মনে বিচার করাও হয় সেটা মনের পাপ হবে। মজার হল তৃতীয়টা বিতর্থাভিনিবেশচ, যে জিনিষগুলো ভুল সেই জিনিষগুলো নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করা, এখানে ভাষ্যকাররা বলছেন, যেমন অনেকে বলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পরলোক বলে কিছু নেই, দেহটাই আত্মা ইত্যাদি, এই ভাবে যে চিন্তা ভাবনা করা হয়ে এতেও মনের পাপ হয়। এই তিন ভাবে মনের পাপ হয়। এরপর বলছেন বাচিক পাপ কিভাবে হয় –

পারুষ্যমনৃতধৈবৈ পৈশুন্যধগপি সর্বশঃ।

অসম্বদ্ধ প্রলাপচ বাজয়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্।।১২/৬

পারুষ্যম্, কটু কথা বলা, অনৃতম্, মিথ্যা কথা বলা, পৈশুন্যম্, পিশুনি বৃত্তি, পেছনে কারুর নিন্দা করা আর অসম্বদ্ধ প্রলাপচ, অযথা কথা বলা, এই চার ভাবে বাচিক পাপ হয়। এই চারটে জিনিষ করতে নেই – কটু কথা বলতে নেই, অসত্য কথা বলতে নেই, পরনিন্দা-পরচর্চা করতে নেই আর অসম্বদ্ধ প্রলাপচ, অকারণে বক্ বক্ করতে নেই। শরীর দিয়ে কি কি পাপ হয় –

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং সূতম্।।১২/৭

পরদ্রব্য না বলে নেওয়া, মানে চুরি করা, কেউ আমাকে দেয়নি কিন্তু নিজের মত করে নিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় হিংসা, কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা করা আর তৃতীয় পরস্পরী বা পরনারীর সঙ্গ করা। এই তিন ভাবে শরীর দিয়ে পাপ কর্ম হয়। মনুর মতে মানসিক ভাবে তিন, বাচিক ভাবে চার আর শারীরিক ভাবে তিন মোট দশটি হল ঠিক ঠিক অশুভ কর্ম।

সবাইকে যে তিনটে দণ্ড ধারণ করতে হয়

অনেকে শুনে থাকবেন সাধু সন্ন্যাসীদের তিনটে দণ্ড ধারণ করতে হয়। বলছেন এই তিনটে দণ্ড শুধু সন্ন্যাসীকেই নয় সবাইকেই ধারণ করতে হয় –

বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।

যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।১২/১০

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর মত সব গৃহস্থকেই দণ্ড ধারণ করতে হয়। এই তিনটে দণ্ড হল ‘বাগ্দণ্ড’, ‘মনোদণ্ড’ এবং ‘কায়োদণ্ড’। মৌন অর্থাৎ যখন বাক্ সংযম করে মৌন থাকছে তাকে বলা হচ্ছে ‘বাগ্দণ্ড’। খাওয়া-দাওয়াকে নিয়মিত করে সংযম করাকে বলা হয় ‘মনোদণ্ড’। আর প্রাণায়ামকে বলে ‘কায়োদণ্ড’। শুধু সন্ন্যাসীই নয়, যারা গৃহস্থ তাদেরও এই তিনটে দণ্ড ধারণ করতে হয় – কথা কম বলবে, খাওয়া-দাওয়া সংযম করবে আর প্রাণায়াম করবে। মনুস্মৃতিতে এর সরাসরি উল্লেখ নেই কিন্তু ব্যাখ্যা রূপে এখানে বলা হয়েছে। যদি বাগ্দণ্ড না থাকে তাহলে তার বিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। বিজ্ঞান নাশ হয়ে যাওয়া মানে চেতনা লোপ পাওয়া, বাগ্দণ্ড না থাকলে উচ্চ চিন্তা ভাবনা করা, বিবেক বিচার করার শক্তিটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনোদণ্ড যদি না থাকে অর্থাৎ প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করলে, যখন তখন শুধু খেয়েই যাচ্ছে, এদের উত্তম গতি নষ্ট হয়ে যায়, মানে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। কর্মদণ্ড মানে প্রাণায়ামাদি না করলে তিনটে লোক নাশ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর এরা তির্যক গতিপ্রাপ্ত হয়। এই তিনটে দণ্ডকে যিনি ধারণ করে নিয়েছেন, অযথা সারাক্ষণ কথা বলছেন না, শরীর ধারণের জন্য যতটুকু আহারের দরকার ততটুকুর বাইরে বেশী খাওয়া-দাওয়া করছেন না আর ঈশ্বরের নাম করে যাচ্ছেন তার সাথে প্রাণায়ামও করছেন, এঁদের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না। বলছেন শুধু বাঁশের ডাঙা ধারণ করলেই কেউ সন্ন্যাসী হয় না, এই তিনটে দণ্ডকে ধারণ করতে হয়।

ত্রিদণ্ডমেতান্নিক্ষিপ্য সর্বভূতেষু মানবঃ।

কামক্রোধী তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি।।১২/১১

মনে যার কামনা-বাসনা আছে সে কোন দিন এই তিনটে দণ্ড ধারণ করতে পারবে না। যার মধ্যে ক্রোধ আছে সেও কখনই এই ত্রিদণ্ড ধারণ করতে পারবে না। যিনি কাম ও ক্রোধকে পরাভূত করেছেন এবং ত্রিদণ্ডী ধারণ করেছেন তিনি এখন সব রকম সিদ্ধি পেয়ে যাবেন। খাওয়া-দাওয়াতে অসংযম, বাক সংযমহীনতা আর শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ না করলে পুরো ব্যক্তিত্বকে নাশ করে দেয়। এটা কোন তত্ত্ব কথা নয়, এটা সত্যিই এই রকমই হয়, এই তিনটে দণ্ড মানুষকে খুব শক্তি দেয়। এরপর জীবের ব্যাখ্যা দিয়ে তার তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজ ও তমের কথা বলে বলছেন সত্ত্বগুণের কি কি লক্ষণ –

তিনটে গুণের লক্ষণ

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধর্মক্রিয়াতুচ্ছিতা চ সাত্ত্বিকং গুণফলম্।।১২/৩১

যিনি বেদের অভ্যাস করছেন, তপস্যা করছেন, জ্ঞানং, মানে শাস্ত্র চিন্তন বা শাস্ত্রের মর্মার্থকে ধারণা করার চেষ্টা করেন, ইষ্ট চিন্তনও জ্ঞানের মধ্যে পড়ে, এগুলো সত্ত্বগুণের লক্ষণ। তপস্যা আর জ্ঞান দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। শৌচম্, নিয়মিত স্নান করা, কাপড় জামা পরিষ্কার রাখা সব শৌচের মধ্যে পড়ে, শৌচ না থাকলে সত্ত্বগুণ হবে না। ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম ক্রিয়া, আত্মচিন্তন অর্থাৎ পরমাত্মার চিন্তা করা এগুলো সব সত্ত্বগুণের লক্ষণ। রজো গুণের লক্ষণ বলছেন –

আরম্ভরূচি তাহৈর্ধৈর্যমসৎকার্যপরিগ্রহঃ।

বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্।।১২/৩২

রজোগুণীরা যখন কোন কর্ম শুরু করে তখন সে কর্ম ফলের আশা করেই কাজটা আরম্ভ করে। এদের ধৈর্যের খুব অভাব থাকে। একবার এই কাজ করছে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাজে জড়িয়ে পড়ছে, সব সময় এটা করলে কি হয় দেখি, ওটা করলে কি হয় দেখি। অসৎকার্যপরিগ্রহঃ, মাঝে মাঝে ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করে বসে। বিষয়োপসেবা, সব সময় ইন্দ্রিয়ের আসক্তি হেতু বিষয়ের মধ্যে পড়ে থাকে। এগুলো রাজসিক লোকের লক্ষণ। আর তামসিকদের লক্ষণ হল –

লোভঃ স্বপ্নোহৃতিঃ ক্রৌর্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিকা।

যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্।।১২/৩৩

তামসিক লোকদের মধ্যে লোভ থাকবে, কিভাবে প্রচুর জিনিষ সংগ্রহ করা যাবে সব সময় চিন্তা করে যাচ্ছে। প্রচুর ঘুমাবে, অধৈর্য, ক্রুরতা, যদি কারুর উপর রেগে যায় তো তাকে নাশ করে দেবে, নাস্তিকতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, ভিন্নবৃত্তিকা, নিজের বৃত্তি ছাড়া সব বৃত্তি করবে এমনকি নিত্যকর্মও করে না। যাচিষ্ণুতা, সবার কাছে সব কিছু চেয়ে বেড়াবে, আপনার এটা কি সুন্দর আমাকে দেবেন, এগুলো তমোগুণের লক্ষণ। প্রমাদশ্চ, জ্ঞান পরিষ্কার নয়। এই আটটি তামসিক লোকদের লক্ষণ – লোভ, নিদ্রালুতা, অধৈর্য, ক্রুরতা, নাস্তিকতা, ভিন্নবৃত্তি অবলম্বন, চেয়ে বেড়ানো আর প্রমাদ। এরপর সংক্ষেপে তিনটে গুণের লক্ষণ কেমন হয়। প্রথমে তমোগুণের লক্ষণ –

যৎ কর্ম কৃত্বা কুর্বংশ্চ করিষ্যাৎশৈব লজ্জতি।

তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্বং তামসং গুণলক্ষণম্।।১২/৩৪

যে কাজটা করে লোক ভবিষ্যতে লজ্জা পায়, ছিঃ আমি কি করেছিলাম, এটা হল তামসিক গুণের লক্ষণ। যেমন আমি যখন পেছনের দিকে ফিরে তাকাব তখন দেখতে পাবো জীবনে আমি এমন অনেক কিছু করেছি যার কথা মনে পড়লে এখন লজ্জা পায়। এটাই তামসিকতার লক্ষণ।

যেনাস্মিন্ কৰ্মাণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুঙ্কলাম্।

ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়স্তু রাজসম্।।১২/৩৬

যখন মানুষ আসক্ত হয়ে কোন কাজ করে ইহলোকে প্রচুর নাম-যশ কামনা করে, অথচ সেই কাজ না করা হলে কেউ আফশোসও করবে না, তখন এটাকে রজোগুণের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

যৎ সৰ্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।

যেন তুষ্যতি চাত্মস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্।।১২/৩৭

যে কাজের দ্বারা মানুষ জানতে চায় বুঝতে চায় আর যে কাজ করে মানুষ এতটুকু লজ্জিত বোধ করে না এবং যে কাজ করে মানুষের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, এটাই সত্ত্বগুণের লক্ষণ। এটাই সাত্ত্বিক কর্ম। আচার্য শঙ্করও ঠিক একই কথা বলছেন – যে কাজ সর্ব সমক্ষে সম্পন্ন করা যায়, যে কাজ করে লজ্জা বোধ হয় না আর নিজের আত্মা সন্তুষ্ট হয়, এই কাজগুলোই ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক কর্ম। পূজো করতে জপ-ধ্যান করতে কেউ লজ্জা পায় না তাই এগুলোকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। যে কাজের পেছনে নাম-যশ পাওয়ার বাসনা থাকে সেই কর্ম রাজসিক কর্ম আর যে কাজগুলো করে ভবিষ্যতে লজ্জিত ও কুণ্ঠাবোধ হয় সেই কর্মগুলো তামসিক কর্ম। কর্মের এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতে হয়। এরপরে বিরাট লম্বা তালিকা দিয়ে বলছেন এই তিনটে গুণের আধিক্য অনুযায়ী কার কি গতি হয়।

যদি মানুষের সাত্ত্বিক গতি হয় তখন সে দেবতাদি হয়ে জন্ম নেয়। মাঝা মাঝারি থাকলে মানুষ হয়ে জন্মায়। আর তমোগুণের আধিক্য থাকলে তির্যকাদি গতিপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নগামী হয়। যত রকমের প্রাণী আছে এদের মধ্যে তামসিক গতি কোনটা, রাজসিক গতি কোনটা আর সাত্ত্বিক গতি কোনটা, এইভাবে এক এক করে বলে যাচ্ছেন। যেমন –

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দান্তিকাঃ।

রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীযুত্তমা গতিঃ।।১২/৪৪

যারা চারণ, চারণ মানে আগেকার দিনে যারা রাজাদের গান শুনিয়ে ঘুম থেকে তুলত বা গান শোনাত, রাজার ভাঁড়, যারা কপট, ভেতরটা সব সময় চালাকিতে পূর্ণ, রাক্ষস এবং পিশাচ এদের উত্তম তামসিক গতি হয়। ‘উত্তম তামসিক গতি’ এটা আবার খুব লক্ষণীয়। তামসিক ভাবাপন্ন লোকেরা সব সময় তির্যকগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তামসিকদের মধ্যে যদি সে একটু ভালো হয় তাহলে সে মানুষ হয়ে জন্ম নেবে। জন্মে হয়তো অপরের মোসায়েরী করে বেড়াবে। যদি দেখা যায় ভেতরে খুব ছল-কপটতা আছে তাহলে বুঝতে হবে এরা তামসিক কিন্তু বাঘ-সিংহ না হয়ে মানুষ যোনি পেয়ে এদের উত্তম তামসিক গতি হয়েছে। এইভাবে বিরাট একটা লম্বা তালিকা দিয়ে গেছেন। সাত্ত্বিক গতি কি রকম হয় –

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।

নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ।।১২/৪৮

বাণপ্রস্থি, তপস্বী, পরিব্রাজক প্রভৃতি সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারি কিছু কিছু দেবতা, নক্ষত্র, দৈত্য যেমন প্রহ্লাদাদি এদের সব সময় প্রথমা সাত্ত্বিকী গতি হয়। প্রথমা সাত্ত্বিকী গতি বলতে সাধারণ সাত্ত্বিকী গতি। এর থেকে ভালো গতি যাদের হয় তাঁদের বলছেন দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতি –

যজ্ঞান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীর্ষি বৎসরাঃ।

পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ।।১২/৪৯

যাঁরা যাজ্ঞিক, ঋষি, দেবগণ, ঋগ্বাদি জ্যোতিষ্কগণ, পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ এনাদের আরও উচ্চ সাত্ত্বিক গতি লাভ হয়। সাত্ত্বিক মানে যে সবাই একই ধরণের সাত্ত্বিক গুণের হবে তা নয়, সাত্ত্বিকের মধ্যে আবার উচ্চ নীচ স্তর আছে। আর উত্তম সাত্ত্বিক গতি লাভ করেন –

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ।

উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাল্হর্মনীষিণঃ।।১২/৫০

ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টা, মরীচি আদি সপ্তর্ষিরা, প্রজাপতিগণ, ধর্ম, মহত্ত্ব অর্থাৎ মহৎ এবং অব্যক্ত মানে প্রকৃতি এই সমস্ত গতি প্রাপ্তিকে মনীষিরা উত্তম সাত্ত্বিকী গতি বলেন। যাঁরা ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ তাঁদের উদ্দেশ্য হল একেবারে উচ্চ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া। যদি সন্ন্যাসীও হন, ব্রাহ্মণও যদি হন তাহলেও সেটা শ্রেষ্ঠ গতি নয়, কারণ তার উপরেও আছে। ব্রহ্মা হলেন শেষ কথা, ব্রহ্মলোক হল শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম লোক। এই রকম অনেক কিছু বর্ণনা করে মনু আস্তে আস্তে আরও গভীরে প্রবেশ করছেন, যেমন এই শ্লোকে বলছেন –

মুক্তির সাধন

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।

অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।।১২/৮৩

একই ভাব মনু বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন। এখান পরমনিঃশ্রেয় সাধন মানে মুক্তির সাধন কিভাবে হবে বলছেন। নিয়মিত বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, জ্ঞান মানে শুধু বেদ মুখস্ত করলেই হবে না বেদের যে জ্ঞান সেটাকে সব সময় নিদিধ্যাসন করাটাই জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা আর গুরুসেবা এই ছটিকে বলা হয় মোক্ষসাধন – বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা। অন্যান্য শাস্ত্রে অন্য রকম পাওয়া যাবে কিন্তু মনু এই ছটিকেই মোক্ষসাধন বলছেন।

এতক্ষণ ধরে মনু পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, বর্ণ-অবর্ণ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির আলোচনা করে করে এখানে এসে মোক্ষসাধনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে স্মৃতিশাস্ত্র মোক্ষের কথা বেশী আলোচনা করে না। কিন্তু স্মৃতি আবার শাস্ত্র, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল মুক্তির পথ দেখান। মনু তাই এখানে মুক্তির পথও দেখিয়ে দিচ্ছেন। যে কার্য ও জিনিষগুলো দিয়ে মানুষ ব্রাহ্মণ হয়, সেটাকেই বিশেষ ভাবে অনুশীলন করলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি করতে হলে উপনিষদের জ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে, কেননা এখানে বলেই দিচ্ছেন জ্ঞানম্। আর উপনিষদ বলেই দিচ্ছে মোক্ষ কোন কর্ম দ্বারা হয় না, জ্ঞান যখন হয়ে যাবে তখনই মুক্তি হবে। তাপরের শ্লোকটা আমরা অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় শুনে আসছি –

সুখাভ্যুদয়িকধৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।।১২/৮৮

বেদ আমাদের দুটি ধর্মের শিক্ষা দিচ্ছে – প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম আমাদের এই জগতের সুখ দেবে আর মৃত্যুর পর স্বর্গাদির সুখ প্রদান করবে। আর নিবৃত্তিমূলক ধর্ম আমাদের মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর যখন গীতাভাষ্য লিখছেন তখন তিনি এই শ্লোকটাকে আধার করেই শুরু করছেন।

প্রবৃত্তং কর্ম সংসেব্য দেবানামেতি সম্যতাম্।

নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভূতান্যতোতি পঞ্চ বৈ।।১২/৯০

মানুষ যখন প্রবৃত্ত কর্ম পালন করে অর্থাৎ যখন বিধি পালন করা হয় তখন সে ধীরে ধীরে দেবতাদের সমান হয়ে যায়। এই শ্লোকের মজার জিনিষ হল প্রথমে বলছেন প্রবৃত্ত কর্ম কিন্তু পরের লাইনে নিবৃত্ত কর্ম না বলে সেবমানস্ত বলছেন। নিবৃত্ত মানে ত্যাগ সেইজন্য নিবৃত্ত কর্ম হয় না। প্রবৃত্তি সব সময় কর্মের সঙ্গে জুড়ে থাকবে কিন্তু নিবৃত্তি কর্ম ছাড়া, তাই বলছেন নিবৃত্ত সেবী। শাস্ত্রে যে আদেশ করা হয়েছে, যে বিধি পালন করতে বলা হয়েছে সেগুলোকে পালন করলে মানুষ ধীরে ধীরে দেবতাদের মত সুখ পায়। যাঁরা নিবৃত্ত সেবী, যাঁরা ত্যাগের পথে চলে গেছেন তাঁরা ভূতানাতেতি পঞ্চ বৈ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই যে পঞ্চভূত আছে, এই পঞ্চভূতকে তাঁরা ধীরে ধীরে অতিক্রম করে চলে যান। এর ফলে কি হয় –

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।।১২/৯১

গীতাতে এর উপর খুব সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে। এখানে বলছেন, তিনি যখন সমস্ত ভূতের মধ্যে নিজেকে দেখেন আর সমস্ত ভূতকে নিজের আত্মাতে দর্শন করেন তখন এনারা আত্মযাজী হয় যান। আত্মযাজী মানে, এনারা কোন ধরণের যজ্ঞ করেন না, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ এই ভাব যাঁদের তাঁদের আত্মযাজী বলে। তখন এঁদের কি হয়? স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি, স্বারাজ্য মানে নিজের যে আসল স্বরূপ সেটা পেয়ে যান, এঁদের আর আসা-যাওয়া করতে হয় না। এর উপর আবার বলছেন –

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোহন্যানি কানিচিৎ।

তান্যররবাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ।।১২/৯৬

এই জগতে বেদই একমাত্র শাস্ত্র। বেদের বাইরে যা কিছু রচনা আছে সেগুলো রচিত হয়, রচিত হয়ে কিছু দিন থাকে তারপর সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে কালের গহুরে বিলীন হয়ে যায়, বেদই একমাত্র থেকে যায়। যে জিনিষগুলো বিনাশশীল সেগুলো অসত্য এবং নিষ্ফল। বেদ বলতে আজকে আমরা জানি ব্যাসদেব যে পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছেন ওইটুকুই বেদ। কিন্তু বেদকে এইভাবে বাঁধা যায় না। বেদ মানে যেখানে জগতের যে সত্য গুলো সংরক্ষিত আছে। জগতের সত্যগুলোকে একটা কি দুটো বাক্যেই নিয়ে আসা যায়। যত নাটক, উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস এগুলো রচিত হচ্ছে কিছু দিন পরে হারিয়ে যাবে। কিন্তু যে কবিতা বা উপন্যাস বা নাটক জগতের সত্যকে, জীবন যে সত্যকে আধার করে চলছে, সেগুলোকে অবলম্বন করে রচিত হয় সেই সাহিত্য নিষ্ফল হবে না, কোন দিন হারিয়ে যাবে না। একমাত্র বেদ, যেটা ঠিক ঠিক জ্ঞান এটাই থাকবে আর বাকি সব নষ্ট হয়ে যাবে। বেদের কি বৈশিষ্ট্য –

চাতুর্বর্ণ্যাং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বরশ্চশ্রমাঃ পৃথক্।

ভূতং ভব্দ্ভবিষ্যঞ্চ সর্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি।।১২/৯৭

চারটে বর্ণ, তিনটে লোক আর চারটে আশ্রম এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটে কাল এই সব কিছু বেদ দিয়ে জানা যায়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, আমাদের বর্ণাশ্রম বেদেই প্রতিষ্ঠিত, বেদ না থাকলে বর্ণাশ্রমের কোন গুরুত্বই নেই। তাই যারা বেদ মানে না তারা বর্ণাশ্রমকেও মানবে না। মনু প্রথম থেকেই বার বার বেদের মাহাত্ম্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন।

যথা জাতবলো বহ্নির্দহত্যাদ্রানপি দ্রুমান্।

তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্মজং দোষমাত্মনঃ।।১২/১০১

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন ভেজা পাতা, কাঁচা কাঠ সবই পুড়িয়ে দেয় ঠিক তেমনি বেদজ্ঞাতা যিনি তাঁর সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একই ভাব মনু বার বার বলে বলে সবাইকে উৎসাহিত করছেন যাতে সবাই বেদের জ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্নশীল হয়।

অজ্ঞেভ্যো গ্রহ্নিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রহ্নিভ্যো ধারিণো বরাঃ।

ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।।১২/১০৩

এই শ্লোকটিও খুব উল্লেখনীয় একটি শ্লোক। যারা অজ্ঞ তাদের থেকে যাঁরা গ্রহ্ন পড়েছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ। যাঁরা সমস্ত গ্রহ্ন পড়েছেন তাঁদের তুলনায় যাঁরা গ্রহ্নকে ধারণ করে আছেন, মানে মুখস্ত করেছে তাঁরা অনেক শ্রেষ্ঠ। যাঁরা সমস্ত গ্রহ্নকে মুখস্ত করে আছে তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন জ্ঞানী। জ্ঞানী মানে শাস্ত্রের অর্থ অর্থাৎ শাস্ত্র কি বলতে চাইছে ঠিক ঠিক বুঝে গেছেন। কিন্তু এই জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা এই জ্ঞানের অনুশীলন করছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠতম, এঁরাই বিজ্ঞানী। এখানে ব্যবসায়ী শব্দ নেওয়া হয়েছে কিন্তু ঠাকুরের ভাষায় এঁরা বিজ্ঞানী। তাহলে প্রথমে অজ্ঞ যারা কিছু জানেই না, দ্বিতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, তৃতীয় শাস্ত্র মুখস্ত, চতুর্থ জ্ঞানী, শাস্ত্রের অর্থ তাঁর কাছে স্পষ্ট। আর সব শেষে যাঁরা এই জ্ঞানকে জীবনে অনুশীলনের দ্বারা করে প্রয়োগ করছেন তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম। পরের শ্লোকে বলছেন –

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।

তপসা কিল্বিষং হস্তি বিদ্যাহমৃতমশ্বতে।।১২/১০৪

একই কথা বলছেন, তপস্যা আর বিদ্যাই পরমনিঃশ্রেয়স সাধন। ব্রাহ্মণদের তাই তপস্যা আর জ্ঞানই একমাত্র সাধন। যাঁরাই শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন তাঁরাই ব্রাহ্মণ, ভেতরে ব্রাহ্মণত্ব না থাকলে কেউ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেই পারবে না, দুদিন পড়লে তৃতীয় দিন সে শাস্ত্র থেকে দশ হাত দূরে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সুতরাং যাঁরাই শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন তাঁদের জন্য মোক্ষ সাধনের পথ হল তপস্যা আর জ্ঞান। তপস্যাতে কিল্বিষং হস্তি, সমস্ত পাপের নাশ হয়ে যায়। আর বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ সাধন হয়, বিদ্যা মানে এখানে বেদের জ্ঞান। প্রথমে পাপকে নাশ করতে হবে, পাপ নাশ করা মানে আবর্জনা গুলোকে নাশ করতে হবে, এই আবর্জনা ভেতরে জমে আছে বলে আমাদের মন সব সময় চঞ্চল, বাক্ চঞ্চল, ইন্দ্রিয় চঞ্চল। এই পাপকে কিভাবে নাশ করতে হবে? আবর্জনাগুলো কিভাবে পরিষ্কার হবে? তপস্যার দ্বারা। তপস্যা আবার তিন প্রকার – কায়িক, বাচিক ও মানসিক। মৌন, খাওয়া-দাওয়া কম করা আর প্রাণায়াম, সংক্ষেপে বলতে গেলে এগুলোই তপস্যা। এই তিনটে অভ্যাস করলে পাপগুলো কেটে যায়। আর বিদ্যা অর্থাৎ বেদের জ্ঞান চর্চা করলে পরমনিঃশ্রেয়সতা লাভ হয়, মানে ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমনম্।

ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।।১২/১০৫

বেদান্তে ষট্‌প্রমাণের কথা বলা হয়। মনু এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ ও শাস্ত্র প্রমাণ এই তিনটে প্রমাণকে শ্রেয় বলে মনে করছেন, আর এর পরে যে প্রমাণের কথা বলা হয় সেগুলো তিনি মানেন না। আমাদের জীবনেও সচরাচর এই তিনটেকেই মানা হয়। কিন্তু বেদান্তে, বিশেষ করে যখন ঘোর বেদান্তে নামবে তখন অভাব প্রমাণ, উপমান প্রমাণ এগুলোকে যদি না নেওয়া হয়, তখন বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করতে গিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে।

ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।

ত্র্যবরা পরিযজ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে।।১২/১১২

আমাদের যত শাস্ত্রাদি আছে সব শাস্ত্রই বেদের অর্থ নিরূপণ করাকে आधार করে রচিত হয়েছে, বেদ কি বলতে চাইছে। যদি কখন ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ অধ্যয়ন করার সময় বেদের অর্থ বা তত্ত্বের সংশয় উৎপন্ন হয় তখন তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মিলে যেটা বলবেন সেটাই অর্থ। যদিও বলছেন তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মিলে যেটা বলবেন সেটাই বেদের অর্থ হবে, কিন্তু এই জায়গাতেই তিনজন কখনই এক অর্থ

করবেন না, তাঁদের মত একজনের সাথে আরেকজনের মিলবে না। এই কারণেই হিন্দুদের এত দর্শনের জন্ম হয়েছে। আবার বলছেন –

একোহপি বেদবিক্রমং যং ব্যবস্যেদ্বিজোত্তমঃ।

স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোহ্যুতৈঃ।।১২/১১৩

কিন্তু কোন কারণে যদি মুর্থ অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা করে বলে দেয় বেদে এটা বলতে চাইছে, তখন সেই অর্থকে কোন ভাবেই মানা যাবে না। যদি তিন জন ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তখন একজনও যদি বেদবিৎ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ থাকেন তখন তিনি যে অর্থটা বলে দেবেন সেটাই মানতে হবে, তাকেই যথার্থ ধর্ম বলে মানতে হবে। মুর্থদের ঠিক করে দেওয়া ধর্ম কোন ধর্মই নয়। শেষের দিকে মনু বলছেন –

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।

স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্।।১২/১২৫

যত বিধি পালনের কথা বলা হয়েছে, সব বিধি পালন করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিল, তপস্যা করে নিজের সব পাপকে পুড়িয়ে দিল আর জ্ঞান চর্চা করে কাউকে অহিংসা না করে উপরে উঠে এল। এরপরে তিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত সেই আত্মাকে আত্মা দ্বারা দর্শন করেন। কারণ আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জানা যায় না। ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ হয়। যখন বোধে সেই আত্মাকে বোধ করেন তখন তিনি পরমপদ ব্রহ্মপদ মোক্ষ প্রাপ্তি করেন। শেষ শ্লোকে বলছেন –

ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।

ভবত্যাচারবান্ধিত্যং যথেষ্টাং প্রাপুয়াদ্গতিম্।।১২/১২৬

বলছেন, ভৃগুমুনির মুখবিনির্গত এই মানবধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুস্মৃতি যিনি অধ্যয়ন করেন, যিনি অধ্যয়ন করান, মানে পালন করার অর্থে বলছেন, তাঁরা অবশ্যই স্ব স্ব অভিলক্ষিত উৎকৃষ্ট গতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করেন। মনুস্মৃতি পালন করে একদিকে সদাচারী হওয়া যায় আবার এই স্মৃতিশাস্ত্রকে পুরোদমে অনুশীলন করলে তাঁর মোক্ষ লাভও হয়ে যাবে। তার মানে মনুস্মৃতি আমাদের ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটে দিয়ে একজন সদাচারী ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দেবে আর শেষের দিকে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো পালন করলে মোক্ষ দেবে। মনুস্মৃতি চারটে পুরুষার্থ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই কথা বলে এখানেই আমরা মনুস্মৃতির আলোচনা শেষ করছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

।।ওঁ শ্রীরামাকৃষ্ণার্পণমস্তু।।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	পুরুষার্থ	১
৩	হিন্দু ধর্মের চারটি মূল স্তম্ভ	৩
৪	বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের মৌলিক পার্থক্য	৩
৫	বেদই মনুস্মৃতির আধার	৪
৬	আইন প্রণয়নের ইতিহাস ও আইনের উদ্দেশ্য	৫
৭	ধর্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য	৬
৮	ধর্মশাস্ত্র এবং আইনশাস্ত্রের পার্থক্য	৭
৯	ভারতের বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র	৮
১০	মনুর ইতিহাস	৯
১১	মনুস্মৃতির সময়কাল	১০
১২	ধর্মের কথা কোথা থেকে জানা যায়	১১
১৩	ধর্মশাস্ত্রের কাজ	১১
১৪	ব্রাহ্মণের সম্মান কেন	১২
১৫	মনুর কয়েকটি মৌলিক চিন্তা-ভাবনা	১৫
১৬	স্মৃতির দর্শন	১৬
১৭	বৈষম্যই জগতের ধর্ম	১৯
১৮	বর্ণাশ্রম, কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ	২০
১৯	ধর্মশাস্ত্রই প্রমাণ	২৩
২০	স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়	২৪
২১	হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্মের আচার বিধি	২৫
	প্রথমোহধ্যায়	৩৪-৫৩
২২	মনুস্মৃতির সৃষ্টি প্রকরণ	৩৪
২৩	বিভিন্ন যুগের ধর্ম	৪৩
২৪	প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে	৪৪
২৫	স্মৃতিশাস্ত্রের ষোড়শ সংস্কারের উদ্দেশ্য	৪৪
২৬	স্মৃতিশাস্ত্রের ষোলটি সংস্কার	৪৮
	দ্বিতীয়োহধ্যায়	৫৩-৮১
২৭	বেদকে কেন শ্রুতি বলা হয়	৫৩
২৮	সদাচারের সংজ্ঞা	৫৪
২৯	বিভিন্ন বর্ণের জাতকের নামকরণ বিধি	৫৭
৩০	নারীদের সংস্কার কিভাবে হত	৫৮

৩১	ব্রহ্মচারীর কয়েকটি ব্রত	৫৯
৩২	শূদ্র ও নারীর প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ	৬০
৩৩	স্মৃতিশাস্ত্রে পাপ থেকে মুক্তির উপায় ও প্রণবের মাহাত্ম্য	৬১
৩৪	ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে দূরে থাকা, নাকি ভোগ মিটিয়ে নেওয়া?	৬৩
৩৫	জপ-ধ্যানের উদ্দেশ্য	৬৫
৩৬	বেদবিদ্যা লাভের যোগ্যতার বিচার	৬৬
৩৭	গুরুজনরা সামনে এলে উঠে দাঁড়ানোর রীতি	৬৯
৩৮	পথ ছেড়ে সম্মান দেওয়ার পর্যায়ক্রম	৬৯
৩৯	তুমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, সংস্কারের দ্বারা সুসংস্কৃত হয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও	৭০
৪০	আচার্য কত রকমের এবং মায়ের স্থান	৭২
৪১	আচার্য পিতার থেকে শ্রেষ্ঠ কেন	৭৩
৪২	ঈশ্বরের প্রার্থনা ব্যতিরেকে সন্তান সমাজের অভিশাপ	৭৪
৪৩	চারটি বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব নিরূপণ	৭৪
৪৪	শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ	৭৫
৪৫	সম্মান ও অপমানকে ব্রাহ্মণ কি ভাবে দেখবে	৭৬
৪৬	ব্রহ্মচারীর মুখ্য কর্ম	৭৮
৪৭	ব্রহ্মচারীর কিছু বিধি-নিষেধ	৭৯
৪৮	নারীর ব্যাপারে ব্রহ্মচারীর প্রতি কিছু সাবধান বাণী	৮০
	তৃতীয়োহধ্যায়ঃ	৮২-৯৫
৪৯	বেদ অধ্যয়নের সমাপ্তি কাল	৮২
৫০	বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারীর স্বগৃহে আগমন ও তার যোগ্য ভাবী স্ত্রীর লক্ষণাদি নিরূপণ	৮৩
৫১	বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ	৮৫
৫২	নারীজাতির প্রতি সম্মানেই পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণ	৮৮
৫৩	কুলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয় বিদ্যাচর্চা দ্বারা	৮৯
৫৪	পঞ্চ মহাযজ্ঞ	৮৯
৫৫	গৃহস্থশ্রম বাকি তিনটে আশ্রমের প্রাণবায়ু	৯১
৫৬	নির্ধনও অতিথি সেবা করতে পারে – অতিথি কে এবং কে অতিথি নয়	৯২
৫৭	শ্রাদ্ধাদি কর্ম	৯৪
	চতুর্থোহধ্যায়ঃ	৯৫-১৪৬
৫৮	উত্তম, মধ্যম, সাধারণ ও সর্বোত্তম জীবিকা	৯৬
৫৯	সন্তোষেই পরম সুখ	৯৭
৬০	ব্রাহ্মণ কিভাবে কর্ম করবে	৯৮
৬১	মনের চাঞ্চল্যতাই আসক্তির লক্ষণ	৯৯
৬২	মানুষের আচরণ ঠিক হয় পাঁচটি জিনিষকে কেন্দ্র করে	১০০

৬৩	বুদ্ধির বিকাশ, অর্থ বৃদ্ধি এবং হিত সাধনের উপায়	১০১
৬৪	কোন ধরনের অতিথিকে সেবা করতে নেই	১০৩
৬৫	মনুস্মৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আত্মহিত	১০৪
৬৬	অপরের ব্যবহৃত জিনিস কখনই কেন ব্যবহার করতে নেই	১০৯
৬৭	নিরাপত্তার জন্য যেগুলো পালনীয়	১১১
৬৮	মনুস্মৃতিতে রাজার স্থান কত নীচে	১১৩
৬৯	মানুষ আয়ু, প্রজ্ঞা, কীর্তি ও ব্রহ্মতেজ কিভাবে লাভ করবে	১১৩
৭০	বেদ অধ্যয়নের বিধি-নিষেধ	১১৫
৭১	স্নানের বিধি-নিয়ম	১১৭
৭২	কি ধরনের মানুষ থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে	১১৭
৭৩	পরজী সঙ্গের পরিণতি	১১৯
৭৪	নিজের ও অপরের মঙ্গলার্থে কি কি কাজ করতে নেই	১২১
৭৫	এই জীবন একটা মহৎ সুযোগ, অনুশোচনা না করে এই সুযোগকে কাজে লাগাও	১২১
৭৬	সনাতন ধর্মের পালন	১২২
৭৭	গৃহের মঙ্গলের জন্য কি কি করণীয়	১২৫
৭৮	মানুষ কিভাবে জাতিস্মার হয়	১২৬
৭৯	সমস্ত কর্মই ধর্মভাবে করতে হবে	১২৯
৮০	সদাচারের প্রশংসা	১২৯
৮১	অন্তরাত্মা যে কাজে প্রসন্ন হন সেটাই সদাচার	১৩০
৮২	মানুষ নিজের দুঃখকে নিজেই কত ভাবে ডেকে আনে	১৩২
৮৩	ধর্ম ও অধর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না	১৩৩
৮৪	শরীরের অঙ্গ দিয়ে যে কাজগুলো করতে নেই	১৩৫
৮৫	যে পথ অবলম্বন করলে কষ্ট কম হয়	১৩৫
৮৬	কাদের সাথে বিবাদ করতে নেই	১৩৬
৮৭	মনুস্মৃতিতে উপনিষদের প্রভাব	১৩৭
৮৮	দানের প্রসঙ্গে মনুস্মৃতি	১৩৯
৮৯	যম-নিয়মের অনুশীলন	১৪০
৯০	অগ্নির শুদ্ধি-অশুদ্ধি	১৪১
৯১	বিভিন্ন দানের ফল	১৪২
৯২	তপস্যা প্রসঙ্গে	১৪৩
৯৩	ধর্ম সঞ্চয় করে যাও, একমাত্র ধর্মই তোমার সাথে যাবে	১৪৪
৯৪	আত্মার অপহরণ করা নিন্দনীয়	১৪৫
	পঞ্চমোহধ্যায়ঃ	১৪৬-১৬১
৯৫	ব্রাহ্মণের যদি চারটি দোষ থাকে	১৪৬
৯৬	ঈশ্বরে অনিবেদিত অন্ন বৃথা	১৪৭

৯৭	মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সূতির বিধান	১৪৮
৯৮	কোন্ কোন্ জিনিষ শুদ্ধি করে	১৫১
৯৯	নারী স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মনু	১৫৬
১০০	নারীর ধর্ম ও তার কয়েকটি গুণ	১৫৮
১০১	সন্তান দ্বারা নয়, তপস্যার দ্বারাই মানুষ স্বর্গ লাভ করে	১৬০
	ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ	১৬১-১৮৩
১০২	বাণপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম	১৬১
১০৩	মানুষের কত রকমের ঋণ	১৬৪
১০৪	সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্ম	১৬৪
১০৫	শ্রেষ্ঠ আশ্রম ও ধর্মের দশটি লক্ষণ	১৮১
	সপ্তমোহধ্যায়ঃ	১৮৩-১৯৯
১০৬	রাজধর্ম	১৮৩
১০৭	পবিত্র ও ভালো মানুষ জগতে অতি দুর্লভ	১৮৬
১০৮	অপদার্থ রাজার লক্ষণ	১৮৭
১০৯	রাজার যশ ও অপযশ কিভাবে হয়	১৮৯
১১০	রাজার কয়েকটি দোষ	১৯০
১১১	রাজার চারটে নীতি	১৯২
১১২	রাজা বেঁচে থেকেও মৃত	১৯৪
১১৩	কাদের উপস্থিতিতে রাজা গোপন মন্ত্রণা করবে না	১৯৪
১১৪	কাজ করার আগে রাজাকে তিনটে জিনিষকে আগে জানতে হয়	১৯৫
১১৫	রাজনীতি ও জীবনের মূল নীতি	১৯৫
১১৬	দৈব ও কর্ম প্রচেষ্টা	১৯৬
১১৭	রাজাকে যে চারটে জিনিষকে সব সময় রক্ষা করে যেতে হবে	১৯৭
	অষ্টমোহধ্যায়ঃ	১৯৯-২১৩
১১৮	বিবাদের কারণ	১৯৯
১১৯	বিচারসভায় অধর্মের ফল	২০০
১২০	ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাকে রক্ষা করে	২০০
১২১	বৃষভ ও বৃষল	২০১
১২২	মানুষের একমাত্র সুহৃৎ তার ধর্ম	২০২
১২৩	বিচার করার সময় বিচারককে কি কি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে	২০৩
১২৪	রাজার কয়েকটি দায়িত্ব	২০৪
১২৫	কারা সাক্ষী হতে পারবে না	২০৫
১২৬	পাপী কখনই পাপকে লুকোতে পারবে না	২০৬
১২৭	সাক্ষীকে কখন মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হবে	২০৬
১২৮	সাক্ষী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে কি করে বোঝা যাবে	২০৮
১২৯	যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা ভাষণ দোষের নয়	২০৮

১৩০	মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য সাক্ষীর শাস্তির বিবিধ বিধান	২০৯
১৩১	গুণীলোকের প্রতি রাজা কিভাবে দণ্ড বিধান করবে	২০৯
১৩২	মালিকানা কখন হবে এবং কখন হবে না	২১০
১৩৩	বিবাহ বিষয়ক কিছু ধারণা	২১০
১৩৪	বর্ণানুযায়ী জরিমানার হার নিরূপণ	২১০
১৩৫	কানাকে কানা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ	২১১
১৩৬	অপরের পাপ কিভাবে অন্যের উপর চলে আসে	২১১
১৩৭	মনুস্মৃতির বিভিন্ন সামাজিক বিধান (পাপ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়, রাজার পাপের দণ্ড এক হাজার গুণ বেশী, সামাজিক মর্যাদানুযায়ী পাপের শাস্তি, আততায়ীর সংজ্ঞা, পরস্পরের সাথে কিভাবে সংগ্রহণ হয়, ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড কিভাবে হবে)	২১১
	নবমোহধ্যায়ঃ	২১৩-২৩৫
১৩৮	নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে মনুর দৃষ্টিভঙ্গী	২১৩
১৩৯	স্ত্রীকে রক্ষা করলে সব কিছু রক্ষিত হয়	২১৪
১৪০	‘জায়া’ শব্দের ব্যাখ্যা	২১৬
১৪১	জাগ্রত ধর্মবুদ্ধিই নারীকে সুরক্ষা দেয়	২১৬
১৪২	নারীর চরিত্রহননে ছয়টি কারণ	২১৮
১৪৩	নারীর তিনটি দোষ	২২০
১৪৪	সৃষ্টির শুরুতেই ব্রহ্মাই নারী মানসিক গঠন তৈরী করে দিয়েছেন	২২০
১৪৫	নারী কেন প্রত্যেক গৃহে পূজ্যা	২২১
১৪৬	কোন কোন অবস্থায় স্ত্রী নিয়োগ বিধিতে সন্তানোৎপত্তি করতে পারে	২২২
১৪৭	স্বামী স্ত্রী একে অপরকে কোন অবস্থায় ত্যাগ করতে পারবে	২২৩
১৪৮	কোন কোন অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে	২২৩
১৪৯	মেয়ে কখন নিজে থেকে বিবাহ করতে পারবে	২২৪
১৫০	দেবতাদের কৃপাতেই নারী স্বামী লাভ করে	২২৬
১৫১	সংক্ষেপে দাম্পত্য ধর্ম	২২৭
১৫২	পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাজনের নিয়ম	২২৮
১৫৩	শ্রাদ্ধাদি কর্মে দৌহিত্রের অধিকার	২২৯
১৫৪	চার বর্ণের স্ত্রীদের সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ	২৩০
১৫৫	কত ভাবে সন্তান লাভ করা যায়	২৩১
১৫৬	স্ত্রীধনে কার কার অধিকার ও তার বিভাজন	২৩৩
১৫৭	স্ত্রীধন কিভাবে আসে	২৩৩
১৫৮	রাজধর্মের কয়েকটি অন্যান্য দিক	২৩৫
	দশমোহধ্যায়ঃ	২৩৬-২৪৬
১৫৯	এত উপাধি তৈরী হওয়ার কারণ	২৩৬
১৬০	বর্ণভ্রষ্ট বোঝা যাবে কি করে	২৩৬
১৬১	নারীর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আর পুরুষের মধ্যে ক্রুরতা	২৩৮

১৬২	বাবা-মার বর্ণ ও সংস্কারের উপরই সন্তান কেমন হবে নির্ভর করে	২৩৯
১৬৩	ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ম	২৪০
১৬৪	স্বধর্ম পালনই শ্রেয়	২৪০
১৬৫	ব্রাহ্মণের আপৎকালীন ধর্মের বিধান	২৪১
১৬৬	বিভিন্ন দোষযুক্ত কর্মে প্রায়শ্চিত্তের বিধান	২৪১
১৬৭	ন্যায়োপার্জিত সম্পদ	২৪২
১৬৮	জীবন নির্বাহের দশটি উপায়	২৪৩
১৬৯	শূদ্রের অধিকার	২৪৪
	একাদশোহধ্যায়ঃ	২৪৬-২৬৩
১৭০	দান সম্বন্ধীয় কিছু বিধান	২৪৬
১৭১	মনুর কাছে জীবনের মূল্য সব থেকে বেশী	২৪৭
১৭২	ব্রাহ্মণ কখন কাক শকুন হয়ে জন্মাতে থাকবে	২৫০
১৭৩	ব্রাহ্মণ কেন রাজার কাছে নালিশ করবে না	২৫০
১৭৪	কারা কারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করতে পারবে না	২৫২
১৭৫	প্রায়শ্চিত্ত কর্ম	২৫৩
১৭৬	ব্রত ও তপস্যাদি	২৫৫
১৭৭	ধর্ম আর পাপ গোপনে করলে বৃদ্ধি পায়	২৫৬
১৭৮	পাপের পরিভাষা	২৫৭
১৭৯	পাপ-পুণ্য বোধ ও মূল্যবোধ	২৬০
১৮০	দৈনন্দীন জীবনে মূল্যবোধের সহজ অনুশীলন	২৬০
১৮১	তপস্যার দ্বারাই সব কিছু সম্ভব আর তপস্যাই সুখের মূল	২৬১
	দ্বাদশোহধ্যায়ঃ	২৬৩-২৭০
১৮২	মানসিক, বাচসিক ও শারীরিক পাপ	২৬৩
১৮৩	সবাইকে যে তিনটে দণ্ড ধারণ করতে হয়	২৬৪
১৮৪	তিনটে গুণের লক্ষণ	২৬৫
১৮৫	মুক্তির সাধন	২৬৭